প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'প্রবন্ধ-সংকলন' দুই খণ্ডে বিভক্ত হ'লো : 'সমালোচনা' এবং 'রম্যরচনা ও ভ্রমণ'। প্রথম খণ্ডের আরম্ভে আছে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত পাঁচটি প্রবন্ধ, তারপর অন্যান্য ভারতীয় ও বৈদেশিক কবি ও শিল্পীদের বিষয়ে আলোচনা। ভারতীয় ভাষা-সমস্যা বিষয়ক একটি প্রবন্ধকেও এই অংশে স্থান দিয়েছি। দ্বিতীয় খণ্ডে একটি অনুল্লিখিত উপবিভাগ আছে ; তাতে প্রথম ছয়টি প্রবন্ধ রম্যরচনা পর্যায় থেকে, এবং পরবর্তী পাঁচটি আমার বিবিধ ভ্রমণবিবরণ থেকে সংকলিত হ'লো। উভয় উপবিভাগ স্বতন্ত্রভাবে রচনার কালক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে। প্রতি প্রবন্ধের শেষে আদি রচনার তারিখ, এবং রচনাটি আমার যে-পুস্তকে অন্তর্ভূত আছে তার নাম উল্লিখিত হ'লো।

কোনো-কোনো দীর্ঘ রচনা ঈষৎ সংক্ষেপিত. এবং আমার আদি-যুগের অনেক রচনা পরিমার্জিত আকারে প্রকাশ করা হ'লো ; যথাস্থানে তার উল্লেখ পাওয়া যাবে। 'কালিদাসের মেঘদূত' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে সংকলন করেছি শুধু প্রথম অংশ, যেখানে সংস্কৃত কবিতার সাধারণ চরিত্রলক্ষণ বিষয়ে আলোচনা আছে।

আমার বিভিন্ন প্রবন্ধপুস্তকগুলির অতীতে যাঁরা প্রকাশক ছিলেন ও যাঁরা বর্তমানে আছেন, এবং আমার 'কালিদাসের মেঘদূত' ও 'শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা' এই দুটি পুস্তকের যাঁরা প্রকাশক, এই উপলক্ষে তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাই।

বু. ব.

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড ॥ সমালোচনা

দ্বিতীয় খণ্ড ॥ রম্যরচনা ও ভ্রমণ

প্রথম খণ্ড

সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালি

যেন এক দৈব আবির্ভাব—অপর্যাপ্ত, চেষ্টাহীন, ভাস্বর, পৃথিবীর মহত্তম কবিদের অন্যতম : আমার কাছে, এবং আমার মতো আরো অনেকের কাছে, এ-ই হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর তুল্য ক্ষমতা ও উদ্যম ভাষার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, এমন ঘটনা ইতিহাসে বিরল : এবং ভাষাব্যবহারের দক্ষতায়, কবিতা ও গদ্যরচনায় যুগপৎ অনুশীলনে, বহু ভিন্ন-ভিন্ন বিষয় ও রূপকল্পের সার্থক প্রয়োজনায়—সব মিলিয়ে, অন্য দেশে বা কালে, তাঁর সমকক্ষ ক-জন আছে, বা কেউ আছেন কিনা, তা আমি অন্তত গবেষণার বিষয় ব'লে মনে করি। আমি যেহেতু বাঙালি, উপরন্তু সাহিত্যে সচেষ্ট, আর যেহেতু আমার কৈশোরকালে রবীন্দ্রনাথে নিমজ্জন ঘটেছিলো, তাই আমার কাছে এ-সব কথা তর্কাতীত। অন্যান্য বাঙালি—যাঁরা বয়সে আমার বড়ো বা ছোটো, এবং যাঁরা লেখক হওয়া দূরে থাক রবীন্দ্রনাথের বা সাহিত্যের পাঠক পর্যন্ত নন, কিংবা যাঁরা পাঠক হ'য়েও আমাকে সর্বান্তঃকরণে অপছন্দ করেন—এই একটা বিষয়ে তাঁরা সকলেই আমার সঙ্গে একমত ব'লে ধ'রে নেয়া যায় তাঁদের মতামতের মূল্য যা-ই হোক না। কেননা, রবীন্দ্রনাথ বাঙালির জীবনে এমনভাবে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন, এত বিভিন্ন দিক থেকে তাঁর দ্বারা আমরা অনবরত সংক্রান্ত, যে তাঁর শ্রেষ্ঠতা মেনে নিতে হ'লে তাঁর কবিতা বা কোনো কবিতা, প'ড়ে দেখার আর প্রয়োজন হয় না। চিন্তাহীন মাল্যচন্দনে আজ আবৃত তিনি, এক বিগ্রহ, তাঁর মাতৃভূমির নব্যতম 'অবতার'।

আর বিদেশে? অবাঙালির কাছে? বলতেই হবে আমরা যেটাকে স্বতঃসিদ্ধ ব'লে ভাবি, অন্যদের কাছে তা অতি অস্পষ্ট একটি অনুমান মাত্র। দান্তের কবিতা অনুবাদে প'ড়ে জগতের লোক আনন্দিত ; জর্মানিতে এমন দিন যায় না যেদিন কোনো-না-কোনো নগরে 'জর্মান কবি' শেক্সপীয়রের অভিনয় না হচ্ছে ; যাঁরা আমার চেয়ে অনেক বেশি বিদগ্ধ হ'য়েও চীনে ভাষায় আমারই মতো নিরক্ষর, এমন অনেকে লি-পোকে মহাকবি ব'লে অনুভব করেছেন : কিন্তু জগতের পটভূমিকায় কবি রবীন্দ্রনাথের কোনো চিহ্ন নেই। এই শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে জগৎ তাঁকে যে-অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো, তা ভারতের অতীত গৌরবেরই মতো, আজ নিতান্ত স্মৃতিকথায় পর্যবসিত। কেন এমন

ক্রত হ'লো তাঁর অবক্ষয়, আর আপাতত এমন আশাহীন, কেন তাঁর মৃত্যু অথবা শতবার্ষিকীও তা থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে পারলে না? শতবার্ষিকীর ব্রতপালনে সভ্য জাতিরা পরাঙ্মুখ হননি; আমাদের এই 'দূরদেশী রাখাল ছেলেটি'কে সিন্ধুপারের রাজকন্যারা স্মরণ করেছেন; তা জানতে পেরে আমরাও প্রীত হয়েছি। কিন্তু বিষাদও আমরা এড়াতে পারি না, যখন ভেবে দেখি যে এই উপলক্ষে যা-কিছু কথাবার্তা আমরা শুনলাম, তার সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ নামমাত্র। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতীক তিনি, আন্তর্জাতিকতার পুরোহিত, শান্তির দূত, দুর্বলের বন্ধু, শোষকের শত্রু, মানব-প্রেমিক, ঈশ্বর-প্রেমিক, পূর্ব-পশ্চিমে মিলনমন্ত্রের উদ্গাতা—এমনি নানা দিক থেকে কতবার তাঁকে অর্ঘ্য দেয়া হ'লো! এই সবই ছিলেন তিনি, কিন্তু এ-সব স্মর্তব্য হ'তো না যদি তিনি কবি না-হতেন, তাঁর কবিতার জন্যই তাঁর অন্য সব চেষ্টা অর্থ পেয়েছে, যেহেতু তিনি কবিতা লিখতেন তাই তিনি স্মরণীয় ও বরণীয়। আর সেই তাঁর কবিতা কেমন একান্তভাবে বাঙালির সম্পত্তি হ'য়ে গেলো, বাংলা ভাষার পরিধির বাইরে, মহাবিশ্বে, তার স্থান নেই। এখনো আমরা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছি সেই বিদেশী পাঠকের প্রত্যাশায়, যিনি এসে আমাদের বলবেন যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর ভালো লাগে—উন্নত ধারণার বাহন হিশেবে নয়—শুধু কবিতা ব'লেই।

আমি ভুলে যাচ্ছি না যে অর্ধশতাব্দী আগে তিন প্রতীচ্য পুরুষ—আয়র্লণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার সন্তান—ইংরেজিতে 'গীতাঞ্জলি' প'ড়ে সে-বিষয়ে প্রখর, বোধসম্পন্ন আলোচনা লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধত্রয়ে আজকের দিনেও বিস্ময়ের উপাদান আছে। ইয়েটস, জিদ ও পাউণ্ডের সাংস্কৃতিক উৎস ছিলো বিভিন্ন, এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্যের আদর্শগত সাদৃশ্য তাঁদের কারোরই ছিলো না; অথচ তিনজনেই যেন সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রায় দৃষ্টান্তহিশেবে গ্রহণ করেছিলেন। কেন সেই উৎসাহ তাঁদের অচিরেই নির্বাপিত হ'লো? কেন, প্রতীচীতে; তাঁর জয়যাত্রার মাত্রই কুড়ি বছর পরে, রবীন্দ্রনাথের নামের উপরে নেমে এলো সৌজন্যস্নিগ্ধ উদাসীনতার আচ্ছাদন, অথবা, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অগুপ্ত প্রত্যাখ্যান? এর একটা সুস্পষ্ট কারণ—হয়তো বা প্রধান কারণ—যথাযোগ্য ও পর্যাপ্তপরিমাণ অনুবাদের অভাব; এই প্রশ্নটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচ্য হ'লেও এখানে আমার বিষয়ীভূত নয়। অন্য একটি কারণ এই যে 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম প্রতীচ্য পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথের ললাটে 'ধর্মীয়' কবির মারাত্মক তিলক

একে দিয়েছিলো। এর ফলে সেই সব মহলে আজও তাঁর নাম উল্লিখিত হ'য়ে থাকে, যেখানে আছেন পেশাদার সাধু, গুহ্য জ্ঞানী, শৌখিন অধ্যাত্মবাদী এবং খলিল জিব্রান-এর মতো ভাবালুতাময় পদ্যরচয়িতা। যখন, ১৯১৫ সালে, রবীন্দ্রনাথ *One Hundred Poems of Kabir* প্রকাশ করলেন, তখন যে অনেকে তাঁকে ভুল বুঝলেন তারও এই একই কারণ। শোনা যায়, ঐ পুস্তক প'ড়ে লণ্ডনে তাঁর বন্ধুরা বলাবলি করেছেন, 'এটা উনি ছাপালেন কেন? এখন ওঁর লেখা কে পড়বে?' কবির, মধ্যযুগের মরমী, তাঁকে এঁদের মনে হ'লো রবীন্দ্রনাথেরই ধরনের অন্য এক কবি, কিন্তু আরো বিশুদ্ধ। 'পৌরুষে উন্নত' এই কবির—কথাগুলো এডওঅর্ড টমসনের লেখা থেকে তর্জমা ক'রে দিচ্ছি—'যে-সব উপমা রবীন্দ্রনাথে মামুলি তার ব্যবহার কবিরের কাব্যে অনেক বেশি আন্তরিক,...রবীন্দ্রনাথের ঢোলকগুলো সাহিত্যিক, সত্যিকার নয়।' হায়, ভ্রান্তি!—আর এই ভ্রান্তির জন্য দায়ী ইংরেজ মনীষীরাই, কবির অথবা রবীন্দ্রনাথ নন! 'হিন্দু'—এই জাদুশব্দ থেকে তাঁরা যেহেতু রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে নিতে পারেননি, তাই একটি সহজ সত্য তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো—যে কবির আসলে খাঁটি মরমী, আর রবীন্দ্রনাথ খাঁটি কবি, এবং মরমীরা মাঝে-মাঝে কবিতা লিখলেও তাঁরা অভিপ্রায়বশত কবি হন না, আর কবিদের পক্ষে মরমী ভাব সম্ভব হ'লেও সেই ভাবটিকেও তাঁরা সচেতন শিল্পিতার দ্বারা প্রকাশ করেন— যে-শিল্পিতা অলোক-দ্রষ্টার অনুপযোগী।

রবীন্দ্রনাথের অবক্ষয়ের একটি তৃতীয় কারণ আছে— টমসন তা উল্লেখ করতে ভোলেননি, এবং আমরাও অনেকে অনুভব করেছি। প্রথম মহাযুদ্ধের যখন শেষ, তখনই সাহিত্যে এক নবযুগের আরম্ভ।* সুর, শৈলী, রূপকল্প, কবিতার ও জগতের প্রতি কবিদের মনোভাব— সব-কিছুরই পরিবর্তন হ'লো, আর তা শুধু প্রতীচীতে নয়, সারা জগতে, বলা বাহুল্য বাংলাদেশেও। এই বিপ্লবের চরম ক্ষণে রবীন্দ্রনাথ সত্তর ছুঁয়েছেন, আর যেহেতু তিনি তখন গদ্যকবিতা লিখেছিলেন, আর দৈনন্দিনকে স্থান দিয়েছিলেন কবিতায়, তাই যাঁরা রবীন্দ্রনাথে সেই বিপ্লবের লক্ষণ দেখতে পান, আমি বলতে বাধ্য তাঁরা কবিতার সংবেদী পাঠক নন। জীবন ও কবিতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যৌবন

* আসলে, উনিশ শতকের মধ্যভাগে ফরাশি দেশে এই নবযুগের আরম্ভ, কিন্তু ইংলণ্ডে তা বিশ-শতকী ঘটনা।

থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একই ধারণা পোষণ ক'রে গেছেন, আর তাঁর ক্ষেত্রে সেটাকেই হয়তো স্বাভাবিক ব'লে ভাবা যেতে পারে। টমসন বাংলা জানতেন, বোলপুর ও কলকাতার সঙ্গে সংযোগ হারাননি; অবশেষে এই খেদময় সিদ্ধান্তে তাঁকে পৌঁছতে হ'লো যে এলিয়ট যে-কালে অধিনায়ক, সে-কালে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার অনিবার্য। এই কি ঠিক কথা, বা সব কথা, না কি এতে শুধু আসল প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া হ'লো?*

আমরা অবশ্য ওঅর্ডস্বার্থ ও উগোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে এক নৌকোয় বসিয়ে দিতে পারি, তাহ'লে আর তাঁর বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। বলতে পারি, এই কবিরা নিজ-নিজ গুণে মহৎ, কিন্তু বর্তমান 'যুগধর্ম' এদের বিরোধী, আর এ-ব্যাপারে কারোরই কিছু করবার নেই। ওঅর্ডস্বার্থ যাঁদের ক্লান্ত করে না, কিংবা যাঁরা আকস্মিক স্তবকের বাইরে অবিরলভাবে শেলিকে উপভোগ করেন, এমন পাঠক আজ যে-কোনো দেশেই বিরল। আর রবীন্দ্রনাথে কিছুটা ওঅর্ডস্বার্থ আছেন, কিছুটা শেলি ও কীটস, এমনকি— কথাটা আমাদের যতই খারাপ লাগুক না— টেনিসনের সঙ্গেও মাঝে-মাঝে তাঁর জ্ঞাতিত্ব ধরা পড়ে। আর হুইটম্যান খুললে রবীন্দ্রনাথকে যাঁর মনে না পড়ে, তিনি রবীন্দ্রনাথ পড়েননি। কিন্তু তাই ব'লে রবীন্দ্রনাথ কি এমন কবি, যাঁকে আমরা ওঅর্ডস্বার্থ বা টেনিসন, শেলি বা কীটসের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসাতে পারি? বা অন্য কোনো রোমান্টিক কবির সঙ্গে, যাঁর

* রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্ত্য খ্যাতির পিছনে রাজনীতিও কম ছিলো না— এখানে খুব সংক্ষেপে তার উল্লেখ করছি। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে, তিনি তাদের শত্রু এই ধারণাবশত, জর্মান জনসাধারণ তাঁর 'পদতলে লুণ্ঠিত' হয়েছিলো; কৌতূহলী পাঠক *Rabindranath Tagore in Germany* নামক পুস্তিকায় (প্রকাশক : মোক্ষমূলর ভবন, নয়া দিল্লি) পাউল নাটর্প-এর প্রবন্ধ প'ড়ে দেখতে পারেন। পক্ষান্তরে, ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথে দেখেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির একটি সমর্থন ও ক্ষতিপূরণ: এই কবির কাছে তাঁরা আশা করেছিলেন ধীর বন্ধুতা, তাঁকে স্তুতি করেছিলেন 'নাইট' উপাধি অর্পণ ক'রে, কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের পরে রবীন্দ্রনাথ যখন ঐ 'ছার উপাধি' ত্যাগ করলেন তখন কলকাতার 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা মন্তব্য করলে: 'এই বাঙালি কবি, যাঁর নাম পঞ্জাবে কেউ শোনেনি, আর যিনি লেখক হিশেবে নিশ্চয়ই কর্নেল ফ্র্যাঙ্ক জনসন-এর মতো জনপ্রিয় নন, তিনি নাইটই হোন বা শাদাশিধে বাবুই থেকে যান, তাতে ব্রিটিশ রাজত্বের সম্মান ও যার্টো্র পক্ষে এক কানাকড়িও যেন এসে যায়!'—এই কর্নেল ফ্র্যাঙ্ক জনসন নামক 'লেখক'টি কে, তা নিয়ে গবেষণা করার আমি অবশ্য উৎসাহ পাইনি।

চরিত্রলক্ষণ অংশত রবীন্দ্রনাথেরও? সামগ্রিকভাবে, এবং মুহূর্তের জন্যও, রবীন্দ্রনাথকে চিন্তা করলে আমরা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারি, এই প্রশ্ন কত অবান্তর। ঐতিহাসিক অবস্থার হিশেবে তাঁর সঙ্গে ভিক্তর উগোর, আর তার চেয়েও বেশি পুশকিনের—সাদৃশ্য স্বীকার্য; কবিতা ও গদ্যের কোনো-কোনো প্রকরণে তাঁর চেয়ে মহৎ শিল্পীও উনিশ-শতকী য়োরোপীয় সাহিত্যে নিশ্চয়ই আছেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে অতুলনীয় বলার লোভ অদম্য হ'য়ে ওঠে যখন আমরা তাঁর ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য ও পরিমাণ স্মরণে আনি। সামগ্রিক কৃতির দিক থেকে তাঁর সঙ্গে সার্থক তুলনা চলে, এমন প্রতীচ্য কবি একজনমাত্র আছেন: তিনি গ্যেটে। আর এই 'যুগধর্ম' কি গ্যেটেরও বিরুদ্ধে কাজ করছে না? এমন অনেকের কথা আমরা তো জানি, যাঁরা রুচিতে ও রসবোধে প্রকৃষ্ট, অথচ আনন্দের জন্য কবিতা পড়তে হ'লে গ্যেটেকে যাঁরা এড়িয়ে চলেন। গ্যেটের বিপুলতা, তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির সুস্পষ্ট সমারোহ—এগুলোই যেন তাঁর সম্মুখীন হবার বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তিনিও, রবীন্দ্রনাথের মতো, জীবনের শুভত্ব বিষয়ে নিঃসংশয়; 'যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই'—এই কথা, যা আধুনিক মানুষের পক্ষে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করা দুঃসাধ্য, ঠিক এই কথাই দ্বিতীয় 'ফাউস্টে'র ঘোষণা।* অথচ যে-যুগে উগো ও লামারতিন পাণ্ডুর, ওঅর্ডস্বার্থের প্রভাব বিলুপ্ত, সেই এ-কালকেও কেমন গ্যেটের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে নিতে হচ্ছে, তাঁকে অপছন্দ করলেও অবহেলা করার উপায় নেই। টি. এস. এলিয়ট, যাঁর কাছে ফাউস্টীয় কাব্য ও জীবনদর্শন সমান অপ্রিয় ব'লে ধ'রে নেয়া যায়, তাঁকেও অবশেষে, ঢোঁক গিলে, 'জ্ঞানী গ্যেটে'কে বিনতি জানাতে হ'লো। আর পোল ক্লোদেলের মতে যিনি এক 'বিরাট গম্ভীর গর্দভ', সেই গ্যেটেকেই ভালেরি বললেন 'জগতের জুয়োখেলার টেবিলে এক মহাভাগ্যবান দান।' এমনি অন্য এক ভাগ্যের খেলা হলেন রবীন্দ্রনাথ, অদৃষ্টের আশ্চর্য এক উচ্ছ্বাস; আর পাশ্চাত্ত্য জগৎ, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হ'য়েও তাঁকে অতি সহজে বিস্মৃত হ'লো। এ-রকম হবার কারণ কী?

বলা যেতে পারে, এই বিশেষ প্রসঙ্গে গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথে তুলনা চলে না,

* 'ধন্য তোমরা, আমার চক্ষুদ্বয়—যা-কিছু তোমরা দেখেছো, তা যেমনই হোক না, তা-ই পরম সুন্দর।'—(প্রহরীর গান, 'ফাউস্ট,' দ্বিতীয় খণ্ড)। এখানে উল্লেখ্য যে 'ফাউস্টে'র আস্বর্গনরক ঘটনাবলির পরে এই উক্তির একটি নাটকীয় সার্থকতা আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে বিশ্বাসের ঘোষণা অধিকাংশ স্থলেই নির্ভার।

কেননা গ্যেটে য়োরোপীয়—আর তা শুধু আক্ষরিক অর্থে নয়, আদর্শের দিক থেকে ; একটি নিখিল-য়োরোপীয় চেতনার তিনি জনক, আর সেই কারণে প্রতীচীর পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের ধারণাটিরও প্রবক্তা তিনি, তিনিই তাঁর য়োরোপীয় চৈতন্য থেকে গ'ড়ে তুলেছিলেন সেই আদর্শ জগৎ, যা সর্বমানবের মিলনস্থল। 'সর্বমানব' কথাটি লেখা বা বলা সহজ, কিন্তু তার উপলব্ধি দুরূহ। অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গের কাছে, অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী শ্বেতাঙ্গের কাছেও, আজকের দিন পর্যন্ত 'প্রতীচী' ও 'জগৎ' প্রায় সমার্থক শব্দ ; প্রতীচীর বাইরে ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক পৃথিবী আছে তা তাঁরা জানেন, কিন্তু তাঁদের সমকালীন সাহিত্যিক চৈতন্যের কাছে তার অস্তিত্ব অতি অস্পষ্ট। কিন্তু প্রায় দেড়শো বছর আগে গ্যেটে বুঝেছিলেন যে এক 'আন্তর্জাতিক কথোপকথনে'রই নামান্তর হ'লো সাহিত্য, আর 'এই জগৎ, তা যত বড়োই হোক, তা সম্প্রসারিত মাতৃভূমি ছাড়া কিছু নয়।' আর তারপর : 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি / সেই ঘর মরি খুঁজিয়া। দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি / সেই দেশ লব যুঝিয়া।' বাঙালি পাঠকের হয়তো অজানা নেই যে দ্বিতীয় অংশটির বক্তা এমন এক কবি, যিনি অত্যন্ত বাঙালি, অত্যন্ত ভারতীয়, এবং যিনি মানবশিশুকে 'জগৎ-পারাবারের তীরে' খেলা করতে দেখেছিলেন। যে-বিশ্ববোধ গ্যেটে আয়ত্ত করেছিলেন সচেতন ও সচেষ্টভাবে, তা ছিলো রবীন্দ্রনাথে স্বজ্ঞাপ্রসূত ; গ্যেটের পক্ষে যা বার্ধক্যের উপার্জন, তা রবীন্দ্রনাথে আযৌবন অবিচ্ছেদী। এ-দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে গ্যেটের স্বপ্ন যে-মানুষের মধ্যে প্রথম সার্থক হ'লো তিনিই রবীন্দ্রনাথ, যে প্রকৃতির এই আশাতীত দানের মধ্যে গ্যেটের আদর্শ বাস্তব হ'য়ে উঠলো। রবীন্দ্রনাথের দেশের মাটিতে 'বিশ্বময়ী' তাঁর আঁচল পেতে রেখেছেন, আর সেইজন্যই সেই 'মাটি' প্রণম্য ; আর তাঁর ভগবান যেখানে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত, সেখানেই ভগবানের সঙ্গে মিলন তাঁর আকাঙ্ক্ষা। তাঁর কবিতায় যে-সব শব্দ পৌনঃপুনিক, তার অন্যতম হ'লো 'বিশ্ব' ; হয়তো সেটা একটা কারণ, যে-জন্যে বাঙালিরা তাঁকে 'বিশ্বকবি' আখ্যা দিয়েছিলো। কিন্তু, আবার গ্যেটেকে স্মরণ করলে, মনে কি হয় না যে এই উপাধি সত্যই তাঁর প্রাপ্য ? আজকের দিনে বঙ্গভাষী ছাড়া তাঁর কবিতার পাঠক বেশি নেই, কিন্তু জাগতিক প্রচার থাক বা না-ই থাক, অন্য এক অর্থেও তিনি বিশ্বকবি।

'বিশ্বকবি' কথাটায় দুটো আলাদা অর্থের ইঙ্গিত আছে। যাঁরা চিরায়ত

কবি, অর্থাৎ সর্বদেশে ও সর্বকালে যাঁদের কোনো-না-কোনো রচনার কিছু-না-কিছু গুণগ্রাহী পাঠক থাকে, ঐ উপাধি নিশ্চয়ই তাঁদের প্রাপ্য, য়োরোপের ভাষায় এঁদেরই বলা হয় ক্লাসিক। আবার এমন কবিকেও বিশ্বকবি বলা সংগত, যাঁর চিন্তায় জগতের সাহিত্য এক ও অভিন্ন—রূপকরণে অফুরানভাবে বিচিত্র হ'লেও নির্যাসে এক, যাঁর মনের মধ্যে সাহিত্য এক বিশাল ও বিরতিহীন উৎসবের মতো উপস্থিত, যেখানে সব যুগ, সব জাতি একত্র হয়েছে, আর তিনিও ক্ষণকালের জন্য আহ্বান পেয়েছেন। সর্বোত্তম কবিদের পক্ষে সাধারণত এই দুই অর্থ সম্পৃক্ত বা অন্যোন্যনির্ভর, কিন্তু আমার বিশ্বাস দ্বিতীয় গুণটি বিরলতর, এবং গ্যেটের ধারণার অধিক অনুগামী। আর এই বিশ্ববোধই বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রলক্ষণ। স্মর্তব্য, গ্যেটের জীবৎকালের তুলনায় 'বিশ্বে'র আয়তন এখন বৃহত্তর, তার সাংস্কৃতিক অবয়বরেখাও এক নেই। রুশ সাহিত্যের উত্থান, আমেরিকার আত্মোপলব্ধি, পূর্ব পৃথিবীর প্রাচীনতর সভ্যতাগুলির নব-জাগরণ—গ্যেটের মৃত্যুর পরে এই সব ঘটনা জগতের মানসচিত্র বদলে দিয়েছে। গ্যেটের চিন্তাকে ফলপ্রসূ ক'রে তোলার জন্য জগৎ আজ প্রস্তুত ও সচেষ্ট, এই প্রয়াসের পরিধি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও বাদ পড়েনি। সব বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে একটি আন্তর সম্বন্ধ বিদ্যমান, এই বিশ্বাসের উপর গ'ড়ে উঠেছে সেই আধুনিক বিদ্যা, যাকে শিক্ষাব্রতীরা 'তুলনামূলক সাহিত্য' নাম দিয়েছেন। 'তুলনামূলক সাহিত্য'—'তোমার কিংবা আমার সাহিত্য' নয়, মানুষের বহু বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে একানুভূতির অনুসরণ—১৯০৮ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে আমাদের কবিও একে অভ্যর্থনা জানিয়ে গেছেন।—কিন্তু গ্যেটের মনন থেকে উদ্ভূত এই আশ্চর্য ধারণাটি, এই অভিনব ও আবহমান বিশ্বসাহিত্য—আজ রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেকে তা অসম্পূর্ণ। শুধু ভারতীয়, এশীয় বা প্রাচ্য কবি ব'লে ভাবলে তাঁর মর্মস্থলে পৌঁছনো যাবে না।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের পৃথক্করণ সার্থক নয় তা নয়; ভাষা বা জাতি অনুসারে সূক্ষ্মতর উপবিভাগের মূল্যও যথাস্থলে স্বীকার্য। কিন্তু যে-রবীন্দ্রনাথ কবি ও সাহিত্যিক তিনি আজ প্রতীচীতে ম্লান হ'য়ে আছেন শুধু ভারতীয় ব'লে, বা তাঁর রচনা থেকে যথোচিত অনুবাদের অভাবে, এ-কথা ভাবলে আমরা বোধহয় ভুল করবো। আংশিক কারণ হিশেবে দুটোই বিবেচ্য হ'তে পারে, এবং দ্বিতীয়টি অবশ্যই মান্য, কিন্তু এটুকুই সব কথা নয়। গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথে তুলনা করলে অন্য একটি তথ্য বেরিয়ে আসে, আর সেখানেই

জর্মান কবির অনাক্রমণীয় প্রতিষ্ঠা। ঋজু, প্রত্যক্ষ, দার্ঢ্যগুণে নিটোল—এই হলেন গ্যেটে : তিনি যে একজন মহাজ্ঞানী তা অসতর্ক পাঠকেরও লক্ষ না-ক'রে উপায় নেই ; শ্রীযুক্ত এলিয়ট এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে গ্যেটের যাবতীয় কবিতা ও গদ্যরচনা তাঁর 'প্রজ্ঞার উদাহরণ মাত্র' ('merely illustrations of his wisdom')। পাঠককে অনুরোধ জানাই ঐ 'মাত্র' কথাটি স্মরণে রাখতে ; ভাবখানা এই রকম দাঁড়ালো যেন গ্যেটে আমাদের জ্ঞানদানের জন্যই গদ্যে-পদ্যে বিস্তর লিখেছিলেন—কিন্তু এটা অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হয়। তবে এই অর্থে গ্যেটের কবিতার পক্ষে তাঁর জ্ঞান মূল্যবান যে আমাদের প্রাথমিক বিরুদ্ধতাকে তা ভেঙে দিতে পারে, পারে অনুবাদের প্রতিবন্ধক অতিক্রম করতে,—যাকে তিনি আনন্দ দিতে পারেন না তাকেও তাঁর স্পষ্ট কিছু দেবার আছে। ঐ জ্ঞান অথবা প্রজ্ঞা—একটি শব্দ উচ্চারণ করলেই বিদেশীর কাছে গ্যেটের অর্থ বুঝিয়ে দেয়া হয়, এই ভিত্তির উপরেই জগতের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথে যা ঘটেছে তাকে আমরা বলতে পারি নারী-প্রকৃতির গুঞ্জনময় প্রকাশ : তাঁর মাধুরী পরোক্ষতায়, অর্ধাবগুণ্ঠনে, গতিভঙ্গে, এক কমনীয় ও প্রতারক সরলতায়। তাঁর কাছে যেতে হ'লে বিদ্বান অথবা পরিশ্রমী হ'তে হয় না, কিন্তু সেইজন্য যাঁরা তাঁকে লঘুপথ্য ভাবেন তাঁরা শোচনীয়রূপে ভ্রান্ত। এক ভূমিখণ্ড, যেখানে গিরিমাত্র বিদীর্ণ ক'রে সুড়ঙ্গ নির্মাণ করা হচ্ছে, আর বিরাট অট্টালিকা মাথা তুলছে আকাশের দিকে—রবীন্দ্রনাথকে ভাবলে এই ছবি আমার মনে জাগে না ; বরং মনে পড়ে এক স্রোতস্বিনী, সঞ্চারিণী, পরিবর্তনশীল, ক্রমান্বিত—যার জলে গা ডোবালে প্রথমে বড়ো মৃদু ও শীতল ব'লে মনে হয়, কিন্তু যা গোপনে এত গভীর ও জোরালো যে অসতর্ক আগন্তুককে মুহূর্তে ভাসিয়ে নিতে পারে। 'আভাস,' 'ইঙ্গিত', 'ভঙ্গি', 'কানাকানি',—এই সব এবং এই ধরনের শব্দ, যার বহুলতা বাংলাভাষার একটি লক্ষণ, তাঁর কবিতা ও গদ্যরচনায় এরা নিরন্তর আবৃত্ত ; তাঁর সমগ্র কবিতা ও গানের মধ্যে অক্লান্ত অনুলাপে যা প্রবহমান, তা রুসোর সেই বিখ্যাত 'জানি না কী' (je ne sais quoi) ;* তিনি কবি অচির মুহূর্তের, প্রত্যুষে অবিস্মৃত

*'কী', 'কোন', 'কী জানি,' 'কী যেন,' 'কে জানে', 'জানি না'—এ-সব বাগ্‌ধারায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের এমনভাবে অভ্যস্ত করেছেন যে তাঁকে ভাবলেই এগুলো আমাদের মনে পড়ে, এবং প্রায় মনে হয়—অন্তত বহুদিন ধ'রে মনে হয়েছে—যে বাংলাভাষার কবিতায় এরা অপরিহার্য।

স্বপ্নের, জন্মান্তরের অস্পষ্ট স্মৃতির, আর এমন সব সূক্ষ্ম ও পলাতক ইন্দ্রিয়বোধের, যার কোনো নাম আমরা দিতে পারি না। ইঙ্গিতের মহান শিল্পী তিনি। প্রজ্ঞা নয়, এক অভিনব বোধের জাগরণ—এই তাঁর অবদান আমাদের জীবনে; এমন এক বোধ, যা, তাঁর কবিতার দ্বারা যতদিন আমরা স্পৃষ্ট হইনি, ততদিন আমাদের ধারণার মধ্যেও ছিলো না, এবং যা না-পেলে আমরা জীবনের এক গভীর অংশে রিক্ত হ'য়ে থাকতুম। জগৎটাকে অনুভব করাবার ঘটক তিনি আর তাঁর কাছে উপলব্ধিরও উপায় হ'লো অনুভব। তাঁর কবিতার সঙ্গে তর্ক চলে না, কেননা তা নির্দ্বন্দ্ব ও সমস্যাহীন; তাঁর বিশ্বাসের ভূমিতে নেই দান্তের মতো কোনো ধর্মতত্ত্ব, বা ব্লেকের মতো নতুন এক তন্ত্ররচনার আয়োজন; মানুষকে তিনি পরিণতি বা মুক্তির পথ দেখিয়েছেন এমন দাবি তাঁর ভক্তেরা মাঝে-মাঝে ক'রে থাকলেও তাঁর কবিতা কখনোই তা করে না। উপরন্তু, কোনো 'শকুন্তলা' বা 'ফাউস্ট' বা 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস'-এর স্রষ্টা নন তিনি; বৃথাই আমরা সন্ধান করি তাঁর 'শ্রেষ্ঠ' রচনা বা এমন কোনো প্রতিনিধি-পুস্তক, যার উপর হাত রেখে আমরা বলতে পারি—'এই হলেন রবীন্দ্রনাথ।' তিনি গীতিকবি? নিশ্চয়ই, যে-কোনো অর্থেই তা-ই, অথচ র‍্যাঁবো ও ব্লেকের সমগ্র রচনার সঙ্গে 'মাতাল তরণী', ও 'সারল্য ও অভিজ্ঞতার গান' নামক কাব্য-গ্রন্থের যা সম্বন্ধ, সমগ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেইভাবে সম্পৃক্ত তাঁর কোনো-একটি কবিতা বা গ্রন্থ আমরা মনে আনতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব উপচয়-নির্ভর, তাঁকে 'পেতে' হ'লে তাঁর অনেকগুলো কবিতা ও গ্রন্থের মধ্যে ইতস্তত সঞ্চরণ প্রয়োজন। এবং এমন কেউ যদি থাকে—থাকতে পারে না তা নয়—যে তাঁর বিশেষ কাব্যগুণে তেমনভাবে সাড়া দিতে পারছে না, সেই পাঠকের হয়তো মনে হবে তাঁর কিছুই দেবার নেই। এখানেই রবীন্দ্রনাথের অসুবিধে; তাঁর সর্বজগতে প্রকাশিত হবার এও একটি অন্তরায়।

রবীন্দ্রনাথকে অবলোকনের অন্য এক উপায় আছে, তা হ'লো—'স্বজাতির উপর তাঁর অভিঘাত কী?' এই প্রশ্ন উত্থাপন করা। আমি জানি, বাঙালির কাছে এই প্রশ্ন আজ আলোচনার অতীত, তর্কের পরপারে, এবং এদিক থেকেও তাঁর একমাত্র তুলনা—আবার সেই গ্যেটে। জর্মান জীবনে গ্যেটের যা অর্থ, বাঙালির জীবনে রবীন্দ্রনাথের তা-ই; কিংবা এমনও হ'তে পারে যে তিনি আরো বিচিত্রভাবে আমাদের মর্মজীবন অধিকার ক'রে আছেন। রবীন্দ্রনাথও, অন্যান্য মহাকবিদের মতো, এক প্রাথমিক সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলেন; তাঁর

জন্মকালে অস্থির ছিলো তাঁর দেশ—অস্থির, পরিণতিপ্রবণ, বিদেশী সংস্পর্শের ফলে পুনরুজ্জীবিত; আশা, চেষ্টা, ও সংগ্রামের সেই সময়, যখন দিকে-দিকে নতুন দিগন্ত খুলে যাচ্ছে, আর সম্ভাবনা অন্তহীন মনে হ'লেও অনেক-কিছুই তখন পর্যন্ত অসম্পন্ন, ভাষা পর্যন্ত অস্পষ্টতায় অপ্রস্তুত। তাঁর শৈশব ও প্রথম যৌবন সেই অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে, যাকে কোনো-কোনো ঐতিহাসিক বাংলার রেনেসাঁস ব'লে থাকেন, কিন্তু আসলে যা ভারতের নবজন্মকাল, এবং যার আদি কেন্দ্র রবীন্দ্রনাথেরই জন্মস্থান—এই কলকাতা। প্রবাহ শুরু হয়েছিলো দুই পুরুষ আগে: রামমোহন ও বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও মধুসূদন, তাঁর ঠাকুরবংশীয় ও অন্যান্য পূর্বতনেরা—এই সব অগ্রদূতের যা-কিছু কৃতি, এই সব দেশপ্রেমিক, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী, সাহিত্যিক ও ধর্মগুরুদের শতকার্ধ-ব্যাপী যা-কিছু সাধনা, সব যেন তাঁর মধ্যে এসে সংশ্লিষ্ট ও সমন্বিত হ'লো: আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথকে আমরা এইভাবে দেখতে পাই। যেন তিনি সেই স্থায়ী ও সুন্দর রূপকল্প, যার মধ্যে বাঙালির শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষাগুলি গৃহীত হ'লো, যেন পূর্বসূরিদের বহুমুখী প্রচেষ্টার শেষ ফল-তিনি, যেন, তাঁকে সম্ভব ক'রে তোলার জন্যই সেই যুগের বিচিত্র পরিশ্রম। এমনি, আমাদের কাছে, রবীন্দ্রনাথ।

জর্মানিতে গ্যেটে, ও বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ যখন যুবক, এই দুই কালের মধ্যে সামান্য লক্ষণ অনেক। রাজনৈতিক হিশেবে জর্মানি তখন অসংবদ্ধ, বাংলাদেশ পরাধীন। জর্মান সাহিত্যে বিদ্রোহ জেগেছে মৃতকল্প ফরাশি আদর্শের বিরুদ্ধে; আর আমরা সচেষ্ট আছি মধ্যযুগের গ্লানিমার চিকিৎসায়। আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় ইতিহাস- ও লোকসাহিত্যচর্চা সংরক্ত হ'লো; অতীতের পুনর্বোধনে মেতে উঠলেন মনীষীরা, আবার বৈদেশিক ও আধুনিকের জন্যও দ্বার খুলে দিলেন। নানা স্রোতে প্রবাহিত হ'লো উদ্যম; এবং যে-কোনো কর্ম অথবা চিন্তাধারাকে প্রেরণা দিলে রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ। এবং গ্যেটে যেমন জর্মানিতে, তেমনি বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বঘটে নারায়ণ; দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটতে পারেনি, যাতে তিনি অংশ না-নিয়েছেন। কিন্তু উত্তরজীবনে দুই কবিতে আর তুলনা চলে না। প্রবীণ গ্যেটে, 'ষ্টুর্ম উন্ট দ্রুং'-এর ভাবোচ্ছ্বাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, স্থানীয় ও সাময়িকের ঊর্ধ্বে, মহান স্বার্থপরতায় অনবরত সফল ক'রে তুলছেন নিজেকে: আর রবীন্দ্রনাথ, জাতীয়তাবাদে ক্লান্ত; তবু তাঁর স্বদেশের ভাগ্যের সঙ্গে হৃদয়সূত্রে আবদ্ধ আছেন; নিজের একটি বিরাট অংশ বিলিয়ে দিচ্ছেন দেশবাসীর প্রতি

তাৎকালিক কর্তব্যপালনে। আর-এক কথা : জর্মান সাহিত্যে—শুধু হ্বাইমার-বাসী দেবরাজ নন, তাঁর সমকালীন শিলারও ছিলেন, ছিলেন গ্যেটে-বিরোধী শোপেনহাউয়ার, তরুণ বিদ্রোহী হাইনে ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, মধ্যবয়সেই, বাংলা সাহিত্যে পরম হ'য়ে উঠলেন, বলতে গেলে অনন্য, প্রতিযোগিতার পরপারে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ভাষায় এমন কোনো কবিতা লেখা হচ্ছে না, যা তাঁরই করুণ অনুকরণ নয় ; অন্য কোনো রীতির উদাহরণ নেই চোখের সামনে ; নেই এমন কোনো সাহিত্যিক সহচর, যাঁকে তিনি সমকক্ষ ব'লে ভাবতে পারেন ; যার দ্বারা তিনি উপকৃত হ'তে পারেন এমন সমালোচনাও অস্তিত্বহীন। তাঁর অগ্রজের মধ্যে তাঁর যোগ্য ছিলেন অনেকেই, কিন্তু সমকালীনের মধ্যে কেউ ছিলেন না যাঁর দিকে তাকিয়ে মনে-মনে তিনি মেপে নিতে পারেন নিজেকে, বা এমন কথা তাঁর মনে হ'তে পারে যে তাঁরও আত্মশোধনের প্রয়োজন আছে। এটা তাঁর দুর্ভাগ্য ব'লে আমি মনে করি ; আমরা যারা কবিতা ভালোবাসি, আমাদেরও দুর্ভাগ্য এটা। প্রবীণ রবীন্দ্রনাথকে স্মরণে আনলে হৃদয়ে ঠিক পুলক জাগে না ;—দেখতে পাই নিঃসঙ্গ এক পুরুষ, বহু ক্ষুদ্র উপাসকের দ্বারা পরিবৃত, এক প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকার মধ্যে বন্দী, এক উৎপীড়িত ত্রিংশৎ কোটির মুখপাত্র। তাঁর অবস্থার এই বৈশিষ্ট্যের জন্য নিজের উপরে বিপুল দায়িত্ব তাঁকে নিতে হ'লো ; লিখতে হ'লো এমন বহু পঙক্তি যার সত্যি কোনো প্রয়োজন ছিলো না, নিজেকে ব্যয় করতে হ'লো এমন বহু উদ্যোগে যা ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিদের হাতেও তুলে দেয়া যেতো, যে-কোনো দিন যে-কোনো সময়ে জনতার ডাকে সাড়া দিতে হ'লো। ভেবে দেখলে মনে হয় যে তিনি যতটা ভার বয়েছিলেন, তা তাঁর মতো মহাবলের পক্ষেও অত্যধিক।

বাহুল্য হবে, যদি নতুন ক'রে তাঁর বহুমুখিতার বর্ণনা দিতে চেষ্টা করি। কে না আমরা মুগ্ধ হয়েছি তাঁর ক্ষমতায়, তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যে, তাঁর অবিরাম রচনাপ্রবাহে—মর্মান্তিক বন্ধ্যতার দিনে, কাগজের উপর হতাশ আঁকিবুঁকি কাটতে-কাটতে, কে না আমরা দেবতা ব'লে মেনেছি তাঁকে! কিন্তু এই অবিরল নির্ঝর, এই নির্বাধ রচনাশক্তি, স্বদেশ, জগৎ, দেশবাসী ও মানবজাতি বিষয়ে তাঁর অশেষ হিতৈষণা—এর জন্য কিছু মূল্যও তাঁকে দিতে হয়েছিলো। 'All things can tempt me from this craft of verse'—এ-কথা রবীন্দ্রনাথও লিখতে পারতেন, অন্তত 'কণিকা' প'ড়ে মনে হয় যে তাঁরও এক-এক সময় কবিতা ছাড়া অন্য সব দায়িত্ব ছেড়ে দেবার ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু শেষ

পর্যন্ত তাঁর কবিতা ও অন্যান্য কর্মে বিরোধ তিনি ঘটতে দেননি, সেই সব অন্য স্থলেও অনবরত কবিতার বিষয় খুঁজে পেয়েছেন; এর ফলে তাঁর দেশবাসীর উৎসাহ আরো বেড়ে গেছে, কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয়েছে তাঁর কবিতা। আমি ভাবতে পারি না তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক বিগ্রহটিকে রবীন্দ্রনাথ কী-চোখে দেখতেন, কখনো কি অসহ্য লাগতো না পূজিত হ'তে, না কি সেই শিখর থেকে পালাবার জন্যই বৃদ্ধ বয়সে ছবি এঁকেছিলেন? তাঁর দিক থেকে চিন্তা করলে নানারকম অনুমান সম্ভব, তবে এ-কথা নিঃসন্দেহ যে ঐ বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে আমরা আমাদের পরাধীনতাজনিত অপমানে সান্ত্বনা পেয়েছি। তিনি তা জানতেন, আর জানতেন ব'লেই স্বজাতির প্রতি তাঁর বাৎসল্যের সীমা ছিলো না; এমনভাবে আমাদের সব ছোটো-ছোটো দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতেন, যেন আমরা সকলেই শিশু—আর সেটাই যে ঠিক কথা নয় কে জানে। কী উদার তাঁর করুণা তা এতেই বোঝা যায় যে আমাদের মধ্যে যারা তাঁর আস্ত কোনো বই কখনো পড়িনি, বা তাঁর কাছে কিছু শেখার অভিপ্রায় থেকে যারা স্বভাবতই সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, তারাও তাঁকে 'গুরুদেব' ব'লে সম্বোধন করলে তিনি সহ্য করেছেন। জগতের কবিদের মধ্যে, আমি যতদূর জানি, একমাত্র তিনিই পত্রে স্বাক্ষর করেছেন 'কবি' ব'লে; তার পিছনে হয়তো একটু কৌতুক আছে, কিন্তু এ-কথাও তাঁর জানা ছিলো যে ঐ একটি 'কবি' শব্দের দ্বারাই বহু বাঙালির কাছে তাঁর পরিচয়। সহাস্যে, এবং হয়তো সখেদে, মাঝে-মাঝে বলতেন যে বাঙালিরা তাঁকে নিয়ে 'পুতুল-খেলা করছে,' কিন্তু ঐ সর্বাধিগম্য বিগ্রহ থেকে লোকেদের বঞ্চিত করতেও তাঁর মন সরেনি। আর তিনি যে এত বিবিধ প্রকার কর্মভার নিয়েছেন, যুক্ত হয়েছেন ক্রমাগত এত বিচিত্র ব্যাপারে, তাও তাঁর স্বজাতিরই জন্য; হয়তো বলা যায় যে তাঁর অসুখী মাতৃভূমির দৈনন্দিন প্রয়োজন-সাধনে তাঁর প্রতিভা ছিলো উৎসর্গিত। সেই সঙ্গে স্মরণে আসে কবিতায় তাঁর শিথিল মুহূর্ত, তাঁর পুনরুক্তি ও অসমতা, সেই সব রচনা যা নিতান্তই অভ্যাসের ফল; আর তখন মনে হয় যে যথার্থভাবে কবিতার যা অঙ্গ নয় এমন বহু বিষয়ের দ্বারা 'লুব্ধ' হ'য়ে তিনি এমনকি তাঁর অমরতার একটি অংশ ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তা-ই যদি হয়, তাহ'লে তো তাঁর কাছে আমাদের ঋণ আরো বেশি অপরিমেয়।

'সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ'

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প

রবীন্দ্রনাথ গদ্য লিখেছেন কবির মতো; তাঁর গদ্যের গুণ কবিতারই গুণ; যা কবিতা আমাদের দিতে পারে, তা-ই তাঁর গদ্যের উপঢৌকন। যদি কোনো খণ্ডপ্রলয়ে তাঁর সব কবিতার বই লুপ্ত হ'য়ে যায়, থাকে শুধু নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, তাহ'লে সেই প্রবন্ধ নাটক উপন্যাস থেকেই ভাবীকালের পাঠক বুঝে নিতে পারবে যে রবীন্দ্রনাথ এক মহাকবির নাম।

হ্যাঁ, প্রবন্ধ থেকেও বুঝে নিতে পারবে। প্রবন্ধ: যাতে স্পষ্ট কোনো বিষয় চাই, বিশেষ কোনো পদ্ধতি চাই, যাতে যুক্তির সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে মীমাংসার দিকে পৌঁছতে হয়—অন্তত সেইরকমই ধারণা করি আমরা—তাতেও এই অবিশ্রান্ত কবি পরতে-পরতে প্রবিষ্ট হ'য়ে আছেন; যে-কোনো বিষয়ে যে-কোনো আলোচনায় বিষয়টাকে ছাপিয়ে ওঠে তাঁর স্বর, দ্যুতি, স্পন্দন, বেগ, তরঙ্গ—এক কথায়, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ। অর্থাৎ, প্রবন্ধ যেমনটি হওয়া উচিত নয় ব'লে আমরা জানি—অন্তত‍পক্ষে পাঠশালায় যা শেখানো হ'য়ে থাকে—তাঁর প্রবন্ধ ঠিক তা-ই।

যাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের পক্ষপাতী নন, বা যাঁরা মনে করেন আলোচনা-ধর্মী রচনায় কবিতার গুণ দোষ ব'লে গণ্য, অতএব বর্জনীয়, আমি তাঁদের কথা বেশ বুঝতে পারি। এমনকি তাঁদের কথায় সায় দিয়ে ফেলতেও লুব্ধ হয়েছি মাঝে-মাঝে। সত্যি তো—রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে কত পুনরুক্তি, কত অবান্তর অংশ, অনেক ব'লেও মীমাংসা যেন অস্পষ্ট থেকে যায়, গুরুমশাই-ধরনে 'বুঝিয়ে' যেন বলতে পারেন না। যুক্তির বদলে তিনি দেন উপমা, তথ্যের বদলে চিত্রকল্প; সেখানে পাঠককে স্বমতে টেনে আনা তাঁর প্রকাশ্য অভিপ্রায় সেখানে তিনি তীক্ষ্ণ ক'রে তোলেন তার ইন্দ্রিয়গুলিকে; যেখানে বুদ্ধির কাছে প্রমাণ দিতে হবে সেখানে তিনি বেআইনিভাবে আমাদের হৃদয়ের আর্দ্রতা সম্পাদন করেন। সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, ইতিহাস—এই সব বিষয়ে, পূর্বোক্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও, শব্দালংকার থেকে বক্তব্যকে তবু আলাদা ক'রে নেয়া যায় ও চেনা যায়; কিন্তু—যা তাঁর প্রিয়তম ও অন্তরতম, সেই সাহিত্য বিষয়ে যখন আলোচনা করেন তখন কোনো বিশ্লেষযোগ্য 'সারাংশ' যেন দুর্লভ হ'য়ে ওঠে; তাতে থাকে না কোনো পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞার্থ বা বিধান;

কোনো সুস্পষ্ট সূত্র ঘোষণা করতে তাঁকে অক্ষম বা অনিচ্ছুক ব'লে মনে হয়, কিংবা কখনো তা ক'রে ফেললেও নিজেই সেটাকে খণ্ডন করেন—হয়তো বা পরমুহূর্তেই। মানতেই হবে, যে-অর্থে আরিস্টটল, আনন্দবর্ধন বা মল্লিনাথ সমালোচক, সে-অর্থে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সমালোচক পর্যন্ত নন।

তা না-ই বা হলেন; ঐ পদবি তাঁর প্রাপ্য কিনা তা নিয়ে তর্ক করবো না। শুধু বলি: একাধারে সফোক্লেস ও আরিস্টটল কি হওয়া যায়, বা একাধারে কালিদাস ও মল্লিনাথ—সেটা কি স্বাভাবিক, না কাম্য, না সম্ভব, না কি মর্তলোকের পক্ষে সহনীয়? আর-এক কথা: হোমর ও সফোক্লেস যদি আগে জ'ন্মে না যেতেন, তাহ'লে কোথায় থাকতেন আরিস্টটল; বাল্মীকি কালিদাস প্রভৃতি কবিদের সামনে না-রেখে কোনো আনন্দবর্ধনকে কল্পনা করতে পারি কি? সাহিত্যব্যাপারে সৃষ্টিকর্মই প্রধান ও প্রাথমিক, সমালোচনা তার অনুগামী মাত্র; এবং কোনো উত্তম সৃষ্টিশীল প্রতিভা যখন সমালোচনায় হাত দেন তখন তাঁর পক্ষে যা সম্ভব হ'তে পারে তা 'সমালোচনাকেই সৃষ্টিকর্ম ক'রে তোলা।' এই কথাটা রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন; তাঁর প্রবন্ধের আলোচনায় এটি মনে রাখতে হবে। মেনে নিতে হবে, পদ্য ও গদ্য রচনা মিলিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে-অখণ্ডতা প্রকাশ পাচ্ছে সেইটেই তিনি; কোনো পাঠক-গোষ্ঠীকে খুশি করার জন্য তা ছাড়া অন্য কিছু তিনি হ'তে পারেন না; আমরা গ্রহণ করি বা না করি তিনি অনবচ্ছিন্নভাবে তিনিই থেকে যাবেন। তাঁর গদ্য অতিভাষী? তাঁর কবিতাও তা-ই। অলংকারবহুল? অস্পষ্ট? উচ্ছ্বাস-প্রবণ? তাঁর কোনো-না-কোনো পর্যায়ের কবিতা বিষয়ে এর প্রত্যেকটি কথা সত্য। যেমন 'বসন্তযাপন'-এর মতো গদ্যরচনায় তিনি প্রবন্ধের আকারে কবিতা লিখেছেন, তেমনি কবিতার আকারে প্রবন্ধ লিখেছেন 'এবার ফিরাও মোরে' বা 'বসুন্ধরা'য়। আমরা তাঁকে দোষ দিতে পারি সাহিত্যে বর্ণসংকরতা ঘটিয়েছেন ব'লে; গদ্যে কবিতার রীতি, ও কবিতায় গদ্য বিষয়ের সঞ্চার ক'রে তিনি উভয়েরই ক্ষতি করেছেন এমন কথাও স্বীকার্য হ'তে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে-প্রশ্নটি সবচেয়ে জরুরি হ'য়ে ওঠে তা এই: আমরা তাঁকে বর্জন করতে পারি কি? রবীন্দ্রনাথের দোষগুলি শিশুদের মতো সরল, কোনো ভান নেই তাদের, আত্মগোপনের কোনো চেষ্টাই নেই, নিজের বাড়ির আঙিনায় ব'সে অত্যন্ত সহজে তারা খেলা করে, দর্শকের হাতে ধরা প'ড়ে যেতে ভয় করে না, ধরা প'ড়ে গিয়েও মলিন হ'তে জানে না। এক বিরাট প্রতিভার

আশ্রয়ে খেয়ে-প'রে বড়ো হচ্ছে তারা; যেমন তাদের হ্রাসপ্রাপ্তির লক্ষণ নেই, তেমনি তাদের উৎসস্থল সেই প্রতিভাও পরাক্রান্ত; প্রয়োজন হ'লে তা বজ্রপাতের মতো অবিশ্বাসীকে বিদীর্ণ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সেই লেখক, যাঁর দোষ আমরা যে-কেউ যে-কোনোদিন ধরতে পারি, আর যাঁকে না-হ'লে আমাদের কারোরই এক মুহূর্ত চলে না। আর এখানেই তাঁর চরম জয় যে তিনি অপরিহার্য: তাঁর দোষগুলিকে ছাড়াতে গেলে তাঁকেই ছেড়ে দিতে হয়, তাই সব দোষ নিয়েই—যখন মনে-মনে তাঁর 'বিরুদ্ধে' তর্ক করছি ঠিক তখনই—সব দোষ নিয়েই তাঁকে বরণ ক'রে নিতে হবে; উৎকর্ষের অন্য বহু উদাহরণ তাঁকে ম্লান ক'রে দিতে পারে না, যেমন পারে না বহু তীর্থের স্মৃতি গৃহদেবতাকে অপসৃত করতে।

কিন্তু কোন অর্থে অপরিহার্য, কোন অর্থে গৃহদেবতা? তিনি 'কথা ও কাহিনী' না-লিখলে মধ্যবিদ্যালয়ে পড়াবার মতো ভালো বাংলা কবিতার বই পাওয়া যেতো না, সেইজন্য? 'জনগণমন' রচনা না-করলে সর্বভারতে সর্বতো-ভাবে গ্রহণযোগ্য জাতীয় সংগীত দুষ্প্রাপ্য হ'তো, তাই? 'গীতবিতান' প্রণয়ন না-করলে উৎসবে, অন্নপ্রাশনে, শ্রাদ্ধবাসরে ও চলচ্চিত্রে নায়িকাকর্তৃক গীত হবার মতো সংগীতের অভাব ঘটতো ব'লে? না কি তাঁর প্রবন্ধের ভাণ্ডার থেকে বক্তৃতায় ও সাংবাদিক রচনায় উদ্ধৃতিযোগ্য বচন আমরা অনবরত পেয়ে যাচ্ছি সেইজন্য? বাংলাদেশে ও সর্বভারতে তাঁর যে-প্রাতিষ্ঠানিক মূর্তি স্থাপিত হয়েছে—যাকে বিগ্রহ বললে ভুল হয় না—তার উপর জোর দিতে চাচ্ছি না আমি; যেখানে আমরা উঠতে বসতে তাঁর নাম করছি, প্রায় যে-কোনো অনুষ্ঠান আরম্ভ করছি তাঁকে স্মরণ ক'রে, প্রায় যে-কোনো মতবাদের সমর্থক-রূপে দাঁড় করাচ্ছি তাঁকে, সেখানে তিনি সর্বজনের স্বতঃপ্রাপ্ত আশ্রয়, আমাদের আত্মসম্মানের পক্ষে প্রয়োজনীয়, মহিমার একটি প্রতীকরূপে সর্বভারতের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু ও-রকম বিনাব্যয়ে কোনো পাঠক তাঁকে পেতেই পারেন না (কেননা পাঠক হ'তে হ'লে নিজের উপর দায়িত্ব নেবার শক্তি চাই); তাঁর রচনার মধ্যে প্রবেশ করতে হ'লে তাঁকে উপার্জন ক'রে নিতে হবে আমাদের; তিনি যে একজন বড়ো কবি বা ভালো কবি, এই মোটা কথাটাও আমাদের আবিষ্কারসাপেক্ষ। আর, একজন পাঠক হিশেবেই আমি বলতে চাই যে দোষ তাঁর যতই দেখতে পাওয়া যাক, তাঁকে না-হ'লে আমাদের একদণ্ড চলবে না।

কিন্তু এক বাছাই-করা রবীন্দ্রনাথ কি সম্ভব হয় না? আমরা কি পেতে পারি না বাহুল্য বাদ দিয়ে তাঁর বাণী, উচ্ছ্বাস বর্জন ক'রে উপলব্ধি, কিংবা তাঁর 'শ্রেষ্ঠ' রচনার সমাহার? সেটা সম্ভব নয় বলতে পারি না, বরং আমরা মানতে বাধ্য যে তাঁর মতো অতিপ্রজ লেখকের পক্ষে সংকলন একটি উপকারী চিকিৎসা। সে-দিকে তাঁর নিজের ও অনুরাগী সম্পাদকের প্রয়াস দেখা গেছে, সাহিত্য-অকাদেমির এই গ্রন্থেও* সে-চেষ্টা প্রতীয়মান। ভাবীকালেও তাঁর রচনা থেকে চয়নের প্রয়োজন নিরন্তর অনুভূত হবে মনে হয়, কেননা তাঁকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি; কোনো বিদেশী অথবা নতুন পাঠকের কাছে তাঁকে উপস্থিত করতে হ'লে প্রথমেই তাঁর বহুমুখিতা ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে চাই—'জানেন তো, তিনি সব রকম লেখা লিখেছেন, আর প্রায় এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে লেখেননি।' পাছে কেউ ভাবে যে তিনি শুধু কান্তকোমল পদাবলি লিখেছেন তাই আমরা চেষ্টা করি তাঁর সমাজবিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে তুলে ধরতে; পাছে কারো ধারণা হয় যে ঈশ্বরকে ভালোবাসার ফলে জগৎটাকে তিনি দেখতে পাননি তাই আমরা 'গল্পগুচ্ছ' খুঁটে-খুঁটে তাঁর বাস্তববোধের উদাহরণ বের করি। এই সবই সৎকর্ম, তাঁর বিষয়ে আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক, কিন্তু তাঁকে প্রদক্ষিণ করার পরে বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনে যখন উদ্যত হই তখনই ধরা পড়ে যে গভীরতম অর্থে তিনি কবি, কবি ছাড়া আর-কিছুই নন। এক উৎস থেকে, একই উৎসাহের প্রেরণায় তাঁর বিখ্যাত ভিন্ন-ভিন্ন 'দিক'গুলি বিকীর্ণ—ঠিক যে-ভাবে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় বলা আছে—খোপে-খোপে ভাগ-করা মন নয় তাঁর, সাময়িকভাবে জুড়ে-দেয়া কিন্তু আসলে সম্পর্করহিত অনেকগুলো গাড়িকে এঞ্জিনের মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে না; তাঁর সব বৈচিত্র্য যেন প্রতিহত ও অপ্রতিরোধ্য জলস্রোতের গতিভঙ্গি। 'কবি রবীন্দ্রনাথ', 'ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ', 'প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ'—এই বিভাগগুলি তাই স্বীকার্য হ'লেও শেষ পর্যন্ত উপেক্ষণীয়; অর্থাৎ তারা পরস্পরে প্রবিষ্ট, পরস্পরের উদ্দীপক ও পরিপূরক, এবং এক অখণ্ড সত্তার প্রতিরূপ। যে-মৌলিক উপাদানে রবীন্দ্রনাথ গঠিত সেটা কবিত্বশক্তি, সেটাই তাঁর গদ্যরচনাকে সপ্রাণ ও সার্থক ক'রে তুলেছে; আগুন যেমন যে-কোনো ইন্ধনে ভাস্বর, তেমনি তাঁর কবিপ্রতিভাও

*সাহিত্য-অকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'নিবন্ধমালা' দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা।

যে-কোনো রূপকল্পে প্রদীপ্ত। দীপ্তির তারতম্য নিশ্চয়ই আছে; নিশ্চয়ই 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে ও 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধমালায় কবিত্বের একই প্রকার ঘনতা নেই; কিন্তু কবিতার দ্বারা স্পৃষ্ট ব'লেই তাঁর প্রায় যে-কোনো সন্দর্ভে কিছু-না-কিছু যৌবনশোণিমা লক্ষ করা যায়—হোক না তার প্রসঙ্গ পুরাতন বা বক্তব্য সুপরিচিত বা উপদেশ আজকের দিনে অবান্তর। হাড়ে-হাড়ে কবি নন এমন কেউ কি লিখতে পারতেন 'ছেলে-ভুলানো ছড়া'র মতো সমালোচনা বা 'বাংলা ভাষাপরিচয়ে'র মুখবন্ধ, বা 'সহজ পাঠে'র মতো বর্ণপরিচয়পুস্তক? 'কবিতা আছে ভাষার সর্বত্র—ছন্দ থাকলেই কবিতা থাকবে—সর্বত্র আছে, নেই শুধু বিজ্ঞাপনে ও সংবাদপত্রে। সাহিত্যের যে-বিভাগটিকে আমরা "গদ্য" নাম দিয়েছি তাতেও কবিতা আছে—মাঝে-মাঝে খুব ভালো কবিতা—নানা রকম ছন্দে তারা রচিত। আসলে গদ্য ব'লে কিছু নেই: আছে বর্ণমালা, আর নানা ধরনের কবিতা, কোনোটি শিথিল, কোনোটি সংহত, কোনোটি বা একটু বেশি ছড়িয়ে-যাওয়া। যেখানে স্টাইলের দিকে প্রযত্ন, সেখানেই পদবিন্যাস।' স্তেফান মালার্মের এই উক্তির প্রমাণস্বরূপ কোনো-একজন—সারা জগতের মধ্যে কোনো-একজন কবিকে যদি দাঁড় করাতে হয়, তাহ'লে সেই কবি—মালার্মে নন, তাঁর শিষ্য পোল ভালেরিও নন—তর্কাতীতরূপে তিনি রবীন্দ্রনাথ। কেননা মালার্মে ও ভালেরির গদ্য তাঁদের কবিতার মতোই সাংকেতিক, গদ্যরচনার বিষয়গুলিও 'বিশুদ্ধ' ও নির্ভার—বলতে গেলে তাঁদের কবিতা ছাড়া বিষয় নেই, আর কবিতার বিষয়ে কবির মন্তব্য লিখতে গেলে অন্তত পক্ষে ব্যবহারিক প্রতিবন্ধক অল্পই থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গদ্য লিখেছেন সাধারণ ভাষায়, অনেক সময় নিরুৎসাহজনক সাংসারিক বিষয় নিয়ে (সমবায়নীতি বিষয়েও তাঁর প্রবন্ধ আছে), গদ্যকে কবিতার স্তরে উন্নীত করার সচেতন চেষ্টা বার্ধক্যের আগে তাঁকে করতে দেখি না। অথচ, যেহেতু স্টাইল তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, ছন্দ তাঁর মজ্জাগত, তাই তাঁর সমগ্র গদ্যের মধ্যে এমন লেখা আপেক্ষিক অর্থে অল্পই (কিছু নেই তা নয়) যা প্রতিধ্বনি তোলে না, রেশ রেখে যায় না, স্পন্দিত হয় না স্মরণে, দেয় না সেই অপার্থিব অনুভূতি আমরা যার নাম দিয়েছি আনন্দ। এমনি ক'রে তাঁর গদ্যের ভিতরে কবিতাকে পাচ্ছি—'মাঝে-মাঝে খুব ভালো কবিতা কোনোটি শিথিল, কোনোটি সংহত, কোনোটি বা একটু বেশি ছড়িয়ে-যাওয়া।'

* * *

যা দেখতে-শুনতে প্রবন্ধের মতো, এ-রকম গদ্যরচনার মধ্যে দুটো স্পষ্ট ভাগ দেখা যায় : তার একটাতে বিষয় হ'লো সর্বস্ব বা মুখ্য, লেখক সেখানে নতুন জ্ঞান দিতে চাচ্ছেন, বা নতুন মত প্রচার করা তাঁর অভিপ্রায়। এ-সব রচনার সূচনা, মধ্যভাগ ও সমাপ্তির একান্ত নির্দেশক হ'লো বক্তব্য ; প্রতিপাদ্য প্রমাণ করার জন্য যে-ক'টি যুক্তি ও উদাহরণের প্রয়োজন, লেখক তা পূর্বেই সংগ্রহ ক'রে নিয়েছেন—'লেখক' হিশেবে তাঁর সমস্যা শুধু সেই উপাদানগুলিকে ভাষার মধ্যে সংবদ্ধ করা ; —ভাষা তাঁর কাছে বাহনমাত্র. অপরিহার্য যন্ত্র একটি—বলতে গেলে তাঁর উপাদানসমূহের শৃঙ্খলাসাধনই তাঁর রচনা। আর অন্যটিতে বিষয়টা গৌণ ; লেখক রচনাকর্ম শুরু করার আগে তাঁর বাঁচা, মেলা-মেশা ও সাধারণ পড়াশুনোর বাইরে—কোনো 'গবেষণা' করেননি ; কোনো পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা বা সমাজের পক্ষে হিতকারী কোনো উদ্দেশ্য নিয়েও লিখতে বসেননি তিনি ; লিখতে-লিখতে ভাবনা আসে তাঁর, নিজেকে অনুসরণ ক'রে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চ'লে যান ; তাঁর সূচনা, মধ্যভাগ ও সমাপ্তির পিছনে থাকে—'বক্তব্য'কে উপস্থিত করার গরজ নয়, সেই সব অমোঘ ও অলক্ষ্য বিধান যা কোনো কবিতা, নাটক বা উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করে ; তাঁর ভাষায় থাকে রূপ, ছন্দ ও স্বাদুতা, পাঠকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে থাকে সৌজন্য, আসক্তি, হাস্যরসবোধ, জগতের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে থাকে সংরাগ ও দূরকল্পনা। শিরোনামায় যে-'বিষয়ে'র উল্লেখ থাকে তা নিয়ে যতটা বলেন, হয়তো ততটাই থাকে তাঁর নিজের কথা ; আমরা জানতে পারি কী-ভাবে এই জগৎ তাঁর চেতনার মধ্যে প্রবেশ করছে, কোথায় তাঁর প্রেম, কোন সংশয়ে তিনি দষ্ট, কোন গোপন বেদনাকে রচনার মধ্য দিয়ে পরিপাক ক'রে নিচ্ছেন। অর্থাৎ, বিষয় যা-ই হোক না, তিনি ব্যক্ত করছেন নিজেকে (এই সূত্রটি মঁতেনের), আর এই অর্থে তাঁর রচনা ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিনির্ভর, বলা যেতে পারে তাঁর ব্যক্তিতারই দর্পণ। মঁতেন নিঃকুণ্ঠভাবে 'আমি' শব্দ ব্যবহার করেছেন, রবীন্দ্রনাথের 'আমরা'টিও 'আমি'র একটি বিনয়ী ও চতুর প্রকরণ ; এবং এই 'আমি'—গীতিকাব্যের বক্তার মতোই—দেশ-কালের বিশেষ লক্ষণদ্বারা চিহ্নিত হ'য়েও বিশ্বমানবের প্রতিভূ। জীববিজ্ঞানী যখন সর্বাশী প্রাণীর পাকস্থলী বিষয়ে 'প্রবন্ধ' লেখেন তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের একটি মাত্র অংশকে উদ্যোগী হ'তে হয়, কিন্তু অন্য যে-ধরনের প্রবন্ধের আমরা বর্ণনা করছি, তা লেখকের সমগ্র

সত্তা থেকে নিঃসৃত ; শুধু বুদ্ধির বা চিত্তের নয়, সেটা প্রাণের ও অন্তঃকরণেরও কাজ ; যে-মানুষ তার শিশুকন্যার বিনোদের জন্য মেঝেতে হামাগুড়ি দেয়, সর্দির ভয়ে সারা শীত স্নান করে না, অবসর পেলেই মহাভারত পড়ে, আলকাৎরার গন্ধ ভালোবাসে—সেই ইন্দ্রিয়বদ্ধ অসংগতিময় মানুষটিও তাতে সঞ্চারিত ও প্রতিফলিত হচ্ছে। যাকে বলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তা এই বিরাট জগতের একটি বিচ্ছিন্ন কণিকার উপর সংহত হ'য়ে থাকে, অন্য সব-কিছুর অস্তিত্ব সেখানে লুপ্ত ; নিরঞ্জন জ্ঞান সেই দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। আমরা যাঁকে প্রবন্ধকার বলছি, তিনি এই বিচ্ছেদপ্রবণ ঐকান্তিক দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত। জগৎটা তার বিচিত্র উপাদান নিয়ে তাঁর চৈতন্যের উপর অনবরত আঘাত করছে ; সুখে দুঃখে আকাঙ্ক্ষায় স্পন্দমান রক্তমাংসের মানুষকে তিনি কখনো ভোলেন না ;—আর তাই তাঁর রচনা হ'য়ে ওঠে—সত্য নয়, জীবন্ত, শিক্ষণীয় নয়, নন্দনজনক ; তাতে থাকে না কোনো অমোঘ যুক্তি, কোনো ধ্রুব মীমাংসা, নিশ্চিতভাবে কিছুই বলেন না তিনি ; কিন্তু এমন কতগুলো ইঙ্গিত বিকীর্ণ ক'রে দেন যা সহৃদয় পাঠকের মনে বীজের মতো উড়ে এসে পড়ে—হয়তো ছড়িয়ে দেয় শিকড়, হয়তো কোনোদিন সেখানেও এক নতুন ভাবনাকে ফলিয়ে তোলে। বিজ্ঞানীর মতো কোনো প্রস্তুত সত্য তিনি আস্ত তুলে দেন না আমাদের হাতে—দিতে পারেন না ; তিনি পাঠককে তাঁর সহকারী ক'রে নেন ; যা তিনি আভাসে বলেন, উপমায় বলেন, বলেন গুঞ্জরনে ও বর্ণহিল্লোলে, তার 'অর্থ' পূর্ণতা পায় পাঠকের মনে—যদি পাঠক অযোগ্য না হন।

অতিরঞ্জন হচ্ছে কি ? বড্ড বেশি দাবি করা হচ্ছে ? কিন্তু আমি তো কোনো আদর্শ স্থাপন করছি না, রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করছি। এই প্রবন্ধ—বা প্রবন্ধের এই বিশেষ ধরন—য়োরোপে মঁতেন যার স্রষ্টা—আমাদের সাহিত্যে তার মহাশিল্পী হলেন রবীন্দ্রনাথ। এতে সিদ্ধিলাভের পক্ষে যে-সব গুণ প্রয়োজনীয় বা কাঙ্ক্ষণীয় মনে হ'তে পারে, তাঁর প্রতিভায় সেগুলোর সন্নিপাত ঘটেছিলো। শুধু 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বা 'পঞ্চভূতের' মতো গ্রন্থ নয়, তাঁর বহু গদ্য রচনাই পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন, অর্থাৎ সৃষ্টিশীল সাহিত্য ; তাদের মূল্য রচনার মধ্যেই, আধেয়বস্তুতে নয় ;—এমনকি তাঁর সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, প্রবন্ধের মধ্যে যেগুলি কালপ্রভাবে মলিন হ'য়ে যায়নি, সেগুলোতেও এই একই লক্ষণ বিদ্যমান। কেননা রবীন্দ্রনাথ সেই লেখক, যাঁর পক্ষে যে-কোনো সময়ে শিল্পী না-হওয়া দুঃসাধ্য ছিলো, যাঁর কোনো-কোনো প্রবন্ধগ্রন্থে (যেমন 'ছন্দ',

'বাংলাভাষা-পরিচয়') আমরা পাই গবেষণা ও নন্দনধর্মিতার সমন্বয়, বিশ্লেষণ-দক্ষতার সঙ্গেই কবিতার উদ্বোধনীশক্তি। সাহিত্যের নিয়ম ও সংজ্ঞার্থগুলিকে তিনি সাবলীলভাবে অতিক্রম ক'রে যান: তাঁর আত্মজীবনী, ভ্রমণপঞ্জি ও চিঠিপত্রে আশানুরূপ তথ্য পাই না আমরা ; পাই না সমালোচনায় যথাযোগ্য তত্ত্বকথা। পক্ষান্তরে, সমালোচনার মধ্যে আত্মজীবনীর অবতারণা করতে বাধে না তাঁর, ভ্রমণপঞ্জিতে ভ্রমণ ভুলে গিয়ে জীবন, মৃত্যু ও শিল্পকলা বিষয়ে দূরকল্পনাকে প্রশ্রয় দেন। কোনো পাঠক ভুলেও যেন না ভাবেন যে তাঁর 'সমালোচনা' ব'লে চিহ্নিত বইগুলিতেই সাহিত্য বিষয়ে তাঁর সব বক্তব্য বিধৃত হ'য়ে আছে, বা তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র বাইরে আর কোথাও আত্ম-জীবনী নেই। সাহিত্য বিষয়ে তিনি কী ভেবেছেন তা সম্পূর্ণভাবে জানতে হ'লে তাঁর চিঠিপত্র, আত্মজীবনী ও ভ্রমণপঞ্জিও পড়তে হবে, আর তাঁর জীবন বিষয়েও যথেষ্ট আমরা জানতে পাবো না, যদি না তাঁর সমালোচনার প্রতি মনোযোগী হই। এই গ্রন্থের বিভাগগুলি করা হয়েছে সুবিধের জন্য বা নিয়মরক্ষার খাতিরে ; আসলে এই সব প্রবন্ধই পরস্পর-সম্পৃক্ত।

২

এবং তাঁর কবিতার সঙ্গেও এদের সম্বন্ধ নিবিড়। কবিদের বিষয়ে সাধারণভাবেই সত্য এই কথা, কিন্তু সব কবির কবিতা ও গদ্যরচনা একই ভাবে অন্বিত হয় না। যেমন রিলকের বিষয়ে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে আমরা বলতে পারি না যে তাঁর কবিতা হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে তাঁর পত্রাবলির সঙ্গে পরিচয় অত্যাবশ্যক। মালার্মে বা ভালেরির মতো নন তিনি: ঘুরিয়ে, ফিরিয়ে, বেঁকিয়ে পেঁচিয়ে, লুকিয়ে, ভুলিয়ে, ছলে, কৌশলে, সংকেতে, ফাঁদ পেতে—শিল্পকলার এমন একটি ভাবমূর্তি গ'ড়ে তোলেন না, যা তাঁর স্বীয় কবিতার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। ইয়েটসের মতো আমাদের নিয়ে যান না তাঁর কবিতার অন্তঃপুরে ; কবিজীবনের বিবৃতিরূপে 'জীবনস্মৃতি' নিঃসন্দেহে নৈরাশ্যজনক। রবীন্দ্রনাথ যা করেছিলেন তা পুনরুক্তি ; একই কথা পদ্যে ও গদ্যে বলেছিলেন ; পরস্পরের পরিপূরক শুধু নয়, তাঁর কবিতা ও গদ্য এক-এক সময় প্রায় বিনিময়-ধর্মী। পাছে, যাঁরা আধুনিক কবিতায় দীক্ষিত, এ-কথা শুনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ক'মে যায়, তাই এখানে উল্লেখ করি যে শার্ল বোদলেয়ার—আধুনিক কবিতার আদি উৎস যিনি—তাঁর গদ্যেও তাঁর কবিতার প্রতিধ্বনি বিরল নয় ;

প্রবন্ধের মধ্যে কবিতার স্তবক সুদ্ধ রচনা ক'রে দেন তিনি, ছিটিয়ে দেন কবিতার ভাণ্ডার থেকে আহৃত চিত্রকল্প, শব্দবন্ধ ও অলংকার, কখনো-কখনো একই উপাদান থেকে রচনা করেন তাঁর কবিতা ও সমালোচনা। দুই কবিতে প্রভেদ এইখানে—আর এই প্রভেদ তাৎপর্যময়—যে একই কথা রবীন্দ্রনাথ গদ্যে বলেছেন কম কথায় আর কবিতায় কলোচ্ছ্বাসে, আর বোদলেয়ার গদ্য লেখেন সবিস্তারে, কিন্তু কবিতায় তিনি কঠিনরূপে সংহত। 'জীবনস্মৃতি'র 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ দুটিমাত্র অনুচ্ছেদে যা বলেছিলেন, 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ অংশ তারই ব্যাখ্যা ও সম্প্রসারণ; কিন্তু বোদলেয়ারের শিল্পবিষয়ক প্রচুর সমালোচনার নির্যাস তাঁর 'আলোকস্তম্ভ' ('Les Phares') কবিতার এগারোটি চতুষ্পদীতে বিধৃত আছে। বোদলেয়ারের গদ্য যেন তাঁর ছুটির ঘণ্টা—এই রকম মনে হয় আমাদের : ছন্দ, মিল ও স্তবকবিন্যাসের ক্ষমাহীন শর্তপূরণের পরে, চতুর্দশপদীর ব্যূহের মধ্যে আদর্শকে সংবদ্ধ করার অরুন্তুদ প্রয়াসের পরে, গদ্যে যেন নিজেকে নিষ্কৃতি দেন তিনি; সেটা তাঁর বিনোদ ও বিচরণের ক্ষেত্র, কৌতুকের মণ্ডপ এবং বিচারবুদ্ধির মৃগয়াভূমি; অর্থাৎ, তাঁর ব্যক্তিত্বের যে-অংশ সামাজিক, রসিক ও তত্ত্বদর্শী, যা তাঁর কবিতায় প্রচ্ছন্ন থেকে কবিতাকে মেঘচ্ছুরিত রৌদ্রের মতো রঞ্জিত ক'রে তুলেছে, তার স্বাধীন ক্রীড়া গদ্যপ্রবন্ধে তাঁর অনুমত ছিলো। বোদলেয়ারের গদ্য যত ভালোই হোক, তাঁর কবিতার বিকল্প বা সমকক্ষ হবার দাবি তা করে না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে সংবৃত করার চেষ্টা করেননি ব'লে, কখনো-কখনো তাঁর কবিতা ও গদ্যের পার্থক্য চিহ্নিত হয়েছে শুধুমাত্র পদ্যছন্দের ব্যবহার অথবা পঙক্তিবিন্যাসের অসমমাত্রিক পদ্ধতির দ্বারা। 'পূরবী' থেকে 'জন্মদিনে', এই পর্যায়ের মধ্যে বহু কবিতা আমরা খুঁজে পাই, যা গদ্যে একই প্রকার বা অধিকতর মনোরম ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখতে পারতেন বা লিখেই গিয়েছেন; 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'র অনেক অংশকে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ছন্দে-মিলে রূপায়িত করেছেন তিনি, 'শেষের কবিতা'র গদ্যশিল্প অনেক স্থলে কবিতাকে ম্লান ক'রে দিচ্ছে; গদ্যকবিতা 'বাসা' একখানা পত্রের সংস্কারসাধন; এবং পরবর্তী পত্রাবলিতে এমন কোনো-কোনো চমকপ্রদ বাক্য আমরা পাই, বা পলাতক ক্ষণকালীন ভাবচ্ছায়া, যাকে কাব্যরূপ দিতে গিয়ে তাঁকে কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিতা ও সমুদয় গদ্য পাশাপাশি রেখে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে তাঁর কবিতা ও গদ্যের বিবর্তন সমান্তর নয়; তাঁর হাতে গদ্য যে-ভাবে বারে-

বারে পরিবর্তিত হয়েছে, কবিতা সে-রকম হয়নি; কবিতায় তিনি যেন প্রকৃতির হাতে অভিষিক্ত এক সম্রাট, পদ্যাকারে যা-কিছু লিখবেন তা-ই কবিতা হবে, বা তা না-হ'লেও অন্ততপক্ষে উপাদেয় হবে, এই রকম একটা বিধান তিনি নিজেও প্রায় মেনে নিয়েছিলেন; কিন্তু গদ্যে তিনি অনেক বেশি সচেতন শিল্পী, নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করতে অনবরত সচেষ্ট।

এমনি ক'রেই বাংলা সাহিত্যে এই অঘটন ঘটলো যে আমাদের ভাষায় যিনি কবিগুরু, এবং যাঁর সমকক্ষ কবি আবহমান ভারতে আর নেই, তিনিই আমাদের গদ্যরীতির স্রষ্টা। 'স্রষ্টা' কথাটিতে ঐতিহাসিক দিক থেকে আপত্তি হ'তে পারে; বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রকে আমি ভুলে যাচ্ছি না; আমি বলতে চাচ্ছি যে বঙ্কিম থেকে আজকের দিন পর্যন্ত বাংলা গদ্য যে-ভাবে বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে, এবং আজকের দিনে আধুনিক বাংলা ভাষা বলতে যা বোঝায়, তার সাক্ষ্য, প্রমাণ ও উদাহরণের প্রধান ভাণ্ডার রবীন্দ্রনাথ। 'বউঠাকুরানীর হাট' থেকে 'শেষের কবিতা', বা 'বিচিত্র প্রবন্ধ' থেকে 'ছেলে-বেলা': এই গ্রন্থপর্যায় বাংলা গদ্যের ইতিহাসকে ধারণ ক'রে আছে; বঙ্কিমী ও বীরবলী গদ্য, 'সাধু' ও 'চলিত' ভাষা, ঘরোয়া, বৈঠকি ও দরবারি রীতি, প্রাচীন, আধুনিক ও আধুনিকতর শৈলী: এই তাঁর পঞ্চাশ বছরের কৃতিকে বাংলা গদ্যের অণুবিশ্ব বলতে পারি আমরা, হয়তো মহাবিশ্ব বললেও ভুল হবে না। এর মধ্যে সবই আছে: ভারি, হালকা, গম্ভীর, চপল, সংস্কৃত ও দেশজ, সমতল ও বন্ধুর; অত্যুক্তি, বক্রোক্তি ও স্বভাবোক্তি; আছে বহু মিশ্র রাগিণী; সাত্ত্বিক মিতাচারের পাশে বিলাসীর উচ্ছ্বাস, সামাজিক সৌজন্যের পাশে ঐশ্বর্যের আত্মবিকিরণ। 'জীবনস্মৃতি'র পরিমিত, যথোচিত, প্রাঞ্জল ও প্রসন্ন গদ্য যাঁর রচনা, তাঁকে আমরা আঠারো-শতকী ইংরেজি অর্থে 'ভদ্রলোক' বলতে পারি; কিন্তু তার পরে হঠাৎ 'ঘরে-বাইরে' খুললে অলংকরণের আতিশয্যে আমাদের প্রায় দম আটকে আসে; মনে হয়, কালিদাসের ভাষা যদি বাংলা গদ্য হ'তো তাহ'লে তিনি যে-কাব্য লিখতেন, এ যেন তা-ই। আবার 'লিপিকা'য় আমরা জাদুকরের এক উল্টো খেলা দেখতে পাচ্ছি; 'ঘরে-বাইরে'র প্রায় সমকালীন এই গদ্যকে বলতে ইচ্ছে করে মহনীয় অর্থে 'মেয়েলি': যেন ললনাকুলের মৌখিক ভাষার গ্রাম্যতাদোষ নিষ্কাশিত ক'রে রবীন্দ্রনাথ ছেঁকে নিয়েছেন তার ঋজুতা, লাবণ্য ও সারল্য; যা নিতান্ত প্রাকৃত, তারই উন্নয়নজনিত এই সম্মোহন পূর্ববর্তী 'ডাকঘরে'ও

তিনি ঘটিয়েছিলেন। শুধুমাত্র তাঁর লেখা প'ড়ে বাংলা গদ্যের সবগুলি সবীজ ধারাকে আমরা জানতে পারি, এবং ঐতিহাসিক ও অন্যান্য কারণে অন্য কোনো বাঙালি লেখক সম্বন্ধে এ-কথা বলা যায় না। আমাদের গদ্যের অবিকল দর্পণরূপে তাঁকে স্বীকার না-ক'রে আমাদের উপায় নেই।

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের অনুকরণ করেছেন, মধ্যবয়সে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব তাঁকে স্পর্শ করে, এবং এ-দু'জন ছাড়া তাঁর সমকালীন বা পূর্বসূরির মধ্যে আর-কেউ নেই, যাঁর সঙ্গে গদ্যশিল্পের দিক থেকে তাঁর তুলনা সম্ভব। সেইজন্য, যদি আমরা অন্বেষণ করি তাঁর 'বঙ্কিমী' গদ্য কোথায় বঙ্কিম থেকে স'রে এসেছে, আর তাঁর 'সবুজ পত্র' যুগের রচনাই বা কোনদিক থেকে অ-প্রামথিক, তাহ'লে হয়তো ধরা পড়বে তাঁকে বাংলা গদ্যের স্রষ্টা বলার সংগত কারণ আছে কিনা। সেই পার্থক্যটি, আমার মনে হয়, এই। বাংলা গদ্যে রমণীয়তা বঙ্কিমের দান, তাঁর আগে ঐ গুণটি দেখা দেয়নি, এবং তাঁর উপন্যাস ও 'কমলাকান্ত' প্রভৃতি প্রবন্ধ রমণীয় গদ্যে রচিত ব'লেই আজ পর্যন্ত অম্লান। এই রমণীয়তা পদ্যের অধমর্ণ। অর্থাৎ, বঙ্কিমের গদ্যে মাঝে-মাঝেই পদ্যছন্দের বোল শোনা যায়, পদ্যের ধ্রুবপদের মতোই তাতে অনুলাপী অংশ অবিরল, তাঁর কোনো-কোনো বাক্য প্রায় পয়ারের পঙক্তি হ'তে পারে—অন্তত‌পক্ষে মধ্যখণ্ডে তাদের উন্মুখতা স্পষ্ট, এবং আঠারো-শতকী ইংরেজি দশমাত্রার পদ্যের মতো উক্তি ও প্রত্যুক্তির দোটানার মধ্যে তাদের অবস্থান। তাঁর বাক্যগুলি ঋজু, শিক্ষিত সৈন্যদলের মতো তারা তালে-তালে পা ফেলে চলে, তাদের শৃঙ্খলা ও পারম্পর্য যুক্তিনির্ভর, অভিপ্রায়ের ঐক্যের দ্বারা তারা সংবদ্ধ। এবং, সমগ্র-ভাবে দেখতে গেলে, প্রমথ চৌধুরীর চরিত্রলক্ষণও এই: বাক্যবন্ধের এই ঋজুতা, এই যুক্তিনির্ভর বাগনুক্রম। 'সাধু' ও 'চলিত' ভাষা-সম্পৃক্ত বাদানুবাদের ফলে এই সাদৃশ্যটি আমরা বহুদিন পর্যন্ত লক্ষ করিনি; কিন্তু আজকের দিনে, যখন ঐ গৃহযুদ্ধ অবসিত হয়েছে, তখন 'লোকরহস্য' বা 'বিবিধ প্রবন্ধে'র পরে 'হালখাতা' বা 'নানা চর্চা' পড়লে সহজেই ধরা পড়ে যে এই দু-জনের গদ্যের চলন একই ধরনের, গঠনেও উল্লেখযোগ্য তফাৎ নেই। কিন্তু এঁদের পরে রবীন্দ্রনাথ খুললে তৎক্ষণাৎ এক ভিন্ন সুর ধ্বনিত হয়; আমরা অনুভব করি আর-একটি গুণ, যাকে দীপ্তি বা শৃঙ্খলা বা রমণীয়তা বললে যথেষ্ট হয় না, যাকে বলতে হয় প্রবাহ বা প্রবহমানতা— যা রবীন্দ্র-পূর্ব গদ্যে নেই, তাঁর পরবর্তী সব গদ্যেও লক্ষণীয় নয়।

বঙ্কিমে, বা পূর্বসূরি বিদ্যাসাগরেও, গতি আছে; কিন্তু যাকে আমি রবীন্দ্রনাথের প্রবাহ বলছি তা ভিন্ন প্রকৃতির; এবং এই প্রভেদের আকার খুব বড়ো না-হ'লেও প্রকরণে তা দূরস্পর্শী। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের যেটি কল্প বা ইউনিট সেটি বাক্য নয়, অনুচ্ছেদ; একসঙ্গে এক-একটি অনুচ্ছেদে তিনি চিন্তা করেন, এবং অনুচ্ছেদগুলির যোগফলের চাইতে তাঁর সমগ্র রচনাটিকে বড়ো ব'লে মনে হয়। বাক্যের সঙ্গে বাক্যের, বা অনুচ্ছেদের সঙ্গে অনুচ্ছেদের সম্বন্ধের জন্য ব্যাকরণের বা যুক্তির যোগই যথেষ্ট, এবং তার দ্বারাও উৎকৃষ্ট গদ্য সম্ভব হ'য়ে থাকে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথে সেই যোগসূত্রটি এমন এক রহস্যময় প্রাণস্পন্দন, যাকে আমরা অবশেষে ভাষার ধ্বনিস্পন্দন ব'লেই চিনতে পারি। তাঁর বাক্যপর্যায় শুধু সান্নিধ্য-গুণে প্রতিবাসী নয়, একটি অবিচ্ছেদী ধারাবাহিকতায় অন্যোন্যশ্লিষ্ট; তারা একে অন্যের অনুসরণমাত্র করে না, গড়িয়ে-গড়িয়ে পরস্পরকে যেন স্পর্শ ক'রে থাকে; জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো তারা নমনীয়, তারা লীলা জানে, ব্যত্যয় ঘটাতে ভয় করে না, মানসাম্য ভেঙে দিয়ে আশাতীতকে সম্ভব ক'রে তোলে। তাঁর একই রচনার মধ্যে নিঃসংকোচে পাশাপাশি স্থান ক'রে নেয় ক্ষুদ্র ও সরল, এবং জটিল ও দীর্ঘায়িত বাক্যবিন্যাস; তাঁর দুটি প্রতিবেশী বাক্য একই ভাবে আরম্ভ বা শেষ হয় না; স্বরান্ত ও হলন্ত শব্দের সন্নিবেশে তিনি যেন অচেতনভাবেই ব্যবধান রক্ষা ক'রে চলেন, একই স্বরের পৌনঃপুনিকতা সহ্য করেন না; দ্রুতি, বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যের সাধনায় স্বীকার ক'রে নেন ইংরেজি ধরনের অন্বয়— যা তাঁর আগে বঙ্কিম ও বিদ্যাসাগরও করেছেন, কিন্তু পার্শ্বোক্তি, সর্বনাম ও ব্যুৎক্রমের ব্যবহারজনিত যার পূর্ণ রূপটি রবীন্দ্রনাথের আগে প্রতিভাত হয়নি, যদিও সমালোচকেরা তাঁকে ভুলে গিয়ে কখনো-কখনো এমনও বলেছেন যে কতিপয় অযোগ্য আধুনিক লেখকই বাংলা গদ্যে ইংরেজি রীতির প্রবর্তক। কিন্তু ইংরেজি তো আর নেই, সেটাই বিশুদ্ধ বাংলা হ'য়ে গেছে, কিংবা ধরনটাকে হয়তো ইংরেজি বলাই ভুল; কেননা কমা-সেমিকোলনাদি বিরতিচিহ্ন বাংলা গদ্য যেদিন স্বীকার ক'রে নিলে, সেদিনই ব'লে দেয়া যেতো যে, আপন প্রতিভার নির্বন্ধেই, সে বহুলাঙ্গ রূপকরণে অন্যান্য আধুনিক ভাষার প্রতিযোগী হ'য়ে উঠবে। অন্ততপক্ষে রবীন্দ্রনাথের পরে এ-কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য যে এক-দাঁড়ি-দুই-দাঁড়ি-নির্ভর কৃত্তিবাসী পয়ারের সঙ্গে বাংলা গদ্যের কোনো সম্বন্ধ আছে, কিংবা 'খাঁটি বাংলা অন্বয়' নামক অন্য কোনো পদার্থ আর সম্ভবপর। বরং আমাদের এ-কথাই

তর্কাতীত ব'লে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত নূতনত্বের যা উৎস ও আশ্রয়, তা বাঙালির মুখের ভাষার নিজস্ব ও মৌলিক ছন্দ; যে-সুরে আমরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলি, যে-ভাবে আমাদের কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন ঘ'টে থাকে—আমাদের আবেগ ও নৈরাশ্য, সংশয়, উত্তেজনা ও দীর্ঘশ্বাস, এই সব-কিছুর এক আদর্শ ধ্বনিরূপের নামান্তর হ'লো রবীন্দ্রনাথের গদ্য। এবং এই যাকে ছন্দ বলছি তা পদ্যের নয়, গদ্যেরই ছন্দ, পারিভাষিক যাথার্থ্যের খাতিরে তাকে ছন্দস্পন্দ বলতে পারি; তাতে পদ্যের বা গানের মতো তাল নেই, কিন্তু রাগসংগীতে আলাপের মতো লয় আছে; রবীন্দ্রনাথের অসামান্য কৃতিত্ব এইখানে যে আজীবন কবির মতো গদ্য লিখেও, গদ্যে—এমনকি গদ্যকবিতায় পদ্যছন্দের প্রতিধ্বনিকে তিনি স্থান দেননি। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত নির্ভুল বলেছেন যে তাঁর গদ্য 'মহাকবির গদ্য, সুতরাং কোথাও পদ্যগন্ধী নয়।' এই 'সুতরাং'টি অর্থময়।

এই ছন্দসিদ্ধির জন্যই রবীন্দ্রনাথের যুক্তি দুর্বল হ'লেও প্রবন্ধ ভেঙে পড়ে না, ঘটনাগত যাথার্থ্যের অভাবসত্ত্বেও উপন্যাস স্মরণীয় হয়, এবং নাটক অন্যান্য কারণে দুঃসহ বোধ হ'লেও উল্লেখযোগ্যতার মর্যাদা পায়। ব্যতিক্রম নেই তা নয়: 'নবীন', 'বাঁশরী' ও অংশত 'তিন সঙ্গী'র গদ্যকে কৃত্রিমতার পরাকাষ্ঠা বলতে আমি দ্বিধা করবো না; বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দের উপর যাঁর স্বাভাবিক ঈশিত্ব ছিলো তিনি কেমন ক'রে ও-সব গ্রন্থ প্রণয়ন করতে পারলেন তা উত্তর-পুরুষের সমস্যা হ'য়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের যে-একটি লক্ষণ আমাদের অন্তহীন-ভাবে বিস্মিত ক'রে রেখেছে তা তাঁর আপতিক স্বতঃস্ফূর্তি; ক্লান্ত মুহূর্তে তিনি বরং নিজের অনুকরণ করেছেন, কিন্তু চেষ্টাকৃত নূতনত্ব ঘটাতে চাননি; আর সেইজন্যই 'বাঁশরী' বা 'তিন সঙ্গী'কে অমন চরিত্রচ্যুত মনে হয়, তাতে পদে-পদে পাঠককে চমকে দেবার যে-প্রয়াস আছে তা ক্লিষ্ট ও ক্লেশকর ব'লেই গভীরতম অর্থে অ-রাবীন্দ্রিক। অথচ প্রায় একই সময়ে রচিত 'বিশ্বপরিচয়' ও 'ছেলে-বেলা'তে গদ্যভঙ্গির একই প্রকার নূতনত্ব থাকলেও কৃত্রিমতার নিপীড়ন নেই; তার কারণ আমার এই মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের সদ্যতন ভাষা ব্যবহার করলে মানিয়ে যায়, কিন্তু গল্প-নাটকের পাত্রপাত্রীর মুখে তা অবিশ্বাস্য। কাল্পনিক চরিত্রের মুখে চরিত্রশোভন ভাষা বসাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়ই

ব্যর্থ হয়েছেন, নাটকরচনায় এইটেই তাঁর বিঘ্ন ছিলো, 'ডাকঘরে'র ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে তা প্রকট হয়নি, কিন্তু 'রাজা' থেকে 'রক্তকরবী' পর্যন্ত যেখানেই আছে জনতা বা প্রাকৃতজন সেখানেই তাদের কথা শুনে আমাদের সন্দেহ হয় যে এদের কোনো নিজস্ব সত্তা নেই, এরা কর্তার হাতে ক্রীড়নক মাত্র। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের গদ্য সবচেয়ে প্রামাণিক ও স্বচ্ছন্দ হ'য়ে ওঠে যখন তিনি নিজের জবানিতে কথা বলতে পারেন; তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে অবশ্যমান্য তাঁর 'গল্পগুচ্ছ', তাঁর উপন্যাসের বর্ণনার অংশ, এবং তাঁর প্রবন্ধপর্যায়, চিঠিপত্র ও আত্মজৈবনিক রচনাবলি। অন্তত এগুলো থেকে বাছাই ক'রে নিলে আমরা গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রকৃষ্ট পরিচয় পেতে পারি।

প্রবন্ধরচনার একটি গতানুগতিক পদ্ধতির সঙ্গে আমরা পরিচিত আছি: মাষ্টারমশাই ছাত্রকে বলেন, অমুক-অমুক পুস্তক পাঠ ক'রে এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে আনো; এবং ছাত্র যদি প্রমাণ করতে পারে যে উল্লিখিত বই ক-টি সে পড়েছে, প'ড়ে অন্তত অংশত বুঝেছে, এবং সেইটুকু তার 'স্বীয় ভাষা'য় প্রকাশ করতেও অপারগ হয়নি, তাহ'লেই সে পয়লানম্বরি ছাত্র ব'লে গণ্য হ'লো। আমরা ধ'রে নিতে পারি যে উত্তরজীবনে নিজে অধ্যাপক হ'য়ে সে এই পদ্ধতির ব্যাপকতর ব্যবহার করবে, শতাধিক পুস্তক অধ্যয়ন ক'রে রচনা করবে নূতন গ্রন্থ, তার অধ্যবসায়ের ফলে কোনো একটি সীমিত বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বর্ধিত হবে। সম্ভবত সেই বিষয়টি হবে অ-সামান্য, অর্থাৎ সাধারণ সাহিত্যলিপ্সুর পক্ষে মনোজ্ঞ নয়, কিন্তু বিশেষজ্ঞের আদরণীয়। এ-ধরনের পুস্তক তার নিজের ক্ষেত্রে মূল্যবান, কিন্তু ততদিনই মূল্যবান যতদিন সেই বিশেষ বিষয়টিতে নূতনতর জ্ঞান সংকলিত না হয়। কিন্তু প্রবন্ধ-রচনার অন্য একটি উপায় আছে, সেই উপায় প্রতিভাবানের। কোনো-এক শুভ মুহূর্তে লেখক তাঁর স্বজ্ঞার দ্বারা অকস্মাৎ একটি সত্যকে অনুভব করেন—সেটা 'সত্য' কিনা তাও সঠিকভাবে বলা যায় না, শুধু এটুকু বলা যায় যে তাঁর অনুভূতিটা সত্য। সেইটিকে প্রকাশ করার জন্য যে-সব তথ্য, যুক্তি ও উদাহরণ তিনি উপস্থিত করেন, সেগুলিও নির্ধারিত বা সুচিন্তিতভাবে আহৃত নয়, তাঁর উৎসাহের তাপে যা-কিছু মনে প'ড়ে যায় প্রায় তা-ই তিনি গ্রহণ ক'রে থাকেন। এই ধরনের প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে যুক্তি অথবা তথ্যে ভ্রান্তি ধরা পড়লেও রচনাটি অনাহত থাকে, কেননা তাদের মৌলিক অনুভূতিটি প্রমাণনির্ভর নয়, সংক্রামক, এবং সেই কারণেই মূল্যবান। উদাহরণত, রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষীয়

ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধটির উল্লেখ করতে পারি; আজকের দিনে তার প্রতিটি তথ্য যদি পণ্ডিতেরা বাতিল ক'রে দেন তবু সেটিকে বর্জন করতে পারবো না আমরা, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আমাদের মুগ্ধ ক'রে রাখবে। এবং এই দৃষ্টি এ-অর্থে সত্য যে কোনো-এক সময়ে কোনো-এক পুরুষ তার প্রভাবে ভারতের একটি সমগ্র রূপ উপলব্ধি করেছিলেন। যেখানে উপলব্ধি আছে সেখানে আমরা তর্ক করতে ভুলে যাই।

এই ধরনের সমালোচনাকে বিম্বধর্মী বা ইম্প্রেশনিস্টিক আখ্যা দিয়ে অনেকে এর মর্যাদালাঘবের চেষ্টা ক'রে থাকেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন তোলা উচিত: বিম্বটি কার মনে প্রতিভাত হচ্ছে? যদি হন কোনো সমকালীন সাপ্তাহিকের লেখক, যিনি পাঠকের সঙ্গে পাঁচ মিনিট গালগল্প ক'রে প্রসঙ্গত জানিয়ে দিতে ভোলেন না যে কোনো-একটি বই প'ড়ে তাঁর 'কেমন লাগলো', তাহ'লে এ-বিষয়ে আলোচনার কোনো প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু যদি তিনি হন কোনো আলাপচারী স্যামুয়েল জনসন, বা বৃদ্ধ গ্যেটে, বা সদ্যযুবক জন কীটস, বা বোদলেয়ার অথবা টোমাস মান্—কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাহলে এই তথাকথিত বিম্বকে আর অশ্রদ্ধা করার উপায় থাকে না; আমরা দেখতে পাই যে কোনো-একটি ভাব, তাঁদের মনে বিম্বিত হয়েছে ব'লেই, ব্যঞ্জনায় গাঢ় হ'য়ে উঠেছে; এঁদের একটি অসতর্ক মুহূর্তের মুখের কথা, বা দ্রুতরচিত পত্রের কোনো উক্তি—কখনো-কখনো তাও যেন অর্থে ও ইঙ্গিতে সসত্ত্ব। এর পরে আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানতেই হয় যে ভগবানের রাজ্যে সুবিচার ব'লে কিছু নেই; যে প্রতিভা নামক রহস্যময় ব্যাপারটি অন্যায়ভাবে আমাদের উপর জিতে যায়—নির্দিষ্ট শাস্ত্রসমূহ না-পড়েও, বয়সে প্রায় নাবালক হ'য়েও এমনকি আলোচ্য বিষয়টিতে অত্যল্প জ্ঞান নিয়েও—সাবলীলভাবে আমাদের উপর জিতে যায়। যাঁরা নিজেরা সৃষ্টিশীল প্রতিভাবান লেখক, তাঁরা সাহিত্য বা আনুষঙ্গিক বিষয়ে যা বলেন তার মূল্য স্বতঃসিদ্ধ বললে ভুল হয় না; কেননা আমরা দেখতে পাই যে পণ্ডিতেরা যুগে-যুগে তাঁদের উক্তির ভাষ্য রচনা করেন, কিন্তু পণ্ডিতের গবেষণার সঙ্গে পরিচয়স্থাপন কবিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয় না।

কবি-সমালোচকের মন কী-ভাবে কাজ করে, আমাদের ভাষায় তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রবন্ধে উপমার প্রাচুর্য দেখে কেউ-কেউ বলেছেন যে তিনি স্থানে-অস্থানে অকারণ 'কবিত্ব' করে থাকেন। কিন্তু 'কবিত্ব' করার অধিকার সকলের থাকে না, কারো-কারো থাকে—রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয়ই

ছিলো। স্মর্তব্য, উপমা ভিন্ন দর্শনশাস্ত্র প্রায় অচল, উপনিষদ ও প্লেটো থেকে আরম্ভ ক'রে ফ্রয়েড পর্যন্ত তার উদাহরণ অপর্যাপ্ত। পক্ষান্তরে বরং এটাই লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ রীতিমতো তাত্ত্বিক ভাষায় রচিত, যাকে গদ্যতম গদ্য বলা যায় তাও তিনি অনেক লিখেছেন; বস্তুত, 'সবুজ পত্রে'র আগে পর্যন্ত প্রবন্ধে বা কথাসাহিত্যে তাঁর কবিসত্তা সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায়নি। অথচ তাঁর যে-কোনো পর্যায়ের রচনায় আমরা একজন কবির উপস্থিতি অনুভব করি, তার কারণ তাঁর মনের বিদ্যুৎধর্মিতা। যেন বিদ্যুতের উদ্ভাসের মতো তিনি মুহূর্তে তাঁর মূল চিন্তাটিকে আমাদের মনের সামনে উপস্থিত করেন: আলোচ্য বিষয় যা-ই হোক না, রাজনীতি বা ধর্ম, শিক্ষা বা ইতিহাস, তিনি তৎক্ষণাৎ বিষয়টির একেবারে মর্মস্থলে চ'লে যান; পাঠকদের মধ্যে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা নতুন কোনো তথ্য না-পেলেও নতুন একটি দৃষ্টি লাভ করেন; আর যাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত হ'তে পারেন না তাঁরা দেখতে পান যে তাঁদের স্বমতের সপক্ষে নতুন যুক্তি ঐ রচনা থেকেই আহরণ করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ সেই দ্রষ্টাদের অন্যতম, যাঁরা বুঝিয়ে দেন যে আমরা যাকে 'মতামত' বলি সেটি সবচেয়ে অকিঞ্চিৎকর সামগ্রী; আসল কথা অন্তর্দৃষ্টি—সেই 'বিশ্ব', বা বিশ্বগ্রহণের সহজ ক্ষমতা, যা বিষয় ও বিষয়ীকে যুগপৎ উদ্‌ঘাটিত করে। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ একজন অত্যন্ত ঔৎসুক্য-জনক ব্যক্তি, তাই তিনি যে-কোনো বিষয়ে যা-কিছু বলেন প্রায় তাতেই আমাদের ঔৎসুক্য অনিবার্য।

এখানে বলা দরকার যে তাঁর সাহিত্য ও রসতত্ত্বের আলোচনায় আমরা প্রথম থেকেই একটি ভিন্ন সুর লক্ষ করি; এখানে তাঁর কবিসত্তার কাজ বেশি, উপমা আরো প্রচুর, মীমাংসা আরো অনিশ্চিত, এবং উপস্থাপনা—শাস্ত্রীয় আদর্শে দেখলে—সবচেয়ে কম তৃপ্তিকর। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য সমালোচনা-গ্রন্থ 'পঞ্চভূত' সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হ'তে পারি না এটি 'সমালোচনা' না কি রম্যরচনা, এদিকে 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র নামেই যদিও 'বিচিত্র' আছে, তবু সেটিকে অনেকাংশে রসতত্ত্বের বিচার বললে ভুল হয় না—বিখ্যাত 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধ তো রীতিমতো নন্দনতত্ত্বের অনুশীলন। পরবর্তী গ্রন্থগুলিকে 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', এই ধরনের সুস্পষ্ট নাম দিয়ে তিনি পাঠক, সম্পাদক, ছাত্র ও অধ্যাপকের সুবিধে ক'রে দিয়েছেন, কিন্তু এখানেও তাঁর লেখার ধরনে 'শোনো বলছি' ভাবটা নেই, নিজেকে সত্য ও

জ্ঞানের ভাণ্ডার ব'লে ধ'রে নিয়ে পাঠককে শিক্ষিত করার ভঙ্গি নয় তাঁর ; যেমন 'পঞ্চভূতে' ভিন্ন-ভিন্ন 'চরিত্রে'র সাহায্যে ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিকোণ উপস্থিত করেছিলেন, তেমনি এখানেও যেন নিজের সঙ্গে তর্ক করতে-করতে তাঁর যাত্রা ; একটু এগিয়ে, আর-একটু পেছিয়ে, মাঝে-মাঝে হুঁচট খেয়ে, কখনো কোনো আকস্মিক ও উজ্জ্বল ভাবনার পশ্চাদ্ধাবন ক'রে, কখনো বা দূরকল্পনার উৎসাহে আলোচ্য বিষয় বিস্মৃত হ'য়ে—এমনভাবে লেখেন যেন সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর আত্ম-পরীক্ষা ও স্বগতোক্তি। যেমন কবিতায়, তেমনি প্রবন্ধরচনায় অনেক সময় আচ্ছাদনের ব্যবহার উপকারী হয় ; সাহিত্য বিষয়ে কিছু বলার থাকলে তার একটি প্রশস্ত উপায় হ'লো বিশেষ কোনো কবি অথবা গ্রন্থের সমীক্ষণ, সেই অবলম্বনটিকে জড়িয়ে-জড়িয়ে লেখকের চিন্তা উন্মীল হ'তে পারে—এবং কবিরা সাধারণত এইভাবেই সমালোচনা লিখে থাকেন। রবীন্দ্রনাথেও এর উদাহরণের অভাব নেই, কিন্তু 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' ও সর্বশেষ 'সাহিত্যের স্বরূপ'—এই তিনটি গ্রন্থে বিশুদ্ধ রকম তাত্ত্বিক বা দার্শনিক আলোচনার দিকে তাঁর প্রবণতা দেখি, 'সাহিত্যের তাৎপর্য', 'সাহিত্যের সামগ্রী', 'সৌন্দর্যবোধ', 'সাহিত্যবিচার', 'সাহিত্যধর্ম', 'তথ্য ও সত্য',—এই সব শিরোনামা মানতেই হবে, প্রথম দর্শনে তেমন উৎসাহজনক নয় ; আমাদের মনে হ'তে পারে যিনি 'সাহিত্য', 'সত্য' বা 'সৌন্দর্য' বিষয়ে তাঁর ধারণাটি বেশ স্পষ্ট কথায় ব'লে দিতে পারেন তিনি আর যা-ই হোন, কবি নন, এবং রবীন্দ্রনাথ কেমন ক'রে এই বিমূর্ত বায়ুমার্গে বিচরণ করেছিলেন তা ভেবে আমাদের বিস্মিত হওয়াও স্বাভাবিক। কিছুটা বেদনার সঙ্গে আমাদের মনে প'ড়ে যায় যে ততদিনে এই কবি তাঁর দেশের প্রধান পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছেন ; যে-কোনো প্রশ্ন তাঁর সামনে উপস্থিত করতে লোকেরা যেমন আর সংকোচ করে না, তেমনি তাদের সন্তোষসাধনের চেষ্টাও তাঁর কর্তব্য-তালিকার অন্তর্ভূত ; এমনকি, 'কবিতা কাকে বলে' এই রকমের অসম্ভব প্রশ্ন উত্থাপিত হ'লেও তাঁর মৌন থাকার উপায় নেই। পক্ষান্তরে, এমন সম্ভাবনাও স্বীকার্য যে জীবনের প্রধান সৃষ্টিশীল অধ্যায় উত্তীর্ণ হবার পর, এবং তাঁর 'বিরুদ্ধে' একদল অর্বাচীনের কলরব শুনতে পেয়ে, তিনি তাঁর অচেতন সাহিত্যধর্মকে সচেতন স্তরে ব্যক্ত করার চেষ্টা করছিলেন ; হয়তো তাঁর সাহিত্যিক আদর্শ ও বিশ্বাস সম্পর্কে নিজেরই কাছে একটা জবানবন্দি দেবার ইচ্ছে তাঁর হয়েছিলো। এই প্রচেষ্টা বিপর্জ্জনক, কেননা কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মধ্যে কবি তাঁর

কবিতাকে ধরাতে পারেন না; তত্ত্বকে আঁটো করতে গেলে বস্তা ফেটে ধানের আঁটি বেরিয়ে পড়ে, আবার উদার হ'তে গেলে তা সর্বসাহিত্যের নির্বিশেষ আধার হ'য়ে যায়। এ-অবস্থায় কবিরা একমাত্র যা করতে পারেন রবীন্দ্রনাথও তা-ই করেছেন; আরিস্টটল বা আলংকারিকদের মতো বিষয়টিকে মুখোমুখি আক্রমণ না-ক'রে সেটিকে ঘিরে-ঘিরে কথা বলেছেন তিনি, তাঁর রচনার মধ্যে প্রবেশ করেছে সংশয়, কৌতুক, পুনরুক্তি, অস্থিরতা; কোনো-একটি উক্তি ক'রে তখনই তাকে সীমিত, খণ্ডিত বা বিস্তারিত করেছেন; কোনো প্রবন্ধ শেষ করামাত্র সেটিকে আর পর্যাপ্ত ব'লে তাঁর মনে হয়নি—তাঁরই জের টেনে, তার প্রতিবাদে ও সমর্থনে, আরো লিখতে হয়েছে। সেইজন্য তাঁর তত্ত্বালোচনা এমন সপ্রাণ ও উর্মিল, তাকে আমরা বলতে পারি একটি আন্দোলন; 'অলি বার-বার ফিরে যায়, অলি বার-বার ফিরে আসে'—লেখকের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধটি যেন এইরকম, তা না-হ'লে ফুল ফোটে না। এই 'ফুল' হ'লো রবীন্দ্রনাথের দু-একটি নিবিড় ও সহজাত অনুভূতি, তাঁর হৃদয়ের মধ্যে অনির্বচনীয়ের উদ্ভাস; সেটি কোনো প্রমাণসাপেক্ষ তথ্য নয় ব'লে উপমা, রূপক ও অগ্নিধর্মী হিল্লোল ভিন্ন তার সঙ্গে ব্যবহারের কোনো পথ নেই। তা নেই ব'লে তাঁর সব তর্ক গান হ'য়ে ওঠে—'ঘরে-বাইরে'র বিমলার কথা চুরি ক'রে বলছি; কিংবা এর চেয়েও সঠিক বর্ণনা যদি দিতে চাই তাও রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই পাওয়া যাবে। 'ছন্দ' গ্রন্থের আরম্ভে 'সই, কে বা শুনাইল শ্যামনাম', এই পঙক্তি উদ্ধৃত ক'রে তিনি মন্তব্য করেছেন যে এই সাধারণ সংবাদটিকে ছন্দের মধ্যে এমনভাবে দুলিয়ে দেয়া হয়েছে যে পাঠকের মনে 'কেবলই ঢেউ উঠতে লাগলো। ঐ কটি কথার···অন্তরের স্পন্দন আর কোনোদিনই শান্ত হবে না। ওরা অস্থির হয়েছে, এবং অস্থির করাই ওদের কাজ।' পদ্যছন্দের এই ইন্দ্রজাল আমাদের কারোরই অজানা নেই; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের গদ্যের অভিঘাতে কখনো-কখনো অমনি ক'রেই অভিভূত হ'তে হয়, আমাদের মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ উঠতে থাকে, কথা শেষ হ'লেও স্পন্দন থামে না। আরো আশ্চর্য এই যে তাঁর এই কিন্নরকণ্ঠ আমরা সেখানেও শুনতে পাই যেখানে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক; বরং সেখানেই যেন নির্ভুলভাবে শুনতে পাই; তাঁর ছন্দ ও শব্দতত্ত্বের আলোচনা শুধু আমাদের বুদ্ধির কাছে বার্তা পাঠায় না, আমাদের সমগ্র সত্তাকে পুলকিত ক'রে তোলে। হয়তো কোনো মীমাংসার তীরে তিনি উত্তীর্ণ করেন না আমাদের, কোনো তৈরি সত্য

কখনোই হাতে তুলে দেন না ; কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে একটি বেগ সঞ্চার করেন, যার ফলে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে আমাদের নিজেদের ভ্রষ্ট স্মৃতি, স্বপ্নের ভগ্নাংশ, চিন্তার রশ্মি, হয়তো ইন্দ্রিয়ের কোনো নূতন শিহরন। আমরা চঞ্চল হ'য়ে উঠি, ভেলা নিয়ে ভেসে পড়ি সমুদ্রে ; তিনি আমাদের স্বাধীনভাবে সত্যানুসরণে যাত্রা করিয়ে দেন—এই তিনি করেন আমাদের—যদি আমরা নিজেদের অক্ষমতাবশত মধ্যসমুদ্রে ডুবে মরি, সে-দায়িত্ব তাঁর নয়, আর যদি বা তাঁর হয় তবু তো মানতে হবে যে বেরিয়ে প'ড়েই আমরা সার্থক হয়েছি। তাঁর কোনো রচনা অধ্যাপকের কাছে পেশ করলে পাশ-নম্বরও জুটবে কিনা সন্দেহ : কেননা কিছু 'প্রমাণ' করা দূরে থাক, কোনো তথ্যও তিনি পরিবেষণ করেন না ; তাঁর উল্লেখগুলি অস্পষ্ট, মতামতসমূহ ব্যক্তিগত রুচির দ্বারা আক্রান্ত, যাকে বলে গবেষণা তার চিহ্নমাত্র নেই। আর-কিছু না, পাঠকের মনে শুধু একটি সুর তুলে দেন তিনি, এবং সুরমাত্রেই গতিধর্মী। 'ওরা অস্থির হয়েছে, এবং অস্থির করাই ওদের কাজ' : তাঁর গদ্য বিষয়ে সাধারণভাবে এই কথাটি বলা যেতে পারে।

৪

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনাকে অন্য এক ভাবে ভাগ করা যায় : একদিকে সরকারি বা পোশাকি, অন্য দিকে ঘরোয়া বা আটপৌরে। এই বিভাগ তাঁর প্রবন্ধের পক্ষেও অর্থহীন নয়, কিন্তু পত্রাবলি ও ভ্রমণবৃত্তান্ত বিষয়ে আক্ষরিকভাবে প্রয়োজ্য। পত্রাবলিকে বাদ দিয়ে তাঁর গদ্যসাহিত্য বিষয়ে চিন্তা করা যায় না, কেননা তা শুধু পরিমাণে অজস্র নয়, কখনো-কখনো সাহিত্যগুণে ভরপুর। যেগুলি তাঁর সত্যকার চিঠি, এবং সেই সঙ্গে স্মরণীয় সাহিত্য, সেগুলি সবই তাঁর যৌবনের রচনা ; যেদিন থেকে শান্তিনিকেতনের গুরুদেব ও জগতের গুরুস্থানীয় হবার দুর্ভাগ্য তাঁর ঘটলো, সেদিন থেকে চিঠি লেখার সুযোগ তিনি হারালেন ; তাঁর জীবনের শেষ কুড়ি বা পঁচিশ বছরে তিনি পত্রাকারে যা-কিছু লিখেছেন তার শ্রেষ্ঠ অংশ পত্রবেশী প্রবন্ধ, বা অন্তত প্রকাশের জন্যই রচিত ; অন্যগুলো অনুরোধরক্ষার্থে বা কর্তব্যবোধে লেখা, তাতে কখনো কোনো মহিলাকে তিনি সান্ত্বনা বা উপদেশ দিচ্ছেন, কখনো বা সমকালীন পুস্তক বা ঘটনা বিষয়ে তাঁকে কিছুটা অনিচ্ছা কাটিয়ে অভিমত দিতে হচ্ছে। শেষের দিকে তাঁর প্রতিটি চিঠির প্রতিলিপি রেখে তবে তা ডাকে পাঠানো

হ'তো, চিঠির স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে এত বড়ো বিঘ্ন আর নেই; তাঁর এই পর্যায়ের চিঠিপত্র সাধারণত এমন অব্যক্তিক যে প্রায় যে-কোনোটি যে-কোনো ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিলে অশোভন হ'তো না। অথচ এই অবস্থাতেও, তিনি নিতান্তই রবীন্দ্রনাথ ব'লে অনেক পত্রে অল্পবিস্তর সরসতার তিনি সঞ্চার করেছেন, তাঁর হাতের গুণে খুচরো খবরের চিরকুটও স্বাদু হয়েছে, কাজের কথাও প্রয়োজনের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। যাকে বলে গুণপনা বা দক্ষতা, তা যেন তাঁর নয়নহরণ হস্তাক্ষরের মতোই তাঁর সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলো; তা দেখে তাঁকে ধন্য না-ব'লে যেমন পারি না, তেমনি আমাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে সেই স্বর্ণযুগ স্মরণ ক'রে, যখন পত্রলেখক ও প্রাপকের মধ্যে মুদ্রাকরের উপচ্ছায়া হানা দেয়নি। সেই যুগের একটি শ্রেষ্ঠ ফসল 'ছিন্নপত্র'—অমর কাব্য 'সোনার তরী', ও 'গল্পগুচ্ছ'কে মনে রেখেই এ-কথা বলছি; অমন প্রাণোচ্ছল, যুগপৎ অমন ব্যক্তিগত ও সার্বিক, অমন চিরনতুন ও অফুরন্তরূপে পাঠযোগ্য পত্রপর্যায় রবীন্দ্রনাথও আর দ্বিতীয়বার রচনা করেননি। কল্পনা, হাস্যরস, মনস্বিতা; অনুচিন্তনের আবিষ্কার ও বহির্জগতের বাস্তব তথ্য; চোখ দিয়ে দেখা ও মনে-মনে ভাবা;—এই সবই আছে 'ছিন্নপত্রে,' আর সেই সঙ্গে আছে আর-একটি ব্যাপ্ত সত্তা, যার নাম বাংলাদেশ ছাড়া আর-কিছুই দিতে পারি না। ঋতু, নদী ও তৃণতরুময় বাংলার পল্লীপ্রকৃতি, তার কান্তি, গন্ধ ও আর্দ্রতা নিয়ে, এই পুস্তকের অক্ষর থেকে এমনভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে 'ছিন্নপত্র' নামটি উচ্চারণ করলেই বাংলাদেশে একটি মানসমূর্তি আমরা দেখতে পাই। এবং এগুলো খাঁটি চিঠি, বস্তুতই বন্ধু বা আত্মীয়ের কাছে বার্তাপ্রেরণ, এখানে সচেতন শিল্পিতার কোনো চেষ্টা ছিলো না, লেখার পরে রবীন্দ্রনাথ ভুলেও গিয়েছিলেন। তাঁর স্বতঃস্ফূর্তি একান্তভাবে জয়ী এখানে।

অপরিচিত বা স্বল্প-পরিচিত ভক্তের কাছে আত্ম-উদ্‌ঘাটন রিলকের পক্ষে যেমন সহজ ছিলো, তেমনি ছিলো রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিরোধী; আমরা দেখতে পাই তাঁর যে-কোনো পর্যায়ের প্রকৃষ্ট চিঠি কোনো নিকট আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে লেখা হয়েছিলো। সতেরো বছর বয়সে, প্রথমবার বিলেতে গিয়ে তিনি যে-ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখেন সেটিকে গদ্যসাহিত্যে তাঁর প্রতিভার প্রথম স্বাক্ষর বলা যায়, 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', তৎকালে সাময়িক পত্রে ছাপা হ'য়ে থাকলেও, প্রকাশের জন্যই লেখা হয়নি; জোড়াসাঁকোবাসী আত্মীয়দের উদ্দেশে যথার্থই চিঠি লিখেছিলেন ব'লে তাতে সেই অন্তরঙ্গতা ধ্বনিত হয়েছে, যা পরে আমরা

'ছিন্নপত্রে' ও 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'তে পাই, কিন্তু পরবর্তী ভ্রমণগ্রন্থ ও পত্রাবলিতে যা বিলীয়মান। এই পুস্তকত্রয় প্রমাণ করে যে যে-কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সরকারি' সাহিত্য 'সাধু' ভাষায় লিখছিলেন সে-কালেই, প্রমথ চৌধুরীর বহু পূর্বে, তাঁর 'ঘরোয়া' সাহিত্যে 'চলিত' ভাষা স্রোতস্বিনী হ'য়ে উঠেছিলো; অতখানি স্বভাবনৈপুণ্য সত্ত্বেও কেন যে তিনি 'সবুজ পত্রে'র পূর্বযুগে চলিত ভাষার প্রকাশ্য ব্যবহারে কুণ্ঠিত ছিলেন, আমরা তা ভেবে অবাক না-হ'য়ে পারি না।

উত্তরযৌবনে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেউ ছিলেন না, ছিলো এক বিরাট ভক্তসম্প্রদায়, সৌরকেন্দ্রিক বহু মণ্ডলে বিভক্ত। ততদিনে তাঁর ব্যক্তিজীবনে বহু পরিবর্তন ঘটেছে; পত্নী এবং দুই পুত্রকন্যা মৃত; যৌবনের বন্ধু বা পরিবার-ভুক্ত ঘনিষ্ঠেরা মৃত অথবা ছিন্নযোগ; বাংলাদেশে কেউ নেই যাঁকে তিনি সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতে পারেন; সম্রাট তিনি বাংলা সাহিত্যের, জগতের চোখে প্রাচীর প্রতিভূ, ইংরেজ-শাসিত নিখিলভারতের আত্মমর্যাদার প্রতীক, এবং পূর্বে পশ্চিমে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ। তৎকালীন পত্রে ও প্রবন্ধে এই সবই প্রতিফলিত হয়েছে। উপরন্তু, এই সময়েই গদ্যরীতি নিয়ে ক্লান্তিহীন পরীক্ষায় তাঁকে প্রবৃত্ত দেখি; তাঁর জীবনের শেষ কুড়ি বছরের গদ্যে যত নূতন ও নূতনতর ভঙ্গি দেখা যায়, পূর্বতন চল্লিশ বছরের রচনায় সে-তুলনায় প্রায় কিছুই নেই; যদিও চলিত ভাষাকে আগেই একান্তভাবে মেনে নিয়েছিলেন, গদ্যশিল্পে সচেতন পরীক্ষার 'লিপিকা'তেই আরম্ভ। যা কোনোরকমেই পদ্য নয়, গদ্য-পদ্যের মাঝামাঝি জায়গায় অব্যবস্থিতভাবে প'ড়েও নেই, যা নির্ভুলভাবে গদ্য এবং নির্ভুলভাবে ছন্দস্পন্দিত, এই ধরনের রচনাপর্যায় তাঁর অন্ত্যজীবনের প্রধান অবদান। 'লিপিকা'য় তৃপ্ত না-হ'য়ে 'পুনশ্চ' লিখলেন; তারপর তিনটি নৃত্যনাট্যে গদ্যকবিতার নূতন রূপকল্প; 'শেষের কবিতা' থেকে 'মালঞ্চ' পর্যন্ত উপন্যাস; অবশেষে 'ছেলেবেলা', 'সহজ পাঠ', 'গল্পসল্প'। তুল্যমূল্য নয় এরা, কিংবা আমি এমন কথাও বলতে চাচ্ছি না যে সামগ্রিক বিচারে এই পর্যায় পূর্বরচনার চেয়ে উৎকৃষ্ট; কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এই রচনাধারার মধ্য দিয়ে গদ্যশিল্পের এক ত্বরান্বিত বিচিত্র বিকাশ সম্ভব হয়েছে; বিশেষ অর্থে আধুনিক বলতে পারি এমন বাংলা গদ্যের এরা প্রবর্তক ও বিবর্তক। গদ্যের প্রতি বৃদ্ধ কবির এই নিবিড় মনোযোগের একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে সাধুভাষার তুলনায় চলিত ভাষা অনেক বেশি নম্য, তাতে লীলা ও ভঙ্গিবৈচিত্র্যের অবকাশ রবীন্দ্রনাথের কানে ও মনে অমোঘভাবে ধরা পড়েছিলো; এবং যৌবনে যেমন

বাংলা পদ্যের প্রতিটি সম্ভবপর ছন্দকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন, তেমনি প্রৌঢ় জীবনে গদ্যের ধ্বনিমাধুরীকে নানা রূপে আবিষ্কার না-ক'রে পারেননি। অন্য কারণ হয়তো এই যে তিনি ভিতরের দিক থেকে ক্লান্ত হয়েছিলেন; বলার কথা আর ছিলো না ব'লে স্টাইল তাঁর অবলম্বন হ'য়ে উঠলো। তিনটি নৃত্যনাট্যের মধ্যে দুটিরই কাহিনীর অংশ তাঁর নিজের পূর্বরচনা থেকে আহৃত; 'ছেলেবেলা'য় নতুন কোনো উপাদান নেই; 'রাজা ও রানী'র রূপান্তর হ'লো 'তপতী'; 'রাজা'র, 'শাপমোচন'; 'একটি আষাঢ়ে গল্পে'র, 'তাসের দেশ', ও 'পূজারিনী' কবিতার, 'নটীর পূজা'। নৃত্য, সংগীত ও অভিনয়ের আবেদন থেকে চ্যুত ক'রে দেখলেও, শুধু পঠনীয় পুস্তক হিশেবে, এই সব পুনর্লিখনের মর্যাদা যে অনস্বীকার্য তার কারণই এদের গদ্যরীতি কারুকর্মিতা।

এই পর্যায়ের ভ্রমণগ্রন্থের প্রধান লক্ষণ এই যে রবীন্দ্রনাথ কখনো ভুলতে পারছেন না তিনি রবীন্দ্রনাথ, 'কৃষ্ণাঙ্গের ভার' বহন ক'রে পৃথিবীতে বেরিয়েছেন। যেমন এককালে সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে বাংলাদেশ ও ইংলণ্ডকে অন্তঃস্থ করেছিলেন, জাপান, রাশিয়া বা দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে তেমন ব্যবহার আর নেই তাঁর; তাঁর চক্ষু আর তথ্য ছাখে না, ঘ্রাণেন্দ্রিয় শুধু পূর্বপরিচিত জুঁইফুলে সাড়া দেয়; নূতন দেশের কোনো দৃশ্য বা আবহ আর সৃষ্টি করেন না আমাদের জন্য। স্বদেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের তুলনায় তিনি ব্যাপৃত; স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধির চিন্তায় আচ্ছন্ন তাঁর মন; বিচার, বিতর্ক ও বিশ্লেষণে তিনি এতদূর পর্যন্ত নিযুক্ত যে 'রাশিয়ার চিঠি' প্রায় একটি রাজনৈতিক নিবন্ধ হ'য়ে উঠলো। অথচ প্রতিটি পুস্তকে গদ্য এমন বেগবান ও দ্যুতিময় যে তার প্রভাব তাত্ত্বিক মূল্যকে ছাপিয়ে পড়ে; সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে যা পাঠযোগ্য তা শিল্পগুণে স্মরণীয়তার মূল্য পায়। আমার এই কথার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'যাত্রী'; তার ভাবগম্ভীর স্বগতোক্তির মধ্যে জ্ঞানের কথা যা আছে তা অন্য লেখকও শোনাতে পারেন, কিন্তু সুন্দরের সান্নিধ্যলাভে যে-আনন্দ পাই তা রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব দান। এবং, কোনো বিষয়ব্যতিরেকে, শুধুমাত্র ভাষার উপর কর্তৃত্বের ফলে, কতদূর পর্যন্ত মনোমুগ্ধকর রচনা সম্ভব, তার দৃষ্টান্ত 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'; পত্রপ্রাপিকা বালিকাটিকে রবীন্দ্রনাথের কিছুই বলার নেই, শুধু খেলাচ্ছলে তার উপযোগী কথা বয়ন ক'রে যাচ্ছেন, এবং ফলত যা দাঁড়িয়েছে তা সকলের পক্ষেই সম্ভোগ্য। একে এক ধরনের 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' বললে হয়তো ভুল হয় না।

মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের রচনার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দিহান হয়েছিলেন। রোগ ও জরা তাঁর মনকে তখন দুর্বল ক'রে দিয়েছে, তাঁর ভাষার তরুণ লেখকেরা অ-রাবীন্দ্রিক পথে অগ্রসর হচ্ছেন, সদ্যোত্থিত মার্ক্সবাদের প্রভাবে এমন কয়েকটি অপবাদ তাঁকে শুনতে হচ্ছে যা একেবারেই অসাহিত্যিক ও অবান্তর। ভাবতে বেদনা বোধ হয় যে তিনি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এর ফলে দুঃখ পেয়েছিলেন, বিরুদ্ধ মতের উত্তর দেবার সুযোগ হারাননি, এমনকি তরুণ লেখকদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তিও তাঁর পরিহাসের অন্তর্ভূত হয়েছিলো। বিশেষত তাঁর আয়ুষ্কালের শেষ বৎসরটিতে তিনি নিজের রচনা বিষয়ে অবিরলভাবে কথা বলেছেন—যা এর আগে কখনোই করেননি; তার অনেক অংশ শ্রুতিলিখিত প্রবন্ধাকারে বা বিভিন্ন লেখকের স্মৃতিকথায় বিধৃত আছে। বার-বার বলেছেন তাঁর ছোটোগল্পের কথা—যাকে কোনো-এক সমালোচক 'গীতিধর্মী' বলাতে তিনি ব্যথিত হন; তাঁর ছবির বিষয়ে মুখর হয়েছেন মাঝে-মাঝে; স্মরণ করেছেন লণ্ডনে রটেনস্টাইনের বাড়িতে সেই সন্ধ্যাটি, যখন ইয়েটস তাঁর ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠ করেন। তিনি যে 'চোদ্দ অক্ষর মেলাতে' পারেন তা সহাস্যে মনে করিয়ে দিয়েছেন আমাদের; অবশেষে বলেছেন, 'বাংলাদেশের লোককে আমার গান গাইতেই হবে; আর-কিছু যদি নাও থাকে, তবু আমার গান থাকবে।'[1] কিন্তু অনেক কথা ব'লেও তাঁর গদ্য বিষয়ে কিছু বলেননি; এমন কি হ'তে পারে যে তাঁর নিজেরও মনে হয়নি যে তাঁর প্রসঙ্গে সেটাও আলোচ্য? সত্য, যিনি কবির অভিধা নিজের প্রাপ্য ব'লে জেনেছেন, তাঁর আর-কিছু চাইবার থাকে না, ঐ একটি কথাতেই সব বলা হ'য়ে যায়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যের স্বতন্ত্র দাবিকেও উপেক্ষা করা অসম্ভব। আজকের দিনে, তাঁর মৃত্যুর কুড়ি বছর পরে, সহজেই বলা যায় যে তাঁর গান বিষয়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে, এমনকি হয়তো উন্মাত্রিকভাবে; রেকর্ড, রেডিও ও সিনেমার বিপুল প্রচারের ফলে বাংলাদেশে আজ প্রায় এমন কেউ নেই যিনি তাঁর গানের দু-চার কলি না জানেন, কিন্তু অনেকে হয়তো সেটুকুর বাইরে তাঁকে আর কোনোভাবে জানেন না। শিক্ষিত তরুণেরাও তাঁর গানের দ্বারা যতদূর মোহিত তাঁর পঠনীয় রচনাদির সঙ্গে ততদূর পরিচিত নন; তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করেছেন এমন যুবক বা কবি-যুবকও আজকের দিনে বিরল, এবং তা নিয়ে আক্ষেপ করাও বৃথা,

কেননা যুগধর্ম অপ্রতিরোধ্য, রবীন্দ্রনাথের 'প্রত্যাবর্তনে'র জন্য অপেক্ষা করা ভিন্ন উপায় নেই। সেই দিনের উদ্দেশে ব'লে রাখতে চাই যে কোনো ভাবী পাঠক যখন সযত্নে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গল্পরচনা পড়বেন, তাঁর ধারণা হবে তিনি গল্প-শিল্পে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পুরুষ, এবং বিশ্বসাহিত্যেও গরীয়ান। বৈদেশিক কোনো-কোনো লেখকের কথা আমরা ভাবতে পারি যাঁরা তাঁর চাইতে ভালো নাটক, ভালো উপন্যাস বা প্রবন্ধ লিখেছেন, কিংবা যাঁদের গল্প আরো তীব্র বা গভীর; কিন্তু গল্পশিল্পের এমন ঐশ্বর্য, এমন বিচিত্র বৈভব আর কারো রচনায় প্রকাশ পেয়েছে কিনা সন্দেহ। একজন কবির বিষয়ে এই কথাটা খুব আশ্চর্য শোনায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে অপরিমেয়রূপে প্রতিভাবান ছিলেন সেটা তো তাঁর অপরাধ নয়।

'সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ' (ঈষৎ সংক্ষেপিত ও পরিবর্তিত)

কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

কোনো-এক লোকোত্তর কৃষকের কথা কোনো-এক কবিতায় আমরা পড়েছি। তার অর্থ নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে, কিন্তু আজ দেখছি সে-কবিতা উল্টো অর্থে সত্য হ'লো। যার হাতে ফসল ফললো তাকে নিয়েই সোনার তরী দিগন্তপারে চ'লে গেলো, প'ড়ে থাকলো তার রাশি-রাশি ধান, সোনার ধান, যতদূর দৃষ্টি যায় যেন শেষ নেই।

এখন আমাদের উপর ভার পড়েছে সেই ফসল ঘরে তোলার। বাছতে হবে, গোছাতে হবে, সাজাতে হবে গোলাঘরে থরে-থরে। ডেকে বলতে হবে সকলকে— এসো, এখানে এসো, এখানে তোমার পুষ্টি, স্বাস্থ্য, কল্যাণ। এখানে তোমার উত্তরপুরুষের আনন্দের সঞ্চয়।

কিন্তু এই ঘরে তোলার কাজটি— যার পারিভাষিক নাম সমালোচনা— এখানে শুরু করাই শক্ত। একখানি ছোটো খেতে এত ফসল? এত বিচিত্র রকমের শস্য? যেন একই মাটিতে বিশ্বের সম্ভার, প্রকৃতির মতোই অমিতবিত্ত প্রাচুর্য। কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো?

এই প্রশ্নই প্রথম। যে-কোনো মানুষ, যিনি রবীন্দ্রনাথের সম্মুখীন হবেন, শুধু সমগ্রভাবে দৃষ্টিপাত করবেন একবার, এই প্রশ্নের আঘাত তাঁকে সইতেই হবে। সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকালে, শুধু তাঁর প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য, বিস্তার, আশি বছরের জীবনব্যাপী বিরামহীন প্রবাহ— শুধু তাঁর আয়তনের বিষয়ে চিন্তা করলে সম্ভাব্য সমালোচকের মনের প্রায় সেই দশা হ'তে পারে— যদিও ভিন্ন অর্থে— যে-দশা হয়েছিলো অর্জুনের, কুরুক্ষেত্রে যখন যুদ্ধের যবনিকা উঠেছিলো। কাতারে-কাতারে কীর্তিবাহিনী দেখতে পেয়ে, এমনও হ'তে পারে যে বেশ কড়াপাকের সমালোচকও বিহ্বল হবেন, বলবার কোনো কথাই প্রথমে খুঁজে পাবেন না। অবশ্য যদি তিনি বাঙালি হন।

অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই জাতের লেখক, সমগ্রভাবে না-দেখলে যাঁকে চেনাই যাবে না। তিনি যে একজন মহাকবি, বিশ্বের মহত্তমদের অন্যতম, এ নিয়ে বাংলাদেশে আজকের দিনে আর তর্ক নেই। কিন্তু তাঁর প্রতিভার যেটি বৈশিষ্ট্য— যেখানে তিনি পাঠকের পক্ষে বিপত্তিস্থল এবং সমালোচকের পক্ষে হতাশাস্বরূপ— সেটি এই যে তাঁর মহত্ত্ব তাঁর সমগ্রতায়। বিচ্ছিন্ন পঙক্তিতে

তাঁকে পাওয়া যাবে না, কাব্যাংশে না, কোনো-একটি কবিতায় কিংবা সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থেও তাঁর পরিচয় বিধৃত হ'য়ে নেই। যে-কোনো অংশের চাইতে তাঁর সমগ্র রচনাটি বড়ো, যে-কোনো একটি গ্রন্থের তুলনায় অনেক বড়ো তাঁর সমগ্র রচনাবলি— শুধু আয়তনে নয়, অর্থবহতায়। তাই কোনো সংকলনগ্রন্থ তাঁর যথার্থ প্রতিভূ হ'তে পারে না, একেবারেই কাজে লাগে না ম্যাথু আর্নল্ডের মাদুলি, সমালোচনায় অন্য অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত কানুন তাঁর সামনে ভেঙে পড়ে। যেন নদীর স্রোত ব'য়ে চলেছে— কোনো-একটি জায়গায় হাত দিয়ে বলা যাবে না যে এই রবীন্দ্রনাথ। কালিদাস বলতেই 'শকুন্তলা' মনে পড়ে, গ্যেটে বলতেই 'ফাউস্ট', কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলতে—যদিও বিদেশী পাঠক নিশ্চয়ই ব'লে উঠবেন 'গীতাঞ্জলি'— আমাদের পক্ষে এ-রকম কোনো একনিষ্ঠতার বশবর্তী হওয়া অসম্ভব। 'তুমি এসো, তুমি এসো, তুমিও এসো, এবং তুমি!'— এ-ই হচ্ছে আমাদের কথা, উত্তরকৈশোর রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলির দিকে বিহঙ্গ-চোখেও যখন দৃষ্টিপাত করি। গুণের তারতম্য নিশ্চয়ই আছে, রুচিভেদে পক্ষপাতও আছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথ কোনো 'মাস্টারপীস' লেখেননি, তাঁর কোনো-একটি বা কয়েকটি গ্রন্থকেও শ্রেষ্ঠ ব'লে চিহ্নিত করার উপায় নেই। পক্ষান্তরে কালিদাসের যেমন 'ঋতুসংহার', বা শেক্সপীয়রের 'কমেডি অব এরর্স', এই রকম উপেক্ষণীয় রচনা রবীন্দ্রনাথের— কিছুই নেই বলতে পারলে খুশি হতুম, কিন্তু— যেটুকু আছে তা তাঁর সমগ্র পরিমাণের তুলনায় নগণ্য। এই পরিমাণ, এই বিস্ময়কর অজস্রতা— যাতে বাহুল্যদোষ আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়— রবীন্দ্রনাথের পূর্ণবিকাশের পক্ষে এরই ঠিক প্রয়োজন ছিলো;— এত বেশি না-লিখলে এত বড়ো তিনি হতেন না, অসংখ্য বার না-বললে কোনো কথাই তাঁর বলা হতো না; তাঁর পরিমাণেই তাঁর মহত্বের পরিমাপ।

রবীন্দ্রনাথের সম্মুখীন হবার দ্বিতীয় বিপদ তাঁর সর্বমুখিতা। সর্বতোভাবে কবি— আবার সেই সঙ্গে এমন-কী আছে যা তিনি নন, সাহিত্যক্ষেত্রে এমন কোন উপাধি আছে যা তাঁর প্রাপ্য নয়? নাট্যকার, গীতকার, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, হাস্যরসিক, পত্র-ভ্রমণ-কথোপকথনে কারুশিল্পী— এমনকি, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক। 'এমনকি' কথাটা ভেবে-চিন্তে বসিয়েছি। কেননা কবির সঙ্গে নাট্যকারের চিরাচরিত আত্মীয়তা আছে, গানে আর কবিতায় তো সোদরসম্বন্ধ, সমালোচনাও কবিকর্মের অন্তর্ভূত, কিন্তু কবিতায় আর উপন্যাসে যে-ব্যবধান তাতে বিরোধের আভাস পাওয়া যায়। সুদূর

সেই ইতিহাসের স্বর্ণযুগ, যখন কাব্য আর উপন্যাস অঙ্গাঙ্গী মিশে ছিলো মহাকাব্যে ; আধুনিক কালের গদ্য উপন্যাস এমনভাবে পৃথক্‌কৃত যে তা কবিতার সহবাসী হ'লে উভয়তই অস্বস্তির আশঙ্কা থাকে। তার কারণ শুধু রূপের—form এর— ভিন্নতা নয়। কথাটা এই যে কবিতা লিখতে, এবং আধুনিক অর্থে উপন্যাস লিখতে, দুই আলাদা জাতের মনের প্রয়োজন। পার্থক্যটা খুব সহজ ক'রে বলা যায় এইভাবে যে কবির মন অন্তর্মুখী আর ঔপন্যাসিকের মন বহির্মুখী ; ঔপন্যাসিক মিশুক মানুষ, আর কবি লাজুক প্রকৃতির ; ঔপন্যাসিক নিজেকে ছড়িয়ে দেন বিশ্বময়, আর কবি আনেন বিশ্বকে সংহত ক'রে তাঁর অন্তরে। অবশ্য কোনো মানুষই শুধু অন্তর্মুখী বা শুধুই বহির্মুখী হ'তে পারে না, সকলের মধ্যেই দুয়েরই অংশ মিশ্রিত থাকে, সেই মিশ্রণের মাত্রাভেদেই কেউ পান কবিস্বভাব, কেউ বা কথকের, আর স্বল্পসংখ্যক কেউ-কেউ উভয় বিভাগেই আনাগোনা করেন। এই শেষোক্তদেরও কোনো-এক দিকে পাল্লা ভারি থাকে ; কেউ লেখেন কবির প্রকৃতি নিয়ে গল্প, কেউ বা বৈঠকি মেজাজ নিয়ে কবিতা। প্রথম শ্রেণীতে উদাহরণ পাই ইংরেজি সাহিত্যে ডি. এইচ. লরেন্স, দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাডিয়ার্ড কিপলিং। এঁদের বিষয়ে টি. এস. এলিয়টের মন্তব্যটি চিন্তনীয় ; তাঁর মতে যেখানে একই ব্যক্তি কবি এবং কথাশিল্পী, সেখানে একটা দিক বেড়ে ওঠে অন্য দিকটাকে জখম ক'রে। এ-কথার সারবত্তায় বিশ্বাস জন্মায়, যখন দেখি যে লরেন্স, আর 'দি ডাইনাস্টস' সত্ত্বেও টমাস হার্ডি, এই দুই কথাশিল্পীর স্থান হ'লো শেষ পর্যন্ত গৌণ কবিদের পিছন-বেঞ্চিতে ; আর কিপলিং তাঁর অসামান্য ছন্দসিদ্ধি নিয়েও সত্যিকার কবি হ'তে পারলেন না, হলেন, এলিয়টের ভাষায়, মহৎ পদ্যলেখক—'a great writer of verse'। কবিতায় আর কথাসাহিত্যে সমান মর্যাদা কারো ভাগ্যেই জুটেছে ব'লে শোনা যায় না ; ও-দুয়ের পরস্পরে সখ্যভাব নেই, আছে প্রতিযোগিতা, পরস্পরকে দমিত অথবা বিক্ষত করাই এদের স্বভাব।

অতএব সাহিত্যের যাঁরা উভচর, একাধারে কবি এবং কথক, একদিক থেকে তাঁরা বিশেষভাবে সম্মানযোগ্য হ'লেও অন্যদিক থেকে তাঁদের অবস্থা একটু বিপজ্জনক। এই উভচরবৃত্তির অর্থই দ্বন্দ্বের অধীন হওয়া, এবং কখনো এমন পথে পা বাড়ানো যাতে আপন স্বভাবের সম্মতি নেই। এই দ্বন্দ্বের সমাধান হয়েছে কিনা, হ'য়ে থাকলে কেমন ক'রে হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের আলোচনায় এই প্রশ্নই সর্বপ্রথমে বিবেচ্য। এত বড়ো কবি হ'য়েও কেউ

উপন্যাসও লিখেছেন, এমন ঘটনা পৃথিবীতে বেশি ঘটেনি, তাই. এ-বিষয়ে কৌতূহলের বিশেষ সার্থকতা আছে মনে করি।

আমি আরম্ভ করবো এ-কথা ব'লে যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর কথা-সাহিত্যের একই আদর্শে বিচার চলবে না। তাঁর কাব্য, কাব্যধর্মী নাট্য, এরা দাবি করে বিশ্বসাহিত্যর পটভূমিকা, কিন্তু কথাসাহিত্যকে দেখতে হবে বাংলা সাহিত্যের, বাঙালি জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। তার প্রথম কারণ এই যে কথাসাহিত্যে দেশকালের প্রভাব খুব প্রবল; তা ভূগোলনির্ভর, ইতিহাসে বিন্যস্ত, সামাজিক অবস্থার বৈসাদৃশ্য তার আবেদনের অন্তরায় হ'তে পারে। দ্বিতীয় কারণ, আমাদের মাতৃভূমিতে কাব্য আর গদ্যসাহিত্যের ঐতিহ্যগত ব্যবধান। কাব্যের দিকে বহু শতাব্দীর পুরোনো একটি ধারা ছিলো, সম্পদ ছিল প্রচুর, রবীন্দ্রনাথের আংশিক আশ্রয় ছিলো সংস্কৃত, বৈষ্ণব, বাউল কাব্যে; কিন্তু তাঁর উন্মেষের সময় বাংলা গদ্য ছিলো অপরিণত, উপন্যাস সদ্যোজাত এবং ছোটোগল্প নামক পদার্থের অস্তিত্ব ছিলো না। লিখতে-লিখতে ভাষা তৈরি করতে হয়েছে তাঁকে, ভাবতে হয়েছে নতুন রূপ, নতুন রীতি; বাংলা গদ্যের যোজনব্যাপী পরিণতি এক জীবনে তিনি সমাধা করেছেন এক জীবনে, কিন্তু ধীরে। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ 'প্রডিজি' গোছের জীব ছিলেন না, মধুসূদনের মতো চমক লাগাননি কখনো; যেহেতু তাঁকে বহুদূরে যেতে হবে, তাই অতি ধীরে তিনি এগিয়েছেন। জীবদেহের মতো মন্থর তাঁর পরিণতি, বনস্পতির বেড়ে ওঠার মতো; তাঁর স্বভাবে বিপ্লবী বৃত্তি ছিলো না, ছিলো বিনয়, নিয়মনিষ্ঠা— যার অর্থ ডিসিপ্লিন। চলতি প্রথাকে মুচড়ে ভেঙে আশ্চর্য কিছু নতুন করার উদ্যম তাঁর যৌবনের ইতিহাসে নেই; তাঁর পথ নিশ্চিত বিবর্তনের; ঐতিহ্যের অনুসরণে, অগ্রজের অনুকরণে তাঁর পদক্ষেপ। তরুণ রবীন্দ্রনাথ রাতারাতি কোনো বদল ঘটাতে যাননি; বাংলা কথাসাহিত্যকে বঙ্কিমের হাত থেকে যে-অবস্থায় পেয়েছিলেন, ঠিক সেখান থেকেই যাত্রা করেছিলেন।

উপরন্তু লক্ষণীয় যে এই ধীরগামিতার লক্ষণ তাঁর পদ্যে ততটা দেখা যায় না, যতটা তাঁর গদ্যে। শুধু ধীরগামিতাই নয়, কেমন ভীরুতা যেন— যাকে প্রায় রক্ষণশীলতা বলা যায়— কিংবা যেন অব্যবস্থিত হ'য়ে আছেন, মনস্থির করতে পারছেন না। পদ্যে তিনি প্রথম থেকেই বিশিষ্ট, প্রায় কৈশোর থেকেই নিজের গলায় কথা বলছেন— যদিও চলতিকালের ফ্যাশনের সঙ্গে সেই গলার মিল ছিলো না। কিন্তু গদ্যে— আজকের দিনে ভাবতে অবাক লাগে আমাদের—

গদ্যে তিনি চলেছিলেন অর্ধোত্তর জীবন ভ'রে প্রথাসম্মত পথেই— বঙ্কিমের সংলগ্ন হ'য়ে সতর্কভাবে পা ফেলে। তাঁর পক্ষে সেটা যে ঠিক স্বাভাবিক ছিলো না, তার চমৎকার প্রমাণ মেলে তাঁর ভাষার ভঙ্গিতে। তাঁর কৈশোর থেকে প্রৌঢ়কাল পর্যন্ত, তাঁর গদ্যের দুটো পাশাপাশি ধারা আমরা দেখতে পাই; একটি সরকারি, অন্যটি ঘরোয়া; একটি 'সাধু', অন্যটি চলতি ভাষায়; একটি গল্প উপন্যাস প্রবন্ধাদিতে প্রকাশ্য, অন্যটি চিঠিপত্রে নেপথ্যবিহারী। যাকে আজকাল আমরা চলতি ভাষা বলি, তাতে আবাল্য আনন্দ ছিলো রবীন্দ্রনাথের; যখন 'স্বাধীনভাবে' লিখতেন প্রকাশের কথা ভাবতেন না, তখন ঐ গদ্যই আসতো তাঁর কলমে— সে-গদ্য বঙ্কিমের অধমর্ণ নয়, হুতোম প্যাঁচারও না, সেটা একান্তই তাঁর নিজস্ব ও নতুন— এবং সেই গদ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিলো ভবিষ্যতের বৃহৎ সম্ভাবনা, বাংলা চলতি গদ্যের— আধুনিক গদ্যের— প্রথম পরিমার্জিত রূপটি তাঁরই হাতে রচিত হয়েছিলো তাঁর পত্রাবলিতে। কিন্তু এই ধারাটিকে তিনি অন্তঃপুরিকা ক'রে রেখেছিলেন, এমনকি উপেক্ষা করেছিলেন, যেহেতু তৎকালীন শাস্ত্রমতের তাতে অনুমোদন ছিলো না। যিনি আঠারো বছর বয়সে দীপ্তিশালী 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' লিখেছিলেন, চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ বছরের মধ্যে 'ছিন্নপত্রে'র অপরূপ পত্রাবলি, তিনিই আবার একই সময়ে গল্পের সংলাপের অংশেও 'সাধু' ভাষা লিখেছিলেন, এবং চলতি ভাষাকে ভালোবেসেও তাকে ঘরে তুলতে পারেননি, যতদিন না বাইরের দিক থেকে তাগিদ উঠেছিলো। তাঁর বয়স তখন পঞ্চাশ পার, নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, জগৎবিখ্যাত হয়েছেন, তবু তো ঐ 'জাত-খোয়ানো প্রিয়া'কে প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করার জন্য তাঁর দরকার হয়েছিলো 'সবুজ পত্রে'র উদ্দীপনা, প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্ব। ভাবতে অবাক লাগে আমাদের।

যেমন গদ্য রচনায়, তেমনি উপন্যাসের ভিতর-মহলেও, বহুকাল পর্যন্ত গতানুগতির বাঁধ তিনি ভাঙতে পারেননি। এখানে গতানুগতি মানে অবশ্য— বঙ্কিমি আদর্শে রচনা। রবীন্দ্রনাথ ভুল করেছিলেন বলবো না—ভুল করার কথাই এখানে অবান্তর, কেননা বেছে নেবার সুযোগ তাঁর ছিলো না। অনুকরণযোগ্য একটিমাত্র আদর্শ ছিলো তাঁর সামনে, সে-আদর্শ বঙ্কিমের। রবীন্দ্রনাথ ধাপে-ধাপে এগিয়েছিলেন—টপকে পেরোতে যাননি— তাঁর এই ঐতিহ্যবোধ বন্ধুর কাজ করেছিলো তাঁর। পূর্বপরতা লঙ্ঘন ক'রে হঠাৎ কিছু করতে গেলে বিস্ময়ের সৃষ্টি হ'লেও অনেক সময় নির্বীজতার আশঙ্কা

থাকে—তা থেকে আর অন্য কিছু জন্মায় না, বাংলা সাহিত্যে এর দৃষ্টান্তস্থল মধুসূদন। রবীন্দ্রনাথের সহজবোধ এখানে তাঁকে সুপরামর্শ দিয়েছিলো, কিন্তু দৈবদোষে তাঁর আদর্শে আর উন্মুখতায় সংগতি ছিলো না। বঙ্কিম ছিলেন স্বভাবতই ঔপন্যাসিক, রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই কবি; অগ্রজের নৈপুণ্য ছিলো রহস্যময় ঘটনাবিন্যাসে, আর মানুষের মন নামক রহস্যময় বস্তুটি ছিলো অনুজের সন্ধানস্থল। ফলত, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-উপন্যাসে একটা অস্বস্তির ভাব ধরা পড়ে, যেন লেখকের বুদ্ধি আর প্রবৃত্তি ভিন্ন পথে যেতে চাচ্ছে, যখন হৃদয় চায় হৃদয়ের কথা বলতে তখন মগজের কারখানায় চলছে প্লটের চতুরালির চেষ্টা। এ-চেষ্টা একবার অন্তত অপচেষ্টায় দাঁড়িয়েছিলো 'নৌকাডুবি'তে—'বউঠাকুরানীর হাটে'র কথা ছেড়েই দিলাম; কিন্তু 'নৌকাডুবি'র ভরাডুবি তেমন উল্লেখ্য নয়, কেননা ঐ ঘটনাজটিল অসংগতিবহুল উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের লক্ষণযুক্ত রচনাবলির মধ্যে পড়ে না, প্রক্ষিপ্ত ব'লে মনে হয়। বইটি ভালো নয় ব'লে দুঃখ করি না, দুঃখ এই ভেবে যে রবীন্দ্রনাথ কখনো ও-রকম বই লিখতে রাজি করিয়েছিলেন নিজেকে। আরো আশ্চর্য লাগে—প্রায় বিশ্বাস হয় না— যখন ভাবি যে 'নৌকাডুবি' লেখা হয়েছিলো 'চোখের বালি'র বছর চারেক পরে;—সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে পশ্চাদপসরণের দৃষ্টান্ত এই একটি ছাড়া দুটি বোধহয় নেই।

বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় গ্রন্থ 'চোখের বালি'। কাঁচা লেখা, সন্দেহ নেই; এই গ্রন্থের ছিদ্রসন্ধানে বড়ো-একটা সূক্ষ্মতারও প্রয়োজন হয় না আজকের দিনে; তবু একে অস্বীকার করাও সম্ভব নয়। তার কারণ এটি বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস, যাকে বলা যায় মনস্তত্ত্বপ্রধান, অর্থাৎ যেখানে বাইরের দিক থেকে ঘটনা সাজাবার কৌশলটাই বড়ো কথা নয়, মানুষের মর্মকথা টেনে বের করা যার লক্ষ্য। কিন্তু এখানেও শেষ রক্ষা হয়নি। উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে আর উত্তরাধিকারে যে-বিরোধ ছিলো, তার দুষ্ক্রিয়তার সবচেয়ে শোচনীয় দৃষ্টান্ত 'চোখের বালি'র উপসংহার। তখনকার পাঠকেরা কেউ আপত্তি করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু বিনোদিনীর তুচ্ছ পরিণাম আমাদের কাছে অগ্রাহ্য— রসের দিক থেকে তা-ই, নীতিধর্মের দিক থেকেও তা-ই। 'মনোরঞ্জনী প্রলেপ' লাগিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ—তাঁর নিজের ভাষাতেই বলছি; একদিক থেকে বিধবা প্রেমিকার সমুচিত, অর্থাৎ অনুচিত, শাস্তিবিধান করেছিলেন, অন্য দিক থেকে চেয়েছিলেন তৎকালীন কানুনমতো কাহিনীটিকে

সুগোলভাবে শেষ করতে। এই দ্বিবিধ দৌর্বল্য 'চোখের বালি'র অপঘাত ঘটিয়েছিলো।

আমরা সাধারণত ব'লে থাকি যে উপন্যাস লিখতে হ'লে প্লট চাই। কিন্তু প্লটের জন্য যে-ধরনের উদ্ভাবনী বুদ্ধি লাগে, তা কবিত্বশক্তির অনুগামী নয়; ও-ক্ষেত্রে কবিরা অনেক সময়ই ফেল হ'য়ে থাকেন; আর কেউ-কেউ সে-রকম কোনো চেষ্টাই করেন না, পুরোনো গল্পই নতুন ক'রে লেখেন। শেক্সপীয়রের সাঁইত্রিশটি নাটকের মধ্যে শুধু একটির কাহিনীর অংশ মৌলিক—এবং সে-নাটক ঐ একটি কারণেই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কাব্য-নাট্য আর গল্প উপন্যাসের জাত আলাদা, একের আদর্শ অন্যের উপর চাপানো যায় না। অবশ্য আধুনিক যুগে উপন্যাসেও প্লটের ধারণা বদলেছে—'দি ম্যাজিক মাউণ্টেন' বা 'ইউলিসিস্'-এর মতো দীর্ঘায়িত যুগপ্রতিভূ উপন্যাসে আস্ত একটা ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান স্থান পেলেও প্লট নামক বস্তুটিকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সামনে ছিলো উনিশ-শতকী ধারণা; প্লটের অর্থ ছিলো খানিকটা ঘোরপ্যাঁচ, কী-হয়-কী-হয়-রুদ্ধশ্বাসে পাঠককে টেনে নিয়ে যাওয়া, নেহাৎই বাইরে থেকে উত্তেজনা এনে কৌতূহল জাগিয়ে রাখা, তারপর গ্রন্থিমোচনে সমস্ত কিছু মিলিয়ে দেয়া, বুঝিয়ে দেয়া: এর যান্ত্রিক দিকটায় স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো না রবীন্দ্রনাথের, তাই তাঁর গল্পাংশে এত বেশি পাওয়া যায় আকস্মিক ঘটনা—অ্যাক্সিডেণ্ট; কাকতালীয় ফিরে আসে বার-বার। কিন্তু এই প্লটের দাবি সম্পূর্ণ মিটিয়েও আপন বক্তব্য তিনি প্রকাশ করতে পেরেছিলেন 'গোরা' উপন্যাসে;—এখানে বড়ো একটি বক্তব্য ছিলো তাঁর, সেই বক্তব্য ধরাবার মতো কাহিনীর আধারও ঠিক পেয়েছিলেন, আর এই সংযোগের ফলে সর্বাঙ্গে সম্পূর্ণ হয়েছে 'গোরা'—লেখকের স্বভাব কোথাও ব্যাহত হয়নি, রুচি কোথাও খণ্ডিত হয়নি, এখানে আস্তস্ত আমরা রবীন্দ্রনাথকেই চিনতে পারি। তাঁর উপন্যাস-মালার মধ্যমণি এই গ্রন্থ, উপন্যাস হিশেবে সবচেয়ে তৃপ্তিকর, গঠনশিল্পে নিটোল, চরিত্রসৃষ্টিতে উজ্জ্বল, কাহিনীর বিন্যাসেও নিবিড়;—এই একটি বই প'ড়ে ধারণা হয় যে অন্তত একজন মহাকবিকে ঔপন্যাসিকেরও উপাদান দিয়েছিলেন তাঁর ভাগ্যবিধাতা।

আগে বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ধীরে এগিয়েছেন, হঠাৎ কিছু বদল ঘটাতে যাননি। কিন্তু তাঁর সাহিত্যজীবনে দু-বার কিছু বড়ো রকমের বদল দেখা যায়। প্রথমটি এতই বড়ো যে বিপ্লবের কাছাকাছি পৌঁছয়, দ্বিতীয়টি তেমন

না হ'লেও তাতেও কিছু আকস্মিকতা ছিলো। প্রথম বার 'সবুজ পত্রে'র যুগে— যখন তিনি কাব্যে লিখলেন 'বলাকা', আর গদ্যে লিখলেন 'চতুরঙ্গ', 'চতুরঙ্গে'র অব্যবহিত পরে 'ঘরে-বাইরে'। দ্বিতীয় বার— যখন বাংলা সাহিত্যের তরুণ মহলে আর-একবার বিদ্রোহের ঢেউ উঠেছে—যখন তিনি 'শেষের কবিতা' লিখলেন, প্রায় একই সময়ে 'যোগাযোগ', তারপর 'পুনশ্চ'। আসল কথাটা হয়তো এই যে বড়ো বদল একবারই ঘটেছিলো, প্রথম বারের ভাঙনের পর অনিবার্য ছিলো মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়া। 'সবুজ পত্রে' মুক্তি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ; অবিরলতায় যদিও কোথাও ফাঁক নেই, তবু নদীর স্রোত তীব্র বাঁক নিলো এখানে; 'সবুজ পত্রে'র আগে এবং পরে যেন দুই আলাদা রবীন্দ্রনাথকে আমরা দেখতে পাই। সে-সময়ে পুরোনো কূল ছাড়লেন তিনি, বহুদিনের অনেক অভ্যাসের বেড়ি ভাঙলেন, যে-কূল ছেড়ে গেলেন সেখানে আর ফিরলেন না।

এই নতুন রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দিকেই প্রতীয়মান হলেন, কিন্তু কবিতার চেয়েও প্রবলভাবে তাঁকে চেনা গেলো তাঁর গদ্যে। গদ্যে এতদিন সতর্কভাবে চলেছিলেন, যেন তারই ক্ষতিপূরণস্বরূপ একেবারে নির্ভয় হলেন এবার। সেই যে 'ঘরে-বাইরে'তে চলতি ভাষাকে বরণ করলেন, জীবনে আর 'সাধু' ভাষা লিখলেন না; আরম্ভ করলেন ভাষা নিয়ে পরীক্ষা; ভাঙলেন, গড়লেন, ছেঁটে দিলেন, জুড়ে দিলেন, সমস্তটাকে মিলিয়ে দিলেন নতুন ছন্দে; বেগ আনলেন বাংলা গদ্যে, আনলেন তীক্ষ্ণতা, নমনীয়তা, লাস্য। রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে এই গদ্য-সাধনা; 'ঘরে-বাইরে' থেকে 'ছেলেবেলা' পর্যন্ত গদ্য ভাষাকে যত রকম ক'রে মুচড়ে বেঁকিয়ে তিনি চালিয়েছিলেন, তাতে বাংলা গদ্যের রূপান্তর ঘটেছে এ-কথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

উপন্যাসের রূপের দিকেও বদল হ'লো। উনিশ-শতকী প্লটের মোহ কেটে গেলো; উপন্যাস হ'য়ে উঠলো বক্তব্যপ্রধান, ভাবনানির্ভর। সেই সঙ্গে চললো কথাশিল্পের কলাকৌশল নিয়ে বিচিত্র রকমের পরীক্ষা। পত্রাকারে গল্প, ডায়েরির আকারে উপন্যাস, 'চতুরঙ্গে'র নিবিড় সংহতি—এ-সবের পরেও 'শেষের কবিতা'র নতুনতর কারুকর্ম। এ-সব পরীক্ষার অর্থ, বলা বাহুল্য, শুধুই বৈচিত্র্যসাধন নয়, এর জন্য মনের দিক থেকে তাগিদ ছিলো। তিনি যা চাচ্ছিলেন, খুঁজছিলেন, পরখ ক'রে-ক'রে দেখছিলেন, তা উপন্যাসের এমন একটি রূপ, যা কবির স্বভাবের পক্ষে অনুকূল। তার ভিতরকার কবিটি যাতে

প্রশ্রয় পায়, কবিত্ব সহযোগী হয় কথাশিল্পে, এই ছিলো রবীন্দ্রনাথের সচেতন না হোক অচেতন মনের লক্ষ্য। তাই কাহিনীর অংশ সরল হ'লো, লঘু হ'লো উদ্ভাবনার দায়, এলো স্বগতোক্তি, মননশীলতা, বিশ্লেষণী পদ্ধতি। প্রধান হ'য়ে উঠলো পাত্র-পাত্রীর মন; তারা কী করছে, কী ঘটছে তাদের জীবনে, সেটা যেন উপলক্ষ মাত্র, অপরিহার্য ছল। তাঁর উত্তরজীবনের কথাসাহিত্যে কোনো নিছক গল্প বলতে যাননি রবীন্দ্রনাথ, মানুষের গহন মনে আলো ফেলতে চেয়েছিলেন; চেয়েছিলেন উপন্যাসকে কাব্যের সধর্মী ক'রে তুলতে।

এর ফল মানতেই হয়, সর্বত্র সমান হয়নি। 'চতুরঙ্গে'র সৌষম্য উল্লেখযোগ্য: 'যোগাযোগ', অসমাপ্ত হ'লেও, কবির সঙ্গে ঔপন্যাসিকের সার্থক মিলনের দৃষ্টান্ত। কিন্তু 'ঘরে-বাইরে' অতিকথনে ভারাক্রান্ত, 'শেষের কবিতা'র গল্পাংশ দুর্বল, 'চার অধ্যায়ে' কোথাও-কোথাও সন্দেহ জাগে লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে চ'লে যাচ্ছেন। কিন্তু এ-সব বই যাতে রক্ষা পেয়েছে— শুধু রক্ষা পেয়েছে তা নয়, আলো, তাপ, প্রাণ পেয়েছে যেখান থেকে, সেই উৎস আর-কিছুই নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা। কবিত্বই সেই শক্তি, যাতে শেষ পর্যন্ত ফাঁড়া কেটে গেছে, যাতে এ-সব বইয়ের সম্মোহনী প্রভাব ঠেকানো যায় না। কবি ছাড়া আর কারো হাতে 'শেষের কবিতা' সম্ভব ছিলো না— ও-বইয়ের পদ্যাংশই তার কারণ নয়— কবি ছাড়া আর কারো সাধ্য ছিলো না এলা-অন্তর দীর্ঘায়িত সংলাপে মুগ্ধ ক'রে ধ'রে রাখে আমাদের।

তাহ'লে মোটের উপর দাঁড়াচ্ছে কী? দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ কবি আর কথাশিল্পীর সম্পূর্ণ সংগতি ঘটাতে পারেননি— এত বড়ো কবির কাছে সেটা আশা করাও অন্যায় হয়। দুয়ের বিরোধে ক্ষতি হয়েছে উপন্যাসের; কবিত্ব যখন দমিত হয়েছে তখন এসেছে 'নৌকাডুবি'র কৃত্রিমতা, আর যখন প্রশ্রয় পেলো তখন দেখি 'ঘরে-বাইরে'র আতিশয্য, 'শেষের কবিতা'য় বিষয়বস্তুতে যাথার্থ্যের অভাব। আবার সেই সঙ্গে এও দেখি যে তাঁর কথাসাহিত্যের একটি বড়ো অংশের প্রতিপত্তির কারণই তার কবিত্বগুণ; পূর্ব-রবীন্দ্রের উপন্যাসে পাই ঐতিহ্যরক্ষা, কিন্তু 'ঘরে বাইরে', 'শেষের কবিতা', এ-সব বই বীজের মতো কাজ করেছে বাংলা সাহিত্যে, তা থেকে অন্য বই জন্ম নিয়েছে। এই অবস্থায় কবিকে বাদ দিয়ে কথাশিল্পীর বিচার চলবে না; রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ বেছে নিতে হ'লে আমাদের খুঁজতে হবে কোথায় তাঁর দুই সত্তায় সামঞ্জস্য ঘটেছে, একটা অন্যটাকে ছাপিয়ে ওঠেনি, কোথায়

কবিত্বের দিকটা গল্পের সঙ্গে এমনভাবে মিলে-মিশে আছে যে কোনোটাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেয়া যায় না। সে-রকম বই 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'যোগাযোগ', কিন্তু এই সংগতিসাধনের দৃষ্টান্তরূপে সর্বাগ্রে যার নাম করতে হয়, সে-বই 'গল্পগুচ্ছ'।

'গল্পগুচ্ছ' আশ্চর্য বই। ইতিহাসের দিকে থেকে আশ্চর্য, আন্তরিক মূল্যেও তা-ই। বাংলা ভাষায় প্রথম ছোটোগল্প লেখেন রবীন্দ্রনাথ, এবং এমন সময়ে লেখেন, যখন ইংরেজি সাহিত্যেও ছোটোগল্প নামক বস্তুটির চল হয়নি। যৌবনে পদ্মার বুকে 'সজন-নির্জনের নিত্যসংগমে' যখন বাসা ছিলো তাঁর, যখন 'সোনার তরী' লিখছিলেন, তারপর 'চিত্রা', সেই একই সময়ে ছোটোগল্পের ধারাটি তাঁর খুলে গিয়েছিলো। শুভযোগ ঘটেছিলো তাঁর জীবনে; ঠিক লোকালয়ে ছিলেন না, কিন্তু কাছাকাছি ছিলেন; সংসারে জড়িত ছিলেন না, কিন্তু মানুষের সংসারযাত্রার দর্শক হ'য়ে ছিলেন। কল্পনার উৎসাহ ছিলো উদার আকাশে, আবার মানবচরিত্র লক্ষ করারও সুযোগ ছিলো। এই অবস্থা কবির পক্ষে তেজস্কর, কথাশিল্পীরও পুষ্টিসাধক। এই সময়ে একটি-দুটি ক'রে 'আপনার মনোমতো' যে-সব গল্প তিনি লিখেছিলেন, পরবর্তী অন্য সব রচনাবলির পাশে রেখেও তাদের সদ্যোজাত টাটকা ভাবটা উবে যায় না, বরং তুলনা ক'রে দেখলে তাদের অফুরান প্রাণশক্তিতেই বিস্মিত হ'তে হয়। 'গল্পগুচ্ছ', আর তার যমজ বই 'ছিন্নপত্র', রবীন্দ্রনাথের গদ্য বইয়ের মধ্যে এই দুটির আমি নাম করবো, যা অসংখ্য বার প'ড়েও পুরোনো হয় না।

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প অধিকাংশ তাঁর পূর্বজীবনের রচনা। তখন তিনি উপন্যাসে বঙ্কিমের অধীন ছিলেন, কিন্তু ছোটোগল্প লিখতে গিয়েই তাঁর পথ ভিন্ন হ'য়ে গেলো। বঙ্কিমের সাড়ম্বর শোভাযাত্রার পরে, রাজন্যজড়িত অলোক-সামান্য ঘটনাবলির পরে, রবীন্দ্রনাথ আনলেন লৌকিক জীবনের ছবি, সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের সুখদুঃখের কাহিনী,— সমস্ত 'গল্পগুচ্ছে'র উপাদানে, একমাত্র 'মহামায়া' গল্পে ছাড়া, আর কোথাও বঙ্কিমের অনুগামিতা নেই। যেমন বিষয়বস্তুতে গল্পগুলির স্বকীয়তা, তেমনি রচনাশিল্পেও প্রথম থেকেই স্বাচ্ছন্দ্য বেশি; সমসাময়িক গল্পে আর উপন্যাসে প্রায় যেন তুলনাই চলে না; যতদিনে রবীন্দ্রনাথ 'পোস্টমাস্টার' থেকে 'নষ্টনীড়' পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন, ততদিনে 'চোখের বালি' মাত্র পাওয়া যায়, আবার 'নৌকাডুবি'র অনতিপরে পাই 'মাস্টার মশাই', 'গুপ্তধন'। উপন্যাসের তুলনায় গল্প কত সুপরিণত; গল্প যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল, সেখানে উপন্যাস কেমন আড়ষ্ট, যেন অংশত

বানিয়ে-তোলা। গল্পে আর উপন্যাসে এই ব্যবধান দেখে বিস্ময়ের উদ্রেক হ'তে পারে, কিন্তু লেখক যেখানে কবি, সেখানে এ-রকম হওয়াই স্বাভাবিক ছিলো, কেননা কবিতা আর উপন্যাসে বিরোধ থাকলেও ছোটোগল্প কবিপ্রতিভার অনুকূল। কথাসাহিত্যের এই দুই শ্রেণীতে সব সময় সৌহার্দ্য থাকে না; এর এক দিকে শক্তি থাকলে অন্য দিকে অবশ্যত দখল জন্মে না; আন্তন চেখভ কখনো উপন্যাস লেখেননি, ভার্জিনিয়া উল্‌ফের একটিও ছোটোগল্প নেই। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য সমগ্রভাবে দেখলে সন্দেহ থাকে না যে তাঁর স্বভাবের পক্ষে ছোটোগল্পের উপযোগিতা বেশি ছিলো; কবিতায় তিনি যত বড়ো, ছোটোগল্পে তার কাছাকাছি, কিন্তু— 'গোরা' সত্ত্বেও, 'যোগাযোগে'র সূচনা সত্ত্বেও— উপন্যাসে তাঁর আসন ভিন্ন। শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই নয়, সাধারণভাবে বাংলা উপন্যাস বিষয়েই এ-কথা সত্য; বাংলা সাহিত্য যেখানে উৎকৃষ্ট, সেখানে কবিতা আর ছোটোগল্প যে-পরিমাণে দেখতে পাই, উপন্যাস সে-তুলনায় অল্প। এর কারণ হয়তো বাঙালি জীবনের ক্ষুদ্র পরিধি, হয়তো বা বাঙালি মনের গীতধর্মিতা; কিন্তু কারণ যা-ই হোক, বাংলা উপন্যাসের আপেক্ষিক দুর্বলতা সুস্পষ্ট, আধুনিক অর্থে মহৎ কোনো উপন্যাস বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। কিন্তু বাংলা উপন্যাসের যে-সৌধ আজ উঠেছে, সেখানে বঙ্কিম ভিত্তিস্থাপক হ'লেও রবীন্দ্রনাথই প্রধান স্থপতি, আর— যেহেতু তিনি 'ঘরে-বাইরে' লিখেছেন, 'শেষের কবিতা' লিখেছেন— পরবর্তীরও যাত্রাস্থল;— এর পর যাঁরা বাড়াবেন, বদলাবেন, নতুন-নতুন মহল বানাবেন, তেতলার উপর চারতলা-পাঁচতলা তুলবেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠ না-নিলে তাঁদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে না। রুচির গুরু তিনি, রূপায়ণের ভাষাশিল্পের; যেখানে তিনি নিজের জমিতে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে তিনি অবশ্যমান্য, আর যেখানে তাঁর ভুল হয়েছিলো সেখানেও উত্তরকালের শিক্ষার ক্ষেত্র প'ড়ে আছে।

'রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য'

'গল্পগুচ্ছ'

'গল্পগুচ্ছ' কি কাব্যধর্মী

আমাদের সমালোচনা-মহলে একটা প্রচলিত মত হ'লো এই যে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প প্রধানত কাব্যধর্মী। কথাটা প্রশস্তিরূপে উচ্চারিত হয় না; বরং এর মধ্যে এই ইঙ্গিতটাই স্পষ্ট যে ছোটোগল্পের পক্ষে কাব্যধর্মী হওয়া দোষের কথা, এবং সে-দোষ রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্পেই বিদ্যমান। কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা সবাই এতদিনে একমত হ'তে পেরেছি, কিন্তু গল্পের ক্ষেত্রে তাঁর সম্বন্ধে ঈষৎ ক্ষমাশীল বদান্যতার ভাব এখনো অনেকের মধ্যে দেখা যায়— যেন বিচারবুদ্ধির সতর্কতা অনেকখানি শিথিল ক'রে না-দিয়ে তাঁর গল্পকে গ্রহণ করা যায় না, মুখে খুব স্পষ্ট ক'রে না-বললেও মনের ভাবটা অনেকেরই এইরকম। এর কারণ, সমালোচনা করতে ব'সে আমরা প্রায়ই কতকগুলি নির্দিষ্ট সূত্রের অন্ধ আনুগত্য স্বীকার ক'রে থাকি। যিনি সাহিত্যের এক বিভাগে বড়ো তিনি যে অন্য বিভাগেও সমান বড়ো হ'তে পারেন, এই কথাটা স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই কিংবা ভয় পাই। ওঅর্ডস্বার্থ, শেলি, টেনিসন ইত্যাদির রচনায় হাস্যরসের প্রভাব দেখি না, অতএব হাস্যরস গীতিকবির স্বধর্ম নয়, এই রকম একটা মন-গড়া সূত্রের অনুসরণ ক'রে আমাদের একজন অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথেও কোনো হাস্যরস খুঁজে পাননি! তেমনি, বিশ্বসাহিত্যে আমরা আর-কোনো লেখকের কথা জানি না যিনি একই সঙ্গে বিরাট কবি এবং মহৎ গল্পলেখক, শুধুমাত্র এই কারণে আমরা যেন ধ'রেই নিই যে একসঙ্গে ও-দুটো হওয়া যায় না, এবং এই সূত্র অনুসারে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পকে একটু তলার দিকে ঠেলে দেবার ঝোঁক হয় আমাদের। কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে, প্রতিভার ক্ষেত্রে কোনো নিয়মই যে চলে না সেটাই সবচেয়ে বড়ো নিয়ম; যা কখনো হয়নি, তাও ঘ'টে থাকে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে নানাদিক থেকেই তা ঘটেছে; তিনি বিরাট গীতিকবি হ'য়েও উজ্জ্বল হাস্যরসিক, ছন্দোবদ্ধ বাণীর অধীশ্বর হ'য়েও ছোটোগল্পের প্রকৃষ্ট কারুশিল্পী। এর প্রমাণের জন্য পণ্ডিতের দ্বারস্থ হ'তে হয় না, পাঠক-হিশেবে আমাদের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট।

এখন 'কাব্যধর্মী' কথাটাকে পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক।

পৌরাণিক যুগে কাব্য ও কাহিনী একই রচনার মধ্যে মিলে-মিশে থাকতো, কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে ও-দুয়ে এমন একটি বিচ্ছেদ গ'ড়ে উঠেছে যে সাধারণত কাব্যের ধর্ম ও কাহিনীর ধর্মকে আমরা স্বতন্ত্র ব'লেই ধারণা করি। তবু এ-বিচ্ছেদ একেবারে সম্পূর্ণ নয়; এখনো পদ্যে গল্প লেখা হ'য়ে থাকে, কিংবা গল্পের গদ্যকে এমন একটি ছন্দোবন্ধনে গ্রথিত করা হয় যে তাকে কাব্য না-ব'লে উপায় থাকে না। 'চিত্রাঙ্গদা'য় কিংবা 'মেঘনাদবধ কাব্যে' একটা সম্পূর্ণ স্পর্শসহ গল্প আছে, সে-সব গল্প গদ্যেও লেখা হ'তে পারতো, কিন্তু কবিতায় লেখা হয়েছে ব'লেই তারা বিশেষভাবে মর্যাদাবান। কাব্য এখানে কাহিনীকে অনেকদূর অতিক্রম ক'রে গিয়েছে এ-কথা সত্য, কিন্তু এইটুকুই সব কথা নয়; বলা যেতে পারে যে কোনো-কোনো কাহিনী বিশেষভাবে কাব্য-রূপেরই প্রত্যাশা করে, গদ্যের বদলে পদ্যে কিংবা গদ্য-কাব্যে বললে তবেই তাদের প্রতি যথার্থ সুবিচার করা যায়। সেইজন্যই নাট্য-কাব্য ও আখ্যান-কবিতার প্রচলন গদ্যের এই রাজত্বের যুগেও পৃথিবী থেকে লুপ্ত হ'লো না। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে গল্প ও কাব্য মূলত পরস্পরবিরোধী সংজ্ঞার্থ নয়; এমন গল্পও আছে যা স্বভাবতই কাব্যধর্মী। 'দেবতার গ্রাস' গদ্যে লিখলে কী হ'তো? 'পুরাতন ভৃত্য' পাঠযোগ্য হ'তে পেরেছে ছন্দ-মিলের লোভনতার জন্যই, গদ্যে রচিত হ'লে ও-গল্পের কী-গতি হ'তো তা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়। এরও পরে একটা স্তর আমরা পাই যেখানে গল্প তার বস্তুঘনতা বিসর্জন দিতে-দিতে প্রায় একটা গান হ'য়ে ওঠে, যেমন 'লিপিকা', যেমন বোদলেয়ার-এর গদ্য-কবিতা। এখানেই বলা যায় যে গল্প পুরোপুরি কাব্যধর্মী হ'য়ে উঠলো; যেমন 'কথা ও কাহিনী' পদ্য হ'য়েও স্পষ্টত গল্প, তেমনি 'লিপিকা' গদ্য হ'য়েও স্পষ্টত কবিতা; এ থেকে বোঝা যায় যে কাব্য ও কাহিনীর বিবাহ উপযুক্ত পৌরোহিত্যে নানাভাবেই ঘটতে পারে। যাঁরা গল্পের পক্ষে কাব্যধর্মী হওয়াটাই অপরাধ মনে করেন, তাঁদের আমরা প্রথমে বলবো— গল্প কাব্যধর্মী হবেই বা না কেন? এমন বিষয়, এমন ঘটনাসমাবেশ, রূপ ও রসের এমন বিশেষ মাত্রাবৈচিত্র্য হ'তে পারে যেখানে কাব্যধর্মী না-হ'লে গল্প গল্পই হবে না। এই ধরনের গল্পের উদাহরণ বাঙালি পাঠকের প্রথমেই যেটি মনে পড়বে, সেটি 'ক্ষুধিত পাষাণ'। কবি-প্রাণ যাঁর নেই, ভাষাবিন্যাসে কাব্যরীতিসংগত কারুকর্ম যাঁর আয়ত্তের বাইরে, তাঁর পক্ষে ও-ধরনের গল্প লেখা সম্ভব নয়। এই রকম ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব যে তাঁর গল্পরচনায় সহায় এবং সম্পদ হয়েছে তা হয়তো না-বললেও চলে।

তাই ব'লে এমন যদি হ'তো যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পই 'মেঘ ও রৌদ্রে'র মতো চম্পূ-রচনা কিংবা 'ক্ষুধিত পাষাণের' মতো অতি-লৌকিক কাহিনী, তাহ'লে গল্প-লেখকের সভায় তাঁকে অপেক্ষাকৃত নিচু আসনে বসাতে আমরা বাধ্য হতুম। কেননা কাব্য-কাহিনীতে মানবিক চরিত্র ও ঘটনা অত্যন্ত গভীর ও সেই সঙ্গে অত্যন্ত সরল ক'রে দেখানো হয়—তাতে আমাদের গল্পপিপাসু মনের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না— বিশেষত আজকের দিনের গদ্য গল্পের কাছে আমরা চাই জটিলতা, অনুপুঙ্খ, বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে প্রতিদিনের জীবনের প্রতিফলন। এটাকেই আমরা চলতি কথায় বলি বাস্তবতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটোগল্পে কল্পনার বেগ সামলাতে না পেরে বাস্তব ছাড়িয়ে স্বপ্নলোকে বিলীন হ'য়ে গিয়েছেন, এই রকম একটা ধারণা অনেকের মনে হয়তো প্রচ্ছন্ন আছে। এ-ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সমগ্র 'গল্পগুচ্ছ' প'ড়ে উঠলে আমাদের মনকে প্রবলভাবে এই কথাটাই আঘাত করে যে এর বেশির ভাগ গল্প আক্ষরিক অর্থে বাস্তব। সারা বাংলাদেশটাকে পাওয়া যায় এখানে। যে-বাংলাদেশ শুধু বাস্তবও নয়, জীবন্ত, তারই হৃৎস্পন্দন এর পাতায়-পাতায় আমরা শুনতে পাই। তার ঋতুবৈচিত্র্য, তার প্রাণপ্রতিম নদীস্রোত, তার প্রান্তর, বাঁশবন, চণ্ডীমণ্ডপ, রথতলা, তার স্নিগ্ধ আর্দ্র ঘন উদ্ভিজ্জ গন্ধ, তার দুরন্ত কলোচ্ছ্বাসিত পল্লীপ্রাণ বালক-বালিকা, সেবানিপুণা কল্যাণী বুদ্ধিমতী গৃহিণী, নধর গোলগাল পরিতৃপ্ত পান-তামাক-আড্ডায় আসক্ত ভালোমানুষ পুরুষ, প্রাচীন যুগের ক্ষয়িত অভিজাত, নবীন যুগের কর্মঠ ব্যবসায়ী, প্রথম স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সামাজিক বিপ্লব, শেষ-উনিশ ও প্রথম-বিশ-শতকের আধুনিকতা, বাংলার সুখদুঃখ, হাস্যপরিহাস, আচার-সংস্কার, তার ভয়, লোভ, লজ্জা, তার শক্তি, তার ব্যর্থতা—সব ধরা পড়েছে 'গল্পগুচ্ছে': পুরুষের নির্বোধ দাম্ভিক আত্মকেন্দ্রিকতা, তাও আছে, আছে বালিকা-বধূর নিঃশব্দ দুঃসহ বেদনা, আছে আত্মবশ আধুনিকার দীপ্ত মূর্তি। মনে হয় যেন এই গল্পগুলির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশই কথা ক'য়ে উঠছে বার-বার। তথ্য হিশেবে জানি এ-বাংলা শেষ-উনিশ-শতকের, এবং পল্লীপ্রধান; কিন্তু তাই ব'লে, আমরা যারা নগরে বাস করি, এবং নগরের বাইরে ক্বচিৎ পা বাড়াই, যাদের কাছে রথতলা চণ্ডীমণ্ডপ ইত্যাদি প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে, সেই আমাদেরও বিশ্বাস কিংবা অনুকম্পা কোথাও ব্যাহত হয় না। বরং পরবর্তী অনেক লেখকের অনেক গল্প আমাদের কাছে আজ পুরোনো ঠেকে, কিন্তু

'গল্পগুচ্ছে' ম্লানিমার কোনো লক্ষণ নেই। অথচ ছোটো অর্থে বস্তুধর্মের দাবি তিনি সম্পূর্ণই পালন করেছেন, গল্পগুলি তৎকালীন বঙ্গসমাজের একেবারে হুবহু প্রতিলিপি, তবু ইতিহাসের অতীত অধ্যায়ের আলেখ্যমাত্র নয়, প্রাণের বেগে স্পন্দমান, যেন আমাদেরই জীবনপ্রবাহ তাদের মধ্য দিয়ে ব'য়ে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে 'গল্পগুচ্ছে'র অধিকাংশ নায়িকার বয়স আট থেকে তেরোর মধ্যে, আর তার 'কলেজে'-পড়া নায়কেরা দাড়ি রাখেন, চাপকান পরেন এবং ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য হিন্দুয়ানির বুলি আওড়ান। বলা বাহুল্য, এ-যুগের বাস্তব বা কাল্পনিক নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে তাঁদের কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই। তবু তো গল্পগুলিকে আমরা সত্য ব'লে অনুভব করতে পারি। কী সেই রহস্য, যার প্রভাবে সেই অপরিণত গ্রাম্য বালিকা আর অকালগম্ভীর বি.এ.-পাশ যুবকের মধ্যে আমরা নিজেদেরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই? অন্যান্য লেখকদের মধ্যে দেখেছি, তাঁদের ত্রয়োদশবর্ষীয়ারা যখন প্রেমালাপ করেন সেটা দুঃসহরকম অস্বাভাবিক বোধ হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাস্তবসদৃশতা লঙ্ঘন না-করবার চেষ্টায় কোনোখানেই ভিন্ন অর্থে অবাস্তব হ'য়ে ওঠেননি; নায়িকার বয়স কলমের এক আঁচড়ে একুশ ক'রে দেননি, অথচ বালিকাটির প্রাণে প্রেমের উন্মেষ ও পরিণতি এমন ক'রে এঁকেছেন যেটা চিরকালের পক্ষেই সত্য। 'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ীকে মনে করুন। কথায়, চিন্তায়, বা ব্যবহারে মৃন্ময়ী কোনোখানেই তার বয়স বা শিক্ষাকে অতিক্রম করেনি, সে একটি অশিক্ষিত উচ্ছৃঙ্খল গ্রাম্য বালিকা ছাড়া কিছুই নয়, অথচ তারই অন্তরে প্রেমের সলজ্জ বিকাশ কী সহজ, এবং সহজ ব'লেই সুন্দর। মৃন্ময়ীর মনে পর-পর যে-ক'টি পরিবর্তনের স্তর লেখক এঁকেছেন, তার প্রত্যেকটিই অত্যন্ত স্বাভাবিক, সেগুলি মানুষমাত্রেরই হৃদয়ের সম্পদ; তার জন্য ইশকুল-কলেজে পড়তে হয় না। রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর কৃতিত্ব এইখানে যে তাঁর পাত্রপাত্রীরা তাদের অব্যবহিত পরিবেশ থেকে কোনোখানেই বিচ্যুত নয়, অথচ তারা এক দেশকালাতীত ভাবলোকেরও অধিবাসী। ঠিক এই সংযোগটি সব সময় ঘটে না। শেক্সপীয়রের জুলিয়েটের বয়সও তেরো, কিন্তু সেটা কাগজে-কলমে, 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' পড়বার সময় তাকে আমরা নিতান্ত বালিকা ব'লে সব সময় অনুভব করি না। যেহেতু শেক্সপীয়রের নাটকগুলি কাব্যও বটে, তাঁর অনেকখানি স্বাধীনতা ছিলো, এবং সে-স্বাধীনতা তিনি দরাজ হাতেই ব্যবহার করেছিলেন—তাঁর সময়কার স্ত্রী-বেশী বালক-অভিনেতাদের কথা

তবে তাঁর অধিকাংশ নায়িকাদের তিনি বালিকা করেছেন, এবং সুবিধে পেলেই বালকের ছদ্মবেশ পরিয়েছেন—ঐ বালিকা-বয়সটা যে একটা সাহিত্যিক প্রচল মাত্র, তা তিনিও জানতেন, তাঁর সমসাময়িক দর্শকরাও জানতো, আমরাও জানি। কিন্তু 'গল্পগুচ্ছে'র মৃন্ময়ী প্রকৃতই বালিকা, সে ব্যবহার জানে না, কথা বলতে জানে না, মনের ভাব সে লুকোতেও শেখেনি, প্রকাশ করতেও শেখেনি, জুলিয়েট বা রজালিণ্ডের সঙ্গে কিছুতেই সে তুলনীয় নয়, অথচ প্রেম এসে নিজের অজান্তেই তাকে যখন ধীরে-ধীরে যুবতী ক'রে তুললো, তার সেই রূপান্তরিত মূর্তিতে পৃথিবীর যে-কোনো প্রেমিকাকেই আমরা দেখতে পেলাম। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'চিরকুমার-সভা', যেখানে নায়ক-নায়িকাদের প্রত্যক্ষ দেখাশোনা একবারও নেই, অথচ নেই ব'লে স্ত্রী-পুরুষের এই স্বচ্ছন্দ মেলামেশার যুগেও আমাদের মনে কোনো অভাববোধ জাগে না; চাবির রুনুঝুনু, আঁচলের ঈষৎ আভাস, একটি গানের খাতা এবং একটি রুমাল অবলম্বন ক'রেই প্রাক্-পরিণয় মেলামেশার সমস্ত রোমাঞ্চের সঞ্চার হয়েছে; পাত্রপাত্রীদের যে দেখাশোনা হচ্ছে না, সে-বিষয়ে সচেতন হবার অবসর আমরা পাই না। এই যাথার্থ্যের অনুভূতিটাই আসল জিনিশ, এটা যখন আমাদের মনে সংক্রমিত হয়, তখন গল্পে বর্ণিত জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের আচার-ব্যবহারের বৈষম্যে কিছু এসে যায় না, আমরা সমস্তটাকেই স্বাভাবিক ব'লে, অনিবার্য ব'লে সহজেই গ্রহণ করতে পারি। আর এখানেই বারে-বারে রবীন্দ্রনাথের জিৎ। তাঁর গল্প প'ড়ে এ-প্রশ্ন আমাদের মনে কখনো জাগে না, 'এটা কেমন ক'রে হ'লো?' বরং আমাদের মন মুহূর্তে-মুহূর্তে ব'লে ওঠে—'তাই তো! জীবনে ঠিক এমনই হয়।'

'গল্পগুচ্ছে'র রচনারীতি

'গল্পগুচ্ছে'র রচনারীতি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, যে-সময়ে এর বেশির ভাগ গল্প লেখা, রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার কাব্যরীতির সঙ্গে এর সাদৃশ্য নেই। 'মানসী' থেকে 'কল্পনা' পর্যন্ত, কাব্যের ভাষা ও ছন্দের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উদ্ভাবক ও আবিষ্কারক; কিন্তু ছোটোগল্পের গদ্যে ঐতিহাসিক অর্থে নূতনত্ব নেই, এর ভিতর দিয়ে, বঙ্কিমের আদর্শ সামনে রেখে, তিনি নিজেই নিজেকে গদ্য লেখায় শিক্ষিত ক'রে তুলছিলেন। কোথায় তিনি বঙ্কিম থেকে স'রে এলেন, সেই কথাটাই প্রথমে উল্লেখ্য।

'গল্পগুচ্ছে'র রচনারীতি সরল ও সুমিত, কোথাও জমকালো নয়, কোথাও

চমক লাগাবার ইচ্ছে নেই, লেখকের গলা কোথাও চড়ে না, গল্পের বিশেষ-কোনো অংশে বিশেষভাবে জোর দেবার প্রলোভন থেকে তিনি মুক্ত, পাত্র-পাত্রীর মধ্যে হঠাৎ নিজে আবির্ভূত হ'য়ে মন্তব্য করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ— এ-রকম মন্তব্য যেখানে আছে, সেখানে গল্পটি নায়ক কিংবা নায়িকার নিজের মুখেই বলা, তাছাড়া, 'পোস্টমাস্টারে'র মতো দু-একটি গল্পে এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে সেটাকে লেখকের অসাবধানতাও বলা যায়, আবার গল্পের স্বাভাবিক গতির অসংবরণীয় ঝোঁক বললেও ভুল হয় না। সব মিলিয়ে গল্পগুলিতে 'শাস্তি' গল্পের ছিদামের দেহের মতো, 'একটি পরিমিত পারিপাট্য, একটি অবলীলাকৃত শোভা প্রকাশ পায়'; এই গুণটির আমরা নাম দিতে পারি সাত্ত্বিকতা। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ সমগ্রভাবে 'নষ্টনীড়', যেখানে লেখক প্রায় কিছুই বলেননি অথচ সবই বলেছেন; তাছাড়া মৃত্যু, হত্যা প্রভৃতি বড়ো-বড়ো ঘটনাগুলিকে এমন সহজে তিনি বিবৃত করেন যে সেখানে তাঁর অপ্রয়াসের নৈপুণ্যেই আমাদের বিস্ময় জাগে। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে' রাইচরণের প্রভুপুত্রের জলে ডোবার দৃশ্যটি স্মরণ করুন :

> একবার ঝপ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল কেহ নাই, চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারও চিহ্ন নাই।
>
> মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "বাবু—খোকাবাবু, লক্ষ্মী, দাদাবাবু আমার।"
>
> কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

এই কথাগুলি নির্লিপ্তভাবে বলা, আর সেই কারণেই প্রভাবশালী। কী ঘটেছে তা স্পষ্ট ক'রে বলা হয়নি, কিন্তু পদ্মার উদাসীনতার উল্লেখমাত্রে তা বুঝতেও কারো বাকি থাকে না। মিতভাষণের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত 'শাস্তি'তে বড়ো বউয়ের হত্যাকাণ্ড :

> ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় রুদ্ধ গম্ভীর গর্জনে [দুখিরাম] বলিয়া উঠিল, "কী বললি!"—বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না-ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।
>
> চন্দরা রক্তসিক্ত বস্ত্রে "কী হোলো গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার

মুখ চাপিয়া ধরিল। দুখিরাম দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মতো ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ভাষায় কোনোখানে এতটুকু বেশি জোর দেয়া হয়নি; যেন অত্যন্ত সাধারণ দৈনন্দিন কোনো ঘটনার বর্ণনা করা হচ্ছে, এমনি আটপৌরে ভাষা; বরং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে প্রত্যেকটি বাক্য 'ইল' প্রত্যয়ান্ত শব্দে শেষ হওয়ায় ভাষাবিন্যাসে কিছুটা শৈথিল্যই ধরা পড়ে। ঘটনা যেখানে খুব জমকালো ধরনের, সেখানেই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে নিচু গলায় কথা বলেন, এবং বলেন সবচেয়ে কম। অথচ এই নিরাসক্তি ভলটেয়ার-ধর্মী নয়, সমগ্র জীবন-রঙ্গকে বিপুল প্রহসনরসে বিগলিত ক'রে দেয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়; তাঁর রচনার নির্লিপ্ততা সত্ত্বেও 'একটুখানি মোহ তবু মনের মধ্যে' থেকেই যায়; যারা দুঃখ পাচ্ছে, যারা মরছে, তাদের জন্য অল্প কথাতেই বৃহৎ বেদনা সঞ্চিত হ'য়ে থাকে। 'গল্পগুচ্ছে' মৃত্যুর আবির্ভাব পৌনঃপুনিক—গল্পের মাঝখানে কিংবা পরিশেষে কোনো-না-কোনো চরিত্র প্রায়ই মরছে, কিন্তু তার কোনোটাই লিট্‌ল নেল্-এর মৃত্যুর মতো অশ্রুজলে আকুল নয়; 'ডাকঘরে' অমলের মৃত্যু যেমন গম্ভীর, পবিত্র ও চিত্তশুদ্ধিকর, 'ছুটি'র ফটিকের বা 'শেষের রাত্রি'র যতীনের মৃত্যুও তা-ই। প্রধান চরিত্রের মৃত্যুতে গল্প শেষ করা সাধারণত বিপজ্জনক, আপাত-দৃষ্টিতে তা দুর্বলতার পরিচয় দেয়, অথচ রবীন্দ্রনাথ তা বার-বার করেছেন, এবং এমনভাবে করেছেন যাতে শিল্পের একটি বিশুদ্ধ রূপ আমরা দেখতে পেয়েছি। মৃত্যু সেখানে অনিবার্য, এমনকি প্রয়োজনীয়, গল্প শেষ করার অনন্যোপায় কৌশল কিংবা 'করুণ রস' সঞ্চারের একটি যন্ত্র নয়। সংযত সশ্রদ্ধ বিনম্র চিত্তে তিনি মৃত্যুকে আহ্বান করেন, বেশি বলেন না, কিছুই প্রায় বলেন না। 'মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে, মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি; কিংবা 'না মাসি, আমার পায়ের উপর ও শাল নয়, ও-শাল মিথ্যে, ও-শাল ফাঁকি'— এই রকম উক্তিতে যখন গল্প আর তার নায়কের জীবন শেষ হয়, তখন মৃত্যুর নির্মমতার সঙ্গে তার মুক্তিও আমরা উপলব্ধি করি; শোকের বেদনার মধ্যেও আবিলতা স্পর্শ করে না। 'শাস্তি'র চন্দরার ফাঁসির সঙ্গে হার্ডির টেস্-এর ফাঁসির তুলনা হ'তে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'President of the Immortals'-কে লক্ষ্য ক'রে একটিও ব্যঙ্গোক্তি করেননি, গল্পের শেষ প্রান্তে এসে শুধু একবার বিবাহ-রাত্রির 'কালোকোলো ছোটোখাটো গোলগাল' চন্দরাকে স্মরণ ক'রেই আবার সহজভাবে গল্প বলায় ফিরে গিয়েছেন :

জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা করো?"

চন্দরা কহিল, "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।"

ডাক্তার কহিল—"তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব?"

চন্দরা কহিল—"মরণ!"

গল্প শেষ: 'দয়ালু' কথাটির মৃদু শ্লেষ থেকে শুরু ক'রে 'মরণ' কথাটির বহুমুখী ব্যঞ্জনা পর্যন্ত যেন তীরের ফলকের মতো ক্রমশ সরু হ'য়ে, সংহত হ'য়ে বুকে এসে বিঁধলো। 'সম্পত্তি-সমর্পণে' বৃদ্ধ যজ্ঞনাথ কর্তৃক বালক নিতাইকে বধ করার দৃশ্য, তারপর বৃদ্ধের মৃত্যু, এবং 'রাসমণির ছেলে'তে কালীপদর মৃত্যুও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যদিও এ-সব দৃশ্য 'ছুটি', 'শেষের রাত্রি' কি 'শাস্তি'র শেষাংশের সঙ্গে তুলনীয় নয়। একমাত্র 'মাল্যদান' গল্পে কুড়ানির মৃত্যুতে এই অনিবার্যতা নেই, তা না-ঘটলেও চলতো, এমনকি না-ঘটলেই ভালো হ'তো। কুড়ানির গৃহত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গেই শেষ হ'লে 'মাল্যদান' একটি চমৎকার চেখভ-ধরনের গল্প হ'তে পারতো; এটি 'গল্পগুচ্ছে'র সেই স্বল্পসংখ্যক রচনার একটি, যেখানে শেষরক্ষা হয়নি।

ভেবে অবাক লাগে, যে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'গল্পগুচ্ছ' লিখছিলেন সেই একই সময়ে তিনি রচনা করছিলেন 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা'-র বর্ণালংকার-বিলাসী প্রাসাদ; ও-সব কাব্যগ্রন্থে যে-বিচিত্র বাণীপ্রবাহ আমাদের বিহ্বল করে, তার উচ্ছ্বাস, ঝংকার ও সমারোহ গল্পগুলিতে কোথায়? যদিও এখানেও অনিবার্যভাবে রাবীন্দ্রিক স্বভাবমাধুরীর আস্বাদ আমরা পাই, আর কখনো ভুলতে পারি না তাঁর গল্প তাঁর কবিতার কাছে কত কৃতজ্ঞ, তবু এক-এক সময় মনে হয় যে 'মানসসুন্দরী' কবিতা আর 'কাবুলিওয়ালা' গল্প যেন একই লেখকের রচনা নয়, যেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির পাশাপাশি জায়গা ছিলো, একজন খাঁটি কবি, আর-একজন খাঁটি গল্পলেখক। তাঁর উপন্যাস বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে, কিন্তু গল্পে যে-গুণগুলি প্রকাশ পেয়েছে সেগুলি বিশেষভাবে গল্পেরই গুণ, কবিতার নয়; গল্প-লেখকের স্বাভাবিক ক্ষমতায় তিনি মোপাসাঁ, চেখভ প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্যদের সমকক্ষ। গল্প তিনি সরাসরি আরম্ভ করেন এবং মুহূর্তের মধ্যে পাঠকের মনকে ঘটনাস্রোতে মগ্ন করেন, ভূমিকা করেন না, দম নেবার জন্য থামেন না, পরোক্ষভাবে উপদেশ দেন না,

ঠিক মুখে-বলা গল্পের মতো সহজ স্বচ্ছন্দ স্রোতে ব'য়ে চলে তাঁর কাহিনী—সে-স্রোত কোথাও অত্যধিক বর্ণপ্রয়োগে ঘোলা হ'য়ে ওঠে না, সেটি একেবারে স্বচ্ছ অথচ মানবহৃদয়ের রহস্যের মতোই অতলস্পর্শী। এই মুখে-বলা ভাবটা মোপাসাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য, এবং এই ভাবটার হুবহু অনুকৃতির জন্য তিনি প্রায়ই কারো-না-কারো মুখ দিয়ে গল্পটা বলিয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে এই পদ্ধতি দেখতে পাই তিনটি মাত্র গল্পে: 'নিশীথে', 'কঙ্কাল' ও 'মণিহারা'য়। নায়ক বা নায়িকা নিজের মুখে বলছে এমন গল্পের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অল্প; প্রথম খণ্ডে একটিও নেই, দ্বিতীয় খণ্ডে কিছু আছে, তৃতীয় খণ্ডে পর-পর কয়েকটি গল্পই 'আমি'র মুখ দিয়ে বলা—কেননা ততদিনে তিনি 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে' লিখেছেন, তাঁর সাহিত্যের জগতে হাওয়া-বদল হ'য়ে গিয়েছে।

মোটের উপর দেখতে পাই, কথকতার যেটা বড়ো রাস্তা, সেই পথেই রবীন্দ্রনাথের আনাগোনা বেশি; যেখানে লেখক সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা। সকলেই জানেন সে-পথের পরিসর সীমাহীন ব'লে সেখানে বাহুল্যের, অতিভাষণের প্রলোভনও প্রবল। তাঁর ছোটোগল্পে—যদিও অন্যত্র নয়—এই প্রলোভন থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সর্বদা মুক্ত ব'লে 'গল্পগুচ্ছ' সুমিতির একটি উদাহরণস্বরূপ। মোপাসাঁর রুদ্ধশ্বাস গতি নেই এখানে, ঘটনা অনেক সময় বহুবর্ষব্যাপী, তার লয়টা বিলম্বিত; ত্বরা নেই, অথচ অনর্থক কালক্ষেপও নেই, ঠিক যেখানে যেটুকু বক্তব্য তা বলা হ'তে-হ'তে এমন নির্ভুলভাবে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে যে তার অনুরণন অনেকক্ষণ পর্যন্ত পাঠকের মনে ধ্বনিত হ'তে থাকে। গদ্য গল্পের সব লক্ষণে সমৃদ্ধ হ'য়েও এই গ্রন্থ কাব্যের মতোই পৌনঃপুনিক পাঠসাপেক্ষ—এই একটি মাত্র অর্থে একে 'কাব্যধর্মী' বললে ভুল হয় না।

কথাসাহিত্যে ভাষা যদি বিষয়কে অতিক্রম ক'রে স্বতন্ত্রভাবে লক্ষণীয় হ'য়ে ওঠে—যেমন হয়েছে 'ঘরে-বাইরে' বা 'শেষের কবিতা'য়, সেটা অবিমিশ্র প্রশংসার কথা নয়। এমনকি কাব্যেও সর্বত্র সেটা সুফলপ্রসূ হয় না, তারও উদাহরণ রবীন্দ্রনাথেই আছে। কিন্তু 'গল্পগুচ্ছে' অলংকরণের আতিশয্য নেই; এদিক থেকে তা সমকালীন রবীন্দ্র-কাব্য ও পরবর্তী রবীন্দ্র-গদ্য থেকে স্বতন্ত্র। যাকে বলা যায় বাক্‌চাতুর্য, তা প্রথম দুই খণ্ডে প্রায় দেখতেই পাই না, তৃতীয় খণ্ডে প্রবেশ করেছে কথা নিয়ে নানা রকম খেলা: সেটা রবীন্দ্র-গদ্যেরই স্বাভাবিক বিবর্তন ব'লে ধরা যায়, হয়তো নেপথ্যে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবও রয়েছে। 'গল্পগুচ্ছ' রবীন্দ্রনাথের একটি গ্রন্থ, যাতে তাঁর গদ্যের ক্রমবিকাশের

ধারা আমরা নিবিষ্টভাবে অনুসরণ করতে পারি ; সাধু থেকে চলতি ভাষায়, ঋজু থেকে বঙ্কিম ভঙ্গিতে, সরলতা থেকে সমৃদ্ধ কারুকলায়—বিবর্তনের সবগুলো ধাপই 'পোস্টমাস্টার' থেকে 'পাত্র-পাত্রী' পর্যন্ত ধাপে ধাপে চিহ্নিত হ'য়ে আছে। এখানে আমাদের প্রধান আলোচ্য রবীন্দ্রনাথের পূর্বযুগের গদ্য ; এই গদ্যে 'শেষের কবিতা'র দীপ্তি নেই, কিন্তু উপমার যাথার্থ্যে, বর্ণনার বাস্তবঘনতায় এখানে একটি সুন্দর সৌষম্য অনুভব করি—উঁচু-নিচু নেই, সমতলভাবে কাহিনীর স্রোত প্রবাহিত—ভাষা যেন স্বতন্ত্র ভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচরই হয় না, শুধু কাহিনীকে এগিয়ে দেয়াই তার উদ্দেশ্য।

বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দু-প্রহরের সময় খুব এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনো চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের খেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্বর্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ। ('শাস্তি')

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, চারিদিকে সোনা ঝকঝক করিতেছে। সোনা ছাড়া আর কিছুই নাই। মৃত্যুঞ্জয় ভাবিতে লাগিল—পৃথিবীর উপরে হয়তো এতক্ষণে প্রভাত হইয়াছে—সমস্ত জীবজন্তু আনন্দে জাগিয়া উঠিয়াছে।—তাহাদের বাড়িতে পুকুরের ধারে বাগান হইতে প্রভাতে যে একটি স্নিগ্ধ গন্ধ উঠিত, তাহাই কল্পনায় তাহার নাসিকায় যেন প্রবেশ করিতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট চোখে দেখিতে পাইল, পাতিহাঁসগুলি দুলিতে-দুলিতে কলরব করিতে-করিতে সকালবেলায় পুকুরের জলের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, আর বাড়ির ঝি বামা কোমরে কাপড় জড়াইয়া উর্ধ্বোত্থিত দক্ষিণ হস্তের উপর একরাশি পিতল কাঁসার থালাবাটি লইয়া ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। ('গুপ্তধন')

এ-সবই চোখে দেখা জিনিশ, কিন্তু এদের আবেদন শুধুই আমাদের চোখের কাছে নয়, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সমবায়ে বিষয়টিকে মূর্ত ক'রে তোলা হয়েছে। উভয় উদ্ধৃতিতেই গন্ধের উল্লেখ লক্ষণীয়! পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে সবচেয়ে কোমল ও সূক্ষ্ম, সবচেয়ে স্মৃতিসঞ্চারী এবং সবচেয়ে আশুক্রান্ত এই ঘ্রাণচেতনার প্রয়োগ-মাত্রে বর্ণনাগুলির যাথার্থ্য বেড়ে যায়, যে-বিশেষ আবহটি তার লক্ষ্য সেখানে যেন সশরীরে বদলি হই আমরা। এই রকম আরো কয়েকটি উদাহরণ চয়ন করি :

গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শ্রান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। ('মহামায়া')

একদিন বর্ষাকালের মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে। ('পোস্টমাস্টার')

নিকটের পাহাড়ে বন-তুলসী, পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ('ক্ষুধিত পাষাণ')

গিরিকাননের সমস্ত সুগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া একটা উদ্দাম বায়ুর উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিত…আমার চারি দিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই অরালী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল করস্পর্শ নিভৃত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত…। ('ক্ষুধিত পাষাণ')

আজ মধ্যাহ্নে গাছের ফাঁক দিয়া যতীন যখন ফাল্গুনের আকাশ দেখিতেছিল, দূর হইতে কাঁঠাল মুকুলের গন্ধ মৃদুতর হইয়া তাহার ঘ্রাণকে আবিষ্ট করিয়া ধরিতেছিল…। ('মাল্যদান')*

এ-সব বর্ণনা ভাবপ্রধান, এদের উদ্দেশ্য পাঠকের মনে বিশেষ একটি ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করা। আবার বর্ণনা যেখানে রূপপ্রধান, যেখানে লেখক কথা নিয়ে চিত্রকরের মতোই ছবি আঁকেন, সেখানেও রবীন্দ্রনাথ কার্পণ্য করেননি।

তাহার জাফরান রঙের পায়জামা এবং দুটি শুভ্র রক্তিম কোমল পায়ে বক্রশীর্ষ জরির চটি পরা বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির ফুলকাটা কাঁচুলি আবদ্ধ, মাথায় একটি লাল টুপি এবং তাহা হইতে সোনার ঝালর ঝুলিয়া তাহার শুভ্র ললাট এবং কপোল বেষ্টন করিয়াছে। ('ক্ষুধিত পাষাণ')

নবাবজাদীর ভাষামাত্র শুনিয়া সেই ইংরাজরচিত আধুনিক শৈলনগরী দার্জিলিঙের ঘন কুজ্ঝটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে মোগলসম্রাটের মানসপুরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—শ্বেতপ্রস্তররচিত বড়োবড়ো অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ অশ্বপৃষ্ঠে মছলন্দের সাজ, হস্তীপৃষ্ঠে স্বর্ণঝালরখচিত হাওদা, পুরবাসিগণের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেশমের মসলিনের প্রচুরপ্রসর জামা পাজামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারি, জরির জুতার অগ্রভাগে বক্র শীর্ষ—সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার। ('দুরাশা')

* এই রকম অংশগুলি প'ড়ে, বিশেষত 'ক্ষুধিত পাষাণে'র 'বহুদিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধে', আজকাল আমাদের মনে প'ড়ে যায় জীবনানন্দ দাশের 'লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ', 'চালের ধূসর গন্ধ', 'হরিৎ মদের মতো ঘাসের ঘ্রাণ'। এই দুই লেখকে আর-কোনো মিল নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গন্ধের সাম্রাজ্যে জীবনানন্দই উত্তরাধিকারী।

কোনো অনুপুঙ্খ বাদ যায়নি, জরির জুতোর বক্রশীর্ষটুকু পর্যন্ত ঠিক জায়গায় উঁকি দিচ্ছে। আমাদের পরিচিত পরিবেশের মধ্যে আরো দু-একটা রূপপ্রধান বর্ণনা দেখা যাক :

নিবারণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গলির ধারে গৃহদ্বারে খোলা গায়ে বসিয়া অত্যন্ত নিরুদ্‌বিগ্নভাবে হুঁকাটি লইয়া তামাক খাইতে থাকে। পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, গাড়িঘোড়া চলে, বৈষ্ণব-ভিখারি গান গাহে, পুরাতন-বোতল-সংগ্রহকারী হাঁকিয়া চলিয়া যায় ; এই সমস্ত চঞ্চল দৃশ্য মনকে লঘুভাবে ব্যাপৃত রাখে এবং যেদিন কাঁচা আম অথবা তপসিমাছ-ওয়ালা আসে, সেদিন অনেক দরদাম করিয়া কিঞ্চিৎ বিশেষরূপ রন্ধনের আয়োজন হয়। তাহার পর যথাসময়ে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে দড়িতে ঝুলানো চাপকানটি পরিয়া, একছিলিম তামাক পানের সহিত নিঃশেষপূর্বক আর-একটি পান মুখে পুরিয়া, আপিসে যাত্রা করে। আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলাটা প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষের বাড়িতে প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে সন্ধ্যা যাপন করিয়া আহারান্তে রাত্রে শয়নগৃহে স্ত্রী হরসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ('মধ্যবর্তিনী')।

গত যুগের অনতিবিত্ত প্রায়-প্রৌঢ় বাঙালি ভদ্রলোকের দৈনন্দিন জীবনের সম্পূর্ণ ছবিটি এখানে পাওয়া গেলো। এ যে 'নিতান্তই সচরাচর রকমের', নিতান্তই সাধারণ—সাহিত্যের চিত্রশালায় সেটাই এর গৌরব। বাস্তব জীবনে যা প্রতিদিনই আমাদের চোখে পড়ছে, অথচ যাকে আমরা দেখেও দেখি না, শিল্পী যেন তারই চারদিকে একটি অদৃশ্য জ্যোতির্লেখা এঁকে দেন, তখনই সেটা বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য হ'য়ে ওঠে। বাঙালি মধ্যবিত্তের একটি সাধারণ ছাঁচ আঁকা হয়েছে এখানে, অথচ দ্বিতীয় পানটির উল্লেখমাত্রে সাধারণ জীবন বিশেষ ও ব্যক্তিগত হ'য়ে উঠলো, আর 'প্রশান্ত গম্ভীর সন্ধ্যাযাপনে'র চাপা হাসিটুকু সমস্ত অনুচ্ছেদটিতে একটি কৌতুকের আভা ছড়িয়ে দিলে। কৌতুকের, ব্যঙ্গের নয় ; যে-মধ্যবিত্ত আধা-দরিদ্র সমাজ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনপরিধির বহির্ভূত ছিলো, এটা লক্ষণীয় যে তিনি সেখান থেকেই সংগ্রহ করেছেন তাঁর অধিকাংশ গল্পের উপাদান, এবং এই মৃদু, অপরিসর, ধীরগামী সমাজকে কবিতায় ও প্রবন্ধে বার-বার আঘাত ক'রে থাকলেও গল্পে এর প্রতি প্রকাশ করেছেন অবিরল আনুকূল্য, মমত্ববোধজনিত পক্ষপাত। মোটের উপর 'গল্পগুচ্ছে' আমরা যে-লেখকের দেখা পাই, তিনি একাধারে কবি এবং সাংসারিক অর্থে 'পাকা লোক', পর্যবেক্ষণে সূক্ষ্ম, উদ্ভাবনে সপ্রতিভ, এবং মনোধর্মে সহনশীল। সব রকম অসংগতি তাঁর চোখে পড়ে, কিন্তু তা নিয়ে

বিদ্রূপ করেন না, একটি সহাস্য অনুকম্পায় সবই স্নিগ্ধ ক'রে তোলেন। 'সমাপ্তি' গল্পের অপূর্ব কনে-দেখার উপলক্ষে

একটু বিশেষ যত্নপূর্বক সাজ করিল। ধুতি ও চাদর ছাড়িয়া সিল্কের চাপকান জোব্বা, মাথায় একটা গোলাকার পাগড়ি, এবং বার্নিশকরা একজোড়া জুতা পায়ে দিয়া সিল্কের ছাতা হস্তে প্রাতঃকালে বাহির হইল।

ব্যাকরণে ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু সাজগোজে নেই, সিল্কের ছাতাটি পর্যন্ত ভুল হয়নি। তারপর

যথাকালে কম্পিতহৃদয় মেয়েটিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া রঙ করিয়া, খোঁপায় রাংতা জড়াইয়া একখানি পাৎলা রঙিন কাপড়ে মুড়িয়া বরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সে এক কোণে নীরবে মাথা প্রায় হাঁটুর কাছে ঠেকাইয়া বসিয়া রহিল এবং এক প্রৌঢ়া দাসী তাহাকে সাহস দিবার জন্য পশ্চাতে উপস্থিত রহিল।

কনে-দেখার পাট ভালো ক'রে শুরু হ'তে-না-হ'তেই

বহির্দেশে একটা অশান্ত গতির ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দ শোনা গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে দৌড়িয়া হাঁপাইয়া পিঠের চুল দোলাইয়া মৃন্ময়ী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।···দাসীটি তাহার সংযত কণ্ঠস্বরের মৃদুতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য তীব্রভাবে মৃন্ময়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অপূর্বকৃষ্ণ আপনার সমস্ত গাম্ভীর্য এবং গৌরব একত্র করিয়া পাগড়ি-পরা মস্তকে অভ্রভেদী হইয়া বসিয়া রহিল এবং পেটের কাছে ঘড়ির চেন নাড়িতে লাগিল।

বাহুল্যভয়ে বেশি উদ্ধৃত করলুম না, কিন্তু অপূর্বর যাত্রারম্ভ থেকে এই পরিচ্ছেদের সমাপ্তি—অপূর্বর জুতো চুরি যাওয়া, 'অনন্যোপায় হইয়া বাড়ির কর্তার পুরাতন ছিন্ন ঢিলা চটিজোড়াটা পরিয়া প্যাণ্টলুন চাপকান পাগড়ি সমেত···কর্দমাক্ত গ্রাম্যপথে' তার প্রত্যাবর্তন, তারপর পথের মাঝখানে অপহারিণীকে দু-হাতের মধ্যে ধ'রে ফেলেও তাঁর 'তড়িত্তরল দুটি চক্ষুর মধ্যে' তাকিয়ে দেখেও, 'যেন যথাকর্তব্য অসম্পন্ন' রেখে অপূর্বর 'চিন্তানিমগ্ন ধীর পদক্ষেপ'—সমস্তটাই বর্ণনাশিল্পের উৎকৃষ্ট নমুনারূপে উদ্ধৃতিযোগ্য। অপূর্ব বা মৃন্ময়ীর কথা ছেড়েই দিলাম, খোঁপায়-রাংতা-জড়ানো প্রদর্শিতা, 'আপন পর্যবেক্ষণ-শক্তির চর্চায় একান্তমনে নিযুক্ত' রাখাল, এবং মৃদুস্বরে অথচ তীব্রভাবে ভর্ৎসনাকারিণী দাসীটি পর্যন্ত সকলেই জীবনের রসে সমুজ্জ্বল। কপট-গম্ভীর কৌতুক, রাখাল-মৃন্ময়ীর অচেতন স্নেহলীলা, প্রেমের প্রথম উন্মেষের মধুরিমা—পর-পর কয়েকটি স্বল্পায়তন ছবির সাহায্যে এই ভাবগুলি যথাযথ বেগে আমাদের মনে এসে পৌঁচচ্ছে। 'রাজটিকা'য় নবেন্দু যখন 'স্নানের পূর্বে

বক্ষঃস্থল তৈলাক্ত করিয়া পৃষ্ঠদেশের দুর্গম অংশগুলিতে তৈল সঞ্চার করিবার কৌশল অবলম্বন করিতেছেন', আর তাঁর শ্যালিকারা তাঁর বিরুদ্ধে এক কৌতুকময় চক্রান্ত করছেন, তখন বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের এই অধুনালুপ্ত স্নিগ্ধ ছবিটি আমাদের মনের আসবাবপত্রের অংশ হ'য়ে যায়। এরই পাশে দেখা যাক 'শাস্তি' গল্পের একটি বেদনার ছবি :

বন্দিনী হইয়া চন্দরা, একটি নিরীহ ক্ষুদ্র চঞ্চল কৌতুকপ্রিয় গ্রামবধূ, চিরপরিচিত গ্রামের পথ দিয়া, রথতলা দিয়া, হাটের মধ্য দিয়া, ঘাটের প্রান্ত দিয়া, মজুমদারদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোস্টাপিস এবং ইস্কুল-ঘরের পার্শ্ব দিয়া, সমস্ত পরিচিত লোকের চক্ষের উপর দিয়া, কলঙ্কের ছাপ লইয়া চিরকালের মতো গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এক-পাল ছেলে পিছন পিছন চলিল এবং গ্রামের মেয়েরা, তাহার সই-সাঙাতরা, কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া, কেহ দ্বারের প্রান্ত হইতে, কেহ বা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া পুলিস-চালিত চন্দরাকে দেখিয়া লজ্জায় ঘৃণায় ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ছবিটি কিছু বিশদভাবে আঁকা হয়েছে, চন্দরার দুঃসীম অবমাননা প্রকাশ করার জন্য তার প্রয়োজন ছিলো। হাটে, ঘাটে, পথে, রথতলায়, মজুমদারদের বাড়ির সামনে, পোস্টাপিশ এবং স্কুলঘরের পাশে, প্রতি জায়গায় আমরা নতুন ক'রে লজ্জাঘৃণাভয়ে কণ্টকিত গ্রামিকদের চোখে চন্দরাকে দেখতে পাই, এবং প্রতিবারে এই হতভাগিনীর প্রতি সস্নেহ করুণায় আমাদের হৃদয় আপ্লুত হ'য়ে ওঠে। সিনেমায় যেমন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য একই বস্তুকে নানাদিক থেকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখানো হয়, এ-বর্ণনাটুকু খানিকটা সেই রকম।

বিশেষণ ও উপমা নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা হ'তে পারে। এ-বিষয়ে প্রথমে আমি ব'লে নিতে চাই যে চিরাচরিত সমালোচনা-শাস্ত্রে উপমা একটি অলংকাররূপে এবং বিশেষভাবে কাব্যের অলংকাররূপে গণ্য। কিন্তু গদ্যরচনায় —এমনকি কাব্যেও—উপমার বহুলতাকে আধুনিক যুগে কেউ-কেউ দূষ্য ব'লে মনে ক'রে থাকেন। কিন্তু কিছুই তার নিজের কারণে মান্য অথবা দূষণীয় নয়, কৌশলমাত্রেই ব্যবহারনির্ভর। তাছাড়া, উপমা জিনিশটাকে সূক্ষ্ম বিচারে ঠিক 'অলংকার'ও বলা যায় না, কেননা সেটা বিস্তারিত বিশেষণ ছাড়া আর-কিছু নয়। যেটা অলংকার, সেটা থাকলেও চলে, না-থাকলেও চলে—যেমন কবিতার মিল। কিন্তু বিশেষণ ছাড়া ভাষা হয় না, এবং উপমা বাদ দিলে ভাষার প্রকাশ-শক্তি এতটা খর্ব হ'য়ে পড়ে যে উপমাকেও ভাষার অপরিহার্য অঙ্গরূপেই বিবেচনা করা যেতে পারে। দান্তের কাব্য বিশেষণবিরল, এই নজির দেখিয়ে

যাঁরা বলেন যে অনিবার্য ও অনন্য বিশেষ্যপদটি বেছে নিতে পারলে বিশেষণের প্রয়োজন অনেকটা ক'মে আসে, তাত্ত্বিক অর্থে তাঁদের কথা গ্রাহ্য হ'তে পারে, কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে কোনো সভ্য ভাষাতেই বিশেষণ ছাড়া মনের কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না। শুধু সুশিক্ষিত সাহিত্যিকের রচনাই নয়, প্রাকৃত জনের মুখের ভাষাও বিশেষণ ও উপমার অধীন। মা যে শিশুকে সোনামণি ব'লে ডাকেন সেটা কি বিশেষণ, না উপমা, না উৎপ্রেক্ষা? তিনটেই। সংস্কৃত সাহিত্যে দেখতে পাই উপমার ধারণা একটু স্বতন্ত্র; উপমানের সঙ্গে উপমেয় সম্পূর্ণ মিললো কি মিললো না, সংস্কৃত কবির কাছে সেটা বড়ো কথা ছিলো না, তাঁদের লক্ষ্য ছিলো উপমাটাকেই স্বতন্ত্রভাবে গৌরবময় ক'রে তোলা। সেইজন্য উপমানকে তাঁরা সমগ্রভাবে দেখতেন না, তার বিশেষ একটি গুণ বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে উপমেয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে তাঁদের মাত্রাজ্ঞান ব্যাহত হ'তো না। হস্তিনীর বিরাট বপু ও বিসদৃশ অবয়বাদির কথা ভুলে গিয়ে শুধু তার চলনের জন্য তাকে যুবতীর সঙ্গে উপমিত করতে তাঁরা দ্বিধাবোধ করেননি, কিন্তু গজেন্দ্রগামিনী নায়িকা আধুনিক রুচিতে হাস্যকর, আমরা চাই বস্তুকে সমগ্রভাবে দেখতে, যদিও 'চাঁদের মতো মুখ', 'সাপের মতো বেণী' এইরকম কতগুলি একলক্ষণযুক্ত উপমা বহুকালের অভ্যাসের ফলে আমরা মেনে নিয়েছি। সংস্কৃত সাহিত্যের কোনো-কোনো উপমান উপমেয় থেকে এতই দূরে স'রে আসতো, এতই জটিল ও গ্রন্থিবহুল হ'য়ে উঠতো যে সে-সব উপমাকে আক্ষরিক অর্থেই অলংকার বলা যায়। তার মানে, ওটা না-হলেও চলতো, রীতির সৌষ্ঠববর্ধনের জন্যই তার প্রয়োগ। এই ধরনের উপমা আমাদের কাছে কৃত্রিম লাগে। এই আদর্শের অনুগামিতা উনিশ-শতকী সাহিত্যেও দেখতে পাই; উপমার ঘনবিন্যাসে ভাষা আবিল হ'য়ে উঠছে, উপমানের সঙ্গে উপমেয়ের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। অলংকরণের এই পদ্ধতি, বলা বাহুল্য, আধুনিক সৎলেখকের বর্জনীয়, কেননা বক্তব্যকে সম্পূর্ণ ক'রে প্রকাশ করাই তাঁর উদ্দেশ্য, তারই জন্য তিনি প্রয়োজনমতো উপমা-বিশেষণাদি প্রয়োগ ক'রে থাকেন, কিন্তু সেগুলো যদি আপন ভারে বক্তব্যকে আচ্ছন্ন ক'রে তোলে, তবে তাদের উদ্দেশ্যই পর্যস্ত হয়।

'গল্পগুচ্ছে' বিশেষণ ও উপমা সুপ্রচুর, কিন্তু সেগুলো শুধু শোভাবৃদ্ধির জন্য বসানো হয়নি, কাহিনীকে ফুটিয়ে তোলাই তাদের উদ্দেশ্য এবং উপমানের সঙ্গে উপমেয়ের সাদৃশ্য একাঙ্গ নয়, বহুমুখী। 'ছুটি' গল্পের ফটিক যখন কলকাতায় এলো

তখন তার 'অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা'-র কথা তার বার-বার মনে পড়তে লাগলো—'কেবল একটা আন্তরিক "মা, মা" ক্রন্দন সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলই আলোড়িত' হ'তে লাগলো। তারপর তার 'রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক' কিছুতেই ভাবতে পারলে না যে পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর কারো কাছে সেবা সে পেতে পারে। ফটিকের উদ্দেশে এখানে একটি-দুটি নয়, আটটি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু একটিও বেশি হয়নি, কিংবা কোনোটিই অন্য কোনো-একটির আংশিক পুনরুক্তি নয়, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ও প্রয়োজনীয়, সবগুলি একত্র হ'লে তবেই বক্তব্য সুসম্পূর্ণ হয়।* বিশেষণগুলি যেন হৃদয়াবেগে দ্রব, তাদের ভিতর দিয়েই ফটিকের মনের অবস্থা করুণ হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে, লেখককে আলাদা ক'রে কিছু বলতে হয়নি। 'শাস্তি'র চন্দরা যখন লাস্যময়ী যুবতী তখন সে 'ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া উজ্জ্বল চঞ্চল ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা কিছু সমস্ত দেখিয়া লয়,' আবার সে যখন পুলিশ-বেষ্টিত হ'য়ে মৃত্যু-অভিসারে বেরিয়েছে তখন সে 'নিরীহ চঞ্চল ক্ষুদ্র কৌতুকপ্রিয় গ্রামবধূ।' শেষের চারটি বিশেষণে ঘটনাটির হৃদয়-বিদারকতা পরিস্ফুট হ'লো। 'মধ্যবর্তিনী'তে শৈলবালার মৃত্যুর পরে নিবারণ তার প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে পূর্বের মতো সহজভাবে আর মিলিত হ'তে পারলো না; তার মনে হ'লো যেন একটি 'ক্ষুদ্র উজ্জ্বল সুন্দর নিষ্ঠুর ছুরি আসিয়া একটি হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ এবং বাম অংশের মাঝখানে বেদনাপূর্ণ বিদারণরেখা টানিয়া দিয়া গিয়াছে।' 'অতিথি' গল্পে দেখছি বর্ষাস্ফীত নদীর তীরে 'সমস্তই যেন সজীব, স্পন্দিত, প্রগল্‌ভ, আলোক-উদ্ভাসিত, নবীনতায় সুচিক্কণ, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ'—এখানে বর্ষা ঋতুর ছবি শুধু নয়, তার স্পর্শটাও পাওয়া যাচ্ছে। 'দুরাশা'র নবাবপুত্রী যখন তার প্রেমাস্পদ হিন্দু কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের পর সংজ্ঞা ফিরে পেলো,

* বিশেষণের এই স্তূপীকৃত ব্যবহার হেনরি জেমসকে মনে করিয়ে দেয়—একসঙ্গে তিনটি-চারটি ক'রে আসছে—'splendid, dreadful, funny country,' 'ugly, sickly, witty, charming face'—রবীন্দ্রনাথেও শব্দগুলো কখনো পরস্পরের পরিপূরক, কখনো বা বিরোধী। এই পদ্ধতিরই সম্প্রসারণে কী-রকম বাণীসংগীত রচিত হ'তে পারে তার বিখ্যাত উদাহরণ দিয়েছেন জেমস্ জয়স: 'She was just a young thin pale soft shy slim slip of a thing then.'

তখন 'সেই কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর নির্বিকার পবিত্র বীর ব্রাহ্মণের পদতলে' দূর থেকে সে প্রণাম করলো। ব্রাহ্মণের ব্যবহার এতই অমানুষিক বা অতিমানুষিক, নায়িকার মনোভাব এখানে এতই বিচিত্র যে এই পাঁচটি বিশেষণের পাঁচটি শিখা না-জ্বাললে ঘটনাটি ভালো ক'রে আলোকিত হ'তে পারতো না। একাধিক বিশেষণে সম্পূর্ণ এক-একটি চরিত্রও ফুটে ওঠে রবীন্দ্রনাথের হাতে। 'নিঃশব্দ নিরীহ সামান্য হরলাল'—এ-ই তো সম্পূর্ণ একটি ছবি। ছোটো ভাই বংশীর প্রতি 'হালদার গোষ্ঠী'র বনোয়ারির অবজ্ঞা যে কত গভীর তা কি আমরা এমন ক'রে বুঝতে পারতুম, যদি না বংশীকে 'সেই সূক্ষ্মবুদ্ধি সূক্ষ্মশরীর রসরক্তহীন ক্ষীণজীবী ভীরু মানুষ' ব'লে অভিহিত করা হ'তো। এই বিশেষণবিন্যাসে শুধু যে বংশীর চরিত্র আঁকা হয়েছে তা নয়, বনোয়ারির মনোভাবও ব্যক্ত করা হ'লো।

বিশেষণের মতো, 'গল্পগুচ্ছে' উপমাও অজস্র, কিন্তু দীর্ঘ উপমা বেশি নেই। প্রথমে দু-একটি দীর্ঘ উপমাই পরীক্ষা করা যাক। বর্ণনার আলোচনায় 'সমাপ্তি'র যে-অংশটির উল্লেখ করেছি, সেখানে মৃন্ময়ীর 'পরিপুষ্ট সহাস্য দুষ্ট' মুখখানাকে উপলক্ষ ক'রে বলা হচ্ছে :

রৌদ্রোজ্জ্বল নির্মল চঞ্চল নির্ঝরিণীর দিকে অবনত হইয়া কৌতূহলী পথিক যেমন নিবিষ্ট-দৃষ্টিতে তাহার তলদেশ দেখিতে থাকে, অপূর্ব তেমনি করিয়া গভীর গম্ভীর নেত্রে মৃন্ময়ীর উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত মুখের উপর, তড়িত্তরল দুটি চক্ষুর মধ্যে চাহিয়া দেখিল…।

'পরিপুষ্ট সহাস্য দুষ্ট'-র অনুপ্রাসে, 'রৌদ্রোজ্জ্বল নির্মল চঞ্চলে'র মিলের নিক্বণে সমস্ত অংশটিতেই যেন নির্ঝরিণীর চঞ্চলতা এসেছে। উপমাটি সুন্দর, কিন্তু গতানুগতিকতা থেকে, 'সাহিত্যিকতা' থেকে মুক্ত নয়। এর চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত একটি উপমা পাওয়া যাবে 'মধ্যবর্তিনী'তে হরসুন্দরীর সদ্যরোগ-মুক্তির প্রসঙ্গে :

কিন্তু, বাতায়নতলে শয়ন করিয়া এই বাগানের দিকে চাহিয়া হরসুন্দরী প্রতিমুহূর্তে যে একটি আনন্দরস পান করিতে লাগিল তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনে এমন সে আর কখনো করে নাই। গ্রীষ্মকালে স্রোতোবেগ মন্দ হইয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্যনদীটি যখন বালুশয্যার উপরে শীর্ণ হইয়া আসে তখন সে যেমন অত্যন্ত স্বচ্ছতা লাভ করে; তখন যেমন প্রভাতের সূর্যালোক তাহার তলদেশ পর্যন্ত কম্পিত হইতে থাকে, বায়ুস্পর্শ তাহার সর্বাঙ্গ পুলকিত করিয়া তোলে, এবং আকাশের তারা তাহার স্ফটিকদর্পণের উপর সুখস্মৃতির ন্যায় অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি হরসুন্দরীর ক্ষীণ জীবনতন্তুর উপর আনন্দময়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গুলি যেন স্পর্শ করিতে

লাগিল এবং অন্তরের মধ্যে যে একটি সংগীত উঠিতে লাগিল তাহার ঠিক ভাবটি সে সম্পূর্ণ বুঝতে পারিল না।

সম্ভবত এটি 'গল্পগুচ্ছে'র দীর্ঘতম উপমা। দীর্ঘ উপমা সাধারণত শেষের দিকে ধোঁয়াটে হ'য়ে পড়ে, কিন্তু এটি যেন বর্ণিত স্রোতস্বিনীর মতোই স্বচ্ছ। রোগমুক্তির পর আমাদের দেহ শীর্ণ ও মন সূক্ষ্ম-সংবেদনশীল হয়, তাই উপমাটি একেবারে গাঁটে-গাঁটে মিলে গিয়েছে। আকাশের তারা 'সুখস্মৃতি'র মতো প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, বড়ো উপমার মধ্যে এই ছোটো উপমাটুকুতে হরসুন্দরীর স্মৃতিস্পন্দিত মনের ভিতরটাকে আমরা দেখতে পেলুম। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে গল্পের মেজাজের বিভিন্নতা অনুসারে উপমাগুলিও বিভিন্ন সুরে বাঁধা। 'মণিহারা'র অলৌকিক গা-ছমছম-করা আবহাওয়া একটি উপমার গম্ভীর রসে নিবিড় হ'য়ে উঠলো :

> আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নিচেকার পল্লবের মতো একত্র আসিয়া মিলিত হইল।

আবার 'রাজটিকা'র হাস্যরসোচ্ছল মধুরতায়

> লাবণ্যলেখা পশ্চিম প্রদেশের নব-শীতাগমসম্ভূত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের অরুণে পাণ্ডুরে পূর্ণ-পরিস্ফুট হইয়া নির্মল শরৎকালের নির্জন-নদীকূল-লালিতা অম্লানপ্রফুল্লা কাশবনশ্রীর মতো হাস্যে ও হিল্লোলে ঝলমল করিতেছিল।

প্রকট অনুপ্রাস, সন্ধি-সমাসের বাহুল্য এবং আধা-সংস্কৃত বঙ্কিমি বাংলাও ছবিটিকে আচ্ছন্ন ক'রে দিতে পারেনি।

ব্যতিক্রম নেই তা নয়, কিন্তু যে-সব ছোটো-ছোটো উপমা বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে, তার মধ্যেও দেখতে পাই উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের কোষ-তরবারির সম্বন্ধ, লক্ষ্য বস্তুর হুবহু ছাঁচে ও মাপে উপমাটি গড়া। উপমাকে খাপ বলা হয়তো ঠিক হ'লো না, কারণ উপমা কোনো অর্থেই আবরণ নয়, তার বিপরীত; কিন্তু এ-কথা বলা যেতে পারে যে খাপ জিনিশটা সুন্দর হ'তে পারে, কারুকর্মের নমুনাও হ'তে পারে, কিন্তু সুন্দর খাপের কোনো মূল্য নেই, তার ভিতরে যে-তলোয়ারটি প্রচ্ছন্ন থাকে তাতেই তার গৌরব; তেমনি উপমা স্বতন্ত্রভাবে যতই হৃদয়গ্রাহী হোক, তার পুরো মূল্য তখনই প্রকাশ পায় যখন তার ভিতর থেকে দীপ্তিময় ইঙ্গিত বেরিয়ে আসে। 'জীবিত ও মৃতে'র কাদম্বরী যখন সংবিৎ হারালো, '…সমস্ত কালো হইয়া আসিল—যেন একটি লেখা খাতার উপরে

দোয়াত সুদ্ধ কালি গড়াইয়া পড়িয়াছে।' 'সমাপ্তি'তে 'বালক রাখালের প্রতি বি. এ. পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য যুবকের সূচির মতো অতিসূক্ষ্ম অথচ সুতীক্ষ্ণ ঈর্ষার উদয় হইল।' এই রকম সুসংগত উদাহরণ আরো কয়েকটি উদ্ধার করি: 'গ্রামে বিদেশী জমিদারের নৌকো কালক্রমে যেদিন ঘাটে আসিয়া লাগে সেদিন ...মেয়েদের মুখ-রঙ্গভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্যন্ত যবনিকাপতন হয়...' ('সমাপ্তি')। 'কিরণ এই কবিতাটির পাশে আপন অন্তরতম হৃদয়-পেন্সিল দিয়া একটি উজ্জ্বল রক্তচিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে' ('অধ্যাপক')। 'হিমালয়বক্ষে শিলাতলে একান্তে দুইটি পান্থ নরনারীর রহস্যালাপকাহিনী সহসা সদ্যসম্পূর্ণ কবোষ্ণ কাব্যকথার মতো শুনিতে হয়' ('দুরাশা')। 'মাস্টারমশায়ে' টাকা-চুরির পরে হরলাল উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে কলকাতার পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সারাটা দিন কেটে গিয়ে সন্ধে হ'লো, 'রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলিল—যেন একটা সতর্ক অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র ক্রূর চক্ষু মেলিয়া শিকারলুব্ধ দানবের মতো চুপ করিয়া রহিল।' আবার 'রাসমণির ছেলে'তে কালীপদর মাতৃদত্ত নোটখানি যখন চুরি গেলো, এদিকে শৈলেন ও তার অনুচরদের কৌতুকময় দ্রুত পদশব্দ সিঁড়িতে বার-বার শোনা যেতে লাগলো, সেটা কী রকম? না, 'গ্রামে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে আর ঠিক তাহার পাশ দিয়াই কৌতুকের কলশব্দে নদী অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছে।' এখানে আগুন-লাগা গ্রামের সঙ্গে কালীপদর মনের অবস্থার এবং নদীস্রোতের সঙ্গে শৈলেন-দলের তুলনা বিশেষভাবে সংগত হয়েছে এই কারণে যে নদীর জল যেমন অনায়াসে আগুন নেবাতে পারে অথচ তা কোনো কাজেই লাগে না, তেমনি কালীপদর মনের জ্বালার উপশমের উপায় যার জানা আছে সেই শৈলেনই এখন কৌতুকের কলোচ্ছ্বাসে নির্বিকার। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে' রাইচরণ যখন প্রভুপুত্রকে 'খবরদার, জলের ধারে যেয়ো না,' ব'লে কদমফুল আনতে গেলো, তখন খোকার কাছে নিষিদ্ধ জলটাই মুহূর্তে লোভনীয় হ'য়ে উঠলো, সে নদীর দিকে তাকিয়ে দেখল, 'জল খল্‌খল্‌ ছল্‌ছল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন-এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া একলক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।'

এই সব উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে যে 'গল্পগুচ্ছে'র অধিকাংশ উপমায় শুধু বাহ্য বস্তুর প্রতিকৃতি শুধু নয়, মানসিক অবস্থার প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে,

অর্থাৎ ঘটনার তাৎপর্য বিষয়ে লেখক আমাদের এই উপায়েই সচেতন ক'রে তোলেন। এই রকম ক্ষেত্রে উপমা হ'য়ে ওঠে ভাষা—অলংকার নয়—লেখকের সঙ্গে পাঠকের সংযোগের সেতু। সহায়হীন অবস্থায় আখ্যান যেখানে পৌঁছতে পারে না, মনের সেই গহন অংশে উপমা ও বিশেষণাদি যেন প্রদীপের মতো কাজ ক'রে যাচ্ছে। ভাষার সঙ্গে কাহিনীর এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কথাসাহিত্যে আমরা পাই না; এবং 'গল্পগুচ্ছে' প্রায় সর্বত্র তা পাওয়া যায় ব'লে এই গ্রন্থের আবেদন এমন চিরায়ত।

'রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য'
(অংশ: পরিমার্জিত)

রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক

বাংলায় স্বভাবকবি কথাটা বোধহয় প্রথম উচ্চারিত হয় গোবিন্দচন্দ্র দাসকে উপলক্ষ ক'রে। কে বলেছিলেন জানি না, কিন্তু কোনো-এক বোদ্ধা ব্যক্তিই বলেছিলেন, কেননা গোবিন্দচন্দ্রকে এই আখ্যা নির্ভুল মানিয়েছিলো, তাছাড়া এতে কবিদের মধ্যে যে-শ্রেণীবিভাগের অনুক্ত উল্লেখ আছে সেটাকেও অর্থহীন বলা যায় না। 'নীরব কবি'র অস্তিত্ব উড়িয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভালো করেছিলেন, তাতে মূক-মিল্টনি কুসংস্কারের উচ্ছেদ হ'লো, কিন্তু 'স্বভাবকবি' কথাটা যে টিকে গেলো তার রীতিমতো একটা কারণ আছে। অবশ্য সাধারণ অর্থে কবিমাত্রেই স্বভাবকবি, যেহেতু কোনোরকম শিল্পরচনাই সহজাত শক্তি ছাড়া সম্ভব হয় না, কিন্তু বিশেষ অর্থে অনেকে তার ব্যতিক্রম—বা বিপরীত—যদিও সেই উল্টো লক্ষণের এ-রকম কোনো সহজ সংজ্ঞার্থ তৈরি হয়নি। এই অর্থে 'স্বভাবকবি' বলতে শুধু এটুকু বোঝায় না যে ইনি স্বভাবতই কবি—সে-কথা না-বললেও চলে; বোঝায় সেই কবিকে, যিনি একান্তই হৃদয়নির্ভর, প্রেরণায় বিশ্বাসী, অর্থাৎ যিনি যখন যেমন প্রাণ চায় লিখে যান, কিন্তু কখনোই লেখার বিষয়ে চিন্তা করেন না, যাঁর মনের সংসারে হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সতিনসম্বন্ধ। এ-কথা সত্য যে কবিতায় আবেগের তাপ না-থাকলে কিছুই থাকে না, কিন্তু সেই আবেগটিকে পাঠকের মনে পৌঁছিয়ে দিতে হ'লে তার দাস হ'লে চলে না, তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে শাসন করতে হয়। এই শাসন করার, নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি যেখানে নেই, সেখানেই এই বিশেষ অর্থে 'স্বভাবকবিত্ব' আরোপ করতে পারি। এই লক্ষণ কবিদের মধ্যে বর্তায় কখনো বা ব্যক্তিগত কারণে আর কখনো বা ঐতিহাসিক কারণে; কেউ-কেউ স্বভাবতই স্বভাবকবি, আবার কোনো-কোনো সময়ে সাহিত্যের অবস্থার ফলেই স্বভাবকবি তৈরি হ'য়ে থাকে। গোবিন্দচন্দ্র দাসকে বলা যায় স্বভাবতই স্বভাবকবি, একেবারে খাঁটি অর্থে তা-ই; কেননা, হার্দ্যরসের প্রাচুর্য সত্ত্বেও অসংযমজনিত পতনের তিনি উল্লেখ্য উদাহরণ, উপরন্তু তাঁর রচনায় এই অদ্ভুত ঘোষণা পাই যে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হ'য়েও তিনি রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বসুদ্ধু অনুভব করেননি। অথচ ঐ-কথাও নিশ্চিত বলা যায় না যে তিনি রাবীন্দ্রিক দীক্ষা পেলেই তাঁর ফাঁড়া কেটে যেতো, কেননা ঐ দীক্ষার ফলেও দুর্ঘটনা ঘটেছে,

দেখা দিয়েছেন বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্বভাবকবিরা; রবিরাজত্বের প্রথম পর্বে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে নজরুল ইসলাম পর্যন্ত, তাঁদের সংখ্যা বড়ো কম নয়।

এ-কথা বললে কি ভুল হয় যে বিশ শতকের আরম্ভকালে যাঁরা বাংলার কবিকিশোর ছিলেন, স্বভাবকবিত্ব তাঁদের পক্ষে ঐতিহাসিক ছিলো, বলতে গেলে বিধিলিপি? কেন? অবশ্য রবীন্দ্রনাথেরই জন্য। রবীন্দ্রনাথের মধ্যাহ্ন তখন, তাঁর প্রতিভা প্রখর হ'য়ে উঠছে দিনে দিনে, আর, যদিও সেই আলোকে কালো ব'লে প্রমাণ করার জন্য দেশের মধ্যে অধ্যবসায়ের অভাব ছিলো না, তবু তরুণ কবিরা অদম্য বেগে রবিচুম্বকে সংলগ্ন হয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তেমন কবি নন, যাঁকে বেশ আরামে ব'সে ভোগ করা যায়; তাঁর প্রভাব উপদ্রবের মতো, তাতে শান্তিভঙ্গ ঘটে, খেই হারিয়ে ভেসে যাবার আশঙ্কা তার পদে-পদে। তিনি যে একজন খুব বড়ো কবি তা আমরা অনেক আগেই জেনে গিয়েছি, কিন্তু যে-কথা আজও আমরা ভালো ক'রে জানি না—কিংবা বুঝি না—সে-কথা এই যে বাংলাদেশের পক্ষে বড্ড বেশি বড়ো তিনি, আমাদের মনের মাপজোকের মধ্যে কুলোয় না তাঁকে, আমাদের সহ্যশক্তির সীমা তিনি ছাড়িয়ে যান। তবু আজকের দিনে তার সম্মুখীন হবার সাহস পাওয়া যায়, কেননা ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যে আরো কিছু ঘ'টে গেছে—কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দশকে—দ্বিতীয় দশকেও—কী অবস্থা ছিলো? অপরিসর, ক্ষীণপ্রাণ বাংলা সাহিত্য—তার মধ্যে এই বহ্নিবীজ, আগ্নেয় সত্তা; এ কি সহ্য করা যায়? না;—দাশরথি রায়ের নেহাৎ চাতুরী, রামপ্রসাদের কড়াপাকের ভক্তি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ফিটফাট সাংবাদিকতা, এমন কি মধুসূদনের তূর্যধ্বনি—আগে যখন এর বেশি আর-কিছু নেই তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবে বিস্মিত, মুগ্ধ, বিচলিত, বিব্রত, ক্রুদ্ধ এবং অভিভূত হওয়া সহজ ছিলো, কিন্তু সহজ ছিলো না তাঁকে সহ্য করা, এমনকি—সেই প্রথম সংঘাতের সময়—গ্রহণ করাও সম্ভব ছিলো না। এর প্রমাণ দু-দিক থেকেই পাওয়া যায়; সমালোচনার মহলে নিন্দার অবিরাম উত্তেজনায়, আর কাব্যের ক্ষেত্রে উত্তরপুরুষের প্রতিরোধহীন আত্মবিলোপে। উপরন্তু অন্য প্রমাণও মেলে, যদি পাঠকমণ্ডলীর মতিগতি লক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথের পাঠকসংখ্যা আজ পর্যন্ত অল্প—তাঁর খ্যাতির তুলনায়, তাঁর বিচিত্র বিপুল পরিমাণের তুলনায় অল্প; আর যারা বাংলাদেশের পাঠকসাধারণ, বড়ো অর্থে পাব্লিক, তারা কিছুদিন আগে পর্যন্তও রবীন্দ্রনাথের

স্বাদ নিয়েছে—রবীন্দ্রনাথে নয়, তাঁরই দুই তরলিত, আরামদায়ক সংস্করণে: গদ্যে শরৎচন্দ্রে, আর পদ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে।

বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের প্রথম দুই দশক বড়ো সংকটের সময় গেছে। এই অধ্যায়ের কবিরা—যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, কিরণধন, এবং আরো অনেকে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যাঁদের কুলপ্রদীপ, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সে উদ্গত হ'য়ে নজরুল ইসলামের উত্থানের পরে ক্ষয়িত হলেন—তাঁদের রচনা যে এমন সমতলরকম সদৃশ, এমন আশুক্লান্ত, পাণ্ডুর, মৃদুল, কবিতে-কবিতে ভেদচিহ্ন যে এত অস্পষ্ট, একমাত্র সত্যেন্দ্র দত্ত ছাড়া কাউকেই যে আলাদা ক'রে চেনা যায় না—আর সত্যেন্দ্র দত্তও যে শেষ পর্যন্ত শুধু 'ছন্দোরাজ'ই হ'য়ে থাকলেন—এর কারণ, আমি বলতে চাই, শুধুই ব্যক্তিগত নয়, বহুলাংশে ঐতিহাসিক। এ-সব লক্ষণ থেকে সংগত মীমাংসা, এই কবিদের শক্তির দীনতা নয়, কেননা বিচ্ছিন্নভাবে ভালো কবিতা এঁরা অনেকেই লিখেছেন—সে-মীমাংসা এই যে তাঁরা সকলেই এক অনতিক্রম্য, অসহ্য দেশের অধিবাসী—কিংবা পরবাসী। অর্থাৎ তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ, এবং অসম্ভব ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। রবীন্দ্রনাথের অনতি-উত্তর তাঁরা, বড্ড বেশি কাছাকাছি ছিলেন; এ-কথা তাঁরা ভাবতে পারেননি যে গুরুদেবের কাব্যকলা মারাত্মকরূপে প্রতারক, সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না-বুঝে শুধু বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে। যাঁদের কৈশোরে যৌবনে প্রকাশিত হয়েছে 'সোনার তরী'র পর 'চিত্রা', 'চিত্রা'র পর 'কথা ও কাহিনী'; আর তার পরে 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'গীতাঞ্জলি'—সেই মায়ায় না-ম'জে কোনো উপায় ছিলো না তাঁদের;—সুর শুনে যে-ঘুম ভাঙবে সেই ঘুমই তাঁদের রমণীয় হ'লো; স্বপ্নের তৃপ্তিতে বিলীন হ'লো আত্মচেতনা; জন্ম নিলো এই মনোরম মতিভ্রম যে রিনিঠিনি ছন্দ বাজালেই রাবীন্দ্রিক স্পন্দন জাগে, আর জলের মতো তরল হ'লেই স্রোতস্বিনীর গতি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ব্রত নিলেন তাঁরা, কিন্তু তাঁকে ধ্যান করলেন না, অনুষ্ঠানের ঐকান্তিকতায় স্বরূপচিন্তার সময় পেলেন না; তাঁদের কাছে এ-কথাটি ধরা পড়লো না যে রবীন্দ্রনাথের যে-গুণে তাঁরা মুগ্ধ, সেই সরলতা প্রকৃতপক্ষেই জলধর্মী, অর্থাৎ তিনি সরল শুধু উপর-স্তরে, শুধু আপতিকরূপে, কিন্তু গভীর দেশে অনিশ্চিত ও কুটিল; স্রোতে, প্রতিস্রোতে, আবর্তে নিত্যমথিত; আরো গভীরে ঝড়ের জন্মস্থল, আর হয়তো এমনকি—খরদন্ত মকর-নক্রের দুঃস্বপ্ন নীড়। যে-আশ্রমে তাঁরা স্থিত

হলেন, সেই মহাকবির জঙ্গমতা তাঁরা লক্ষ করলেন না, যাত্রার মন্ত্র নিলেন না তাঁর কাছে, তাঁকে ঘিরেই ঘুরতে লাগলেন, তাঁরই মধ্যে নোঙর ফেলে নিশ্চিন্ত হলেন। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করতে গিয়ে তাঁরা ঠিক তা-ই করলেন যা রবীন্দ্রনাথ কোনোকালেই করেননি। এই ভুলের জন্য—ভুল বোঝার জন্য—তাঁদের লেখায় দেখা দিলো সেই ফেনিলতা, সেই অসহায়, অসংবৃত উচ্ছ্বাস, যা 'স্বভাবকবি'র কুললক্ষণ,—শৈথিল্যকে স্বতঃস্ফূর্তি ব'লে, আর তন্দ্রালুতাকে তন্ময়তা ব'লে ভুল করলেন তাঁরা ;—আর ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় হলেন এই কারণে যে রবিতাপে আত্মাহুতি দিয়ে তাঁরা পরবর্তীদের সতর্ক ক'রে গেছেন।

২

আবার বলি, এ-রকম না-হয়ে উপায় ছিলো না সে-সময়ে, অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে ছিলো না। এ-কথাটা বাড়াবাড়ির মতো শোনাতে পারে, কিন্তু রবি-প্রতিভার বিস্তার, আর তার প্রকৃতির বিষয়ে চিন্তা করলে এ-বিষয়ে প্রত্যয় জন্মে। আমাদের পরম ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি, কিন্তু এই মহাকবিকে পাবার জন্য কিছু মূল্যও দিতে হয়েছে আমাদের—দিতে হচ্ছে। সে মূল্য এই যে বাংলা ভাষায় কবিতা লেখার কাজটি তিনি অনেক বেশি কঠিন ক'রে দিয়েছেন। একজনের বেশি রবীন্দ্রনাথ সম্ভব নয় ; তাঁর পরে কবিতা লিখতে হ'লে এমন কাজ বেছে নিতে হবে যে-কাজ তিনি করেননি ; তুলনায় তা ক্ষুদ্র হ'লে—ক্ষুদ্র হবারই সম্ভাবনা—তা-ই নিয়েই তৃপ্ত থাকা চাই। আর এইখানেই উল্টো বুঝেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়। তাঁদের কাছে, রবীন্দ্রনাথের পরে, কবিতা লেখা কঠিন হওয়া দূরে থাক, সীমাহীনরূপে সহজ হ'য়ে গেলো ; ছন্দ, মিল, ভাষা, উপমা, বিচিত্ররকমের স্তবক-বিন্যাসের নমুনা—সব তৈরি আছে, আর-কিছু ভাবতে হবে না, অন্য কোনো দিকে তাকাতে হবে না, এই রকম একটা পৃষ্ঠপোষিত মোলায়েম মনোভাব নিয়ে তাঁদের কবিতা লেখার আরম্ভ এবং শেষ। রবীন্দ্রনাথ যা করেননি, তাঁদের কাছে করবারই যোগ্য ছিলো না সেটা—কিংবা তেমন কিছুর অস্তিত্বই ছিলো না ; রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন, ক'রে যাচ্ছেন, তাঁরাও ঠিক তা-ই করবেন, এত বড়োই উচ্চাশা ছিলো তাঁদের। আর এই অসম্ভবের অনুসরণে তাঁরা যে এক পা এগিয়ে তিন পা পিছনে হ'টে যাননি, তারও একটি বিশেষ কারণ রবীন্দ্রনাথেই নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথে কোনো বাধা নেই—আর এইখানেই তিনি সবচেয়ে

প্রতারক— তিনি সব সময় দু-হাত বাড়িয়ে কাছে টানেন, কখনো বলেন না 'সাবধান ! তফাৎ যাও !' পরবর্তীদের দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর মধ্যে এমন কোনো লক্ষণ নেই, যাতে ভক্তির সঙ্গে সুবুদ্ধি-জাগানো ভয়ের ভাবও জাগতে পারে। দান্তের মতো, গ্যেটের মতো, স্বর্গ-মর্ত্য-নরক-ব্যাপী বিরাট কোনো পরিকল্পনা নেই তাঁর মধ্যে, নেই শেক্সপীয়রের মতো অমর চরিত্রের চিত্রশালা, এমনকি মিল্টনের মতো বাক্যবন্ধের ব্যূহরচনাও নেই। তাঁকে পাঠ করার অভিজ্ঞতাটি একেবারেই নিষ্কণ্টক—আমাদের সঙ্গে তাঁর মিলনে যেন মৃণালসূত্রেরও ব্যবধান নেই ; কোনোখানেই তিনি দুর্গম নন, নিগূঢ় নন—অন্তত বাইরে থেকে দেখলে তা-ই মনে হয় ; একবারও তিনি অভিধান পাড়তে ছোটান না আমাদের, চিন্তার চাপে ক্লান্ত করেন না, অর্থ খুঁজতে খাটিয়ে নেন না কখনো। আর তাঁর বিষয়বস্তু—তাও বিরল নয়, দুষ্প্রাপ্য নয়, কোনো বিস্ময়কর বহুলতাও নেই তাতে ; এই বাংলাদেশের প্রকৃতির মধ্যে চোখ মেলে, দু-চোখ ভ'রে যা তিনি দেখেছেন তা-ই তিনি লিখেছেন, আবহমান-ইতিহাস লুঠ করেননি, পারাপার করেননি বৈতরণী অলকনন্দা। এইজন্য তাঁর অনুকরণ যেমন দুঃসাধ্য, তার প্রলোভনও তেমনি দুর্দম। 'মনে হচ্ছে আমিও অমন লিখতে পারি ঝুড়ি-ঝুড়ি', এই সর্বনাশী ধারণাটিকে সব দিক থেকেই প্রশ্রয় দেয় তাঁর রচনা, যাতে আপাতদৃষ্টিতে পাণ্ডিত্যের কোনো প্রয়োজন নেই, যেন কোনো প্রস্তুতিরও নয়—এতই সহজে তা ব'য়ে চলে, হ'য়ে যায়—মনে হয় যেন 'ও-রকম' লেখা ইচ্ছে করলেই লেখা যেতে পারে—একটুখানি 'ভাব' আসার শুধু অপেক্ষা। অন্তত পক্ষে আলোচ্য কবিরা এই মোহেই মজেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের 'মতো' হ'তে গিয়ে রবীন্দ্রনাথেই হারিয়ে গেলেন তাঁরা—কি বড়ো জোর তাঁর ছেলেমানুষি সংস্করণ লিখলেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিজেই নিজেকে ব্যক্ত করে, অন্য কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না ; এই নির্ভারতা, এই স্বচ্ছতার জন্য, পরবর্তীর পক্ষে বিপজ্জনক উদাহরণ তিনি। যেহেতু তাঁর লেখায় পাঠকের কোনো পরিশ্রম নেই, তাই এমন ভুলও হ'তে পারে যে চোখ ফেললেই সবটুকু তাঁর দেখে নেয়া যায় ; যেহেতু তাঁর বিষয়ের মধ্যে দৃশ্যমান ব্যাপ্তি নেই, তাই এমনও ভুল হ'তে পারে যে ক্ষুদ্রতর কবিদের পক্ষে তাঁর পথই প্রশস্ত। 'আমরা যাকে বলি ছেলেমানুষি, কাব্যের বিষয় হিসাবে সেটা অতি উত্তম, রচনার রীতি হিসাবেই সেটা উপেক্ষার যোগ্য'—রবীন্দ্রনাথের এই বাক্যটিতে তাঁর নিজের এবং অন্য কবিদের

বিষয়ে অনেক কথাই বলা আছে। কথাটা তিনি বলেছিলেন, 'রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তাঁর 'মানসী'-পূর্ব কবিতাবলিকে লক্ষ ক'রে, যে-সব কবিতার দুষ্টতা তিনি দেখেছিলেন, উপাদানের অভাবে নয়, রূপায়ণের অসম্পূর্ণতায়। উপাদান বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখলে তাঁর পরিণত কালের অনেক কবিতাই 'সন্ধ্যাসংগীত'-'প্রভাতসংগীতে'র সধর্মী, এমনকি সমগ্রভাবে তাঁর কাব্যই তা-ই; তাঁর কাব্যের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে এই 'ছেলেমানুষি', যাকে তিনি বিষয় হিশেবে 'অতি উত্তম' আখ্যা দিয়েছেন। এই 'ছেলেমানুষি'র মানে হ'লো, তাঁর কবিতা বাইরে থেকে সংগ্রহ করা নানা রকম পদার্থের সন্নিপাত নয়, ভিতর থেকে আপনি হ'য়ে-ওঠা, যেন ঠিক মনের কথাটির অবারিত উচ্চারণ। চারদিকের প্রত্যক্ষ এই পৃথিবী দিনে-দিনে যেমন ক'রে দেখা দিয়েছে তাঁর চোখের সামনে, নাড়া দিয়েছে তাঁর মনের মধ্যে, তা-ই তিনি অফুরন্ত বার বলেছেন; প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের সাড়া, মুহূর্তের বৃন্তের উপর ফুটে-ওঠা পলাতক এক-একটি রঙিন বেদনা— তাই ধ'রে রেখেছেন তাঁর কবিতায়, আর কবিতার চেয়েও বেশি তাঁর গানে। এইজন্য তাঁর কবিতা এমন দেহহীন, বিশ্লেষণবিমুখ; তার 'সারাংশ' বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তাকে দেখানো যায় না ভাঁজে-ভাঁজে খুলে; যেটা কবিতা, আর যেটা পাঠকের মনে তার অভিজ্ঞতা, ও-দুয়ে কোনো তফাৎই তাতে নেই যেন; তা আমাদের মনের উপর যা কাজ করবার ক'রে যায়, কিন্তু কেমন ক'রে তা করে আমরা ভেবে পাই না, সমালোচনার কলকব্জা দিয়েও ধরতে পারি না সেই রহস্যটুকু;— শেষ পর্যন্ত হার মেনে বলতে হয় তা যে হ'তে পেরেছে তা-ই যথেষ্ট, তা ভালো হয়েছে তার অস্তিত্বেরই জন্য— আর কোনোই কারণ নেই তার।

এই রকম কবিতা জীবনের পক্ষে সম্পদ, কিন্তু তার আদর্শ অনবরত চোখের সামনে থাকলে অন্য কবিরা বিপদে পড়েন। বিপদটা কোথায় তা বুঝিয়ে বলি। সব মানুষেরই অনুভূতি আছে, ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আছে; যখন দেখা যায় যে তারই প্রকাশ আশ্চর্যভাবে কবিতা হ'য়ে উঠছে আর সেই প্রকাশটাও 'নিতান্তই সোজাসুজি', তার পিছনে কোনো আয়োজন আছে ব'লে মনেই হয় না, তখন যে-কোনো রকম অনুভূতির কাছেই আত্মসমর্পণের লোভ জাগে অন্য কবিদের, কিংবা— খাঁটি বস্তুটির অভাবে— নিজেরাই তাঁরা নিজের মনকে উশকে তোলেন। আর তার ফল কী-রকম দাঁড়ায় তারই শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ পাই— সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে। অনেকের মধ্যে তাঁকে বেছে নিলুম সুস্পষ্ট কারণে;

সমসাময়িক, কাছাকাছি বয়সের কবিদের মধ্যে রচনাশক্তিতে শ্রেষ্ঠ তিনি, সর্বতোভাবে যুগপ্রতিভূ, এবং রবীন্দ্রনাথের পাশে রেখে দেখলেও তাঁকে চেনা যায়। হ্যাঁ, চেনা যায়, আলাদা একটা চেহারা ধরা পড়ে, কিন্তু সেই চেহারাটা কী-রকম তা ভাবলেই আমরা বুঝতে পারবো কেন, রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকলে, আজকের দিনে সত্যেন্দ্রনাথের আর প্রয়োজন হয় না। তফাৎটা জাতের নয় তা বলাই বাহুল্য; একই আন্দোলনের অন্তর্গত জ্যেষ্ঠ এবং অনুজ কবির ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যও নয় এটা; আবার বড়ো কবি ছোটো কবির তফাৎ বলতে ঠিক যা বোঝায় তাও একে বলা যায় না। ইনি ছোটো কবি না বড়ো কবি, কিংবা কত বড়ো কবি—সমালোচনার কোনো-এক প্রসঙ্গে এ-সব প্রশ্ন অবান্তর; ইনি খাঁটি কবি কিনা সেইটেই হ'লো আসল কথা। সত্যেন্দ্রনাথে এই খাঁটিত্বটাই পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের বিরাট মহাজনি কারবারের পর খুচরো দোকানদার হওয়াতে লজ্জার কিছু নেই—সেটাকে প্রায় অনিবার্য বলা যায়, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মালপত্রও আপাতদৃষ্টিতে এক ব'লে বাংলা কাব্যে তাঁর আসন এমন সংশয়াচ্ছন্ন। তিনি ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথেরই সাজ-সরঞ্জাম—সেই ঋতুরঙ্গ, পল্লীচিত্র, দেশপ্রেম; কিন্তু ফুল, পাখি, চাঁদ, মেঘ, শিশির, এই রকম প্রত্যেকটি শব্দের বা বস্তুর পিছনে রবীন্দ্রনাথে যে-আবেগের চাপ পাই, যে-বিশ্বাসের উত্তাপ, যার জন্য 'যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে'র শততম পুনরুক্তিও আমাদের মনে নতুন ক'রে জাগিয়ে তোলে স্বর্গের জন্য বিরহবেদনা, সেই প্রাণবন্ত প্রবলতার স্পর্শমাত্র সত্যেন্দ্রনাথে পাই না, তাঁর কবিতা প'ড়ে অনেক সময়ই আমাদের সন্দেহ হয় যে তাঁর 'অনুভূতি'টাই কৃত্রিম, কবিতা লেখারই জন্য ফেনিয়ে তোলা। যে-স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথে দিব্যদৃষ্টি, কিংবা স্বপ্ন মানেই স্বপ্নভঙ্গ, সত্যেন্দ্রনাথে তা পর্যবসিত হ'লো দিবাস্বপ্নে; যে-ফুল ছিলো বিশ্বসত্তার প্রতীক, তা হ'য়ে উঠলো শৌখিন খেলনা, ভাবুকতা হ'লো ভাবালুতা, সাধনা হ'লো ব্যসন, আর মানসসুন্দরীর পরিণাম হ'লো লাল পরি নীল পরির আমোদ-প্রমোদে। সেই সঙ্গে রীতির দিক থেকেও ভাঙন ধরলো; রবীন্দ্রনাথের ছন্দের যে-মধুরতা, যে-মদিরতা, তার অন্তর্লীন শিক্ষা, সংযম, রুচি, সমস্ত উড়িয়ে দিয়ে যে-ধরনের লেখার প্রবর্তন হ'লো তাতে থাকলো শুধু মিহি সুর ঠুনকো আওয়াজ, আর এমন একরকম চঞ্চল কিংবা চটপটে তাল, যা কবিতার অ-পেশাদার পাঠকের কানেও তক্ষুনি গিয়ে পৌঁছয়। এইজন্যই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সময়ে এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন; রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে তিনি ঠিক সেই পরিমাণে ভেজাল ক'রে

নিয়েছিলেন, যাতে তা সর্বসাধারণের উপভোগ্য হ'তে পারে। তখনকার সাধারণ পাঠক রবীন্দ্রনাথে যা পেয়েছিলো, বা রবীন্দ্রনাথকে যেমন ক'রে চেয়েছিলো, তারই প্রতিমূর্তি সত্যেন্দ্রনাথ। শুধু কর্ণসংযোগ ছাড়া আর-কিছুই তিনি দাবি করলেন না পাঠকের কাছে; তাই তাঁর হাতে কবিতা হ'য়ে উঠলো লেখা-লেখা খেলা বা ছন্দোঘটিত ব্যায়াম। খেলা জিনিশটা সাহিত্যরচনায় অনুমোদনযোগ্য, যতক্ষণ তার পিছনে কোনো উদ্দেশ্য থাকে; সেটি না থাকলে তা নেহাৎই ছেলেখেলা হ'য়ে পড়ে।* আর এই উদ্দেশ্যহীন কসরৎ, শুধু ছন্দের জন্যই ছন্দ লেখা, এই প্রকরণগত ছেলেমানুষি, কোনো-এক সময়ে ব্যাপক হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো বাংলা কাব্যে; সত্যেন্দ্রনাথের খ্যাতির চরমে, যখন, এমনকি, তাঁর প্রভাব রবীন্দ্রনাথকেও ছাপিয়ে উঠেছিলো, সেই সময়ে যে-সব ভূরিপরিমাণ নির্দোষ, সুশ্রাব্য এবং অন্তঃসারশূন্য রচনা 'কবিতা' নাম ধ'রে বাংলা ভাষার মাসিকপত্রে বোঝাই হ'য়ে উঠেছিলো, কালের করুণাময় সম্মার্জনী ইতিমধ্যেই তাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথের, তারপর তাঁর শিষ্যদের হাতে সাত দফা পরিস্রুত হ'তে-হ'তে শেষ পর্যন্ত যখন ঝুমঝুমি কিংবা লজঞ্চুষের মতো পদ্যরচনায়

* এই উদ্দেশ্য মানে সুস্পষ্ট কোনো বিষয় নাও হ'তে পারে, অনেক সময় শুধু একটি অনুভূতি থেকেই লক্ষ্য পায় রচনা, পায় সার্থকতার পক্ষে প্রয়োজনীয় সংহতি। উদাহরণত তুলনা করা যাক সত্যেন্দ্রনাথের 'তুলতুল টুকটুক | টুকটুক তুলতুল | কোন ফুল তার তুল | তার তুল কোন ফুল | টুকটুক রঙ্গন | কিংশুক ফুল্ল | নয় নয় নিশ্চয় | নয় তার তুল্য', আর রবীন্দ্রনাথের 'ওগো বধূ সুন্দরী, | তুমি মধুমঞ্জরী, | পুলকিত চম্পার লহো অভিনন্দন | পর্ণের পাত্রে | ফাল্গুনরাত্রে | মুকুলিত মল্লিকা-মাল্যের বন্ধন।' এ-দুটি একই ছন্দে লেখা, প্রায় একই রকম খেলাচ্ছলে রচিত, আর কোনোটিতেই স্পর্শসহ কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু কেন যে দ্বিতীয়টি ছন্দের আদর্শ হিশেবেও অতুলনীয়রূপে বেশি ভালো হয়েছে তার কারণ শুধু অনুপ্রাস আর যুক্তবর্ণের বিতরণ দিয়েই বোঝানো যাবে না, তার কাব্যগুণের কথাটাই এখানে আসল। প্রথম উদাহরণটি অনুভব ক'রে লেখা হয়নি, নেহাৎই যান্ত্রিকভাবে বানানো হয়েছে, তাই ওর ছন্দটাও এমন কাঁচা, এমন বালকোচিত। 'ওগো বধূ সুন্দরী'তে প্রাণের যে-স্পর্শটুকু আছে, যার জন্য ওটি কবিতা হ'তে পেরেছে, তার ছন্দনৈপুণ্যের মূল কারণটা সেখানেই খুঁজতে হবে। কথাটা এই যে ভালো কবি না-হ'লে ভালো ছন্দও লেখা যায় না; যিনি যত বড়ো কবি কলাকৌশলেও তত বড়োই অধিকার তাঁর; আর যিনি শুধু ছন্দ লেখেন, আর সেইজন্য 'ছন্দোরাজ' আখ্যা পেয়ে থাকেন, তাঁর কাছে— শেষ পর্যন্ত— ছন্দ বিষয়েও শেখবার কিছু থাকে না।

পতিত হ'লো, তখনই বোঝা গেলো যে ওদিকে আর পথ নেই—এবার ফিরতে হবে।

৩

সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়ের নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু ঐতিহাসিক অবস্থাটি দেখাতে চাচ্ছি। তাঁদের সপক্ষে যা-কিছু বলবার আছে তা আমি জানি; প্রবন্ধের প্রথম অংশে পরোক্ষভাবে তা বলাও হয়েছে, সময়টা প্রতিকূল ছিলো তাঁদের, বড্ড বেশি অনুকূল ব'লেই প্রতিকূল ছিলো; রবিরশ্মিকে প্রতিফলিত করা—এছাড়া আর কবিকর্মের ধারণাই তখন ছিলো না। গদ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অনতিপরেই দু-জন রবিভক্ত অথচ মৌলিক লেখকের সাক্ষাৎ পাই আমরা—প্রমথ চৌধুরী আর অবনীন্দ্রনাথ; কিন্তু কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উত্থান এমনই সর্বগ্রাসী হয়েছিলো যে তার বিস্ময়জনিত মুগ্ধতা কাটিয়ে উঠতেই দু-তিন দশক কেটে গেলো বাংলাদেশের। এই মাঝখানকার সময়টাই সত্যেন্দ্র-গোষ্ঠীর সময়; রবীন্দ্রনাথের প্রথম, এবং প্রচণ্ড ধাক্কাটা তাঁরা সামলে নিলেন—অর্থাৎ পরবর্তীদের সামলে নিতে সাহায্য করলেন; তাঁদের কাছে গভীরভাবে ঋণী আমরা। এই শেষের কথাটা শুধু বিচার ক'রে বলছি না, এ-বিষয়ে কথা বলার অভিজ্ঞতাপ্রসূত অধিকার আছে আমার। কৈশোরকালে আমিও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন, যা থেকে বেরোবার ইচ্ছেটাকেও অন্যায় মনে হ'তো—যেন রাজদ্রোহের শামিল; আর সত্যেন্দ্রনাথের তন্দ্রাভরা নেশা, তাঁর বেলোয়ারি আওয়াজের আকর্ষণ—তাও আমি জেনেছি। আর এই নিয়েই বছরের পর বছর কেটে গেলো বাংলা কবিতার; আর অন্য কিছু চাইলো না কেউ, অন্য কিছু সম্ভব ব'লেও ভাবতে পারলো না—যতদিন না 'বিদ্রোহী' কবিতার নিশেন উড়িয়ে হৈ-হৈ ক'রে নজরুল ইসলাম* এসে পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো।

---

* অবশ্য একটি বিরুদ্ধ ভাবও দেশের মধ্যে একই সময়ে সক্রিয় ছিলো, কিন্তু তার সমস্তটাই সমালোচনার ক্ষেত্রে, আর সেই সমালোচনাও বুদ্ধিমান নয়, শুধু ছিদ্রান্বেষী। যেটা সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিলো, সেটা রবীন্দ্রনাথের 'বিরুদ্ধে' যাওয়া নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত রূপ চিনিয়ে দেয়া। এইখানে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বা বিপিনচন্দ্র পাল কোনো সাহায্য করেননি ব'লেই বাংলা কবিতার ভাঙা-গড়ায় তাঁরা একটুও আঁচড় কাটতে পারলেন না।

নজরুল ইসলামকেও ঐতিহাসিক অর্থে স্বভাবকবি বলেছি, সে-কথা নির্ভুল। পূর্বোক্ত প্রকরণগত ছেলেমানুষি তাঁর লেখার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে; রবীন্দ্রনাথের আক্ষরিক প্রতিধ্বনি তাঁর 'বলাকা' ছন্দের প্রেমের কবিতায় যেমনভাবে পাওয়া যায়, তেমন কখনো সত্যেন্দ্রনাথে দেখি না; আর সত্যেন্দ্রনাথেরও নিদর্শন তাঁর রচনার মধ্যে প্রচুর। নজরুলের কবিতাও অসংযত, অসংবৃত, প্রগল্‌ভ; তাতে পরিণতির দিকে প্রবণতা নেই; আগাগোড়াই তিনি প্রতিভাবান বালকের মতো লিখে গেছেন, তাঁর নিজের মধ্যে কোনো বদল ঘটেনি কখনো, তাঁর কুড়ি বছর আর চল্লিশ বছরের লেখায় কোনোরকম প্রভেদ বোঝা যায় না। নজরুলের দোষগুলি সুস্পষ্ট, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমস্ত দোষ ছাপিয়ে ওঠে; সব সত্ত্বেও এ-কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি। সত্যেন্দ্রনাথ, শিল্পিতার দিক থেকে, অন্তত তাঁর সমকক্ষ, সত্যেন্দ্রনাথে বৈচিত্র্যও কিছু বেশি; কিন্তু এ-দু'জন কবিতে পার্থক্য এই যে সত্যেন্দ্রনাথকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথেরই সংলগ্ন, কিংবা অন্তর্গত, আর নজরুল ইসলামকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের পরে অন্য একজন কবি—ক্ষুদ্রতর নিশ্চয়ই, কিন্তু নতুন। এই যে নজরুল, রবিতাপের চরম সময়ে রাবীন্দ্রিক বন্ধন ছিঁড়ে বেরোলেন, বলতে গেলে অসাধ্যসাধন করলেন, এটাও খুব সহজেই ঘটেছিলো, এর পিছনে সাধনার কোনো ইতিহাস নেই, কতগুলো আকস্মিক কারণেই সম্ভব হয়েছিলো এটা। কবিতায় যে-আদর্শ নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, নজরুলও তা-ই, কিন্তু নজরুল বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের পটভূমিকার ভিন্নতায়। মুসলমান তিনি, সেই সঙ্গে হিন্দু মানসও আপন ক'রে নিয়েছিলেন—চেষ্টার দ্বারা নয়, স্বভাবতই। তার বাল্য-কৈশোর কেটেছে—শহরে নয়, মফস্বলে; স্কুল-কলেজে 'ভদ্রলোক' হবার চেষ্টায় নয়, যাত্রাগান লেটো গানের আসরে; বাড়ি থেকে পালিয়ে রুটির দোকানে, তারপর সৈনিক হ'য়ে। এই যেগুলো সামাজিক দিক থেকে তাঁর অসুবিধে ছিলো, এগুলোই সুবিধে হ'য়ে উঠলো যখন তিনি কবিতা লেখায় হাত দিলেন। যেহেতু তাঁর পরিবেশ ছিলো ভিন্ন, এবং একটু বন্য ধরনের, আর যেহেতু সেই পরিবেশ তাঁকে পীড়িত না-ক'রে উল্টে আরো সবল করেছিলো তাঁর সহজাত বৃত্তিগুলোকে, সেইজন্য, কোনোরকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি না-নিয়েও শুধু আপন স্বভাবের জোরেই রবীন্দ্রনাথের মুঠো থেকে পালাতে পারলেন তিনি, বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত আনতে পারলেন।

তাঁর কবিতায় যে-পরিমাণ উত্তেজনা ছিলো সে-পরিমাণ পুষ্টি যদিও ছিলো না, তবু অন্তত নতুনের আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগিয়েছিলেন ; তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব যদিও বেশি স্থায়ী হ'লো না, কিংবা তেমন কাজেও লাগলো না, তবু অন্তত এটুকু তিনি দেখিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্য পথ বাংলা কবিতায় সম্ভব। যে-আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগালেন, তার তৃপ্তির জন্য চাঞ্চল্য জেগে উঠলো নানা দিকে, এলেন 'স্বপনপসারী'র সত্যেন্দ্র দত্তীয় মৌতাত কাটিয়ে, পেশীগত শক্তি নিয়ে মোহিতলাল, এলো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অগভীর—কিন্তু তখনকার মতো ব্যবহারযোগ্য—বিধর্মিতা, আর এই সব পরীক্ষার পরেই দেখা দিলো 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টা, বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজলো।

৪

নজরুল ইসলাম নিজে জানেননি যে, তিনি নতুন যুগ এগিয়ে আনছেন ; তাঁর রচনায় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই। যদি তিনি ভাগ্যগুণে গীতকার এবং সুরকার না-হতেন, এবং যদি পারস্য গজলের অভিনবত্বে তাঁর অবলম্বন না-থাকতো, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথেরই আদর্শ মেনে নিয়ে তৃপ্ত থাকতেন তিনি। কিন্তু যে-অতৃপ্তি তাঁর নিজের মনে ছিলো না, সেটা তিনি সংক্রামিত ক'রে দিলেন অন্যদের মনে ; যে-প্রক্রিয়া অচেতনভাবে তাঁর মধ্যে শুরু হ'লো, তা সচেতন স্তরে উঠে আসতে দেরি হ'লো না। যাকে 'কল্লোল'-যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে-বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অভাব-বোধ জেগে উঠলো—বন্ধ্যা প্রাচীনের সমালোচনার ক্ষেত্রে নয়, অর্বাচীনের সৃষ্টির ক্ষেত্রেই। মনে হ'লো তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হ'লো তাঁর জীবনদর্শনে মানুষের অনস্বীকার্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা ক'রে গেছেন। এই বিদ্রোহে আতিশয্য ছিলো সন্দেহ নেই, কিছু আবিলতাও ছিলো, কিন্তু এর মধ্যে সত্য যেটুকু ছিলো তা উত্তরকালের অঙ্গীকরণের দ্বারা প্রমাণ হ'য়ে গেছে। এর মূল কথাটা আর-কিছু নয়—সুখস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার প্রয়াস, রবীন্দ্রনাথকে সহ্য করার, প্রতিরোধ করার পরিশ্রম। প্রয়োজন ছিলো এই বিদ্রোহের—বাংলা কবিতার মুক্তির জন্য নিশ্চয়ই, রবীন্দ্রনাথকেও

সত্য ক'রে পাবার জন্য। লক্ষ করতে হবে, এই আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন সেই সব তরুণ লেখক, যাঁরা সবচেয়ে বেশি রবীন্দ্রনাথে আপ্লুত; অন্তত একজন যুবকের কথা আমি জানি, যে রাত্রে বিছানায় শুয়ে পাগলের মতো 'পূরবী' আওড়াতো, আর দিনের বেলায় মন্তব্য লিখতো রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ ক'রে। অত্যধিক মধুপানজনিত অগ্নিমান্দ্য ব'লে উড়িয়ে দেয়া যাবে না এটাকে, কেননা, চিকিৎসাও এরই মধ্যে নিহিত ছিলো, ছিলো ভারসাম্যের আকাঙ্ক্ষা আর আত্মপ্রকাশের পথের সন্ধান। 'নিজের কথাটা নিজের মতো ক'রে বলবো'—এই ইচ্ছেটা প্রবল হ'য়ে উঠেছিলো সেদিন, আর তার জন্যই তখনকার মতো রবীন্দ্রনাথকে দূরে রাখতে হ'লো। ফজলি আম ফুরোলে ফজলিতর আম চাইবো না, আতাফলের ফরমাশ দেবো—'শেষের কবিতা'র এই ঠাট্টাকেই তখনকার পক্ষে সত্য ব'লে ধরা যায়।* অর্থাৎ, রবীন্দ্রতর হ'তে গেলে যে রবীন্দ্রনাথের ভগ্নাংশ মাত্র হ'তে হয়, এই কথাটা ধরা পড়লো এতদিনে;—'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লক্ষ্য হ'য়ে উঠলো—রবীন্দ্রেতর হওয়া।

অবশ্য এইভাবে কথাটা বললে ব্যাপারটাকে যেন যান্ত্রিক ক'রে দেখানো হয়, খানিকটা জেদের ভাব ধরা পড়ে। জেদ একেবারেই ছিলো না তা নয়, স্রোতের টানে জঞ্জালও কিছু ভেসে এসেছিলো, কিন্তু এই বিদ্রোহের স্বচ্ছ রূপটি ফুটে উঠলো, যখন, 'কল্লোলে'র ফেনা কেটে যাবার পরে, চিন্তায় স্থিতি-

* এর আগের লাইনেই অমিত রায় বলছে, 'এ কথা বলবো না যে পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলবো অন্য কিছু চাই।' এটা একেবারেই খাঁটি কথা। কবিতার সঙ্গে কবিতার তুলনা করলে ভালো আর আরো-ভালোর তফাৎটা তেমন জরুরি নয়, সমগ্রভাবে কবির সঙ্গে কবির তুলনাই এই তারতম্যের প্রয়োগের ক্ষেত্র। অর্থাৎ অন্যান্য বাঙালি কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যদিও অপরিমেয় ব্যবধান, তবু যে-কোনো ক্ষুদ্র কবির কোনো একটি ভালো কবিতা রবীন্দ্রনাথেরই 'সমান' ভালো হ'তে পারে, যদি তাতে বৈশিষ্ট্য থাকে, থাকে চরিত্রের পরিচয়। আর এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে ফজলি আম ফুরোবার পর চালান-দেয়া মান্দ্রাজি আম অথবা আম্রগন্ধী পিরাপের চাইতে ঢের ভালো ঋতুপন্থী, প্রকৃতিজাত আতাফল, যেমন ভালো, মধুসূদনের পরে, 'বৃত্রসংহারে'র চইতে 'সন্ধ্যাসংগীত'। 'শেষের কবিতা'য় অমিত রায়ের সাহিত্যিক বক্তৃতাটিতে 'কল্লোল'কালীন আন্দোলনেরই একটি বিবরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ— যদিও পরিহাসের ছলে, আর অবশ্য সাহিত্যের ইতিহাসের একটি সাধারণ নিয়মও লিপিবদ্ধ করেছেন। নিবারণ চক্রবর্তীর ওকালতি ভালোই হয়েছিলো, কিন্তু বক্তৃতার পর কবিতাটি যথেষ্ট পরিমাণে অ-রাবীন্দ্রিক হ'লো না ব'লেই তার মামলা ফেঁশে গেলো শেষ পর্যন্ত।

লাভের চেষ্টা দেখা দিলো সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়ে' আর 'কবিতা' পত্রিকায় নবীনতর কবিদের স্বাক্ষর পড়লো একে-একে। সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা হাওয়ার ধোঁয়া কাটাতে সাহায্য করলো; এদিকে, নজরুলের চড়া গলার পরে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের হার্দ্য গুণের পরে, বাংলা কবিতায় দেখা দিলো সংহতি, বুদ্ধি-ঘটিত ঘনতা, বিষয় এবং শব্দচয়নে ব্রাত্যধর্ম, গদ্য-পদ্যের মিলনসাধনের সংকেত। বলা বাহুল্য, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইরকম পরিবর্তন কালপ্রভাবেই ঘ'টে থাকে, কিন্তু তার ব্যবহারগত সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন কবির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যেরই প্রয়োজন হয়। আর বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে, প্রধানতম সমস্যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য প্রচুর—কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দুস্তর; দৃশ্যগন্ধস্পর্শময় জীবনানন্দ আর মননপ্রধান অবক্ষয়চেতন সুধীন্দ্রনাথ দুই বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন, আবার এ-দু'জনের কারো সঙ্গেই অমিয় চক্রবর্তীর একটুও মিল নেই। তবু যে এই কবিরা সকলে মিলে একই আন্দোলনের অন্তর্ভূত, তার কারণ এঁরা নানা দিক থেকে নতুনের স্বাদ এনেছেন; এঁদের মধ্যে সামান্য লক্ষণ এই একটি ধরা পড়ে যে এঁরা পূর্বপুরুষের বিত্ত শুধু ভোগ না-ক'রে, তাকে সাধ্যমতো সুদে বাড়াতেও সচেষ্ট হয়েছেন, এঁদের লেখায় যে-রকমেরই যা-কিছু পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথে ঠিক সে-জিনিশটি পাই না। কেমন ক'রে রবীন্দ্রনাথকে এড়াতে পারবো—অবচেতন, কখনো বা চেতন মনেই এই চিন্তা কাজ ক'রে গেছে এঁদের মনে; কোনো কবি, জীবনানন্দর মতো, রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে স'রে গেলেন, আবার কেউ-কেউ তাঁকে আত্মস্থ ক'রেই শক্তি পেলেন তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবার। এই সংগ্রামে—সংগ্রামই বলা যায় এটাকে—এঁরা রসদ পেয়েছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে, পেয়েছিলেন উপকরণরূপে আধুনিক জীবনের সংশয়, ক্লান্তি, বিতৃষ্ণা। এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধসূত্র অনুধাবন করলে ঔৎসুক্যকর ফল পাওয়া যাবে; দেখা যাবে, বিষ্ণু দে ব্যঙ্গানুকৃতির তির্যক উপায়েই সহ্য ক'রে নিলেন রবীন্দ্রনাথকে; দেখা যাবে সুধীন্দ্রনাথ, তাঁর জীবন-ভুক্ পিশাচ-প্রমথর বর্ণনায়, রাবীন্দ্রিক বাক্যবিন্যাস প্রকাশ্যভাবেই চালিয়ে দিলেন, আবার অমিয় চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথেরই জগতের অধিবাসী হ'য়েও, তার মধ্যে বিস্ময় আনলেন প্রকরণগত বৈচিত্র্যে, আর কাব্যের মধ্যে নানারকম গদ্য বিষয়ের আমদানি ক'রে। অর্থাৎ, এঁরা রবীন্দ্রনাথের মোহন রূপে ভুলে থাকলেন না, তাঁকে কাজে লাগাতে শিখলেন,

সার্থক করলেন তাঁর প্রভাব বাংলা কবিতার পরবর্তী ধারায়। 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল'-এর বদলে 'গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো', আর 'কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা'র বদলে 'কলসি কাঁখে চলছি মৃদু তালে'— এইরকম আক্ষরিক অনুকরণেরই উপায়ে একটি উৎকৃষ্ট এবং মৌলিক কবিতা লেখা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো এঁদের উদাহরণ সামনে ছিলো ব'লেই; দশ বছর আগে এ-রকমটি হ'তেই পারতো না। সত্যেন্দ্র-গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি করতেন নিজেরা তা না জেনে—সেইটেই মারাত্মক হয়েছিলো তাঁদের পক্ষে; আর এই কবিরা সম্পূর্ণরূপে জানেন রবীন্দ্রনাথের কাছে কত ঋণী এঁরা, আর সে-কথা পাঠককে জানতে দিতেও সংকোচ করেন না, কখনো-কখনো আস্ত-আস্ত লাইন তুলে দেন আপন পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে। এই নিষ্কুণ্ঠতা, এই জোরালো সাহস—এটাই এঁদের আত্মবিশ্বাসের, স্বাবলম্বিতার প্রমাণ। ভাবীকালে এঁদের রচনা যে-রকমভাবেই কীটদষ্ট হোক না, এঁরা ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় হবেন অন্তত এই কারণে যে বাংলা কবিতার একটি সংকটের সময়ে এঁরা এই মৌল সত্যের পুনরুদ্ধার করেছিলেন যে সত্য-শিব-সুন্দরকে গুরুর হাত থেকে তৈরি অবস্থায় পাওয়া যায় না, তাকে জীবন দিয়ে সন্ধান করতে হয়, এবং কাব্যকলাও উত্তরাধিকারসূত্রে লভ্য নয়, আপন শ্রমে উপার্জনীয়।

নজরুল ইসলাম থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী অবকাশ—এই কুড়ি বছরে বাংলা কবিতার রবীন্দ্রাশ্রিত নাবালক দশার অবসান হ'লো। এর পরে যাঁরা এসেছেন এবং আরো পরে যাঁরা আসবেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে আর-কোনো ভয় থাকলো না তাঁদের, সে-ফাঁড়া পূর্বোক্ত কবিরা কাটিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য অন্যান্য দুটো-একটা বিপদ ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে; যেমন জীবনানন্দর পাক, কিংবা বিষ্ণু দে-র বা অন্য কারো-কারো আবর্ত, যা থেকে চেষ্টা ক'রেও বেরোতে পারছেন না আজকের দিনের নবাগতরা। এতে অবাক হবার বা মন-খারাপ করার কিছু নেই; এই রকমই হ'য়ে এসেছে চিরকাল; পুনরাবৃত্তির অভ্যাসের চাপেই পুরোনোর খোশা ফেটে যায়, ভিতর থেকে নতুন বীজ ছড়িয়ে পড়ে। নতুন যাঁরা কবিতা লিখছেন আজকাল, তাঁরা অনেকেই দেখছি প্রথম থেকেই টেকনীক নিয়ে বড্ড বেশি ব্যস্ত;—সেটা কোথা থেকে এসেছে, তা আমি জানি, যথাসময়ে তার সমর্থনও করেছি, কিন্তু এখন সেটাকে দুর্লক্ষণ ব'লে মনে না-ক'রে পারি না। 'চোরাবালি' কিংবা

'খসড়া' লেখার সময় যে-সব কৌশল ছিলো প্রয়োজনীয়, আজকের দিনে অনেকটাই তার মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে; আর তাছাড়া যখন ভঙ্গি নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তা দেখা যায়—যেমন চলতিকালের ইংরেজ-মার্কিন কাব্যে—তখনই বুঝতে হয় মনের দিক থেকে দেউলে হ'তে দেরি নেই। আমি এ-কথা ব'লে কলাসিদ্ধির প্রাধান্য কমাতে চাচ্ছি না, কিন্তু কলাকৌশলকে পুরো পাওনা মিটিয়ে দেবার পরেও এই কথাটি বলতে বাকি থাকে যে কবিতা লেখা হয়—স্বরব্যঞ্জনের চাতুরী দেখাতে নয়, কিছু বলবারই জন্য, আর সেই বক্তব্য যেখানে যত বড়ো, যত স্বচ্ছন্দ তার প্রকাশ, প্রকরণগত কৃতিত্বও সেখানেই তত বেশি পাওয়া যায়। মনে হয় এখন বাংলা কবিতায় নতুন ক'রে স্বাচ্ছন্দ্য-সাধনার সময় এসেছে, প্রয়োজন হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তিকে ফিরে পাবার। আর এইখানে রবীন্দ্রনাথ সহায় হ'তে পারেন, এ-কথাটি বলতে গিয়েও থেমে গেলুম, যেহেতু আদি উৎস বিষয়ে কোনো পরামর্শ নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথাটা আজকের দিনে যে আর না-তুললেও চলে, সেটাই বাংলা কবিতার পরিণতির চিহ্ন, এবং রবীন্দ্রনাথেরও 'ভক্তিবন্ধন থেকে পরিত্রাণে'র প্রমাণ। বাংলা সাহিত্যে আদিগন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন তিনি, বাংলা ভাষার রক্তে-মাংসে মিশে আছেন; তাঁর কাছে ঋণী হবার জন্য এমনকি তাঁকে অধ্যয়নেরও আর প্রয়োজন নেই তেমন, সেই ঋণ স্বতঃসিদ্ধ ব'লেই ধরা যেতে পারে—শুধু আজকের দিনের নয়, যুগে-যুগে বাংলা ভাষার যে-কোনো লেখকেরই পক্ষে। আর যেখানে প্রত্যক্ষভাবে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘ'টে যাবে, সেখানেও, সুখের বিষয়, সম্মোহনের আশঙ্কা আর নেই; রবীন্দ্রনাথের উপযোগিতা, ব্যবহার্যতা ক্রমশই বিস্তৃত হ'য়ে, বিচিত্র হ'য়ে প্রকাশ পাবে বাংলা সাহিত্যে। তাঁরই ভিত্তির উপর বেড়ে উঠতে হবে আগামী কালের বাঙালি কবিকে; এইখানে বাংলা কবিতার বিবর্তনের পরবর্তী ধাপেরও ইঙ্গিত আছে।

'সাহিত্যচর্চা'

নজরুল ইসলাম

আমার বাল্যকাল কেটেছে অজ মফস্বলে। দেশের বৃহৎ জীবনের বহুমুখী স্রোত সেখানে পৌঁছতো না—যদি বা কখনো পৌঁছতো, সে অনেক দেরি ক'রে এবং অনেক ক্ষীণ হ'য়ে। অনেকগুলি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক হ'য়ে বালক-মনের প্রবল কৌতূহল যথাসম্ভব মেটাবার চেষ্টা করতুম; ওরই ভিতর দিয়ে রাজধানীর প্রাণকল্লোলের সঙ্গে ছিলো আমার পরিচয়।

ক্বচিৎ এমন ঘটনাও দেশে ঘটে, যার অভিঘাতে ম্লানতম মফস্বলও থরথর ক'রে কেঁপে জেগে ওঠে। গান্ধীজীর প্রথম অসহযোগ আন্দোলন তেমনি একটি ঘটনা। অবাক হ'য়ে দেখলুম নিঃস্ব নোয়াখালিতেও প্রাণের জোয়ার। দেশ-সুদ্ধু লোক যেন সব-খোয়াবার মন্ত্রে খেপে গেলো।

সে-সময়ে আমি যদি দশ বছরের বালক না-হ'য়ে বিশ বছরের যুবা হতুম, তাহ'লে নিশ্চয়ই কলেজরূপী সরকারি গোলামখানার ধুলো পা থেকে ঝেড়ে ফেলে ভাগ্যের ভেলাকে ভাসিয়ে দিতুম বিপর্যয়ের অস্থির আবর্তে। কিন্তু আমি এতই ছোটো ছিলুম যে পিকেটিং ক'রে জেলে যাবার পর্যন্ত উপায় ছিলো না আমার। যা-হোক কিছু-একটা ক'রে উত্তেজনার ধারটাকে ক্ষইয়ে দেবার কোনো পথ আমার খোলা ছিলো না ব'লেই মনে-মনে এই নেশার উচ্ছ্বাসে আকণ্ঠ ডুবে ছিলুম।

ঠিক এই উন্মাদনারই সুর নিয়ে এই সময়ে নজরুল ইসলামের কবিতা প্রথম আমার কাছে পৌঁছলো। 'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিকপত্রে—মনে হ'লো, এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করছিলো, এ যেন তা-ই; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী। একজন মুসলমান যুবকের সঙ্গে পরিচয় হ'লো, তিনি সম্প্রতি কলকাতা থেকে এসেছেন, এবং তাঁর কাছে আছে—কী ভাগ্য! কী বিস্ময়!—একখানা বাঁধানো খাতায় লেখা বিদ্রোহী কবির আরো অনেকগুলি কবিতা। নোয়াখালির রাক্ষসী নদীর আগাছা-কণ্টকিত কর্দমাক্ত নদীতীরে ব'সে সেই খাতাখানা আদ্যন্ত প'ড়ে ফেললুম। তার মধ্যে ছিলো 'ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ, সত্যের উদ্বোধন', ছিলো 'কামাল পাশা', আর কী-কী ছিলো মনে পড়ছে না। সে-সব কবিতা অচিরেই ছাপার অক্ষরে দেখা যেতে লাগলো, আর তাদের

প্রবলতা আমাদের প্রশংসা করার ভাষাটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিলে। তাঁর নিখাদ-নির্ঘোষ আমাদের মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলে ফিরতে লাগলো :

তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখির ঝড়।

নূতনের কেতন সত্যি উড়লো। নজরুল ইসলাম বিখ্যাত হলেন। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড়ো খ্যাতি অন্য কোনো কবি অর্জন করেননি।

কে এই নজরুল ইসলাম? তাঁর সম্বন্ধে একটিমাত্র খবর পাওয়া গেলো যে তিনি যুদ্ধ-প্রত্যাগত। প্রথম-প্রথম তাঁর নামের আগে 'হাবিলদার' এবং 'কাজী' এই জোড়া খেতাব বসানো হ'তো—তার মধ্যে প্রথমটি প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঝ'রে পড়ে, দ্বিতীয়টি বহুদিন পর্যন্ত ঝুলে ছিলো। সামরিক বেশে তাঁর ছবি বেরোলো মাসিকপত্রে—ঠিক মনে নেই এটাই সেই ছবি কিনা যাতে কবি একটা কামানের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে—তরুণ বলিষ্ঠ চেহারা, ঠোঁটের উপর পাৎলা গোঁফের রেখা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। যে-সব ভাগ্যবান কবিকে স্বচক্ষে দেখে এসেছে, তাদের মুখে কালক্রমে আরো শুনলুম যে তিনি বেপরোয়া দিল-খোলা ফুর্তিবাজ মানুষ, এবং তাঁর স্ত্রী হিন্দুকন্যা।

পটপরিবর্তন ক'রে আসা যাক দশ বছর পরে, ঢাকায়, পুরানা পল্টনে, 'কল্লোল'-'প্রগতি'র যুগে। নজরুল ইসলাম ঢাকায় এসেছেন এবং গান গেয়ে সারা শহর মাতিয়ে তুলেছেন। 'কল্লোলে' গজল-গানের প্রথম পর্যায় বেরিয়ে গেছে—তার পরে ব'য়ে চলেছে গানের স্রোত—যেন তা কখনো ক্ষান্ত হবে না, যেন তা কখনো ক্লান্ত হবে না। সেবারে ঢাকায় সুধীজনের মধ্যে নজরুলকে নিয়ে কাড়াকাড়ি, জনসাধারণ তাঁর গান শুনে আত্মহারা, কেবল কতিপয় দুর্জন দুশমনের পক্ষে তাঁর প্রতিপত্তি এত দুঃসহ হলো যে তারা শেষ পর্যন্ত তাঁর উপর গায়ের জোরের গুণ্ডামি ক'রে ঢাকার ইতিহাসে একেবারেই অনেকখানি কালিমালেপন ক'রে দিলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে এক মুসলমান অধ্যাপকের বাসা, সেখান থেকে নজরুলকে ছিনিয়ে নিয়ে আমরা কয়েকটি উৎসাহী যুবক চলেছি আমাদের 'প্রগতি'র আড্ডায়। ব্রিকেলের ঝকঝকে রোদ্দুরে সবুজ রমনা জ্বলছে। হেঁটেই চলেছি আমরা, কেউ-কেউ বাইসিকেলটাকে হাতে ধ'রে ঠেলে নিয়ে চলেছে,

জনবিরল সুন্দর পথ আমাদের কলরবে মুখর, নজরুল একাই একশো। চওড়া মজবুত জোরালো তাঁর শরীর, লাল-ছিটে-লাগা বড়ো-বড়ো মদির তাঁর চোখ, মনোহর মুখশ্রী, লম্বা ঝাঁকড়া চুল তাঁর প্রাণের ফুর্তির মতোই অবাধ্য, গায়ে হলদে কিংবা কমলা রঙের পাঞ্জাবি এবং তার উপর কমলা কিংবা হলদে রঙের চাদর—দুটোই খদ্দরের। 'রঙিন জামা পরেন কেন?' 'সভায় অনেক লোকের মধ্যে চট ক'রে চোখে পড়ে, তাই।' ব'লে ভাঙা-ভাঙা গলায় হো-হো-ক'রে হেসে উঠলেন।

আমাদের টিনের ঘরে নিয়ে এলাম তাঁকে, তারপর হার্মোনিয়ম, চা, পান, গান, গল্প, হাসি। আড্ডা জমলো প্রাণমন-খোলা, সময়ের হিশেব-হারানো—নজরুল যে-ঘরে ঢুকতেন সে-ঘরে কেউ ঘড়ির দিকে তাকাতো না। আমাদের 'প্রগতি'র আড্ডায় বার কয়েক এসেছেন তিনি, প্রতি বারেই আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। প্রাণশক্তির এমন অসংবৃত উচ্ছ্বাস, এমন উচ্ছৃঙ্খল অপচয় অন্য কোনো বয়স্ক মানুষের মধ্যে আমি দেখিনি। দেহের পাত্র ছাপিয়ে সব সময় উছলে পড়ছে তাঁর প্রাণ, কাছাকাছি সকলকেই উজ্জীবিত ক'রে, মনের খেদ ও ক্লেদ সব ভাসিয়ে দিয়ে। সকল লোকই তাঁর আপন, সব বাড়িই তাঁর নিজের বাড়ি। শ্রীকৃষ্ণের মতো, তিনি যখন যার তখন তার। জোর ক'রে একবার ধ'রে আনতে পারলে নিশ্চিন্ত, আর ওঠবার নাম করবেন না—জরুরি এনগেজমেণ্ট যাবে ভেসে। ঝোঁকে প'ড়ে, দলে প'ড়ে, সবই করতে পারেন। একবার কলকাতায় খেলার মাঠে বুঝি মোহনবাগানের জিৎ হ'লো, না কি এমনি আশ্চর্য কিছু ঘটলো, ফুর্তির ঝোঁকে 'কল্লোল'-দলের চার-পাঁচজন খেলার মাঠ থেকে শেয়ালদা স্টেশনে এবং শেয়ালদা থেকে একেবারে ঢাকায় চ'লে এলেন—নজরুলকেও ধ'রে নিয়ে এলেন সঙ্গে। হয়তো দু-দিনের জন্য কলকাতার বাইরে কোথাও গান গাইতে গিয়ে সেখানেই এক মাস কাটিয়ে দিলেন। সাংসারিক দিক থেকে এ-চরিত্র অনুকরণযোগ্য নয়, কিন্তু এতে রম্যতা আছে তাতে সন্দেহ কী। সে-কালে বোহিমিয়ানের চাল-চলন অনেকেই অভ্যাস করেছিলেন— মনে-মনে তাঁদের হিশেবের খাতায় ভুল ছিলো না—জাত-বোহিমিয়ান এক নজরুল ইসলামকেই দেখেছি। অপরূপ তাঁর দায়িত্বহীনতা। সেই যে গোলাম মুস্তফা একবার ছড়া কেটেছিলেন—

কাজী নজরুল ইসলাম
বাসায় একদিন গিছলাম।

ভাস্না লাফ দেয় তিন হাত,
হেসে গান গায় দিন রাত
প্রাণে ফুর্তির ঢেউ বয় ;
ধরায় পর তার কেউ নয় ।

এর প্রতিটি কথা আক্ষরিক সত্য।

কথাবার্তার আসরে তিনি যে খুব দীপ্যমান, তা নয়। নিজের আনন্দেই তিনি মত্ত, অন্যের কথা মন দিয়ে শোনবার সময় কই। নিজে রসিকতা ক'রে নিজেই হেসে লুটিয়ে পড়ছেন। কথার চেয়ে বেশি তাঁর হাসি, হাসির চেয়ে বেশি তাঁর গান। একটি হার্মোনিয়ম এবং যথেষ্ট পরিমাণে চা এবং পান দিয়ে একবার বসিয়ে দিতে পারলে তাঁকে দিয়ে একটানা পাঁচ-সাত ঘণ্টা গান গাওয়ানো কিছুই নয়।—গানে তাঁর আন্তি নেই ; ঘুমের সময় ছাড়া সবটুকু সময় গাইতে হ'লেও তিনি প্রস্তুত। কণ্ঠস্বর মধুর নয়, ভাঙা-ভাঙা খাদের গলা, কিন্তু তাঁর গান গাওয়ায় এমন একটি আনন্দিত উৎসাহ, সমস্ত দেহ-মন-প্রাণের এমন একটি প্রেমের উচ্ছ্বাস ছিলো যে আমরা মুগ্ধ হ'য়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেছি। সে-সময়ে গান রচনা করতেও দেখেছি তাঁকে—হার্মোনিয়ম, কাগজ আর কলম নিয়ে বসেছেন, বাজাতে-বাজাতে গেয়েছেন, গাইতে-গাইতে লিখেছেন। সুরের নেশায় এসেছে কথা, কথার ঠেলা সুরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সেবারে ঢাকায় যে-সব গান তিনি লিখেছিলেন সেগুলি প্রায় সবই স্বরলিপি-সমেত 'প্রগতি'তে বেরিয়েছিলো। 'আমার কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী', 'এ-বাসি বাসরে আসিলে কে গো / ছলিতে', 'নিশি ভোর হ'লো জাগিয়া / পরান-পিয়া', এ-সব গান ঢাকায় লিখেছিলেন ব'লে মনে পড়ছে। এইমাত্র-শেষ-করা গান কবির নিজের মুখে তক্ষুনি শুনতে-শুনতে আমাদেরও মনের মধ্যে নেশা ধ'রে যেতো।

ঠিক মনে পড়ে না কোথায় নজরুলকে প্রথম দেখেছিলাম—ঢাকায় না 'কল্লোলে'র আড্ডায়। নিরবচ্ছিন্নভাবে বেশিদিন ধ'রে দেখাশোনা তাঁর সঙ্গে আমার কখনোই হয়নি, কলকাতায় এসে এখানে-সেখানে মাঝে-মাঝে দেখা হয়েছে, প্রতিবারেই তাঁর প্রাণশক্তির উল্লাস মুগ্ধ করেছে আমাকে। সত্যিই তিনি যেন 'চির-শিশু, চির-কিশোর শিশু।' সম্প্রতি তাঁর মুখে বয়সের ছাপ দেখে ব্যথিত হচ্ছিলাম—এইজন্যে ব্যথিত যে প্রৌঢ় ঋতুর প্রশান্ত সৌন্দর্য সেখানে ফলেনি, তাঁর মুখে যেন ক্লান্তির ছায়া, যেন নিরাশার কালিমা। শেষ বার তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লো বছর চারেক আগে—সেবার অল-ইণ্ডিয়া

রেডিওর ঢাকা-কেন্দ্রের আমন্ত্রণে আমরা একদল কলকাতা থেকে যাচ্ছিলাম। স্টিমারে অনেকক্ষণ একসঙ্গে কাটলো—দেখলাম তাঁর চোখ-মুখ গম্ভীর, হাসির সেই উচ্ছ্বাস আর নেই। কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ ইংরেজিতে বললেন, 'I am the greatest yogi in India', যোগসাধনা আরম্ভ ক'রে তাঁর গায়ের রং তপ্ত-কাঞ্চনের মতো হয়েছিলো, একবার শ্রীঅরবিন্দ সূক্ষ্ম দেহে তাঁর কাছে এসে আধ ঘণ্টা ব'সে ছিলেন—এমনি নানা কথা বললেন। কেমন-কেমন লাগলো। এর কিছুকাল পরে শুনলাম, নজরুল মানসিক অসুস্থতার জন্য চিকিৎসকের নজরবন্দী হয়েছেন।

তার পরে তাঁকে আর দেখিনি। আর দেখবো কিনা জানি না। প্রার্থনা করি, তিনি রোগমুক্ত হ'য়ে আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন—তাঁর কাব্যে, তাঁর গানে, তাঁর জীবনে পরিণত বয়সের শান্ত সুষমা প্রতিফলিত হোক। আর যদি তা না হয়, যদি এখানেই তাঁর সাহিত্যসাধনার সমাপন ঘটে, তাহ'লেও, গেলো পঁচিশ বছর ধ'রে তিনি আমাদের যা দিয়েছেন, সেই তাঁর অজস্র কাব্য ও সংগীত বাঙালির মনে তাঁকে স্মরণীয় ক'রে রাখবে। আমরা যারা তাঁর সমকালীন, আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা, আমাদের প্রীতি, আমাদের কৃতজ্ঞতা মহাকালের খাতায় জমা রাখলুম।

২

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে সবচেয়ে বড়ো কবিত্বশক্তি নজরুল ইসলামের। তিনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে এলেন তখন সত্যেন্দ্র দত্ত তাঁর খ্যাতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত, মোহিতলাল তখনো ঠিক সমাগত হননি, রবীন্দ্রনাথের পরে সত্যেন্দ্রনাথই প্রধান কবি। নজরুলের রচনায় সত্যেন্দ্রীয় আমেজ ছিলো না তা নয়—কেনই বা থাকবে না—কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি সুস্পষ্ট এবং প্রবলভাবে তাঁর স্বকীয়তা ঘোষণা করেছিলেন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বাংলাদেশ তাঁকে গ্রহণ করলো, স্বীকার করলো—তাঁর বই রাজরোষ এবং প্রজানুরাগ লাভ ক'রে এডিশনের পর এডিশন কাটতে লাগলো—অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করলেন তিনি। এটা কবির পক্ষে বিরল ভাগ্যের কথা; কিন্তু যে-লেখা বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গেই লোকপ্রিয় হয় তাকে আমরা ঈষৎ সন্দেহের চোখে দেখি, কারণ ইতিহাসে দেখা যায় সে-সব লেখা প্রায়ই টেঁকসই হয় না। নজরুল সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলবার কথা এইটেই যে তিনি একই সঙ্গে লোকপ্রিয়

কবি এবং ভালো কবি—তাঁর পরে একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যেই পলকের জন্য এই সমন্বয়ের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিলো। বলা বাহুল্য, এ-সমন্বয় দুর্লভ, কারণ সাধারণত দেখা যায় যে বাজে লেখাই সঙ্গে-সঙ্গে সর্বসাধারণের হাততালি পায়, ভালো লেখার ভালোত্ব উপলব্ধি করতে সময় লাগে।

নজরুল চড়া গলার কবি, তাঁর কাব্যে হৈ-চৈ অত্যন্ত বেশি, এবং এই কারণেই তিনি লোকপ্রিয়। যেখানে তিনি ভালো লিখেছেন, সেখানে তিনি হৈ-চৈটাকেই কবিত্বমণ্ডিত করেছেন; তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনায় দেখা যায়, কিপলিঙের মতো, তিনি কোলাহলকে গানে বেঁধেছেন। এ-ধরনের কবি হবার বিপদ এই যে জোর আওয়াজ হ'তে থাকলেই মনটা খুশি হয়, সে-আওয়াজ যে অনেক সময় ফাঁকা আওয়াজ মাত্র সে-খেয়াল একেবারেই থাকে না। নজরুলের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি—অনেক লেখা তিনি লিখেছেন যাতে শুধুই হৈ-চৈ আছে; কবিত্ব নেই। প্রেমের বা প্রকৃতির বিষয়ে কবিতা লিখতে গিয়ে তাঁর এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে—একটি দুটি স্নিগ্ধ কোমল কবিতা ছাড়া প্রায় সবই ভাবালুতায় আবিল, অনর্গল অচেতন বাক্যবিন্যাসে প্রায় অর্থহীন। গদ্যলেখক হ'য়ে তিনি জন্মাননি, কিন্তু গদ্যও তিনি লিখেছেন, এবং গদ্যে যে তাঁর অতিমুখর মনের অসংযত বিশৃঙ্খলা সবচেয়ে দুঃসহ হ'য়ে প্রকাশ পাবে, সে তো অনিবার্য।

অদম্য স্বতঃস্ফূর্তি নজরুলের রচনার প্রধান গুণ—এবং প্রধান দোষ। যা-কিছু তিনি লিখেছেন, লিখেছেন দ্রুতবেগে; ভাবতে, বুঝতে, সংশোধন করতে কখনো থামেননি, কোথায় থামতে হবে দিশে পাননি। সম্পাদক-বন্ধুরা কিছুতেই লেখা আদায় করতে না-পেরে কাগজ, কলম, চা ও পান দিয়ে তাঁকে একটা ঘরে বন্দী ক'রে রেখেছেন—ঘণ্টাখানেক পরে পাওয়া গেছে সম্পূর্ণ একটি কবিতা। আশ্চর্য ক্ষমতা সন্দেহ নেই, কিন্তু সব সময় এতে কাজ চলে না, আর যখন চলে না তখন ফল হয় খুবই খারাপ। এ-ক্ষমতা চমকপ্রদ, কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয়। এদিক থেকে বায়রনের সঙ্গে নজরুলের সাদৃশ্য ধরা পড়ে—সেই কাঁচা, কড়া, উদ্দাম শক্তি, সেই চিন্তাহীন অনর্গলতা, কাব্যের কলকব্জার উপর সেই সহজ নিশ্চিত দখল, সেই উচ্ছৃঙ্খলতা, আতিশয্য, শৈথিল্য, সেই রসের ক্ষীণতা, রূপের হীনতা, রুচির স্খলন। বায়রন সম্বন্ধে গ্যেটে যা বলেছিলেন, নজরুল সম্বন্ধেও সে-কথা সত্য: '**The moment he thinks, he is a child.**'

'আমি চির-শিশু, চির-কিশোর'—এ-কথা বিদ্রূপের বাঁকা হাসির সঙ্গে নজরুলের সাহিত্যিক জীবনে সত্য হয়েছে। পঁচিশ বছর ধ'রে প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েননি, বয়স্ক হননি, পর-পর তাঁর বইগুলিতে কোনো পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একই রকম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর প্রতিভার প্রদীপে ধীশক্তির শিখা জ্বলেনি, যৌবনের তরলতা ঘন হ'লো না কখনো, জীবনদর্শনের গভীরতা তাঁর কাব্যকে রূপান্তরিত করলো না। প্রেরণার প্রবলতা বিপথগামী হয়েছে আত্মস্থ স্বাধীন সচেতনতার অভাবে; রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে যেমন বলেছিলেন, নজরুল সম্বন্ধেও তেমনি বলা যায় যে তাঁর প্রতিভা 'ধনী, কিন্তু গৃহিণী নয়'। যে-সম্পদ নিয়ে জন্মেছিলেন তার পূর্ণ ব্যবহার তাঁর সাহিত্যকর্মে এখনো হ'লো না; সেখানে দেখতে পাই তাঁর আত্ম-অচেতন মনের অনেক হেলাফেলা, অনেক ফেলাছড়া, অনেক অপচয়।

গানের ক্ষেত্রে নজরুল নিজেকে সবচেয়ে সার্থকভাবে দান করেছেন। তাঁর সমগ্র রচনাবলির মধ্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তাঁর গানের। বীর্যব্যঞ্জক গানে—চলতি ভাষায় যাকে 'স্বদেশী গান' বলে—রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের পরেই তাঁর স্থান হ'তে পারে। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' উৎকর্ষের শিখরস্পর্শী। সাধারণভাবে বলা যায় যে তাঁর গান তাঁর কবিতার চেয়ে বেশি তৃপ্তিকর—গানের ক্ষুদ্র আকারে তাঁর অতিকথনের দোষ প্রশ্রয় পেতে পারেনি—'বুলবুল' ও 'চোখের চাতকে' কিছু-কিছু রচনা পাওয়া যাবে, যাকে অনিন্দ্য বললে অত্যন্ত বেশি বলা হয় না। আরো বেশি গান যে অনিন্দ্য হয়নি, তার কারণ নজরুলের দুরতিক্রম্য রুচির দোষ। কত গান সুন্দর আরম্ভ হয়েছে, সুন্দর চ'লে এসেছে, কিন্তু শেষ স্তবকে কোনো-একটা অমার্জিত শব্দ-প্রয়োগে সমস্ত জিনিশটিই গেছে নষ্ট হ'য়ে। তাঁর প্রেমের গান সরস, কমনীয়, চিত্রবহুল; কিন্তু তার আবেদন আমাদের মনে যখনই ঘন হ'য়ে আসে তখনই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কোনো স্থূল স্পর্শে মোহ ভেঙে যায়। গীতরচয়িতার অন্য সমস্ত গুণ তাঁর ছিলো—শুধু যদি এই দোষ না থাকতো, শুধু যদি তাঁর রুচি হ'তো পরিশীলিত, তাহ'লে তাঁর মধ্যে একজন মহৎ গীতকারকে আমরা বরণ করতে পারতাম।

শোনা যায়, নজরুলের গানের সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি—পৃথিবীতেই নাকি কোনো একজন কবি এত বেশি গান রচনা করেননি। কথাটা

অসম্ভব নয়—শেষের দিকে নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানির ফরমাশে যান্ত্রিক নিপুণতায় অজস্র গান উৎপাদন ক'রে যাচ্ছিলেন—প্রেমের গান, কালীর গান, ইসলামি গান, হাসির গান—সব রকম। সে-সব গান বোধহয় গ্রন্থাকারে এখনো সংগৃহীত হয়নি, তাই তাদের অস্তিত্বের কথাও আমরা অনেকে জানি না। নজরুলের সমস্ত গানের মধ্যে যেগুলি ভালো সেগুলি সযত্নে বাছাই ক'রে নিয়ে একটি বই বের করলে সেটাই হবে নজরুল-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়; সেখানে আমরা যাঁর দেখা পাবো তিনি সত্যিকার কবি, তাঁর মন সংবেদনশীল, আবেগপ্রবণ, উদ্দীপনাপূর্ণ। সে-কবি শুধুই বীররসের নন, আদিরসের পথে তাঁর স্বচ্ছন্দ আনাগোনা, এমনকি হাস্যরসের ক্ষেত্রেও প্রবেশ নিষিদ্ধ নয় তাঁর। 'বিদ্রোহী' কবি, 'সাম্যবাদী' কবি কিংবা 'সর্বহারা'র কবি হিশেবে মহাকাল তাঁকে মনে রাখবে কিনা জানি না, কিন্তু কালের কণ্ঠে গানের মালা তিনি পরিয়েছেন, সে-মালা ছোটো কিন্তু অক্ষয়। যদিও শেষ বিচারে বায়রনের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে না—কেননা কোনো 'ডন জুয়ান'—বা এমনকি 'চাইল্ড হ্যারল্ড' লেখা সম্ভব ছিলো না তাঁর পক্ষে, যদিও তিনি স্বভাবত উদ্দাম হ'য়েও প্রকাশের জন্য কোনো বৃহৎ আধার খুঁজে পাননি, তবু শুধু বাংলা কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে তাঁর আসন নিঃসংশয়, কেননা তাঁর কবিতায় আছে সেই বেগ, যাকে দেখামাত্র কবিত্বশক্তি ব'লে চেনা যায়।

'কালের পুতুল'
(ঈষৎ পরিমার্জিত)

জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে

ঢাকা, গ্রীষ্মকাল, ১৯২৭। হাতে-লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা ছাপার অক্ষরে রূপান্তরিত হ'লো। শুঁয়োপোকার খোলশ ঝ'রে গেলো, বেরিয়ে এলো ক্ষণকালীন প্রজাপতি। কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষণিক ব'লেই কোনো-কিছু উপেক্ষণীয় নয়; কারো হয়তো অল্প সময়েই কিছু করবার থাকে, সেটুকু ক'রে দিয়েই সে বিদায় নেয়।

'প্রগতি'র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে রীতিমতো বিখ্যাত ছিলেন একমাত্র নজরুল ইসলাম, আর অচিন্ত্যকুমার— যাঁর 'বেদে', 'টুটা-ফুটা' সবেমাত্র বেরিয়েছে— তাঁকেও বলা যায় সদ্য-সমাগত। এই দু-জন ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন আসন্ন, অত্যাসন্ন, উপক্রমণিক; বৃহত্তর পাঠকসমাজের সঙ্গে তাঁদের অপরিচয়ের ব্যবধান তখনও ভেঙে যায়নি। আর এঁদের মধ্যে— সম্পাদক দু-জনকে বাদ দিয়ে— যাঁদের রচনা সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে ছাপা হ'তো, তাঁদের নাম জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে।

বিষ্ণু দে প্রথম লেখা পাঠিয়েছিলেন 'শ্যামল মিত্র' বা ঐ রকম কোনো ছদ্মনামে, নিপুণ ছন্দের কোনো কবিতা। তারপর স্বনামে ও বেনামে, গদ্যে ও পদ্যে, তাঁর অনেক লেখাই 'প্রগতি'র পাতা উজ্জ্বল করেছিলো। তাঁর সাহিত্য-জীবনের সেটা প্রথমতম অধ্যায়; লোকে তাঁর স্বনামকেই বেনাম ব'লে ভুল করেছে; অনেকেই বিশ্বাস করছে না 'বিষ্ণু দে'-র মতো সংক্ষিপ্ত ও সুশ্রাব্য নাম কোনো বাস্তব মানুষের পক্ষে সম্ভব।

কিছুকাল পূর্বে জীবনানন্দ দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত 'নীলিমা' নামে একটি কবিতা 'কল্লোলে' আমরা লক্ষ করেছিলাম; কবিতাটিতে এমন একটি সুর ছিলো যার জন্য লেখকের নাম ভুলতে পারিনি। 'প্রগতি' যখন বেরোলো, আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই লেখককে আমন্ত্রণ জানালাম, তিনিও তার উত্তর দিলেন উষ্ণ, অকৃপণ প্রাচুর্যে। কী আনন্দ আমাদের, তাঁর কবিতা যখন একটির পর একটি পৌঁছতে লাগলো, যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করলাম— এক সান্ধ্য, ধূসর, আলোছায়ার অদ্ভুত সম্পাতে রহস্যময়, স্পর্শগন্ধময়, অতি-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়চেতন জগৎ— যেখানে পতঙ্গের নিশ্বাসপতনের শব্দটুকুও শোনা যায়, মাছের পাখনার ক্ষীণতম স্পন্দনে কল্পনার গভীর জল আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে। এই চরিত্রবান নতুন কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্য হলাম আমরা।

'প্রগতি'র প্রথম বছরের বাঁধানো সেটটি আমার অনির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার থেকে অনেক আগেই অন্তর্হিত হয়েছে, অন্য কোথাও তা সংগ্রহ করতেও পারলাম না। পত্রিকার সূত্রপাত থেকেই জীবনানন্দর লেখা সেখানে বেরিয়েছে এই রকম একটা ধারণা আছে আমার; কিন্তু প্রথম বছরে কোন-কোন লেখা বেরিয়েছিলো সেটা স্পষ্টভাবে মনে আনতে পারছি না। খুব সম্ভব তার মধ্যে ছিলো '১৩৩৩', 'পিপাসার গান' আর 'অনেক আকাশ'। সৌভাগ্যত, দ্বিতীয় আর অসমাপ্ত তৃতীয় বছরের সংখ্যাগুলি এখনো আমার হাতের কাছে আছে, আর তাতে— এখন পাতা উলটিয়ে প্রায় অবাক হ'য়ে দেখছি— প্রথম দেখা দিয়েছিলো 'সহজ', 'পরস্পর', 'জীবন', 'স্বপ্নের হাতে', 'পুরোহিত' (পরবর্তী নাম 'নির্জন স্বাক্ষর'), 'কয়েকটি লাইন,' 'বোধ', 'আজ', 'অবসরের গান'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সতেরোটি কবিতার মধ্যে 'পাখিরা' 'কল্লোলে', 'ক্যাম্পে', 'পরিচয়ে,' 'মৃত্যুর আগে', 'কবিতা'য়, আর কোনো-কোনোটি 'ধূপছায়া'য় বেরিয়েছিলো, কিন্তু অধিকাংশেরই প্রথম প্রকাশ 'প্রগতি'তে, তার উপর যখন বই ছাপা হ'লো তখন ধাত্রীর কাজও আমি করেছিলাম; তাই ঐ গ্রন্থটিকে আমার নিজের জীবনের একটি অংশ ব'লে মনে হয় আমার। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করি যে 'আজ' নামক স্তবকবিন্যস্ত দীর্ঘ কবিতাটি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে নেই, পরবর্তী অন্য কোনো গ্রন্থেও গৃহীত হয়নি।

'প্রগতি'তে, শুধু প্রকাশ করা নয়, নতুন সাহিত্য প্রচার করার দিকেও লক্ষ ছিলো আমাদের। তার জন্যে মনের মধ্যে তাগিদ ছিলো, বাইরে থেকেও উত্তেজনার অভাব ছিলো না। দেশের মধ্যে উগ্র হ'য়ে উঠেছিলো সংঘবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অপরিমিত, অনবরত বিরুদ্ধতা। যাঁরা যুদ্ধঘোষণা করলেন তাঁরা কেউ সাহিত্যের মহাজনি কারবারি, কেউ বা তাঁদের আশ্রিত, কেউ মহিলা, কেউ বড়ো ঘরের ছেলে, কেউ নামজাদা সম্পাদক অথবা লণ্ডনে পাশ-করা প্রোফেসর, আর কেউ বা ফরাশি জর্মান আর এক লাইন রাশিয়ান জানেন। তুলনায় আমরা, যারা নেহাৎই কলেজের ছাত্র কিংবা সবেমাত্র উত্তীর্ণ, যে-কোনোরকম সাংসারিক বিচারে আমরা কত দুর্বল তা না-বললেও চলে; কিন্তু যেহেতু সংসারের নিয়ম আর সাহিত্যের বিধান এক নয়, যেহেতু নিন্দুকের লক্ষ কথাকে কীটের অন্নে পরিণত ক'রে একটিমাত্র কবিতার পঙক্তি তারার মতো জলজ্বল করে, তাই আমরা হেরে যাইনি, ভেঙে যাইনি, স'রে যাইনি, দাঁড়িয়ে ছিলুম শরবর্ষণের সামনে, কিছু-কিছু প্রত্যুত্তরও দিয়েছিলাম। সেই দু-বছর বা

আড়াই বছর, যে-ক'দিন 'প্রগতি' চলেছিলো, আমি বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলাম, শুধুমাত্র সদর্থকভাবে নিজের কথাটা প্রকাশ না-ক'রে প্রতিপক্ষের জবাব দিতেও চেয়েছিলাম—সেই সব আক্রমণেরও উত্তর, যাতে আক্রোশের ফণা বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে, আর ইতর রসিকতার অন্তরালে দেখা যাচ্ছে পান-খাওয়া লাল-লাল দাঁত, কালচে মোটা ঠোঁট, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুঃশাসনের ঘৃণিত, লোলুপ, ব্যর্থকাম দৃষ্টি। এই রকম আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলেন জীবনানন্দ, আর তাতে আমার যেমন উত্তেজনা হ'তো নিজের বিষয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপে তেমন হ'তো না; যেহেতু তাঁর কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিলুম, আর যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন সব অর্থে সুদূর, কবিতা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দ, তাই আমার মনে হ'তো তাঁর বিষয়ে বিরুদ্ধতার প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে আমার কর্তব্য। 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় আলোচনার মধ্যে জীবনানন্দর প্রসঙ্গ, সমসাময়িক অন্য লেখকদের তুলনায়, কিছু বেশি পৌনঃপুনিক ব'লে মনে হয়; তার অনেকটা অংশই যে প্রতিবাদ সে-কথা ভাবতে আজ আমার খারাপ লাগে। অবশ্য আমি অচিরেই বুঝেছিলাম যে প্রতিবাদ মানেই শক্তির অপব্যয়, আর পরবর্তী দীর্ঘকাল ধ'রে সেই অপব্যয় সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেছি, কিন্তু এখানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হ'লো, তা না-হ'লে সেই সময়কার সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যাবে না। আজ নতুন ক'রে স্মরণ করা প্রয়োজন যে জীবনানন্দ, তাঁর কবিজীবনের আরম্ভ থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত, অসূয়াপন্ন নিন্দার দ্বারা এমনভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন যে তারই জন্য কোনো-এক সময়ে তাঁর জীবিকার ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটেছিলো। এ-কথাটা এখন আর অপ্রকাশ্য নেই যে 'পরিচয়ে' প্রকাশের পরে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির সম্বন্ধে 'অশ্লীলতা'র নির্বোধ এবং দুর্বোধ্য অভিযোগ এমনভাবে রাষ্ট্র হয়েছিলো যে কলকাতার কোনো-এক কলেজের শুচিবায়ুগ্রস্ত অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা থেকে অপসারিত ক'রে দেন। অবশ্য প্রতিভার গতি কোনো বৈরিতার দ্বারাই রুদ্ধ হ'তে পারে না, এবং পৃথিবীর কোনো জন কীটস অথবা জীবনানন্দ কখনো নিন্দার ঘায়ে মূর্ছা যান না—শুধু নিন্দুকেরাই চিহ্নিত হ'য়ে থাকে মূঢ়তার, ক্ষুদ্রতার উদাহরণস্বরূপ। মার্কিন লেখক হেনরি মিলার একখানা বই লিখেছেন, যার নাম *Remember to Remember*। এই নামটি উল্লেখ-যোগ্য, কেননা আমাদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক দায়িত্বের বড়ো একটা অংশ হ'লো মনে রাখা। জীবনে যেখানে-যেখানে সুন্দরের স্পর্শ পেয়েছি সেটা যেমন

স্মরণযোগ্য, তেমনি যেখানে কুৎসিতের পরাকাষ্ঠা দেখলাম সেটাকে যেন দুর্বলের মতো মার্জনীয় ব'লে মনে না করি। যেন মনে রাখি, মনে রাখতে ভুলে না যাই।

২

'প্রগতি'র পাতায় জীবনানন্দর কবিতা বিষয়ে যে-সব আলোচনা বেরিয়েছিলো তার কিছু-কিছু অংশ এখানে তুলে দেবার লোভ হচ্ছে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এই উদ্ধৃতিগুলির লেখক আর বর্তমান প্রবন্ধকার ঐতিহাসিক অর্থে একই ব্যক্তি; কিন্তু এর রচনাভঙ্গি, আর লেখার মধ্যে ইংরেজি শব্দের অবিরল ব্যবহার দেখে আজ আমার কর্ণমূল আরক্ত হচ্ছে। তবু, সব দোষ সত্ত্বেও, অংশগুলি অন্য কারণে ব্যবহার্য হ'তে পারে: প্রথমত, এতে বোঝা যাবে একজন প্রথম ভক্ত পাঠকের মনে জীবনানন্দর কবিতা কী-রকম ভাবে সাড়া তুলেছিলো; দ্বিতীয়ত, এই তিরিশ বছরে বাংলা কবিতা কত দূর অগ্রসর হয়েছে তা বোঝার পক্ষেও এগুলো কিঞ্চিৎ কাজে লাগতে পারে।

> জীবনানন্দবাবু বাঙলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে' আমার মনে হয়। তিনি এ-পর্যন্ত মোটেই popularity অর্জন করতে পারেননি, বরঞ্চ তাঁর রচনায় প্রতি অনেকেই বোধ হয় বিমুখ;—অচিন্ত্যবাবুর মত তাঁর এরি মধ্যে অসংখ্য imitator জোটেনি। তার কারণ বোধ হয় এই যে জীবনানন্দবাবুর কাব্যরসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময়সাপেক্ষ,...তাঁর কবিতা একটু ধীর-সুস্থে পড়তে হয়, আস্তে-আস্তে বুঝতে হয়।
>
> জীবনানন্দবাবুর কবিতায় যে-সুরটি আগাগোড়া বেজেছে, তা'কে ইংরেজ সমালোচকের ভাষায় 'renascence of wonder' বলা যায়।... তাঁর ছন্দ ও শব্দযোজনা, উপমা ইত্যাদিকে চট করে' ভালো কি মন্দ বলা যায় না—তবে "অদ্ভুত" স্বচ্ছন্দে বলা যায়।...তাঁর প্রধান বিশেষত্ব আমরা এই লক্ষ্য করি যে সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে' শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার করে'ই তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ফলে তাঁর diction সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব বস্তু হয়ে পড়েছে—তা'র অনুকরণ করাও সহজ বলে' মনে হয় না।... [তিনি] এমন সব কথা বসাচ্ছেন যা পূর্ব্বে কেউ

কবিতায় দেখতে আশা করেনি—যথা, "ফেঁড়ে", "নটকান," "শেমিজ", "থুতনি" ইত্যাদি। এর ফলে তাঁর কবিতায় যে অপূর্ব্ব স্বাতন্ত্র্য এসেছে সে-কথা আগেই বলেছি; তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি আলাদা ভাষা তৈরী করে' নিতে পেরেছেন, এর জন্য তিনি গৌরবের অধিকারী। * * *

এ-কথা ঠিক যে তিনি [জীবনানন্দ] পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া রোমান্টিক। এক হিসেবে তাঁকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের antithesis বলা যেতে পারে। প্রেমেন্দ্রবাবু বাস্তব জগতের সকল রূঢ়তা ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ, বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা তাঁকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে।…জীবনানন্দবাবু এই সংসারের অস্তিত্ব আগাগোড়া অস্বীকার করেছেন, তিনি আমাদের হাত ধরে' এক অপূর্ব রহস্যলোকে নিয়ে যান; —সে মায়াপুরী হয়তো আমরা কোনোদিন স্বপ্নে দেখে থাকবো।… [সেইজন্যেই] আমি বলেছিলাম যে তাঁর কবিতায় "renascence of wonder" ঘটেছে। * * *

[তাঁর] ছন্দ অসমছন্দ হ'লেও "বলাকা"র ছন্দের সঙ্গে এর পার্থক্য কানেই ধরা পড়ে;—"বলাকা"র চঞ্চলতা, উদ্দাম জলস্রোতের মত তোড় এর নেই;—এ যেন উপলাহত মন্থর স্রোতস্বিনী—থেমে-থেমে, অজস্র ড্যাশ ও কমার বাঁধে ঠেকে-ঠেকে উদাস, অলস গতিতে ব'য়ে চলেছে। এতে প্রচুর উৎসাহের তাড়া নেই, আছে একটি মধুর অবসাদের ক্লান্তি। এই সুর যেন বহুদূর থেকে আমাদের কানে ভেসে আসছে। * * *

জীবনানন্দবাবুর…বহু কবিতায়…পরমবিস্ময়কর কথা-চিত্র পাওয়া যায়, সে ছবিগুলো সব মৃদু রঙে আঁকা, তাঁর কবিতার tone আগাগোড়া subdued।…দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ক'টি লাইন নেয়া যাক—

আমার এ গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে,—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে,—
তবুও হৃদয়ে গান আসে!
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি,—

তবু ভালোবাসা
জেগে থাকে প্রাণে!
পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান!
কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা,— জানি আমি—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে
তবুও হৃদয়ে গান আসে!

এখানে যেন কথা শেষ হ'য়েও শেষ হয়নি;—কথা ফুরিয়ে গেলেও তা'র বিষণ্ণ সুরটি পাঠকের মনকে যেন haunt করতে থাকে। একটি বা কয়েকটি লাইন পুনরাবৃত্তি করার…ফলে গোটা কবিতাটি যেন চট করে' থেমে যায় না, ভ্রমরের পাখার মত গুঞ্জন করে' ভেসে যায়।

('প্রগতি'—আশ্বিন, ১৩৩৫, সম্পাদকীয় মন্তব্য)

অনিল। * * * আজকালকার একটি কবির লেখা পড়ে' আমার আশা হচ্ছে, আর বেশি দেরি নেই, হাওয়া বদলে আসছে।

সুরেশ। কে তিনি?

অনিল। জীবনানন্দ দাশ।

সুরেশ। জীবানন্দ দাশ? কখনো নাম শুনিনি তো!

অনিল। জীবানন্দ নয়, জীবনানন্দ। নামটা অনেককেই ভুল উচ্চারণ করতে শুনি। তাঁর নাম না শোনবারই কথা! কিন্তু তিনি যে একজন খাঁটি কবি তা'র প্রমাণস্বরূপ আমি তোমাকে তাঁর একটি লাইন বলছি—'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে-আকাশে।'… আকাশের অন্তহীন নীলিমার দিগন্ত-বিস্তৃত প্রসারের ছবিকে একটি মাত্র লাইনে আঁকা হয়েছে—একেই বলে magic line। আকাশ কথাটার পুনরাবৃত্তি করবার জন্যই ছবিটি একেবারে স্পষ্ট, সজীব হ'য়ে উঠেছে; শব্দের মূল্য-বোধের এমন পরিচয় খুব কম বাঙালী কবিই দিয়েছেন।

সুরেশ। (অনিচ্ছাসত্ত্বে) লাইনটি ভালো বটে।

অনিল। এই কবি…উদ্ভট ভাষা অবলম্বন করে' আমাদের ধন্যবাদভাজন

হয়েছেন। আজকালকার কবিদের মধ্যে তাঁর ভাষা সব চেয়ে স্বাভাবিক। সরল, নিরলঙ্কার, ঘরোয়া ভাষার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ শুনবে? তুমি যদি অনুমতি করো, প্রগতি থেকে জীবনানন্দর একটি কবিতার খানিকটা পড়ে' শোনাই।

সুরেশ। শুনি?

অনিল। (পড়িল)।

তুমি এই রাতের বাতাস,
বাতাসের সিন্ধু— ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।
অন্ধকার— নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আনো প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা,
রুধিরে পিপাসা
যেতেছে জাগায়ে,
ছেঁড়া দেহে— ব্যথিত মনের ঘায়ে
ঝরিতেছে জলের মতন,
রাতের বাতাস তুমি— বাতাসের সিন্ধু— ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।

এই passageটির একমাত্র weak point হচ্ছে রুধির কথাটা। তা ছাড়া, একেবারে নিখুঁত। এতে melody না থাকে, music আছে— একটা ক্লান্ত উদাস সুরের meandering। থেমে-থেমে পড়তে হয়— তবে সুরটি কানে ধরা পড়বে। যেমন—'রাতের, বাতাস তুমি। বাতাসের, সিন্ধু, ঢেউ॥ তোমার, মতন কেউ। নাই আর॥'

সুরেশ। তা তো বুঝলাম, কিন্তু 'ছেঁড়া দেহ'।

অনিল। ঠিকই— দেহ কথাটা এখানে সঙ্গত হয়নি।...শরীর কথাটাকে তো তিনিই [জীবনানন্দ] জাতে তুলে' দিয়েছেন। তবে দেহ কথাটাও তো কেবলমাত্র অভিধানগত নয়।

স্বরেশ। দেহ সম্বন্ধে আপত্তি করবার কিছুই ছিলো না, কিন্তু ছেঁড়া

অনিল। ছিন্ন না বললে মানে বোঝো না নাকি?

স্বরেশ। ছেঁড়া শুনলেই হাসি পায়।

অনিল। অনভ্যাস। সয়ে' গেলেই এর সৌন্দর্য্য ধরা পড়বে। ত্যাখো, এতদিনে আমাদের এ-কথাটা উপলব্ধি করা উচিত যে সংস্কৃত আর বাঙলা এক ভাষা নয়, সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার নাড়ির বাঁধন বহুকাল ছিঁড়ে গেছে। বাঙলা এখন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সাবালক ভাষা—তা'র ব্যাকরণ, তা'র বিধি-বিধান, তা'র spirit সংস্কৃত থেকে আলাদা।··· অথচ, আশ্চর্যের বিষয় বাঙলা কবিতা এখন পর্য্যন্ত সংস্কৃত কথাগুলোর প্রতিই পক্ষপাত দেখাচ্ছে, সংস্কৃত convention গুলো এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের কবিতায় এখনো সুন্দরীরা বাতায়ন-পাশে দাঁড়িয়ে কেশ আলুলিত ক'রে দেয়, মুকুরে মুখ দেখে, চরণ অলক্তক-রঞ্জিত করে, শুভ্র ও শীতল শয্যায় শোয়। আমাদের নায়িকাদের এখনো হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং ইত্যাদি, যদিও ও-সব ফ্যাশান দেশ থেকে বহুকাল উঠে গেছে। সংস্কৃতের দুয়ারে এই কাঙালপনা করে' আর কতকাল আমরা মাতৃভাষাকে ছোট করে' রাখবো? আমাদের ভুল জীবনানন্দ দাশ বুঝতে পেরেছেন বলে' মনে হয়; ভাষাকে যথাসম্ভব খাঁটি বাঙলা করে' তোলবার চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। তিনি সাহস করে লিখেছেন:

> সেই জল মেয়েদের স্তন
> ঠাণ্ডা— শাদা— বরফের কুচির মতন।

শুনে তোমার—শুধু তোমার কেন? অনেকেরই—হাসি পাবে, বলবে—'ঠাণ্ডা—শাদা—এ আবার কী?' কিন্তু ঐ শব্দ দুটো গদ্যে লিখতে পারি, মুখে বলতে পারি—আর কবিতাতেই লিখতে পারবো না? কেন কবিতায় জানালাকে জানালা বলবো না, বিছানাকে বিছানা?···যত কথা আমাদের মুখের ভাষায় স্থান পেয়েছে··· কাব্যসমাজ থেকে তাদের একঘরে করে' রেখে কেন আমরা আমাদের কবিতাকে এক বিপুল শব্দ-সম্ভার থেকে বঞ্চিত করবো? মৌখিক ভাষার ইডিয়মগুলো ব্যবহার করে' কবিতাকে স্বাভাবিক ও সহজ করে'

তুলবো না কেন ?...আমি তো বলি, ক্ষণিকার ভাষা, জীবনানন্দের কবিতার ভাষা purest বাঙলা, কারণ তা বাঙলা ছাড়া আর কিছু নয়।*

('প্রগতি'—ভাদ্র, ১৩৩৮, 'বাঙলা কাব্যের ভবিষ্যৎ')

ইচ্ছে ক'রেই উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ করলাম, সেই সময়কার সাহিত্যিক আবহাওয়ার কিছু আভাস দেবার জন্য। আজকের দিনের পাঠক নিশ্চয়ই এ-কথা ভেবে অবাক হচ্ছেন যে কবিতায় 'ঠাণ্ডা' বা 'শাদা' কথাটার ব্যবহারের সমর্থনের জন্য এতগুলো বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হ'তে পারে, কিন্তু এ-কথা সত্য যে গম্ভীর ভাবের কবিতায় দেশজ ও বিদেশী শব্দের এমন স্বচ্ছন্দ, সংগত ও প্রচুর ব্যবহার জীবনানন্দর আগে অন্য কোনো বাঙালি কবি করেননি। মনে পড়ছে 'পাখিরা' কবিতা প্রথম পাঠেই আমাদের পক্ষে রোমাঞ্চকর হয়েছিলো 'স্কাইলাইটে'র জন্য, 'প্রথম ডিমে'র জন্য, 'রবারের বলের মতন' ছোটো বুকের জন্য, আর সেখানে 'লক্ষ লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে' মৃত্যু ছিলো ব'লে। ওটা যে ঐকাহিক চমক-লাগানো ব্যাপার নয়, সপ্রাণ এবং সবীজ নূতনত্ব, এতদিনে সেটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হ'য়ে গেছে। এমনকি, মৌখিক ভাষায় প্রচলিত তৎসম শব্দেরও ব্যবহারজাত মালিন্য ঘুচিয়ে তাতে কাব্যের স্পন্দন তিনি এনেছিলেন; 'তোমার শরীর—তা-ই নিয়ে এসেছিলে একদিন', এই পঙক্তিটি প'ড়ে আমি 'শরীর' কথাটাকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করেছিলাম। তার আগে নায়িকাদের কোনো 'শরীরে'র অস্তিত্ব আমরা শুনিনি, শুনেছি 'দেহ', 'দেহলতা', 'তনুলতা', 'দেহবল্লরী'। এই উদাহরণ আমাদেরও রচনার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

৩

কবে কোথায় জীবনানন্দকে প্রথম দেখেছিলাম মনে পড়ছে না। পাঁচ মিনিট দূরে থেকেও 'কল্লোল'-আপিশে তিনি আসতেন না, কিংবা কদাচ আসতেন; অন্তত আমি তাঁকে কখনো সেখানে দেখিনি। হ্যারিসন রোডে তাঁর বোর্ডিঙের তেতলা কিংবা চারতলায় অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে একবার আরোহণ করেছিলাম মনে পড়ে, আর একবার কলেজ স্ট্রীটের ভিড়ের মধ্যে আমরা কয়েকজন তাঁকে

* উদ্ধৃতি দুটোতে মূলের বানান রক্ষা করা হ'লো।

অনুসরণ করতে-করতে বউবাজারের মোড়ের কাছে এসে ধ'রে ফেলেছিলাম। কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় এলেন একবার, মেঘলা দিনে মাঠের পথে ঘুরলাম তাঁর সঙ্গে; পরে, তাঁর বিবাহের অনুষ্ঠানে, ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত আছি অজিত, আমি, অন্যান্য বন্ধুরা। কলকাতায় চ'লে আসার পর রমেশ মিত্র রোডের একতলা ঠাণ্ডা ঘরে তাঁর সঙ্গে ব'সে আছি, শীতকাল, বিকেল হ'য়ে এলো। হঠাৎ চেয়ার-টেবিল ন'ড়ে উঠলো, আমরা বাইরে ছোট্ট বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, মিনিটখানেক পরে ফিরে এসে বসলাম আবার। পরের দিন কাগজে পড়লাম উত্তর বিহারে ভূমিকম্পের খবর।

কিন্তু এই সবই ঝাপসা স্মৃতি, এদের মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতাও নেই। আসলে, জীবনানন্দর স্বভাবে একটি দুরতিক্রম্য দূরত্ব ছিলো—যে-অতিলৌকিক আবহাওয়া তাঁর কবিতার, তা-ই যেন মানুষটিকেও ঘিরে থাকতো সব সময়—তার ব্যবধান অতিক্রম করতে ব্যক্তিগত জীবনে আমি পারিনি, সমকালীন অন্য কোনো সাহিত্যিকও না। এই দূরত্ব তিনি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন; তিন বা চার বছর আগে সন্ধেবেলা লেকের দিকে তাঁকে বেড়াতে দেখতাম—আমি হয়তো পিছনে চলেছি, এগিয়ে গিয়ে কথা বললে তিনি খুশিও হতেন, অপ্রস্তুতও হতেন, আলাপ জমতো না; তাই আবার দেখতে পেলে আমি ইচ্ছে ক'রে পেছিয়েও পড়েছি কখনো-কখনো, তাঁর নির্জনতা ব্যাহত করিনি। কখনো এলে বেশিক্ষণ বসতেন না, আর চিঠিপত্রেও তাঁর সেই রকম স্বভাব-সংকোচ। যুদ্ধের তৃতীয় বা চতুর্থ বছরে একবার আমরা পাক্ষিক সাহিত্যসভার ব্যবস্থা করেছিলুম; তাতে, এ. আর. পি.র কর্মভার সত্ত্বেও, সুধীন্দ্রনাথ মাঝে-মাঝে আসতেন, কিন্তু জীবনানন্দ এসেছিলেন একবার মাত্র; এসে, একটি কবিতা পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হ'য়ে, অথবা তারই ফলে, আমাদের একটু অপ্রস্তুত ক'রে দিয়ে আকস্মিকভাবে বিদায় নিয়েছিলেন। তাঁর মুখে তাঁর নিজের কবিতাপাঠ আমি কখনো শুনিনি, যদিও শুনেছি ইদানীং তরুণদের কাছে তাঁর সংকোচ কেটে গিয়েছিলো। অথচ, সেই 'প্রগতি'র সময় থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সাহিত্যিক বন্ধুতা ও সাযুজ্য ছিলো বিরামহীন; দেখা-শোনায় যেটুকু হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি গভীর ক'রে তাঁকে পেয়েছি তাঁর রচনার মধ্যে—যার অনেকখানি অংশের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রকাশের পূর্বেই ঘ'টে গেছে। এই সম্বন্ধ পঁচিশ বছরের মধ্যে শিথিল হয়নি; 'কবিতা' প্রকাশের অন্যতম পুরস্কার ছিলো আমার পক্ষে একসঙ্গে তিনটি-চারটি ক'রে

পাঠানো তাঁর নতুন কবিতা পড়া; আনন্দ পেয়েছি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রুফ দেখে, 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালায় 'বনলতা সেন' প্রকাশে তাঁর সম্মতি পেয়ে, তাঁর বিষয়ে লিখে, কথা ব'লে, তাঁকে আবৃত্তি ক'রে। বাংলা কবিতার যতগুলো পঙক্তি বা স্তবক আমার বিবর্ধমান বিস্মরণশক্তি এখনও হারিয়ে ফেলেনি, কিংবা পরিবর্তমান রুচি বর্জন করেনি, যেগুলোকে আমি বহু বছর ধ'রে অনেকটা রক্ষাকবচের মতো মনে-মনে বহন ক'রে আসছি, তার মধ্যে জীবনানন্দর পঙক্তির সংখ্যা অনেক। সেই সব কবিতা বেঁচে আছে আমার মনে, অন্য অনেক পাঠকেরও মনে— ভাবী কালেও বেঁচে থাকবে; তবু আজ এই কথা ভেবেই দুঃখ করি যে আমাদের পক্ষে স্বল্পপরিচিত সেই মানুষটিকে আর চোখে দেখবো না।

৪

জীবনানন্দর কবিতা নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু-কিছু আলোচনা আমি করেছি; আজ আবার প'ড়ে আরো কিছু নতুন কথা আমার মনে হচ্ছে। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ইন্দ্রিয়বোধের আনুগত্যে তিনি অতুলনীয়, রূপদক্ষতাই তাঁর চরিত্রলক্ষণ— আর এ-সব কথা পাঠকমহলে যথেষ্টরকম জানাজানিও হ'য়ে গেছে এতদিনে। কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়, তারা যেন পরস্পরকে পরিপূরণ ক'রে চলেছে। একদিকে আমরা রাখতে পারি তাঁর বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভূতির কবিতা বর্ণনাধর্মী, অনুষঙ্গময়, নস্টালজিয়ায় পরাক্রান্ত: যেমন 'মৃত্যুর আগে', 'অবসরের গান', 'হাওয়ার রাত', 'ঘাস', 'বনলতা সেন,' 'নগ্ন নির্জন হাত'—পাঠক আরো অনেক জুড়ে নিতে পারবেন— আমি 'নির্জন স্বাক্ষর' বা '১৩৩৩' ধরনের প্রেমের কবিতাকেও এরই অন্তর্গত করতে চাই। অন্য দিকে কাছে যে-সব কবিতা মননরূপী শয়তান অথবা দেবতার পরামর্শে লেখা, যেখানে লেখক বর্ণনার দ্বারা অন্য কিছু বলতে চেয়েছেন, যেখানে কবির আবেগ বাইরের জগতে প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছে, চিন্তার সঙ্গে গ্রথিত হ'য়ে আরো নিবিড়ভাবে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ করবো 'বোধ', 'ক্যাম্পে', আর সেই লাশ-কাটা ঘরের আশ্চর্য কবিতাটি, যার নাম দেয়া হয়েছিলো 'আট বছর আগের একদিন'। 'কয়েকটি লাইন'কে বলা যায় 'বোধ'-এর সঙ্গী-কবিতা—দুটিই কবির স্বগতোক্তি— প্রথমটিতে কবি নিজের শক্তির বিষয়ে সচেতন হ'য়ে ঘোষণা করছেন তাঁর

নূতনত্ব ('কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী, / আমি ব'হে আনি'), ব'লে দিচ্ছেন তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য কোনখানে ('উৎসবের কথা আমি কহি নাক', / পড়ি নাক' দুর্দশার গান / শুনি শুধু সৃষ্টির আহ্বান') ; আর দ্বিতীয়টিতে তিনি জীবনের সঙ্গে কাব্যের দ্বন্দ্বে পীড়িত, তাঁর 'বোধ' আর-কিছু নয়, তাঁরই কবিপ্রতিভা, যার তাড়নায় 'সকল লোকের মাঝে ব'সে আমার নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা'। আবার, তাঁর আবেগরঞ্জিত বেদনাময় বর্ণনার কাব্যেও বিভিন্ন বিভাগ করা যায় : প্রথমত, সান্ধ্য বা নৈশ কবিতা, বা যে-কবিতায় সকল সময়কেই সন্ধ্যার মতো মনে হয়, যেখানে আলো ম্লান, ছায়া ঘন, কুয়াশার পরদা ঝুলে আছে ('মাঠের গল্প', 'হায় চিল', 'বনলতা সেন', 'কুড়ি বছর পরে', 'শঙ্খমালা') ; দ্বিতীয়ত, আলো যেখানে উজ্জ্বল আর প্রবল অবয়ব নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ('অবসরের গান', 'ঘাস', 'শিকার', 'সিন্ধু-সারস'), আর তৃতীয়ত, যে-সব কবিতায় একাধারে স্থান পেয়েছে আলো আর অন্ধকার, রৌদ্র আর রাত্রি, কান্তি আর অবগুণ্ঠন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিকে আমি ফেলতে চাই না, কেননা বাংলার পল্লীপ্রকৃতির এই চিত্রশালাটিতে 'হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি'কে যদিও একবার দেখা যায়, আর 'ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ' ভোরবেলাটিকেও চিনতে পারি, তবু এর পক্ষপাত নৈশতার দিকেই, পড়তে-পড়তে আমাদের মন বারে-বারেই ছায়াচ্ছন্ন গাঢ়তায় মন্থর হ'য়ে আসে। আমি ভাবছিলাম 'হাওয়ার রাত' বা 'অন্ধকার'-এর মতো কবিতার কথা, যেখানে তারা-ভরা অন্ধকারের কথা বলতে-বলতে কবির হৃদয় 'দিগন্তপ্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে' ভ'রে যায়, যেখানে 'অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে' কবি হঠাৎ 'ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে' জেগে ওঠেন, দেখতে পান 'রক্তিম আকাশে সূর্য' আর 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী'। ভাবছিলাম 'নগ্ন নির্জন হাত'-এর বিস্ময়কর গঠনের কথা—কবিতাটির আরম্ভ অন্ধকারে, তার পটভূমিকাই ফাল্গুনের অন্ধকার, অথচ শেষের অংশে 'রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ' আর 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ' আমাদের মনে এমন একটি প্রদীপ্ত সমৃদ্ধির অভিঘাত রেখে যায় যে মনেই হয় না পুরো কবিতাটিতে আলো ছাড়া, উজ্জ্বলতা ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গ আছে। যেমন 'হায় চিল'-এ দুপুরবেলাতেই সন্ধ্যা নেমে আসে, তেমনি 'হাওয়ার রাত' কবিতায় অন্ধকারটাই আলোর উল্লাসে উতরোল হ'য়ে উঠলো—'মৃত্যুর আগে'র

ছবিগুলোর মতো এ-সব ছবি স্বপ্রতিষ্ঠ নয়, তারা কবির ভাবনা-বেদনারই প্রতিফলন।

৫

আলোচনার আরো অনেক ক্ষেত্র আছে। দেখানো যেতে পারে, বিদ্রূপের শক্তি তাঁর হাতে কী-রকম আত্মস্থ আর গম্ভীর হ'য়ে উঠেছিলো 'সোনার পিত্তলমূর্তি' অথবা 'অজর, অক্ষর অধ্যাপকে'র উদ্দেশে লেখা পঙক্তিগুলিতে,* কিংবা কেমন ক'রে আলোছায়ার দৃশ্যমান জগৎ থেকে তিনি স্বপ্নগোচর অতিবাস্তবের মায়ালোকে প্রবেশ করেছিলেন 'বিড়াল', 'ঘোড়া', 'সেই সব শেয়ালেরা' ধরনের কবিতায়। শেলি, কীটস, পূর্ব-ইয়েটস আর কোথাও-কোথাও সুইনবার্নকে তিনি কেমন ক'রে ব্যবহার করেছিলেন তা তুলনার দ্বারা দেখানো যেতে পারে; সহজেই প্রমাণ করা যায় যে ইয়েটস-এর 'O Curlew'-র তুলনায় তাঁর 'হায় চিল' অনেক বেশি তৃপ্তিকর কবিতা, আর 'The Scholars'-এর সঙ্গে 'সমারূঢ়ে'র সম্বন্ধে যেমন স্পষ্ট, তার স্বাতন্ত্র্যও তেমনি নির্ভুল। 'ওড টু এ নাইটিঙ্গেল'-এর কোনো-কোনো পঙক্তি 'অবসরের গান'-এ কেমন নতুন শস্য হ'য়ে ফ'লে উঠেছে, তাও সহজেই বোধগম্য। যদি কখনো কোনো পাঠক জীবনানন্দর

* তাঁর মধ্য পর্যায়ের কবিতায় মাঝে-মাঝে একটি সংক্ষুব্ধ বিবমিষা লক্ষ্য করা যায়— আসলে তার আরম্ভ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সময়েই, সেই সময়েই 'অন্ধকার' কবিতা লিখেছিলেন, যেখানে 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত পৃথিবী'তে কোটি-কোটি শূয়ারের আর্তনাদে'র 'উৎসব' দেখে তিনি 'অন্ধকারের অনন্ত মৃত্যু'র ভিতর মিশে যেতে চেয়েছিলেন। তারই কিছুকাল পরে 'আদিম দেবতারা' কবিতায় তীব্র হ'য়ে উঠলো জীবন ও কবিতার দ্বন্দ্ববোধজনিত বেদনা:

> অবাক হয়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি?
> রূপ কেন নির্জন দেবদারু-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
> পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?
> স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে— ব্যবহৃত— ব্যবহৃত— ব্যবহৃত— ব্যবহৃত হ'য়ে
> ব্যবহৃত— ব্যবহৃত—
> আগুন বাতাস জল, আদিম দেবতারা হো হো ক'রে হেসে উঠল:
> 'ব্যবহৃত— ব্যবহৃত হয়ে শূয়ারের মাংস হয়ে যায়?'

'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির'-এর অনেক কবিতাতেই এই বিবমিষা বা বিদ্রূপের আঘাত পড়েছে; তাঁর প্রৌঢ় বয়সের রচনার মধ্যে এটিকে একটি প্রধান সুর বললে ভুল হয় না।

অসংরক্ত, অ-মানবিক জগতে শ্রান্তি বোধ করেন, তাঁকে অনুরোধ করা যায় 'ক্যাম্পে' আর 'আট বছর আগের একদিন' পুনর্বার পড়তে—জীবনানন্দর সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই দুটি কবিতা সবচেয়ে প্রাণতপ্ত ও স্তরবহুল; এখানে তিনি মানুষের ঘুম আর জাগরণকে একই রকম 'সচ্ছল'ভাবে মেনে নিয়ে তৃপ্ত হননি ('জাগিবার কাল আছে—দরকার আছে ঘুমাবার; / এই সচ্ছলতা আমাদের'), নিজের কথা নিজে লঙ্ঘন ক'রে উৎসবের কথা বলেছেন, ব্যর্থতার গানও গেয়েছেন। 'ক্যাম্পে' কবিতায় মৃগয়ার গল্প অবলম্বন ক'রে 'প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ' তুলেছেন তিনি, মানবিক প্রেমের, যৌন প্রেমের, যা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে 'কোথাও ফড়িঙে কীটে, মানুষের বুকের ভিতরে', যার ক্ষমতার চাপে ক্ষমতাশালী মাংসাশী শিকারিদেরও হৃদয়গুলো 'বসন্তের জ্যোৎস্নায় মৃত মৃগদের' মতোই পাংশু হ'য়ে প'ড়ে থাকে। আর, 'মৃত্যুকে দলিত ক'রে' 'জীবনের গম্ভীর জয়' তিনি প্রচার করেছেন 'আট বছর আগের একদিন'-এ। এই কবিতাটি এতই দ্যোতনাময় যে এটিকে ভাঁজে-ভাঁজে খুলে দেখালে আলোচনার সহায় হ'তে পারে। এর আরম্ভ—'শোনা গেল লাসকাটা ঘরে / নিয়ে গেছে তারে।' ক্রমশ আমরা জানতে পারলাম যে কোনো-এক পুরুষ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে—আর এই খবরটি শুনেই কবি অনুভব করলেন—মৃত্যুকে নয়, তাঁর চারদিকে চাঁদ-ডুবে-যাওয়া অন্ধকারে 'জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততা'কে :

> তবুও তো পেঁচা জাগে ;
> গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
> আরেকটি প্রভাতের ইসারায়— অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।
>
> টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
> চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা
> মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

মনে পড়লো বাঁচার ইচ্ছার, বাঁচার চেষ্টার অন্যান্য উদাহরণ :

> রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি ;
> সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কতো দেখিয়াছি।...
> দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরন
> মরণের সাথে লড়িয়াছে ;

কিন্তু এই প্রাকৃত প্রেরণা মানুষের পক্ষে তো সর্বস্ব নয় :

চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা-একা ;
যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের— মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা
এই জেনে।

হয়তো গাছের ডাল প্রতিবাদ করেছিলো, ভিড় ক'রে বাধা দিয়েছিলো জোনাকিরা, থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা ইঁদুর ধরার প্রস্তাব এনে জীবনের 'তুমুল গাঢ় সমাচার' জানিয়েছিলো—কিন্তু চেতনার সংকল্পে প্রকৃতি বাধা দিতে পারলো না।

এর পর অনিবার্য প্রশ্ন : কেন মরলো লোকটা ? কোন দুঃখে ? কিসের ব্যর্থতায় ? না—কোনো দুঃখই ছিলো না ; স্ত্রী ছিলো, সন্তান ছিলো, প্রেম ছিলো, দারিদ্র্যের গ্লানিও ছিলো না। কিন্তু—

জানি— তবু জানি
নারীর হৃদয়— প্রেম— শিশু—গৃহ— নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়— সচ্ছলতা নয়—
আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;

আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত— ক্লান্ত করে ;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই…

যদি এই অচিকিৎস্য জীবন-ক্লান্তিতেই কবিতার শেষ হ'তো, তাহ'লে এটি এত দূর পর্যন্ত আলোচ্য হ'তো না। কিন্তু ঠিক শেষের ক-লাইনেই আবার আমরা অন্য একটি স্বর শুনলাম—যেন একটি ঢেউ স'রে যেতে-যেতে দ্বিগুণ বেগে ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো—কবি ফিরিয়ে আনলেন জরাজীর্ণ প্যাঁচাটাকে, যে আত্মহত্যায় বাধা দিতে পারেনি, কিন্তু জীবিতের কানে অবিরাম জ'পে যাচ্ছে তার প্রাণসত্তার আদিম আনন্দ। আর এই প্রগাঢ় পিতামহীর দৃষ্টান্তেই কবি উদ্বুদ্ধ হলেন—'আমরা দু-জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর

ভাঁড়ার'—মৃত্যু পায় হ'য়ে বেজে উঠলো জীবনের জয়ধ্বনি, আর—সেই-সঙ্গে—নির্বোধ ও পাশব জীবনের প্রতি চৈতন্যের বিদ্রূপ।

৬

তাঁর উপমা, বিশেষণ ও ভাষাপ্রয়োগ নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচিত হ'তে পারে। যেহেতু তিনি মুখ্যত ইন্দ্রিয়বোধের কবি, তাই উপমা তাঁর পক্ষে একটি প্রধান অবলম্বন, তাঁর হাতে বিশেষণও অনেক সময় উপমার মতো কর্মিষ্ঠ। 'শিকার' কবিতায় বত্রিশটি পঙক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে চোদ্দটি উপমা, 'মতো' শব্দের তেরো বার ব্যবহার; 'হাওয়ার রাত'-এ 'মতো'-র সংখ্যা আট। এতে যাঁরা আপত্তি করেন তাঁদের ভেবে দেখতে বলবো, ভিন্ন বস্তুর সঙ্গে তুলনা বা সমীকরণ ছাড়া বর্ণনার কোনো উপায় আছে কিনা, যে-কোনো কবিতায় কতখানি ছবি থাকে, আর কবি যদি জ্ঞানের ভাষায় কথা বলতে যান তাহ'লে তিনি কবি থাকেন আর কতটুকু। আর দুটি কথা বিবেচ্য: জীবনানন্দ একটিও উপমা প্রয়োগ না-ক'রে 'আকাশলীনা' ('সুরঞ্জনা, ঐখানে যেয়ো নাকো তুমি') বা 'সমারূঢ়' ('বরং নিজেই তুমি লেখো নাকো একটি কবিতা')-র মতো অজর কবিতা লিখেছেন;* আর তাঁর অনেক উপমাই সরল বা আক্ষরিক নয়, তা থেকে নানা স্তরে নানা ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে, যেমন গানের পরে অনুরণন। কাস্তের মতো চাঁদ, রবারের বলের মতো বুক, বরফের কুচির মতো স্তন—এই সব উপমার উপর আমি জোর দেবো না, কেননা এদের নির্ভর শুধু চোখে-দেখা বা হাতে-ছোঁয়া সাদৃশ্যের উপর, তাঁর আগে কেউ ব্যবহার করেননি ব'লেই এরা স্মরণীয়। আমি উল্লেখ করবো আরো আগেকার লেখা একটি পঙক্তি—

> আঁখি যার গোধূলির মতো গোলাপি, রঙিন—

পড়ামাত্রই আমাদের মনে যে-নূতনত্বের চমক লাগে সেটা অচিরেই কাটিয়ে উঠে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে ঠিক লাল রঙের চোখটাকে বোঝানো

* উপমা ও উৎপ্রেক্ষাকে আলাদা ক'রে দেখছি এখানে, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পেও তফাৎ আছে। 'হাঙরের ঢেউ' বা 'তোমার হৃদয় আজ ঘাস' বড়ো অর্থে উপমা হ'তে পারে, কিন্তু ব্যাকরণগত অর্থে নয়; আর সেই বড়ো অর্থ নিলে এ কথাই বলতে হয় যে কবিতার ভাষাই উপমা।

হচ্ছে না, সন্ধ্যারাগের মদির আবেশের দিকেই এর লক্ষ্য, আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে প'ড়ে যায় গোধূলির সঙ্গে বিবাহ-লগ্নের সংযোগ। 'মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন'—এটা হ'লো চাক্ষুষ উপমা, কিন্তু সেই আগুনই যখন সূর্যের আলোয় 'রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো' হ'য়ে যায়, তখন শুধু ফ্যাকাশে চেহারাটাই আমরা চোখে দেখি না, মনের মধ্যেও নির্বাপণের বেদনা অনুভব করি। কী উপমায়, কী বিশেষণে, একটি ইন্দ্রিয়ে আঘাত দিয়ে অন্য ইন্দ্রিয় জাগিয়ে তোলেন তিনি—'ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো পান' করতে হ'লে বর্ণ, গন্ধ আর আস্বাদকে পরস্পরের মধ্যে মিশিয়ে দিতে হয়; 'বলীয়ান রৌদ্র' বললে রোদ যেন আয়তন পেয়ে ঋজু হ'য়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, আবার সেই রোদকেই 'কচি লেবুপাতার মতো' নরম আর সবুজ বললে তাকে দেখা যায় তখনও-শিশির-শুকিয়ে-না-যাওয়া মাটির উপর সুগন্ধি হ'য়ে শুয়ে থাকতে। এরই পাশে-পাশে 'পরদায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের স্বেদ' আর সন্ধ্যাবেলায় 'জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীর' চিন্তা করলে রোদ বস্তুটাকে আমরা যেন কোনো স্থাপত্যকর্মের মতো প্রদক্ষিণ ক'রে-ক'রে দেখে নিতে পারি। তেমনি, রাত্রি কখনো 'বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে', কখনো 'জ্যোৎস্নার উঠানে খড়ের চালের ছায়া'টুকুর মধ্যে স্তব্ধ ও সংহত, কখনো 'নক্ষত্রের রুপালি আগুনে' উজ্জ্বল, আর কখনো দেখি সন্ধ্যার অন্ধকার 'ছোটো-ছোটো বলের মতো' পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। যে-দুটো বস্তু স্বভাবতই খুব কাছাকাছি তাদের মধ্যে উপমাসম্বন্ধ অপ্রচলিত কিন্তু জীবনানন্দ কখনো-কখনো তাদের একত্র ক'রে দুটোকেই আরো স্পষ্ট ক'রে ফোটাতে পেরেছেন ('কাঁচা বাতাবির মতো ঘাস', 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা'); আবার, যে-দুটো বস্তু অপরিমেয়রূপে অ-সদৃশ, তাদেরও একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে তাঁর বিরাট কল্পনাশক্তি, যার ফলে আমরা পেয়েছি 'চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাস', 'পাখির নীড়ের মতো' বনলতা সেনের চোখ, আর আত্মঘাতীর জানলার ধারে 'অদ্ভুত আঁধারে···উটের গ্রীবার মতো কোনো এক' প্রবল নিস্তব্ধতা। এ-সব উপমা ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম ক'রে ভাবনার মধ্যে আন্দোলন তোলে, সাদৃশ্যের সূত্রগুলি ছড়িয়ে পড়ে অনুভূতির রহস্যলোকে। বউবাজারের নৈশ ফুটপাতে, যেখানে কুষ্ঠরোগী, 'লোল নিগ্রো' আর 'ছিমছাম ফিরিঙ্গি যুবকে'র ছায়াছবির উপর ইহুদি গণিকার আধো-জাগা গানের গলা ঝ'রে পড়ছে, সেখানকার বাতাস নেহাৎই প্রাকৃত অর্থে শুকনো নয়, যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলায়

চাপে দেশের মধ্যে সমস্ত রস শুকিয়ে গিয়ে চীনেবাদামের খোলার মতো শূন্য আর ভঙ্গুর হ'য়ে উঠলো, এই রকম একটা ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। কোনো মহিলার চোখের আকার নিশ্চয়ই পাখির বাসার মতো হয় না, কিন্তু ক্লান্ত প্রাণের পক্ষে কখনো কোনো চোখ আশ্রয়ের নীড় হ'তে পারে। যে-মানুষ আপন হাতে মরতে চলেছে তার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলো 'উটের গ্রীবার মতো' নিস্তব্ধতা, এই অপরিচিত ও অপ্রত্যাশিত ছবিতে আসন্ন আত্মঘাতের আবহাওয়াটা আরো থমথমে ও ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। হয়তো এখানে আরো কিছু ইঙ্গিত আছে, এই 'উট' যেহেতু মৃত্যুর দিকেই প্রলুব্ধ করছে, তাই মনে হয় উপমাটি সেই প্রাচীন কাহিনী থেকে আহৃত, যেখানে উট এসে প্রথমে শুধু ঘাড়টুকু রাখার অনুমতি চাইলো, তারপর প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে সমস্ত ঘর জুড়ে গৃহস্থকেই বহিষ্কৃত ক'রে দিলে। অনেক বিশেষণও এই রকম মনস্তত্ত্বঘটিত : আত্মহত্যার উদ্‌যোগের সময় অশ্বত্থের 'প্রধান আঁধার', জীবনপ্রেমিক মশক-সংঘে সমাকীর্ণ 'যূথচারী আঁধার', শিকারের পরে শিকারিদের 'নিরপরাধ' ঘুম, 'প্রগাঢ় পিতামহী' প্যাঁচার জীবনস্পৃহার 'তুমুল গাঢ় সমাচার'।

'সমাচার' কথাটাও লক্ষণীয়। মিশনারিরা 'গসপেল'-এর আক্ষরিক অনুবাদ করেন 'সুসমাচার'—এ-কথা মনে রাখলেই ধরা পড়ে যে শব্দটিতে এখানে 'খবরে'র চাইতে অনেক বেশি কিছু বোঝাচ্ছে। শুধু বিশেষণে নয়, বিশেষ্যপদেও, আর সাধারণভাবে ভাষাব্যবহারে তাঁর দুঃসাহসী আক্রমণ বারে-বারেই রত্ন ছিনিয়ে এনেছে বিদেশী শব্দ, গেঁয়ো শব্দ, কথ্য বুলি, অপ্রচলিত শব্দ, আর যে-সব শব্দকে আশাহীনরূপে গদ্য ব'লে আমরা জেনেছি—এই সব ভাণ্ডারের উপর সহজ অধিকার তাঁর কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ। ছন্দব্যবহারে বৈচিত্র্য নেই, আপাতরমণীয়তাও নেই, কিন্তু সেজন্যে কোনো অভাববোধও নেই আমাদের; যা আছে, তার সম্মোহন এত ব্যাপক যে তিনি আজকের দিনেও অনায়াসে এবং অনাক্রমণীয়ভাবে 'ছিল-দেখিল' মিল দিতে পেরেছেন, যা অন্য কোনো কবির পক্ষেই সম্ভব হ'তো না। তাঁর কাব্যের পাঠক শুধু বিশেষণের প্রভাবে আবিষ্ট হবেন বার-বার, শিহরিত হবেন পুনরুক্তির আঘাতে ('এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে, জানি না সে শুয়ে আছে কিনা'; 'ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস / অথবা সবুজ বুঝি ঘাস'), মুগ্ধ হবেন যখন হঠাৎ এক-একটি অত্যন্ত চেনা আর গদ্যধর্মী কথার প্রভাবে পুরো পঙক্তিটি আলোকিত হ'য়ে ওঠে।

আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই— নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
বিয়োবার দেরি নাই— রূপ ঝ'রে পড়ে তার—
শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে ;

ভব্য সমাজে অনুচ্চার্য একটি ক্রিয়াপদের জন্যই হেমন্ত ঋতুর এই ছবিটি এমন উজ্জ্বল হ'তে পারলো। তেমনি, বিকেলের আলোর স্বচ্ছ গভীরতায়, শুধু বাইরের প্রকৃতি নয়— আমাদের হৃদয় সুদ্ধ ডুবে গেলো শুধু একটা 'মাইল' শব্দ আছে ব'লে—

অকূল সুপুরিবন স্থির জলে আলো ফেলে এক মাইল শান্ত কল্যাণ
হয়ে আছে।

দৃশ্যটিকে 'এক মাইলে'র মধ্যে সীমিত করা হয়েছে ব'লেই এখানে অসীমের আভাস লাগলো।

উদাহরণ আর বাড়াতে চাই না, কিন্তু এটুকু না-বললে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ হয় না যে তাঁর কাব্যে গদ্য ভাষা এমনভাবে নিবিষ্ট হয়েছিলো যে রীতিমতো বিপজ্জনক শব্দও তাঁর আদেশে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো কাজ ক'রে গেছে—

হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু ক'রে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে

প্রেম ছিলো, আশা ছিলো,…তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত ?

বলা বাহুল্য, 'ভূত' বা 'ঠ্যাং'-এর মতো শব্দের ব্যবহার অন্য যে-কোন কবির পক্ষে হাস্যকর হ'তো।

৭

তাঁর অনন্যতা বিষয়ে অনেক পাঠকই আজকের দিনে সচেতন, আর তিনি যে আমাদের 'নির্জনতম' কবি, অত্যধিক পুনরুক্তিবশত এই কথাটার ধার ক'য়ে গেলেও এর যাথার্থ্যে আমি এখনও সন্দেহ করি না। 'আমার মতন কেউ নাই আর'—তাঁর এই স্বগতোক্তি প্রায় আক্ষরিক অর্থেই সত্য। যৌবনে, যখন মানুষের মন স্বভাবতই সম্প্রসারণ খোঁজে, আর কবির মন বিশ্বজীবনে যোগ দিতে চায়, সকলের সঙ্গে মিলতে চায় আর সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে, সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের ঋতুতেও তিনি বুঝেছেন যে তিনি স্বতন্ত্র, 'সকল লোকের মধ্যে আলাদা', বুঝেছেন যে তাঁর গান জীবনের 'উৎসবের' বা

'ব্যর্থতার' নয়, অর্থাৎ বিদ্রোহের, আলোড়নের নয়—তাঁর গান সমর্পণের, আত্মসমর্পণের, স্থিরতার। 'পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত' রোমান্টিক হ'য়েও, তাই, তিনি ভাবের দিক থেকে রোমান্টিকের উল্টো*; আধুনিক বাংলা কাব্যের বিচিত্র বিদ্রোহের মধ্যে তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। বস্তুত, তাঁকে যেন বাংলা কাব্যের মধ্যে আকস্মিকরূপে উদ্ভূত ব'লে মনে হয়; সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের ক্ষণিক প্রভাবের কথা বাদ দিলে—তিনি যে মহাভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত তাঁর পূর্বজ স্বদেশীয় সাহিত্যের কোনো অংশের দ্বারা কখনো সংক্রমিত হয়েছিলেন, বা কোনো পূর্বসূরির সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ জন্মেছিলো, এমন কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই বললেই চলে। এ থেকে এমন কথাও মনে হ'তে পারে যে তিনি বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যস্রোতের মধ্যে একটি মায়াবী দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন ও উজ্জ্বল; এবং বলা যেতে পারে যে তাঁর কাব্যরীতি—'হুতোম' অথবা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের মতো—একেবারেই তাঁর নিজস্ব ও ব্যক্তিগত, তাঁরই মধ্যে আবদ্ধ, অন্য লেখকের পক্ষে সেই রীতির অনুকরণ, অনুশীলন বা পরিবর্ধন সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে চলতিকালের কাব্যরচনার ধারাকে তিনি গভীরভাবে স্পর্শ করেছেন, সমকালীন ও পরবর্তী কবিদের উপর তাঁর প্রভাব কোথাও-কোথাও এমন সূক্ষ্মভাবে সফল হ'য়ে উঠেছে যে বাইরে থেকে হঠাৎ দেখে চেনা যায় না। বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আসনটি ঠিক কোথায় সে-বিষয়ে এখনই মনস্থির করা সম্ভব নয়, তার কোনো প্রয়োজনও নেই এই মুহূর্তে; এই কাজের দায়িত্ব আমরা তুলে দিতে পারি আমাদের ঈর্ষাভাজন সেই সব নাবালকদের হাতে, যারা আজ প্রথম বার জীবনানন্দর স্বাদুতাময় আলো-অন্ধকারে অবগাহন করছে। আপাতত, আমাদের পক্ষে, এই কথাই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মর্তব্য যে 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে'র 'অগ্নিপরিধি'র মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি 'দেবদারু গাছে' 'কিন্নরকণ্ঠ' শুনেছিলেন, তিনি এই উদ্‌ভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণস্বরূপ।

'কালের পুতুল'

* অর্থাৎ, এক হিশেবে তিনি বাংলা কাব্যের প্রথম খাঁটি আধুনিক।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কবি

এই বইয়ের* কবিতাগুলি যাঁর রচনা, তিনি বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি, তাঁর মতো নানাগুণসমন্বিত পুরুষ রবীন্দ্রনাথের পরে আমি অন্য কাউকে দেখিনি। বহুকাল ধ'রে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখেছিলুম ব'লে, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে একটি প্রশ্ন মাঝে-মাঝে আমার মনে জাগছে: যাকে আমরা প্রতিভা বলি, সে-বস্তুটি কী? তা কি বুদ্ধিরই কোনো উচ্চতর স্তর, না কি বুদ্ধির সীমাতিক্রান্ত কোনো বিশেষ ক্ষমতা, যার প্রয়োগের ক্ষেত্র এক ও অনন্য? ইংরেজি 'genius' শব্দে অলৌকিকের যে-আভাস আছে, সেটা স্বীকার্য হ'লে প্রতিভাকে এক ধরনের আবেশ বলতে হয়, আর সংস্কৃত 'প্রতিভা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ অনুসারে তা হ'য়ে ওঠে বুদ্ধির দীপ্তি, মেধার নামান্তর। যদি প্রতিভাকে অলৌকিক ব'লে মানি, তাহ'লে বলতে হয় যে সহজাত বিশেষ একটি শক্তির প্রভাবেই উত্তম কবিতা রচনা সম্ভব, রচয়িতা অন্যান্য বিষয়ে হীনবুদ্ধি হ'তে পারেন এবং হ'লে কিছু এসে যায় না, উপরন্তু ঐ বিশেষ ক্ষমতাটি শুধু দৈবক্রমে ও সহজাতভাবেই প্রাপণীয়। পক্ষান্তরে, প্রতিভাকে উন্নত বুদ্ধি ব'লে ভাবলে কবি হ'য়ে ওঠেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর ধীশক্তি কোনো-কোনো ব্যক্তিগত বা ঐতিহাসিক কারণে কাব্যরচনায় নিয়োজিত হয়েছিলো, কিন্তু সেই কারণসমূহ ভিন্ন হ'লে যিনি বণিক বা বিজ্ঞানী বা কূটনীতিরূপে বিখ্যাত হ'তে পারতেন। এই দুই বিকল্পের মধ্যে কোনটা গ্রহণীয়?

বলা বাহুল্য, এই প্রশ্ন আমরা শুধু উত্থাপন করতে পারি, এর উত্তর দেয়া সকলেরই সাধ্যাতীত। কেননা ইতিহাস থেকে দুই পক্ষেই বহু সাক্ষী দাঁড় করানো যায়, তাঁরা অনেকে আবার স্ববিরোধে দোলায়মান। বহুমুখী গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথের 'বিরুদ্ধে' আছেন একান্ত হ্যেল্ডার্লিন ও জীবনানন্দ, মনীষী শেলি ও কোলরিজের পাশে উন্মাদ ব্লেক ও অশিক্ষিত কীটস, উৎসাহী বোদলেয়ারের পরে শীতল ও নিরঞ্জন মালার্মে। জগতের কবিদের মধ্যে এত বিভিন্ন ও বিরোধী ধরনের চরিত্র দেখা যায়, এত বিচিত্র প্রকার কৌতূহলে বা অনীহায় তাঁরা আক্রান্ত, এত বিভিন্নভাবে তাঁরা কর্মিষ্ঠ ও ও নিষ্ক্রিয়, এবং উৎসুক ও উদাসীন

---

* নাভানা-কর্তৃক প্রকাশিত 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহে'র ভূমিকা।

ছিলেন, যে ঠিক কোন লক্ষণটির প্রভাবে তাঁরা সকলেই অমোঘভাবে কবি হয়েছিলেন, তা আবিষ্কার করার আশা শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়। এবং কবিত্বের সেই সামান্য লক্ষণ—যদি বা কিছু থাকে—তা আমার বর্তমান নিবন্ধের বিষয়ও নয়; এখানে আমি বলতে চাচ্ছি যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এমন একজন কবি, যাঁর প্রতিভার প্রাচুর্যের কথা ভাবলে প্রায় অবাকই লাগে যে কবিতা লেখার মতো একটি নিরীহ, আসীন ও সামাজিক অর্থে নিষ্ফল কর্মে তিনি গভীরতম নিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

কেননা সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও মনস্বী, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী বুদ্ধির অধিকারী, তথ্যে ও তত্ত্বে আসক্ত, দর্শনে ও সংলগ্ন শাস্ত্রসমূহে বিদ্বান; তাঁর পঠনের পরিধি ছিলো বিরাট, ও বোধের ক্ষিপ্রতা ছিলো অসামান্য। সেই সঙ্গে যাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান, সাংসারিক ও সামাজিক সুবুদ্ধি, তাও পূর্ণমাত্রায় ছিলো তাঁর, কোনো কর্তব্যে অবহেলা করতেন না, গার্হস্থ্য ধর্মপালনে অনিন্দনীয় ছিলেন, ছিলেন আলাপদক্ষ, রসিক, প্রখর ব্যক্তিত্বশালী, বেশবাসে সযত্ন, আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খে সচেতন এবং সর্ববিষয়ে উৎসুক ও মনোযোগী। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে যে, একটু চেষ্টা করলেই, বাংলা সাহিত্যের চাইতে আপাত-বৃহত্তর কোনো ব্যাপারে নায়ক হ'তে পারতেন তিনি; আমার এক তরুণ বন্ধুর সঙ্গে এ-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত যে সুধীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক হ'লে অনিবার্যত নেতৃপদ পেতেন, বা আইনজীবী হ'লে সেই পেশার উচ্চতম শিখরে পৌঁছতে তাঁর দেরি হ'তো না; তাঁকে অনায়াসে কল্পনা করা যেতো রাজমন্ত্রী বা রাষ্ট্রদূতরূপে, তত্ত্বচিন্তায় নিবিষ্ট হ'লে নতুন কোনো দর্শনের প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না তাও নয়। অথচ এর কোনোটাই তিনি করলেন না, কবিতা লিখলেন। পিতার কাছে আইনশিক্ষা আরম্ভ ক'রে শেষ করলেন না; এম. এ. পড়া অসমাপ্ত রেখে ছেড়ে দিলেন; সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরওঅর্ড' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'য়েও রাজনৈতিক কর্মের দিকে প্রবর্তনা পেলেন না; বীমাপ্রতিষ্ঠানে কর্মজীবন আরম্ভ ক'রেও লক্ষ্মীর বাসস্থানটিকে পরিহার করলেন। এ কি এক তরুণ ধনীপুত্রের খেয়ালমাত্র, না কি এর পিছনে কোনো প্রচ্ছন্ন উদ্যম কাজ ক'রে যাচ্ছে? কেউ-কেউ বলেছেন যে তিনি যেমন তাঁর পিতার 'বৈদান্তিক আতিশয্যে' উত্ত্যক্ত হ'য়ে 'অনেকান্ত জড়বাদে'র আশ্রয় নিয়েছিলেন, তেমনি তাঁর দেশহিতৈষী কর্মবীর পিতাকে থিয়সফিতে আত্মবিলোপ করতে দেখে সমাজসেবায় তাঁর আস্থা ভেঙে যায়। এই যুক্তিকে আর-একটু প্রসারিত ক'রে

হয়তো বলা যায় যে দেশ, কাল ও পরিবারের আপতিক সন্নিপাতের ফলে জনকর্মে উৎসাহ হারিয়ে, তিনি বেছে নিলেন সেই একটি কাজ, যা শব্দময় হ'য়েও নীরব, এবং সর্বজনের প্রতি উদ্দিষ্ট হ'লেও নিতান্ত ব্যক্তিগত। কিন্তু সত্যি কি তা-ই? না কি তাঁর নাড়িতেই কবিতা ছিলো, দেহের তন্তুতে ছিলো বাক্ ও ছন্দের প্রতি আকর্ষণ, তাই অন্য কোনো পথে যাবার তাঁর উপায় ছিলো না, অন্যান্য এবং অধিকতর প্রভাবশালী বৃত্তির দিকে বিপুল সম্ভাবনা নিয়েও তাই তাঁকে কবি হ'তে হ'লো? তিনি কি অন্যবিধ কীর্তির আহ্বান উপেক্ষা ক'রে কবিতা লিখতে বসেছিলেন, না কি মন্ত্রমুগ্ধ কান নিয়ে অন্য কোনো আহ্বান তিনি শুনতেই পাননি? মূল্যবান জেনেও কোনো-কিছু ত্যাগ করেছিলেন, না কি বর্জন করেছিলেন শুধু সেই সব, যা তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর, বরণ করেছিলেন শুধু তা-ই, যেখানে তাঁর সার্থকতা নিহিত?

এ-কথার উত্তরে আমি বলতে বাধ্য যে জগতের অন্যান্য উত্তম কবিদের মতো, সুধীন্দ্রনাথও ছিলেন—স্বভাবকবি নন, স্বাভাবিক কবি। তা যদি না হ'তো, তাহ'লে তাঁর মতো মেধাবী ব্যক্তি কবিতা নামক বায়বীয় ব্যাপার নিয়ে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করতেন না। তাঁর সামনে, রবীন্দ্রনাথের মতো, সুযোগ ছিলো অপর্যাপ্ত, ব্যক্তিত্বে ছিলো অন্য নানা গুণপনা; সে-সবের সদ্ব্যবহারও তিনি করেছিলেন। কিন্তু আমি যাঁদের স্বাভাবিক কবি বলছি—আর তাঁরা ছাড়া সকলেই অকবি—তাঁরা লোকমানসে নিতান্ত কবিরূপেই প্রতিভাত হ'য়ে থাকেন, তাঁদের ক্ষমতার অন্যান্য বিকিরণ শেষ পর্যন্ত সেই একই অগ্নিতে লীন হ'য়ে যায়। গ্যেটেকে জগতের লোক কবি ছাড়া অন্য কিছু ব'লে ভাবে কি? জমিদার, ধর্মগুরু, শিক্ষাব্রতী, দেশপ্রেমিক, গ্রামসেবক, বিশ্বপ্রেমিক—রবীন্দ্রনাথ তো কত কিছুই ছিলেন, কিন্তু তাঁর একটিমাত্র মৌলিক পরিচয়ের মধ্যে অন্য সব গৃহীত হ'য়ে গেলো। তেমনি, সুধীন্দ্রনাথের অন্য যে-সব চরিত্রলক্ষণ উল্লেখ করেছি, বা করিনি—তাঁর অধীত জ্ঞান, মনীষিতা, আলাপনৈপুণ্য, অসামান্য প্রফুল্লতা ও সামাজিক বৈদগ্ধ্য, সম্পাদক ও গোষ্ঠীনায়ক হিশেবে স্মরণীয় কৃতিত্ব তাঁর—এই সবই তাঁর কবিত্বের অনুষঙ্গ, তাঁর কবিতার পক্ষে অনুকূল বা বিরোধী ধাতু হিশেবে প্রয়োজনীয়; যদি তিনি কবি না-হতেন, তাহ'লে তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব এ-রকম হ'তো না, এবং যদি ভিন্ন ধরনের কবি হতেন তাহ'লে তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ধরনের হ'তো।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তের সৌজন্যক্রমে সুধীন্দ্রনাথের অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি-পুস্তক দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। ছাপার অক্ষরে তাঁর যে-সব কবিতার সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেগুলির আদি ও পরবর্তী লেখন সবই রক্ষিত আছে, তাছাড়া আছে দুটি প্রাথমিক খাতা, যাতে তাঁর কাব্যরচনার সূত্রপাত হয়েছিলো। সর্বপ্রথম খাতাটির তারিখ বঙ্গাব্দ ১৩২৯, অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ ১৯২২, সুধীন্দ্রনাথের বয়স তখন একুশ। নামপত্রে লেখা: 'শ্রীশ্রীদুর্গামাতা সহায়। শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ১৩৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা' (মূলের বানান উদ্ধৃত হ'লো।) ভিতরের পাতাগুলোতে আছে কম্প্র হাতে মেলানো পদ্য, ছয় বা আট পঙক্তি থেকে দু-তিন পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাপ্তি তাদের, তাতে বানান অস্থির ও ছন্দ ভঙ্গুর; বাংলা ভাষা ও বাংলা ছন্দ—এই দুই অনমনীয় উপাদানের সঙ্গে সংগ্রামের চিহ্ন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। হস্তলিপিও কাঁচা, এবং একেবারে ভিন্ন ধরনের, অক্ষরগুলি কোণবহুল ও বিশ্লিষ্ট, তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব একেবারে নেই, এবং আমাদের পক্ষে তা সুধীন্দ্রনাথের ব'লে ধারণা করা সহজ নয়। এটা কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো যে সুধীন্দ্রনাথ, একুশ বছর বয়সে, যখন রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' পর্যন্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রায় সমগ্র কাব্য বেরিয়ে গেছে, তখন ঐ রকম কাঁচা লেখা লিখেছিলেন?

এর উত্তরে আমি এই তথ্যটি উপস্থিত করবো যে সুধীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে বাংলা ভাষা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলো না। তাঁর বাল্যশিক্ষা ঘটেছিলো কাশীতে; আনি বেসান্ট কর্তৃক স্থাপিত সেই বিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি ভালোভাবে শিখেছিলেন, কিন্তু বাংলা চর্চার তেমন সুযোগ পাননি। শুনেছি, কৈশোরে কলকাতায় ফিরে মাঝে-মাঝে মাতার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতেন। মাতৃভাষাকে স্বাধিকারে আনতে তাঁর যে কিছু বেশি সময় লেগেছিলো তাতে অবাক হবার কিছু নেই; যা লক্ষণীয়—এবং বর্তমান ও ভাবীকালের তরুণ লেখকদের পক্ষে শিক্ষণীয়—তা এই যে মাতৃভাষাকে স্ববশে আনবার জন্য, ও নিজের কবিত্বশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, দিনে-দিনে অনলসভাবে অনবরত তিনি 'উদ্যমের ব্যথা' সহ্য করেছিলেন। তাঁর খাতাগুলিতে দেখা যায়, বাংলা ভাষার কবিতার পঙক্তিকে ইংরেজি ধরনে বিশ্লেষ ক'রে-ক'রে তিনি বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বুঝে নিচ্ছেন, কোথাও দেখা দিচ্ছে পঠিতব্য পুস্তকের তালিকা, কোথাও পর-পর কতগুলো মিল লিখে রাখছেন। এরই পরিণতিস্বরূপে পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই, 'পথ' নামক কবিতার আদি লেখনের প্রতিটি পঙক্তি উচ্ছেদ ক'রে

তারই ফাঁকে-ফাঁকে এক-একটি নতুন পঙক্তি রচনা করছেন ; দেখতে পাই 'সংবর্তে'র ঈশিত্ব, 'যযাতি'র অতুলনীয় কলাকৌশল।

আমার বিশ্বাস, সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ প'ড়ে আমি যা বুঝিনি, তাঁর পাণ্ডুলিপি-পুস্তকের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের ফলে তাঁর সেই গোপন কথাটি আমি ধরতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি, কেন জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর একাত্মবোধ ঘটেছিলো—ধরা যাক তাঁরই মতো আত্মজৈবনিক কবি পোল ভেরলেনের সঙ্গে নয়, স্বভাবে যিনি তাঁর একেবারে বিপরীত, সেই মালার্মের সঙ্গে। সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন তাঁর স্বভাবেরই প্রণোদনায়, কিন্তু তাঁর সামনে একটি প্রাথমিক বিঘ্ন ছিলো ব'লে, এবং অন্য অনেক কবির তুলনায় যৌবনে তাঁর আত্মচেতনা অধিক জাগ্রত ছিলো ব'লে, তিনি প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন—যা আমার উপলব্ধি করতে অন্তত কুড়ি বছরের সাহিত্যচর্চায় প্রয়োজন হয়েছিলো—যে কবিতা লেখা ব্যাপারটা আসলে জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম, ভাবনার সঙ্গে ভাষার, ও ভাষার সঙ্গে ছন্দ, মিল, ধ্বনিমাধুর্যের এক বিরামহীন মল্লযুদ্ধ। তাঁর প্রবৃত্তি তাঁকে চালিত করলে কবিতার পথে—সে-পর্যন্ত নিজের উপর তাঁর হাত ছিলো না, কিন্তু তারপরেই বুদ্ধি বললে, 'পরিশ্রমী হও।' এবং বুদ্ধির আদেশ শিরোধার্য ক'রে অতি ধীরে সাহিত্যের পথে তিনি অগ্রসর হলেন, অতি সুচিন্তিতভাবে, গভীরতম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে। তাঁর প্রথম খাতায় অঙ্কিত সেই মর্মস্পর্শী 'শ্রীশ্রীদুর্গামাতা সহায়'—তাঁর রক্ষণশীল হিন্দু বাঙালি পরিবারের স্বাক্ষরটুকু—এতেও বোঝা যায় কী-রকম নিষ্ঠা নিয়ে, আত্মসমর্পণের নম্রতা নিয়ে, তিনি কাব্যরচনা আরম্ভ করেছিলেন। এই পর্যায়ের রচনার মধ্যে অনেক ছোটোগল্প বা উপন্যাসেরও খশড়া পাওয়া যায়, তার কোনো-কোনোটি সমাপ্ত ও ঔৎসুক্যজনক। সাত বছরের অনুশীলনের ফলে পৌঁছলেন 'তন্বী' পর্যন্ত, যে-পুস্তক, তার বিবিধ আকর্ষণ সত্ত্বেও, তাঁর পরবর্তী কবিতাসমূহের তুলনায় আজকের দিনে কৈশোরক রচনা ব'লে প্রতিভাত হয়।

১৯২৯-এ প্রথমবার তিনি দেশান্তরে গেলেন, প্রায় সংবৎসরকাল প্রবাসে কাটলো, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানে ও আমেরিকায়, তারপর একাকী য়োরোপে। এই সময়টি তাঁর কবিজীবনের ক্রান্তিকাল ; এই সময়েই, তিনি যাকে অভিজ্ঞতা বলতেন, তা তাঁর কবিতার মধ্যে প্রথম প্রবেশ করে। সঙ্গে খাতাপত্র নিয়েছিলেন, জাপানের জাহাজে আরম্ভ করলেন একটা ভ্রমণবৃত্তান্ত, পেনসিলে ও কালিতে বিবিধ গদ্য-পদ্য রচনা, দেখে মনে হয় রোজই কিছু-না-কিছু লিখছেন।

আমরা সাগ্রহে লক্ষ করি, কেমন ক'রে, সেই প্রথম খাতার পর থেকে, ক্রমশ তাঁর ভাষা বদলাচ্ছে, ভাব বদলাচ্ছে, দেখা দিচ্ছে ভাবুকতা ও সংহতি, সুন্দর-ভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে হস্তাক্ষর। তারপর রোমাঞ্চিত হ'য়ে আবিষ্কার করি আমাদের বহুপরিচিত কতিপয় কবিতা—'অর্কেস্ট্রা'র পর্যায়ভুক্ত—কোনোটির রচনাস্থল আমেরিকা থেকে য়োরোপগামী তরণী, কোনোটির বা রাইনের তীরবর্তী নগর। ইতিমধ্যে কিছু-একটা ঘ'টে গেছে; ভূলোক হয়েছে আরো বাস্তব, দ্যুলোক উজ্জ্বলতর; জেমস জয়স যাকে 'এপিফ্যানি' বলেছিলেন আর রবীন্দ্রনাথ, 'স্বপ্নভঙ্গ', তেমনি কোনো উন্মীলনের প্রসাদ তিনি লাভ করেছেন; প্রকৃতি ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগে ও চক্রান্তে বাংলা ভাষায় আবির্ভূত হয়েছেন এক নতুন বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ।

তিনি কি বুঝেছিলেন যে তাঁর সাত-বৎসরব্যাপী পরিশ্রম এবারে পুরস্কৃত হয়েছে? বোঝেননি তা তো হ'তে পারে না, কেননা তাঁর নিরন্তর সাধনা ছিলো আত্মোপলব্ধি। আর সেইজন্যেই, তৃপ্তির তিলতম অবকাশ নিজেকে না-দিয়ে, তিনি আরো ব্যাপকভাবে প্রস্তুতির যজ্ঞে অবতীর্ণ হলেন; প্রকাশ করলেন 'পরিচয়', পাঠ করলেন যা-কিছু পাঠযোগ্য, বৈঠক জমালেন শুক্রবারে, বন্ধু বেছে নিলেন সাহিত্যিক ও মনীষীদের মধ্যে, লিখলেন পুস্তক-সমালোচনা, প্রবন্ধ, ও ছদ্মনামে ছোটোগল্প, তিনটি য়োরোপীয় ভাষা থেকে কবিতা ও গদ্য অনুবাদ করলেন। আর তাঁর নিজের কবিতা? এই সবই তো তাঁর কবিতারই ইন্ধন, এই সমস্ত-কিছুর প্রভাব ও অভিঘাত, উদ্বৃত্ত ও অনুষঙ্গ, তাদের যোগ ও বিয়োগের অঙ্কে সর্বশেষ যে-ফলটুকু দাঁড়ায়, তাঁর কবিতা তো তা-ই। তাঁর 'পরিচয়' পত্রিকা তাঁর কবিতার পাঠক সৃষ্টি করেছে, কবিতার শ্রীবৃদ্ধি করেছে তাঁর উদ্ভাবিত শব্দসমূহ, দার্শনিক প্রবন্ধসমূহ স্থাপন করেছে সমকালীন জগতের সঙ্গে তাঁর কবিতার সম্বন্ধ, সাহিত্যিক প্রবন্ধসমূহ বুঝিয়ে দিয়েছে তাঁর কবিতার আদর্শ কী এবং সিদ্ধি কোনখানে, এবং অনুবাদগুচ্ছ বর্ধিত করেছে স্বাধীন রচনার উপর তাঁর কর্তৃত্ব। সবই কবিতার জন্য। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে ন্যূনতম কথা এই বলা যায় যে তাঁর মতো বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে আর-কেউ বাংলা ভাষায় কবিতা লিখতে অগ্রসর হননি; আর অন্য একটি কথা—উচ্চতম কিনা জানি না—যা আমরা বলতে বাধ্য, তা এই যে এক অবোধ্য, নির্বোধ ও দুঃশাসন বিশ্বের বুকে মানুষের মন কেমন ক'রে অঙ্কিত ক'রে দেয় তার ইচ্ছাশক্তিকে, স্থাপন করে শব্দের প্রভাবে এমন এক শৃঙ্খলা ও সার্থকতা, যা একাধারে

ক্ষণকালীন ও শাশ্বত—এই লোমহর্ষক প্রক্রিয়াটিকে সুধীন্দ্রনাথের কবিজীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করি। কোনো-কোনো কবি প্রক্রিয়াটিকে গোপনে রেখে যান, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ তাঁর সংগ্রামের চিহ্ন বীরের মতো অঙ্গে ধারণ করেছেন। জয়ী হ'য়েও তিনি এ-কথা ভোলেননি যে শান্তি দেবতারই ভোগ্য, মানুষের জীবনকে অর্থ দেয় শুধু প্রচেষ্টা। আর এইজন্যেই প্রৌঢ়বয়সে তিনি বলেছিলেন যে 'মালার্মের কাব্যাদর্শ' তাঁর অম্বিষ্ট; এইজন্যেই প্রেরণার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান এমন পৌনঃপুনিক। তাঁর কবিতা কোনো দিক থেকেই মালার্মের মতো নয়—তা নয় ব'লে আমি অন্তত খেদ করি না; ভুল হবে তাঁকে সিম্বলিস্ট ব'লে ভাবলে; তাঁর সঙ্গে মালার্মের একমাত্র সাদৃশ্য দৈববর্জনের সংকল্পে, স্বায়ত্তশাসনের উৎকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু মানুষের পক্ষে দৈববর্জন কি সম্ভব? এই যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অধ্যবসায়ের শক্তি, এও কি দৈবেরই দান নয়? অন্তত সুধীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আমি নিশ্চয়ই বলবো যে সেই প্রথম কাঁচা হাতের খাতা থেকে 'সংবর্ত' ও 'দশমী'তে তাঁর উত্তরণ পর্যন্ত যে-গতিবেগ কাজ ক'রে গেছে, তারই অন্য নাম 'প্রেরণা'। আত্মোপলব্ধির এক স্বচ্ছ মুহূর্তেই তিনি নিজের বিষয়ে লিখেছিলেন: 'আমি অন্ধকারে বদ্ধমূল, আলোর দিকে উঠছি।' বলা বাহুল্য, এই উক্তির প্রথমার্ধ সব কবির বিষয়েই প্রয়োজ্য, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধ সত্য শুধু তাঁদের বিষয়ে, যাঁদের মনের প্রয়াসপ্রসূত উদ্বর্তন তাঁদের আয়ুর সঙ্গেই পা মিলিয়ে চলতে থাকে। আমাদের এই দেশে ও কালে, অনেক কবির মধ্যপথে অবরোধ ও অনেক প্রতিশ্রুতির তুচ্ছ পরিণাম দেখার পরে, সুধীন্দ্রনাথের এই বিরতিহীন পরিণতি আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার বস্তু হ'য়ে রইলো।

য়োরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল পর্যায় আরম্ভ হ'লো, তার অপর সীমা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০: এই দশ বৎসর তাঁর অধিকাংশ প্রধান রচনার জন্মকাল: প্রায় সমগ্র 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী' ও 'উত্তরফাল্গুনী', প্রায় সমগ্র 'সংবর্ত', সমগ্র কাব্য ও গদ্য অনুবাদ, 'স্বগত' ও 'কুলায় ও কালপুরুষ'-এর প্রবন্ধাবলি—সব এই একটি-মাত্র দশকের মধ্যে তিনি সমাপ্ত করেন। 'পরিচয়'-এর সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল পর্যায়, ১৯৩১-১৯৩৬—তাও এই অধ্যায়ের অন্তর্ভূত। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমনও দিন গেছে যখন তিনি একই দিনে সাতটি শেক্সপীয়র-সনেট অনুবাদ করেছেন, একই দিনে রচনা করেছেন কবিতা ও গদ্য, কোনো লেখা শেষ করামাত্র আর-একটিতে হাত দিয়েছেন। এক প্রবল আবেগ তাঁকে অধিকার করেছিলো এই

সময়ে, এক স্মৃতি তাঁকে আবিষ্ট ক'রে রেখেছিলো, কোনো-এক অপূরণীয় ক্ষতির পরিপূরণস্বরূপ অনবরত ভাষাশিল্প রচনা ক'রে যাচ্ছিলেন: জগতে ভগবান যদি না থাকেন, প্রেম ও ক্ষমা যদি অলীক হয়, তাহ'লেও মানুষ তার অমর আকাঙ্ক্ষার উচ্চারণ ক'রেই জগৎকে অর্থ দিতে পারে। এই আবেগের পরম ঘোষণা ১৯৪০-এ লেখা 'সংবর্ত' কবিতা; ঐ কবিতাটি রচনা করার পর তিনি যেন মুক্তিলাভ করলেন, কবিতার দ্বারা পীড়িত অবস্থা তাঁর কেটে গেলো।

মুক্তি? না। মায়াবিনী কবিতার দেখা একবার যে পেয়েছে, সে কি আর মুক্তি পেতে পারে? রচনার পরিমাণ হ্রাস পেলেও, আরাধ্যা সেই দেবীই থাকেন। জীবনের শেষ দুই দশকে সুধীন্দ্রনাথ কবিতা বেশি রচনা করেননি, কিন্তু অনবরত নতুন ক'রে রচনা করেছেন নিজেকে, এবং সেটিও কবিকৃত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। পুরোনো রচনার তৃপ্তিহীন পরিবর্তন ও পরিমার্জনা তাঁর—যা বন্ধুমহলে মাঝে-মাঝে সরোষ প্রতিবাদ জাগালেও অনেক স্মরণীয় পঙক্তি প্রসব করেছে; তাঁর নতুন সংস্করণের ভূমিকা; 'দশমী'র কবিতাগুচ্ছ; এবং তাঁর আলাপ-আলোচনা: এই সব-কিছুর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এমন একজন মানুষ, জগতের সঙ্গে যাঁর ব্যবহার বহুমুখী হ'লেও যাঁর ধ্যানের বিষয় বাণীমাধুরী। কবিতার প্রকরণগত আলোচনায় দেখেছি তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ; 'আজি' ও 'আজই' শব্দের উচ্চারণগত পার্থক্য তাঁকে ভাবিয়েছে; বানান ও ব্যাকরণ বিষয়ে তাঁকে আমরা অভিধানের মতো ব্যবহার করেছি—আমার সমবয়সী বাঙালি লেখকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র, যিনি বাংলা ও বাংলায় ব্যবহারযোগ্য প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের নির্ভুল বানান জানতেন, এবং শব্দতত্ত্ব ও ছন্দশাস্ত্র বিষয়ে যাঁর ধারণায় ছিলো জ্ঞানাশ্রিত স্পষ্টতা। এই শব্দের প্রেমিক শব্দকে প্রতিটি সম্ভবপর উপায়ে উপার্জন করেছিলেন; জীবনব্যাপী সেই সংসর্গ ও অনুচিন্তনের ফলেই সম্ভব হয়েছিলো 'দ্বিধা-মলিদা' বা 'গুরু-অগুরু'র মতো বিস্ময়কর অথচ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অন্ত্যানুপ্রাস। সাহিত্যের তত্ত্ব বিষয়ে অনেকেই কথা বলতে পারেন ও ব'লে থাকেন, কিন্তু কতগুলো অস্পষ্ট ও অনিচ্ছুক ভাবনা বেদনাকে ছন্দ ও ভাষার নিগড়ে বাঁধতে হ'লে যে সব সমস্যা প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে, তা নিয়ে আলোচনা হ'তে পারে শুধু এক কবির সঙ্গে অন্য এক কবির, এবং এই রকম আলোচনার পক্ষে সুধীন্দ্রনাথের শূন্য স্থান পূরণ করার কেউ নেই ব'লে আজ আরো স্পষ্ট বুঝতে পারি যে 'কবি' শব্দের প্রতিটি অর্থ সুধীন্দ্রনাথের রচনা ও জীবনের মধ্যে মূর্ত হয়েছিলো।

তাঁর বিষয়ে অনেকেই ব'লে থাকেন যে তিনি বাংলা কবিতায় 'ধ্রুপদী রীতির প্রবর্তক'। এই কথার প্রতিবাদ ক'রে আমি এই মুহূর্তেই বলতে চাই যে সুধীন্দ্রনাথের রীতি কোনো বিশেষ অর্থে ক্লাসিকাল হ'লেও তিনি মর্মে মর্মে রোমান্টিক কবি, এবং একজন শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক। এর প্রমাণস্বরূপ আমি দুটিমাত্র বিষয় উল্লেখ করবো; প্রথমত, তাঁর প্রেমের কবিতায় আবেগের তীব্রতা, বাসনা ও বেদনার অলজ্জিত ও ব্যক্তিগত চীৎকার— যার তুলনা আবহমান বাংলা সাহিত্যে আমরা খুঁজে পাবো না, না বৈষ্ণব কবিতায়, না রবীন্দ্রনাথে, না তাঁর সমকালীন কোনো কবিতে। দ্বিতীয়ত, ভগবানের অভাবে তাঁর যন্ত্রণাবোধ—এটিও একটি খাঁটি রোমান্টিক লক্ষণ। তিনি ভগবানের অভাব কবিতা দিয়ে মেটাতে চাননি, জনগণ বা ইতিহাস দিয়েও না; তাই, তিনি নিজেকে জড়বাদী ব'লে থাকলেও, তাঁর কবিতা আমাদের ব'লে দেয় যে তাঁর তৃষ্ণা ছিলো সেই সনাতন অমৃতেরই জন্য। তিনি ছিলেন না যাকে বলে 'মিনারবাসী', স্বকালের জগৎ ও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত হ'য়ে আছে তাঁর কবিতা; কিন্তু যেহেতু তাঁর স্বকালে ভগবান মৃত, তাই কোনো মিথ্যা দেবতাকেও তিনি গ্রহণ করেননি; যারা প্রফুল্ল মনে 'সমস্বর নামসংকীর্তনে' যোগ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়, তাদের বীভৎসতার পাশে নিজের স্বর্গের কল্পনাটিও রেখে গেছেন। যা মর্তভূমিতে সম্ভব নয় তা যাঁর গভীরতম আকূতি, তাঁকে কী ক'রে জড়বাদী বলা যায়?

আর-একটি কথা বহু বছর ধ'রে শুনে আসছি; সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য। এ-বিষয়ে একটি পুরোনো লেখায় যা বলেছি, এখানে তার পুনরুক্তি করা ভিন্ন উপায় দেখি না। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ; এবং সেই দুরূহতা অতিক্রম করা অল্পমাত্র আয়াসসাপেক্ষ। অনেক নতুন শব্দ, বা বাংলায় অচলিত সংস্কৃত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন: তাঁর কবিতার অনুধাবনে এই হ'লো একমাত্র বিঘ্ন। বলা বাহুল্য, অভিধানের সাহায্য নিলে এই বিঘ্নের পরাভবে বিলম্ব হয় না। এবং অভিধান দেখার পরিশ্রমটুকু বহুগুণে পুরস্কৃত হয়, যখন আমরা পুলকিত হ'য়ে আবিষ্কার করি যে আমাদের অজানা শব্দসমূহের প্রয়োগ একেবারে নির্ভুল ও যথাযথ হয়েছে, পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ সেখানে ভাবাই যায় না। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার গঠন এমন যুক্তিনিষ্ঠ, এমন সুমিত তাঁর বাক্যবিন্যাস, পঙক্তিসমূহের পারম্পর্য এমন নির্বিকার, এবং শব্দপ্রয়োগ এমন যথার্থ, যে মাঝে-মাঝে দুরূহ শব্দ ব্যবহার না-করলে তিনি হয়তো প্রাঞ্জলতায়

উদাহরণ ব'লেই গণ্য হ'তেন। কিন্তু মাঝে-মাঝে দুরূহ শব্দ ব্যবহার না-করলে, তাঁর কবিতা হ'তো না অমন সুমিত ও যুক্তিসহ, অমন ঘন ও সুশৃঙ্খল—অর্থাৎ তাঁর চরিত্র প্রকাশ পেতো না। আর এই দুরূহতা নিয়ে আপত্তি— পঁচিশ বছর আগেকার তুলনায় তা এখন অনেক মৃদু হওয়া উচিত, কেননা ইতিমধ্যে তাঁর প্রবর্তিত বহু শব্দ লেখক- ও পাঠকসমাজে প্রচলিত হ'য়ে গেছে; অল্পবয়সীরা হয়তো জানেনও না যে 'অন্বিষ্ট', 'অভিধা', 'ঐতিহ্য', 'প্রমা', 'প্রতিভাস', 'অবৈকল্য', 'ব্যক্তিস্বরূপ', 'বহিরাশ্রয়', 'কলাকৈবল্য' প্রভৃতি শব্দ ও শব্দবন্ধ — যা তাঁরা হয়তো কিছুটা যথেচ্ছভাবেই ব্যবহার করছেন— এগুলোর প্রথম ব্যবহার হয় সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ও প্রবন্ধে, এমনকি 'ক্লাসিকাল' অর্থে 'ধ্রুপদী' শব্দটিও তাঁরই উদ্ভাবনা। এই ধরনের শব্দসমবায়ের সাহায্যে তিনি যুগল সিদ্ধিলাভ করেছেন: একটিও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না-ক'রে, বা অগত্যা চিন্তাকে তরল না-ক'রে, লিখতে পেরেছেন জটিল ও তাত্ত্বিক বিষয়ে প্রবন্ধ, এবং তাঁর কবিতাকে দিয়েছেন এমন শ্রবণসুভগ সংহতি ও গম্ভীর ঐশ্বর্য, যাকে বাংলা ভাষায় অপূর্ব বললে বেশি বলা হয় না। এবং, এই সব শব্দরচনার দ্বারা, বাংলা ভাষার সম্পদ ও সম্ভাবনাকে তিনি কতদূর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা হয়তো না-বললেও চলে। আধুনিক বাংলার ও আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবির এই কাব্যসংগ্রহ যাঁরা প্রথম বার পড়বেন, তাঁরা আমার ঈর্ষাভাজন, আর যাঁরা চেনা কবিতার সঙ্গে নিবিড়তর সম্বন্ধস্থাপনের জন্য এগিয়ে আসবেন, আমি নিজেকে তাঁদেরই সতীর্থ ব'লে মনে করি, কেননা আমি জানি যে আমার অবশিষ্ট আয়ুষ্কালে স্বল্প যে-ক'টি গ্রন্থ আমার নিত্যসঙ্গী হবে, এটি তারই অন্যতম।

'সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ'

অমিয় চক্রবর্তীর 'পালা-বদল'

সমকালীন বাংলা দেশের সবচেয়ে আধ্যাত্মিক কবি অমিয় চক্রবর্তী। অবশ্য কবিতামাত্রেই মানুষের আত্মা থেকে উদ্ভূত, আর সেই হিশেবে প্রত্যেক কবিরই ঐ বিশেষণটিতে অধিকার আছে; কিন্তু আমি এখানে একটি বিশেষ অর্থে 'আধ্যাত্মিক' কথাটা প্রয়োগ করতে চাই। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় একটি আশ্চর্য বৈদেহিকতা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে, রক্তমাংসের সংক্রমণ সেখানে সবচেয়ে কম: ইন্দ্রিয়চেতনার কবি জীবনানন্দর সঙ্গে তাঁর বৈপরীত্য যেমন মেরুপ্রমাণ, তেমনি সুধীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্বরক্তিম মানসও তাঁর সুদূরবর্তী। তাঁর যে-কবিতাটি প্রথম সাড়া তুলেছিলো সেটি মনে করা যাক: 'সংগতি', ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়িটার মিলন-সংগীত; এই সংগতি তাঁর সকল কাব্যের মূলমন্ত্র। এই 'হাঁ'-এর দেশ থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিলো, যেখানে আমরা কেউ-কেউ দীর্ঘ ভ্রমণেও ঠিকমতো পৌঁছতে পারিনি, কিংবা স্পর্শ ক'রে থাকলেও টিঁকে থাকতে পারিনি যেখানে। এটাই তাঁর রচনার প্রেরণা এবং অন্তঃসার: অভাব, প্রশ্ন, তর্ক, বোমা-ভাঙা শহর, বাংলার দারিদ্র্য, মার্কিন সভ্যতা, প্রেমিকার বিচ্ছেদ—এই সব কণ্টকময় জটিলতা একটি স্থির 'হাঁ'-ধর্মের অন্তর্ভূত হ'য়ে আছে; রক্তবীজের মতো 'না'-এর গোষ্ঠী গজিয়ে উঠলেও তারা এক আরো বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে সুষমভাবে, বিনীতভাবে অবস্থান লাভ করছে, কোনো দুর্জয় বিরোধের জন্ম দিতে পারছে না। এক দিকে তাঁর স্বভাবের আপতিক বহির্মুখিতা, অন্য দিকে তাঁর আস্থার নৈষ্ঠিকতা—এই দুটি কারণে, অন্যান্য বিষয়ে যতই গরমিল থাক, তাঁর সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য ধরা পড়ে সমসাময়িকদের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণু দে-র। অবশ্য এই সাদৃশ্য অতিশয় সুকুমার, কোনোরকম সূক্ষ্ম বিচার তার সহ্য হবে না; যেমন দু-জন অনাত্মীয় বা ভিনদেশী মানুষের চেহারায় দৈবাৎ মিল দেখা যায়, কিন্তু নড়াচড়া বা গলার আওয়াজেই ভুল ভাঙতে দেরি হয় না। অমিয় চক্রবর্তীর 'মতো' আর একজন বাঙালি কবিকে যদি খুঁজে বের করতে হয়, তাহ'লে আর একটু দূরে ও পিছনে তাকাতে হবে আমাদের; কলাকৌশলের নূতনত্ব, ভাষার চমকপ্রদ ভঙ্গিমা, এই সব আবরণ ভেদ ক'রে তাঁর রচনার মধ্যে গ্রথিত হ'তে পারলে আমরা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করি যে তিনি আর রবীন্দ্রনাথ একই জগতের

অধিবাসী, যে-জগৎ অন্যান্য সমকালীন কবিদের পক্ষে অপ্রাপণীয়। অমিয় চক্রবর্তীর আধ্যাত্মিকতার বিশেষ লক্ষণ এই যে তা কোথাও কোথাও মিস্টিসিজম-এর প্রান্তে এসে পৌঁছয়; বিশেষত তাঁর সাম্প্রতিক কবিতা অনেক সময় সেই অতি সূক্ষ্ম সীমান্তরেখায় বেপথুমান, যাকে অনুভব করার জন্য প্রায় একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়।

২

যদিও 'সংগতি' প্রায় পঁচিশ বছর আগে ছাপা হয়েছিলো, তবু 'খসড়া' ও 'এক মুঠো' নামক প্রথম বই দুটিতে তাঁকে আমরা অন্য ভাবে পেয়েছিলাম। 'এঁর মন উজ্জ্বল ও সজীব, ইনি বহু ভ্রমণ করেছেন, চলতি পথের বৈদেশিক ছবি তীক্ষ্ণ তুলিতে তুলে ধরতে ইনি ওস্তাদ—' তখনকার কোনো পাঠক এই রকম বললে ভুল করতেন না। ব্যতিক্রম ছিলো না তা নয়, কিন্তু মোটের উপর সিনেমা-চঞ্চল চিত্রাবলির জন্যই তাঁর প্রথম পর্যায় স্মরণীয়; এমনকি, ভৌগোলিক আবেদনের দিক থেকে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের বর্ণনাপ্রধান কবিতার সঙ্গেও তার তুলনা হ'তে পারতো। যতদূর মনে পড়ে, 'অভিজ্ঞান বসন্তে' পরিবর্তনের আভাস দেখা দিয়েছিলো; 'দূরযানী'র প্রথম কবিতা, 'হারানো ছড়ানো পাগল'ও তাঁর তৎকালীন ভঙ্গির মধ্যে ব্যতিক্রম। কিন্তু এই পরিবর্তন কত দূরস্পর্শী এবং কতখানি আন্তরিক পরিণতির ফল, তা আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারিনি, যতদিন না 'পারাপার' এবং তারপর 'পালা-বদল' প্রকাশিত হ'লো। 'পারাপার'-এর কবিতাবলি অন্তত দশ বছর ভ'রে লেখা; তার পটভূমিতে আছে বাংলা, ভারত, য়োরোপ ও আমেরিকা; তার বিচিত্র সম্পদের মধ্যে কবির মনের অনেকগুলো ঋতু পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। 'পালা-বদল' এক সুরে বাঁধা, কবিতাগুলোর প্রত্যেকটি যেন একই প্রেরণা থেকে উৎসারিত, বোধহয় সেইজন্যেই এর এই অর্থবহ নামকরণ। কিন্তু আমরা জানি যে পালা-বদল আগেই ঘ'টে গেছে; এবং তার প্রকৃতি বোঝার জন্য এই সাম্প্রতিক গ্রন্থ দুটি একই সঙ্গে পড়া দরকার। 'পড়া দরকার' ব'লেই থামতে পারি না; পড়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধও জানাই, কেননা অমিয় চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক কবিতা বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান ঘটনা ব'লে আমি মনে করি।

তাঁর কবিতার যে-সব লক্ষণে প্রথমে আমরা চমৎকৃত হয়েছিলাম সেগুলো একেবারে ঝ'রে যায়নি—তা যেতেও পারে না—কিন্তু তার সঙ্গে নতুন কিছু

যুক্ত হয়েছে। এখনো পাওয়া যায় অতি নিপুণ বর্ণনা ('সাণ্টা বার্বারা'), একটি মুহূর্তের মধ্যে অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন তথ্যের তোড়া বাঁধা ('বিধুবাবুর মত', '১৬০৪ য়ুনিভার্সিটি ড্রাইভ'), এবং, বারে-বারেই, পৃথিবীর প্রতি, বিশ্বজীবনের প্রতি তাঁর অম্লান শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। এ-সব কবিতার প্রতি আমার প্রীতি ক্লান্তিহীন, কিন্তু আমি এখানে বিশেষ ক'রে সেই কবিতাবলির উল্লেখ করতে চাই, যেখানে দেখা দিয়েছে বর্ণনার বদলে মনক্রিয়া, আর যেখানে 'পৃথিবীকে ভালোবাসি' এই কথাটা মুখের কথায় বলবার আর প্রয়োজন হয় না। এ-ই তাঁর নূতন সংযোজন —সম্প্রসারণ নয়—এমন একটি কাজ, যা তিনি আগে করেননি। যে-বিষয়ে বলছেন, যার 'বর্ণনা' করা হচ্ছে, আমরা বুঝতে পারি তার সাহায্যে তিনি অন্য কিছু বলতে চাচ্ছেন, (হয়তো কখনো-কখনো কথাটা ঠিক ধরতেও পারি না, কিন্তু বুদ্ধির কৌতূহল জেগে ওঠে)—সেইজন্য ব্যবহৃত ছবিগুলো শুধু ছবি আর থাকে না, হ'য়ে ওঠে চিত্রকল্প, কোথাও বা প্রতীক। এর সুন্দর উদাহরণ 'বৈদান্তিক', 'বিনিময়', 'ওক্লাহোমা', 'লিরিক' ('পারাপার') ; 'পালা-বদল'-এর 'অ্যান্ আর্বার', 'ছবি', 'অতন্দ্রিলা'। বেছে-বেছে কয়েকটি ছোটো কবিতা উল্লেখ করলাম, দশ থেকে কুড়ি লাইনের মধ্যে গ্রথিত, খাঁটি লিরিকধর্মী। শুধু তা-ই নয়, 'বৈদান্তিক' বাদ দিয়ে এর প্রত্যেকটি প্রেমের কবিতা। প্রেমের কবিতার লেখক হিশেবে অমিয় চক্রবর্তীকে আমরা ভাবিনি এতদিন, ভাববার বেশি কারণও তিনি দেননি। অবশ্য তাঁর 'বৃষ্টি' ('কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে'), 'চিরদিন' ('আমি যেন বলি আর তুমি যেন শোনো') —এ-সব রচনার নির্মল হার্দ্যগুণের সঙ্গে আমরা পূর্বেই পরিচিত হয়েছিলাম, কিন্তু উল্লিখিত কবিতাবলির মধ্যে নূতন একটি বেদনা প্রবেশ করেছে ; 'সেদিন রাত্রে যখন আমার কুমু বোনকে হারাই'-এর মতো শুভ্র বেদনা নয়, তার শান্তির পিছনে রক্তের রং ঝিলিক দেয় যেন, যেমন দিয়েছিলো—অবশেষে— রবীন্দ্রনাথের 'স্তব্ধ রাতে একদিন' কবিতায়। পূর্বে বলেছি অমিয় চক্রবর্তীর রচনায় রক্তমাংসের সংক্রাম সবচেয়ে কম—এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও 'পবিত্র' তাঁর রচনা : আলোচ্য কবিতাবলিতেও ভালোবাসার দৈহিক উপাদানের নামগন্ধ নেই। আরো বেশি : তাদের আসল অভিপ্রায়কেই একটি আস্বচ্ছ আচ্ছাদনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ; ব্যাপারটা কী, এবং কতখানি, তা পাঠককেই অনুমান ক'রে নিতে হয় ব'লে অসতর্কের কাছে এদের সংবাদ পৌঁছবে না। স্পষ্টত, দৈহিক সংসর্গে অমিয় চক্রবর্তী দুর্বারভাবে পরাঙ্মুখ ; বাঙালি কবিদের

মধ্যে তিনিই একমাত্র, যাঁর রচনায় নারী তার শরীর নিয়ে কখনোই প্রবেশ করেনি; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপসর্গসম্পন্ন কোনো নায়িকাকে একটিবারও দেখা যায়নি সেখানে; দেহটাকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে তিনি শুধু ভাবটিকে রেখেছেন, কখনো-কখনো নামও দিয়েছেন তাকে—কিন্তু সে-সব নামও এক রকমের ছদ্মবেশ, যেমন কিনা এই রচনাগুলিও ছদ্মবেশী প্রেমের কবিতা। এই ধরনের আরো কিছু কবিতা আমার মনে পড়ছে: 'পারাপার'-এ 'পরিচয়' ('এই দূরত্বের সাঁকো, পাথরে বাঁধানো কল্পদেশ'), 'শ্রীমান শ্রীমতী' ('দুজনায় যেতে ঐ নীল সিন্ধু-পাখি ওড়া তীরে'); 'পালা-বদল'-এ 'মিলন দিগন্ত' (' "কাছাকাছি ফিরে আসা দুজনের বেদনা বাতাসে" ') 'দুই স্বপ্ন' (' "কেন দু-জনায় তবু ধরণীতে স্বচ্ছ অন্তরাল ?" ')—এই সম্পূর্ণ গুচ্ছটিকে আলাদা ক'রে নিয়ে মন দিয়ে পড়লে মানতেই হয় যে বাংলা ভাষার প্রেমের কবিতায় একটি বিশিষ্ট স্থান অমিয় চক্রবর্তীর প্রাপ্য। দেহের প্রসঙ্গে নির্মমভাবে মৌন থেকেও তাঁর বেদনায়—এমনকি তাঁর বাসনায়—কোনো-কোনো রচনা রঙিন হ'য়ে উঠেছে; যার উল্লেখমাত্র নেই তাকেও আমরা অনুভব করতে পারি; এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া বাংলা ভাষায় আর কোনো রচনা আমি জানি না, যেখানে প্রায় কিছুই না-ব'লে অনেক কথা এমনভাবে বলা হ'য়ে গেছে। এবং, রবীন্দ্রনাথের গানের মতোই, তাঁর এ সব রচনায় এক রকমের প্রতারক সরলতা বিদ্যমান—আপাতত সহজ, বিশ্রান্ত, ঈষৎ এলোমেলো, ঈষৎ ঝিমোনো গোছের তাঁর লেখা; যার ফলে, রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন হয়, বক্তব্যটাকে আমরা অনেক সময় ধরতে পারি না, কিন্তু উপলব্ধির শুভক্ষণে দ্বিগুণ আনন্দ পাই। ভিতরে যে-টান পড়েছে, অবয়বের মধ্যে তা সব সময় থাকে না ব'লেই তাঁর কবিতা বহুবার পঠনসাপেক্ষ।

যদি আমরা বলি যে অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের জগতের উত্তরাধিকারী, যদি মনোভঙ্গিতে ও রচনাপদ্ধতিতেও এ-দু'জনে মিল খুঁজে পাই, তাহ'লে এই প্রশ্নটা বাকি থেকে যায় যে তিনি কোন অর্থে আধুনিক, কিংবা তিনি কী এনেছেন যা রবীন্দ্রনাথে নেই। এ-প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো যে এ-দু'জনের জগৎ মূলত এক হ'লেও উপাদানে ও বিন্যাসে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রধান কথাটা এই যে রবীন্দ্রনাথের স্থিতিবোধ, অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনে স্থায়িত্বের ভাব অমিয় চক্রবর্তীতে নেই—কোনো আধুনিক কবিতেই তা সম্ভব নয়। শান্তিনিকেতন, হ্বাইমার, ইয়াসনায়া পল্যানা: এক-একটি সুদৃঢ় আলোকের উৎস, বলতে

গেলে সারা জগতের দৃষ্টি যেখানে বিন্যস্ত—যে-পৃথিবীতে ও-রকম স্থায়িত্ব সম্ভব ছিলো সেই পৃথিবী তর্কাতীতভাবে ভেঙে গেছে: আজকের কবি টি. এস. এলিয়ট রাসেল স্কোয়ারের ব্যবসায়ী এবং স্বদেশত্যাগী, রিলকে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ ও লুক্কায়িত; এমনকি জর্মান কুলীন টোমাস মান্‌কে একাধিকবার আটলান্টিক পারাপার করতে হয়। বাসা ভেঙে গেছে মানুষের; বুদ্ধিজীবী মাত্রেই উদ্বাস্তু; কোনো-কোনো ক্ষেত্রে 'ন্যাশনালিটি' জিনিশটাও তা-ই। এই পরিবর্তিত এবং পরিবর্তমান পৃথিবী বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তী সুতীক্ষ্ণভাবে সচেতন; তাঁর কবিতার পটভূমিকা চার মহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে; তাঁর রচনার মধ্যে যে-মানুষটিকে আমরা দেখতে পাই সে অনবরত ঘুরে বেড়ায় এবং বাসা-বদল করে, অস্থিরতার মধ্যেই অন্তরতম গভীরের দিকে চোখ খুলে রাখে। ট্রেনে, প্লেনে, জাহাজে, অবিরল পথিকবৃত্তির ফাঁকে-ফাঁকে উচ্ছ্রিত হ'য়ে উঠেছে এই রচনাগুলি; কখনো ক্যানসাসে, কখনো প্রিন্সটনে, কখনো বস্টনে বা আরিজোনায়, বার-বার যে-'বাসা' বা 'বাড়ি'র খবর পাওয়া যায়, তারা ঐকাহিক ব'লেই উল্লেখযোগ্য। এই জঙ্গমতাবোধ রবীন্দ্রনাথের ছিলো না, বাংলা ছাড়া অন্য কোনো দেশ তাঁর প্রকৃত অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রবেশ করেনি, তাঁর চেনা জগৎ যে হারিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারলেও কাব্যের মধ্যে তা স্বীকার ক'রে নেয়া সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। এই স্বীকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন অমিয় চক্রবর্তী—শুধু দীর্ঘকাল প্রবাসে আছেন ব'লে নয়, স্বভাবেরই প্রেরণায়; রবীন্দ্রনাথে যে-শানাইয়ের সুর কলকাতার গলির অসংগতিকে মিলিয়ে দিয়েছিলো, তাকে অমিয় চক্রবর্তী প্রয়োগ করেছেন আমাদের সমকালীন পরিচিত পৃথিবীর বিবিধ, বিচিত্র, পরস্পর-বিরোধী তথ্যের উপর; যে-পরিবেশের মধ্যে আমরা প্রতিদিন বেঁচে আছি এবং যুদ্ধ করছি, তাঁর মিলনমন্ত্র একেবারে তার কেন্দ্র থেকে উত্থিত হচ্ছে। এই উপাদানের আয়তন ও বৈচিত্র্য তাঁকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে; রবীন্দ্রনাথের কাছে যা পেয়েছেন তার ব্যবহারের ক্ষেত্র আলাদা ব'লে তাঁর কবিতার রসবস্তুও স্বতন্ত্র; তাঁর কাছে আমরা যা পাই, রবীন্দ্রনাথ তা দিতে পারেন না।

৩

ছদ্মবেশী প্রেমের কবিতার দু-একটি উদাহরণ উপস্থিত না-করলে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ হবে না। 'বিনিময়' কবিতার প্রথম স্তবক:

তার বদলে পেলে—
সমস্ত ঐ শুষ্ক পুকুর
নীল বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর
আলোয় ভরা জল—
ফুলে নোওয়ানো ছায়া ডালটা
বেগনি মেঘের ওড়া পালটা
ভরল হৃদয়তল—
একলা বুকে সবই মেলে॥

তার বদলে—কার বদলে? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই এই কবিতার চাবি লুকোনো। য়োরোপীয় ভাষা হ'লে সর্বনামের লিঙ্গ দ্বারাই সেটা ধরা পড়তো, বাংলায় হয়তো বুঝতে একটু দেরি হয় যে 'সে' মানে কোনো অন্তর্হিতা প্রণয়িনী। তারপর, এটা বোঝামাত্র, সমগ্র কবিতাটির অভিঘাত প্রবল হ'য়ে ওঠে, 'একলা বুকে সবই মেলে'র মধ্যে হাহাকার শুনতে পাওয়া যায়। তেমনি, 'ওক্লাহোমা' কবিতায়—

সাক্ষাৎ সন্ধান এই পেয়েছ কি ৩-টে ২৫-এ?
বিকেলের উইলো-বনে রেড-অ্যারো ট্রেনের হুইসিল
শব্দশেষ ছুঁচে গাঁথে দূর শূন্যে দ্রুত ধোঁয়া নীল;
মার্কিন ডাঙার বুকে ঝেঁড়ো অবসান গেল মিশে॥
অবসান গেল মিশে॥

এখানে কোনো অস্পষ্ট 'সে'-র উল্লেখও নেই, কিন্তু এই তিন স্তবকের প্রতিধ্বনিত কবিতাটিতে চলতি ট্রেনের বিচ্ছেদের বাতাস এমন জোরে ব'য়ে চলেছে যে আমাদের মনে দুর্বারভাবে জেগে ওঠে কোনো বিদায়ের দৃশ্য—ট্রেন ছাড়বার আগে যা ঘটেছিলো তা অব্যক্ত থেকেও কবিতার পরতে-পরতে বিরাজ করছে। এই বিচ্ছেদের বেদনাই বার-বার অনুভব করা যাচ্ছে অন্যান্য কবিতায়:

পৃথিবীতে লগ্ন ছিল এই মিলনের ঘর,
এসেওছিলেম দুজনে— তারপর? ('লিরিক'— পারাপার)

যেখানে রওনা শুরু তার থেকে ঘাড় বলে, শুধু
মিনিট খানিকও নয়: দাঁড়িয়েছি একাকিনী তবু
বসেছি পায়ের কাছে॥ ('অ্যান্ আর্বার'— পালা-বদল)

চলো, কার্মেলিতা, চলো আবার তোমার নিজ দেশে।
এখানে আসবে কাছে স্বপ্ন-চলনের বেশে
কান্না ঢেউ যোজন-যোজন পার হয়ে,...
এ আসা তো আসা নয়, হঠাৎ যদি বা এই ভিড়ে
বুকের শহর চিরে
শোনো চেনা কণ্ঠ, দেখ চেনা চোখ তবে
মুহূর্তে মূর্ছায় সব শেষ হবে।...
দুই জন্ম দুই থাক, মধ্যে সাঁকো পারাপার,
কার্মেলিতা, দেখ এক প্রেম পারাবার ॥ ('পরিচয়' — 'পারাপার')

আর তারপর 'পালা-বদল'-এর 'রাত্রি' কবিতায় 'হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানায় পড়ে জ্যোৎস্না, / দেখি তুমি নেই' — আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় 'লিপিকা'র 'পরিম পরিচয়', এবং বুঝিয়ে দেয় ভারতীয় মন আবহমানভাবে যে-বিরহের গান গেয়েছে, তার ধারা সমকালীন বাঙালি কাব্যে লুপ্ত হ'য়ে যায়নি। সুখের সঙ্গে মনে প'ড়ে যায়, অন্য প্রত্যেকটি বিষয়ে যতই ভিন্নধর্মী হোক, 'অর্কেস্ট্রা'ও বিরহের কাব্য, 'বনলতা সেন'ও তা-ই। রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ণতা', সুধীন্দ্রনাথের 'নাম', জীবনানন্দর 'আকাশলীনা', অমিয় চক্রবর্তীর 'বিনিময়' — এই সব আপাত-বিসদৃশ কবিতার মধ্যে মৌলিক সম্বন্ধ দেখিয়ে কোনো মনোজ্ঞ আলোচনা কেউ একদিন লিখবেন আশা করি।

৪

আমার পরিসর বেশি নেই, এই আলোচনা কোনো অর্থেই সর্বাঙ্গীণ হবে না, তবু অন্য দু-একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে অপরিহার্য। একটু পিছনে স'রে যাওয়া যাক, সেই যখন 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালায় 'মাটির দেয়াল' বেরিয়েছিলো। সেই সময়ে ঐ পুস্তিকা যাঁরা পড়েছিলেন, তাঁদের চমক লেগেছিলো অমিয় চক্রবর্তীর অন্য একটি গুণপনায় — যাকে, অন্য নামের অভাবে, অগত্যা হাস্যরস বলতে বাধ্য হচ্ছি। বেদনামিশ্রিত হাসি — ব্যঙ্গ নয়, অভিযোগবর্জিত — নিজের অবস্থাটাকে মেনে নেবার মতো স্মিত প্রসাদগুণ, অথচ নিজেকে অন্য কেউ ব'লে জানবার মতোও বুদ্ধি — এই রকম ভাবসন্নিপাতে তৈরি হয়েছিলো 'বিধুবাবুর মত', ('মতো' নয়), 'বড়োবাবুর কাছে নিবেদন', 'মামুলি' ('মন যে আমার মন / কোন সাধনার ধন / হাড়ের বাক্সে'), 'লগ্ন'

('চমকিয়ে ওঠে কবিতায় / ডাঁটাসুদ্ধ রাঙা পালং শাক') – হালকা কবিতা, কিন্তু অর্থের দিক থেকে হালকা নয়। এর সবগুলো রচনা 'পারাপার'-এ দেখতে না পেয়ে নিরাশ হয়েছি, কিন্তু তার ক্ষতিপূরণও পেয়েছি সম্ভবত একই সময়ে লেখা 'সাবেকি' কবিতায় –

গেল
গুরুচরণ কামার, দোকানটা তার মামার,
হাতুড়ি আর হাপর ধারের (জানা ছিল আমার)
দেহটা নিজস্ব।
রাম নাম সত্ হ্যায়॥
গৌর বসাকের পড়ে রইল ভরন্ত ক্ষেত খামার।
রাম নাম সত্ হ্যায়॥…
আমরা কাজে রই নিযুক্ত, কেউ কেরানি কেউ অভুক্ত,
লাঙল চালাই, কলম ঠেলি, যখন তখন শুনে ফেলি
রাম নাম সত্ হ্যায়
শুনব না আর যখন কানে বাজবে তবু এই এখানে
রাম নাম সত্ হ্যায়॥

একটি চির-পুরোনো বিষয় লৌকিক ছন্দের দোলাতে নিটোলভাবে নতুন হ'য়ে উঠলো; আরম্ভে 'গেল' কথাটার রেশ-টেনে-চলা আঘাত থেকে শেষ পর্যন্ত মজায় ভরপুর – যদিও বিষয়টা একেবারেই 'মজার' নয়। এত বড়ো দুঃখের কথায় এতখানি কৌতুক যিনি আমদানি করতে পেরেছেন তাঁকে হাস্য-রসিকের চেয়ে বড়ো অর্থেই রসিক বলতে হয়। এই হাসিরই আভাস পাওয়া যায় 'পালা-বদল'-এর প্রথম কবিতায় 'হে প্রভু ঈশ্বরমহাশয়' সম্বোধনে।

যদিও 'পারাপার' ও 'পালা-বদল' একসঙ্গে পঠনীয়, এবং দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সুস্পষ্ট, তবু 'পালা-বদল'-এ কবি আরো অগ্রসর হয়েছেন। প্রথমটিতে যে-নূতনত্ব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে, দ্বিতীয়টিতে তার সংহত রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এবং 'পালা-বদল'-এ কয়েকটি নূতনতর ধরনও স্থান পেয়েছে; কলাকৌশলে চমকপ্রদ 'অপঘাত' (রবীন্দ্রনাথের 'ফিনল্যাণ্ড ধ্বংস হ'লো সোভিয়েত বোমার বর্ষণে'র সঙ্গে যেন সচেতন প্রতিযোগিতা ক'রে লেখা); গভীর চিন্তায় ভরা 'সঙ্গ' নামক কবিতা – যাঁরা মনের সম্পদ সৃষ্টি ক'রে থাকেন তাঁরা নিজ-নিজ নির্জনতার মধ্যেও কেমন ক'রে পরস্পরের সঙ্গ লাভ করেন

তারই কাহিনী, এবং 'ইতিহাস' নামক উৎকৃষ্ট এবং একাধিক অর্থে আমেরিকান কবিতার বিস্ময়। আমেরিকার একটি গ্রাম কী ক'রে শহরে রূপান্তরিত হ'লো, দু-পৃষ্ঠার মধ্যে তারই ইতিহাস। ছন্দে লেখা, কিন্তু গদ্যের মতো পড়া যায়। শুধু বিষয়টাই মার্কিন নয়, রচনার রীতিটাও কোনো উৎকৃষ্ট মার্কিন কবির অনুরূপ—কোথাও-কোথাও রবার্ট ফ্রস্টকে মনে পড়ে। কবিতার মধ্যে যে-ঘটনাটা ঘটলো তার জন্য কোনো অভিযোগ বা আক্ষেপ নেই; লেখক একটিও মন্তব্য করেননি; শুধু একটি পরিচ্ছন্ন বিবরণ দিয়ে গেছেন। ঠিক এই জাতের কবিতা অমিয় চক্রবর্তী আগে আর লেখেননি; বাংলা ভাষায় আর-কেউ লিখেছেন ব'লেও আমার মনে পড়ছে না। এই ধরনটি তাঁর পরবর্তী রচনার মধ্যে যদি ফিরে আসতে থাকে, তাহ'লে আমরা বলতে পারবো যে বাংলা কবিতার জন্য নতুন একটি প্রদেশ তিনি জয় করলেন।

৫

তাঁর ভাষাব্যবহার প্রথম থেকেই অভিনব ও চিত্তহারী; কিন্তু সম্প্রতি তার কোনো-কোনো অংশ বিষয়ে আমার মনে সদ্বিধ প্রশ্ন জাগছে। 'পারাপার' ও 'পালা-বদল'-এ দেখা যাচ্ছে তল্ প্রত্যয়ের পৌনঃপুনিক ব্যবহার, ইন্ ভাগান্ত শব্দের প্রতি হয়তো বা একটু অহেতুক আকর্ষণ, এবং বিশেষ্য থেকে বিশেষ্য ও বিশেষণ থেকে বিশেষণ রচনা করবার প্রবণতা; 'উত্তমতা', 'সাহসতা', 'সংসারতা', 'আসলতা', 'আপনতা'—এদের বিষয়ে প্রথম কথা এই যে বাংলায়, বিশেষত বাংলা কবিতায়, বিশেষণই বিশেষ্যরূপে এবং বিশেষ্য সমাসবদ্ধ হ'য়ে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হবার শক্তি রাখে, দ্বিতীয়ত, দেশজ শব্দে তল্ প্রত্যয় সুশ্রাব্য নয়, এবং তৃতীয়ত, 'সংসারতা' বলতে যা বোঝায় তা 'সংসার'-এর মধ্যেই নিহিত আছে, মূল শব্দটাকে যথাযোগ্যভাবে খাটিয়ে নিলেই 'তা' আগমের প্রয়োজন হয় না। অন্য কোনো দিক থেকে এগুলোকে যদি বা সমর্থন করা যায়, 'পুণ্যতা', 'জীবনতা' বা 'সংসর্গতা'র সপক্ষে কী যুক্তি দাঁড়াতে পারে আমি তা ভেবে পাই না। যা ব্যাকরণদুষ্ট তাকে তখনই শুধু মেনে নেয়া যায় যখন তার দ্বারা কবিতার কোনো বিশেষ লাভ হচ্ছে, কিন্তু যখন তার ফলে সংবাদে বিভ্রান্তি আসে (যেমন এসেছিলো বিষ্ণু দে-র 'আহা যদি আজ পুষ্পকে হানো অগ্নিবাণ'-এ) কিংবা তা কোনোভাবেই কাজে লাগে না, তখন বোঝা যায় এলিয়ট কেন বলেছিলেন কবিতারও গদ্যের মতো সুলিখিত হওয়া দরকার। 'দূরের স্মরণী

বয় পণ্যতায় আঁকাবাঁকা ব্যস্ত দ্বীপের মধ্যে' – এখানে 'পণ্যতা'কে সমগ্রভাবে 'merchandise' অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু 'তুমিহীন জীবনতা তাতে রাঙা হয়ে বেলা নামে', 'সব তার সংসর্গতা অনাদি আদিম নীলালোকে', 'বন্ধুর আঙুল নৃত্যে চোখের তন্ময় ধ্যানতায়', কিংবা 'বাগানে ফুলের গাছে আমাদের নতুন সংসারে / দিলেন পুণ্যতা তীর্থ' – এই পঙক্তিগুলির মধ্যে এমন কোনো দাবি নেই যা 'জীবন', 'সংসর্গ', 'ধ্যান' আর 'পুণ্য' দিয়ে মেটানো সম্ভব হয় না। 'যৌবনী জনতা', 'চন্দনী ধূপ', 'শিল্পের তন্ময়ী গুরু'; যথাক্রমে 'যৌবন', 'চন্দন' এবং 'তন্ময়' পড়লে অর্থ একই থাকে এবং প্রসাদগুণ বর্তায়। 'স্মরণী', 'আনন্ত', 'আনন্তিক', 'নরঘ্নী' – তরুণ লেখকদের উপর এ-সব ব্যবহারের প্রভাব ভালো হবে কিনা সে-বিষয়েও আমার সন্দেহ থাকলো।

'কবিতা'র সাম্প্রতিক সংখ্যায় অমিয় চক্রবর্তীর ছন্দ নিয়ে আলোচনা চলছে। বাংলা ফ্রী ভার্সের নমুনাস্বরূপ তাঁর কোনো-কোনো কবিতা দেখানো যেতে পারে, আমি কোনো সময়ে এই রকম একটা মন্তব্য করেছিলাম। আজ সেই কথাটি নতুন ক'রে উঠেছে, কেননা তাঁর সাম্প্রতিক ছন্দোবদ্ধ লেখাতেও সর্বত্র নিয়মিত পর্ববিভাগ পাওয়া যায় না। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ছন্দব্যবহারে তিনি অনেকখানি স্বাধীনতা নিয়ে থাকেন – এখানে বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তাঁর আবার একটি সাদৃশ্য ধরা পড়ে – তার ফল মোটের উপর যা দাঁড়ায় তাকে অনেক ক্ষেত্রে ফ্রী ভার্স বলাই যুক্তিসংগত।

> ইঁট বাঁধা বহু গ্রাম একত্র শহরে গেঁথে, কোনোমতে
> থাকবে বহু লোক। এই গ্রাম
> তাহ'লে
> উঠে যাবে। ('ইতিহাস' – 'পালা-বদল')
>
> অন্যমনস্ক মস্ত শহরে হঠাৎ কুয়াশায় ('ওক্লাহোমা' – 'পারাপার')
>
> শুতে যাই বুকে ভ'রে শ্রীরাগ ধ্রুপদে গম্ভীর –
> ('য়ুরোপা জাহাজে' – 'পারাপার')

এই পঙক্তিগুলিতে ছন্দকে যেটুকু বেঁকিয়ে দেখা হয়েছে তাতে ছন্দের সীমা লঙ্ঘন করা হয়নি: 'তাহ'লে'-কে চারমাত্রা, 'অন্যমনস্ক' ছয়, এবং 'গম্ভীর'কে বিশ্লিষ্ট ক'রে প্রয়োজনীয় মাত্রা পুরিয়ে নিতে আমাদের আপত্তি হয় না। পক্ষান্তরে এও বলা যায় যে 'তাহ'লে'-তে একমাত্রা কম থাকার জন্যই ওর

ব্যঞ্জনা আরো দীপ্তি পেয়েছে। এ-ধরনের উদাহরণ এখানে আমার আলোচ্য নয়। 'থাকবে', 'চলতে' 'বলতে' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ পয়ার ছন্দে দু-মাত্রায় আজকাল অনেকেই বিন্যস্ত ক'রে থাকেন; আমার মনে হয় এর ব্যবহার স্বল্প ও সুমিত হওয়া প্রয়োজন, এবং তার উপযোগিতা ক্রিয়াপদের ব্যঞ্জনবর্ণের উপরেও নির্ভর করে। উদাহরণত, 'পালা-বদল'-এর 'এই বৃষ্টি' কবিতায়—

মনের প্রহরী **ভিজছে** ছাতি হাতে নিঃঝুম প্রহরে
শুধু **ভিজতে** খানিকক্ষণ ধারাবাহী মগ্ন আকাশে—

চিহ্নিত ক্রিয়াপদ দুটিকে প্রসন্নভাবে উচ্চারণ করা যায় না; 'ভিজছে'-র পরেই 'ছাতি' কথাটায় আরো বেশি হুঁচট খেতে হয়। এ-রকম ক্ষেত্রে, মনে হয়, পদ্যের তুলনায় গদ্যকবিতার পথই প্রশস্ত ছিলো, বিশেষত অমিয় চক্রবর্তীর মতো গদ্যকবিতার নিপুণ শিল্পীর পক্ষে। কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে তাঁর সাম্প্রতিক রচনার মধ্যে পদ্যের সংখ্যাই বেশি; কোথাও-কোথাও তাঁর ছন্দ কারুশিল্পে উজ্জ্বল, এবং অন্য কোথাও একই রচনায় একাধিক প্রকার ছন্দ, অথবা পদ্যের সঙ্গে গদ্য মিশিয়ে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার প্রথাসিদ্ধ নামই হ'লো ফ্রী ভার্স। 'পারাপার'-এর 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতার ছন্দের মধ্যে 'ভারতবর্ষের আকাশে' পঙক্তিটা স্পষ্টত গদ্য (যদি না ওটা মুদ্রাকর বা লেখকের অনবধানতাবশত ঘ'টে থাকে); 'ফ্রাইবুর্গের পথে'র কোনো-কোনো পঙক্তি যেন পয়ারের মধ্যে মাত্রাবৃত্তের আমেজ এনেছে; 'একটি গান শোনা' কবিতায় 'ত্রিশূল স্থির / সুরের শাদা চূড়ো', এ-দুটি পঙক্তি পঞ্চমাত্রিক ব'লে মনে হয়; কিন্তু তার পরেই কয়েকটি পঙক্তি গদ্যে লেখা, আবার দ্বিতীয় স্তবকে 'কোলাহল মিলে মিলে যায় / ···ধ্বনির পাপড়ি ঝরে ধ্যানে। /···এলো হাওয়া মরুতাপসিক' এ-সব পঙক্তি পয়ারের সুরে পড়তে প্রলুব্ধ হই আমরা। এমনও হ'তে পারে যে লেখক সমস্তটাকেই গদ্যকবিতা ব'লে উপস্থিত করতে চেয়েছেন—সেটা খুবই সম্ভব—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায় যেমন প্রত্যেকটি পঙক্তিকে পরিষ্কার গদ্য ব'লে চেনা যায়, ভুলেও কখনো ছন্দের সুর লাগে না, অমিয় চক্রবর্তীর রচনা প্রথম থেকেই তার উল্টো পথে চলেছে: অর্থাৎ তিনি সচেতন বা অচেতনভাবে (সম্ভবত সচেতনভাবেই) গদ্যের ফাঁকে-ফাঁকে পদ্যের বিনুনি গেঁথে দেন। বলা বাহুল্য, আগাগোড়া নিয়মিত ছন্দে তিনি অনেক লিখেছেন, স্মরণীয়ভাবেও লিখেছেন, কিন্তু মাঝে-মাঝে, যেন ইচ্ছে ক'রেই কী রকম অসম

বা বি-ষম পঙক্তি ব্যবহার করেন, 'পালা-বদল' থেকে তার কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করি :

> আয়ুঃক্ষণ মহাবিত্ত, প্রকাণ্ড নিরালা সময়ে ('এরোপ্লেনে')
> কী ক'রে এমন দিনের কোমলতা ('দিন')
> বারো বছর ঐ গির্জের পাশের ঘরে…('ইতিহাস')
>
> দ্রুত হয় ঝংকারে ঝংকারে গীতাঙ্কনে
> তোমার তন্বায় আঙুল ('রাগিণী')

স্বরবৃত্তের অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়

> **সারা বসন্ত** কাশ্মীরি বন জাফ্রানি বাস…
> তবুও দেখ **সাহারার জিভ বালির প্রখর** ('বিসংগতি')

এখানে চিহ্নিত পর্বগুলিকে মাত্রাবৃত্তে না-প'ড়ে উপায় নেই, যদিও অন্য পর্বগুলি স্বরবৃত্তের। ৬৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'দিঘি' নামক ছোটো ও সুন্দর কবিতাটিতে, আমার বিবেচনায়, স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও পঞ্চমাত্রিক, এই তিন রকম ছন্দ স্থান পেয়েছে; প্রথম পঙক্তি—'যেখানে সে ডুবে আছে' পয়ার ও স্বরবৃত্তের মধ্যে দোদুল্যমান। পয়ারের মধ্যে বি-ষম পঙক্তির সুষ্ঠুতা বিষয়ে আমি সন্দেহমুক্ত হ'তে পারছি না, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে (যেমন 'পারাপার'-এর 'বৈদান্তিক' কবিতায়) এই মিশ্রণের ফল উপাদেয় হয়েছে, সতর্কভাবে এ-পথে পরীক্ষা করতে থাকলে বাংলায় মুক্ত ছন্দ বা মিশ্র ছন্দের একটি প্রকরণ গ'ড়ে ওঠা অসম্ভব নয়। এই সম্ভাবনাকে যাঁরা অস্বীকার করেন, যাঁরা বলতে চান এগুলো নিয়মিত ছন্দেরই অন্তর্ভূত, তাঁদের কথা আমি বুঝতে পারি না।

'কালের পুতুল'

রামায়ণ

ছন্দের আনন্দ, কবিতার উন্মাদনা জীবনে প্রথম যে-বইতে আমি জেনেছিলুম, সেটি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছোট্টরামায়ণ', 'ছোট্ট, সচিত্র, বিচিত্র, বিচিত্র-মধুর, সে-বই ছিলো আমার প্রিয়তম সঙ্গী : যোগীন্দ্রনাথ সরকারের পদলালিত্যের আদর খেতুম, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের 'শিশু' পত্রিকায় পাতাবাহারে চোখ জুড়োতো—কিন্তু এমন নেশা ধরতো না আর-কিছুতেই। বার-বার পড়তে-পড়তে সমস্ত বইখানা আমার রসনাগ্রে অবতীর্ণ হয়েছিলো,—কিন্তু শুধু পদাবলি আউড়েই আমার তৃপ্তি নেই, রাম-লীলার অভিনয়ও করা চাই। বাঁশের তীর-ধনুক হাতে নিয়ে বাড়ির উঠোনের রঙ্গমঞ্চে আমার লম্ফঝম্ফ : আমিই রাম এবং আমিই লক্ষ্মণ, আর ওই যে মাচার লাউ-কুমড়ো ফোঁটা-ফোঁটা শিশিরে সেজে আছে—ঐ হ'লো তাড়কা রাক্ষসী। সীতাকে না-হ'লেও তখন আমার চলতো, এমনকি, রাবণকে না-হ'লেও—কেননা রাম-লক্ষ্মণের বনবাসের অমন অপরূপ ফুর্তিটা মাটি হ'লো তো সীতা-রাবণের জন্যই। কী ভালো আমার লাগতো সে-সব নদী, বন, পাহাড়—পম্পা, পঞ্চবটী, চিত্রকূট—ছবির মতো এক-একটি নাম—ছবির মতো, গানের মতো, মন্ত্রের সম্মোহনের মতো উপেন্দ্র-কিশোরের মুখবন্ধ :

> বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে,
> ছায়া তায় মধুময়, বায়ু বহে ধীরে।
> খড়ের কুটিরখানি গাছের ছায়ায়,
> চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।
> রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া,
> সে বড়ো সুন্দর কথা, শোনো মন দিয়া।

'চঞ্চল'-এর যুক্তবর্ণ নিয়ে আমার রসনা সুখাদ্যের মতো খেলা করতো, তার অনুপ্রাসের অনুরণনে বুক কাঁপতো আমার। যোগীন্দ্র সরকার পদ্য পড়িয়েছিলেন অনেক, কিন্তু কবিতার জাদুবিদ্যার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

কৃত্তিবাসের সঙ্গে পরিচয় হ'লো আরো একটু বড়ো হ'য়ে। কৃত্তিবাস আমাকে কাঁদালেন, বোধহয় দুই অর্থেই—কেননা যদিও মনে পড়ে সীতার দুঃখে চোখে জল এসেছে, তবু সে-রকম অসম্ভব ভালো লাগার কোনো স্মৃতি

মনে আনতে পারি না। বয়স যখন কৈশোরের কাছাকাছি তখন একখানা মূল বাল্মীকি উপহার পেয়েছিলুম—তার পাতা ওল্টাবার মতো উৎসাহ যখন আমার হ'তে পারতো তার আগেই বইখানা হারিয়ে গেলো। আর তারপর এই এত বছর কাটলো। এর মধ্যে অনেকবার মনে হয়েছে বাল্মীকি প'ড়ে দেখবো—অন্তত চেখে দেখবো—কিন্তু এই অপব্যয়িত জীবনের অনেক সাধু সংকল্পের মতো এটিও বিলীন হ'য়ে গেছে ইচ্ছার মায়ালোকে। কালীপ্রসন্ন সিংহের কল্যাণে মূল মহাভারতের স্বাদে আমার মতো অবিদ্বানও বঞ্চিত নয়, কিন্তু বাল্মীকি আর বাঙালির মধ্যে দেবভাষার ব্যবধান উনিশ-শতকী উদ্দীপনার দিনে কেন ঘোচানো হয়নি জানি না। হয়তো কৃত্তিবাসের অত্যধিক লোকপ্রিয়তাই তার কারণ। বলা বাহুল্য, কৃত্তিবাস বাল্মীকির বাংলা অনুবাদক নন, তিনি রামায়ণের বাংলা রূপকার; তাঁর কাব্যে রাম লক্ষ্মণ সীতা শুধু নন, দেব দানব রাক্ষসেরা সুদ্ধু মধ্যযুগীয় গৃহস্থ বাঙালি চরিত্রে পরিণত হয়েছেন, গ্রন্থটির প্রাকৃতিক এবং মানসিক আবহাওয়া একান্তই বাংলার। এ-কাব্যে বাঙালির মনের মতো হ'তে পারে, এমনকি বাংলা সাহিত্যে পুরাণের পুনর্জন্মের প্রথম উদাহরণ ব'লেও গণ্য হ'তে পারে, কিন্তু এর আত্মার সঙ্গে বাল্মীকির আত্মার প্রভেদ রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী'র সঙ্গে মহাভারতের দেবযানী-উপাখ্যানের প্রভেদের মতোই, মাপে ঠিক ততটা না-হ'লেও জাতে তা-ই। আমাদের আধুনিক কবি-ঠাকুরদের প্রশংসায় আমরা কখনো ক্লান্ত হবো না, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখবো যে আদিকবিদের চরিত্রলক্ষণ জানতে হ'লে আদিকবিদেরই শরণাগত হ'তে হবে। ভুল করবো, মারাত্মক ভুল, যদি মনে করি কৃত্তিবাসের রম্য কাননে আদিকবির, মহাকাব্যের, ধ্রুপদী সাহিত্যের, ফল কুড়োনো সম্ভব। বাল্মীকিতে রামের বনবাসের খবর পেয়ে লক্ষ্মণ খাঁটি গোঁয়ারের মতো বলছেন, 'ওই কৈকেয়ী-ভজা বুড়ো বাপকে আমি বধ করবো'; বনবাসের উদ্যোগের সময় রাম সীতাকে বলছেন, 'ভরতের সামনে আমার প্রশংসা কোরো না, কেননা ঋদ্ধিশালী পুরুষ অন্যের প্রশংসা সইতে পারে না'; এবং লঙ্কাকাণ্ডে যুদ্ধের পরে সীতাকে যখন রাম পরিত্যাগ করলেন, তখন সীতা তাঁকে বললেন প্রাকৃতজন, অর্থাৎ ছোটোলোক—এই সমস্তই, সতীত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও পুত্রত্বের আদর্শরক্ষার খাতিরে বর্জন করেছেন ব'লে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কৃত্তিবাসকে তারিফ করেছেন। হয়তো তারিফ করাটা ঠিকই হয়েছে, হয়তো এর ঐতিহাসিক কারণ ছিলো, তৎকালীন বঙ্গসমাজের

পটভূমিকায় এর সমর্থনও হয়তো খুঁজে পাওয়া সম্ভব—কিন্তু সে-সব যা-ই হোক, এই বর্জনে আদিকবির আত্মা যে উবে গেলো তাতে সন্দেহ নেই। আদিকবির লক্ষণ, পৃথিবীর আদি মহাকাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য আমি যা বুঝেছি, তার নাম দিতে পারি বাস্তবতা, সে-বাস্তবতা এমন সম্পূর্ণ, নিরাসক্ত ও নির্মম যে তার তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্ত্য রিয়ালিজ্‌ম-এর চরম নমুনাও মনে হয় দয়ার্দ্র। যাকে বলা যায় সম্পূর্ণ সত্য, মহাকাব্য তারই নির্বিকার দর্পণ; মহাকাব্যে ট্র্যাজেডির মত্ততা নেই, কমেডির উচ্ছলতা নেই; তাতে গলা কখনো কাঁপে না, গলা কখনো চড়ে না; বড়ো ঘটনা আর ছোটো ঘটনায় ভেদ নেই—সমস্তই সমান, আগাগোড়াই সমতল—এবং সমস্তই ঈষৎ ক্লান্তিকর। বস্তুত, মহাকাব্য তো পৃথিবীর সেই কিশোর বয়সের সৃষ্টি, যখন পর্যন্ত সাহিত্য একটি সচেতন শিল্প-কর্মরূপে মানুষের মনে প্রতিভাত হয়নি; এবং পরবর্তী কালে সাহিত্যকলার বিচিত্র ঐশ্বর্য যুগ-যুগ ধ'রে অবিরাম উদ্ভাসিত হ'তে পারতো না, যদি আদি-কাব্যের সেই কৈশোর-সরলতাকে, সেই অচেতন সত্যনিষ্ঠাকে মানুষ চিরকালের মতো পরিত্যাগ না-করতো। মহাকাব্যের বাস্তবতা এমনই নির্ভীক যে সংগতি-রক্ষার দায় পর্যন্ত তার নেই; তুচ্ছ আর প্রধানকে সে পাশাপাশি বসায়, কিছু লুকোয় না, কিছু ঘুরিয়ে বলে না, বড়ো বড়ো ব্যাপার দু-তিন কথায় সারে, এবং সবচেয়ে বড়ো ব্যাপারে কিছুই হয়তো বলে না। মানবস্বভাবের কোনো মন্দেই তার চোখের পাতা যেমন পড়ে না, তেমনি ভালোর অসম্ভব আদর্শকেও নিতান্ত সহজে সে চালিয়ে দেয়। সেইজন্য মহাভারতে দেখতে পাই চিরকালের সমস্ত মানবজীবনের প্রতিবিম্বন: তাতে এমন মন্দেরও সন্ধান পাই যাতে এই ঘোর কলিতে আমরা আঁৎকে উঠি, আবার ভালোও অপরিসীম ও অনির্বচনীয়-রূপে ভালো; জীবনের এমন-কোনো দিক নেই, মনের এমন-কোনো মহল নেই, দৃষ্টির এমন কোনো ভঙ্গি নেই, যার সঙ্গে মহাভারত আমাদের পরিচয় করিয়ে না দেয়। শুধু পৃষ্ঠাসংখ্যায় নয়, জীবনদর্শনের ব্যাপ্তিতেও রামায়ণ অনেকটা ছোটো; কিন্তু কাব্য হিশেবে—এবং কাহিনী হিশেবেও—তাতে ঐক্য বেশি, এবং আমরা যাকে কবিত্ব বলি তাতে রামায়ণ সম্ভবত সমৃদ্ধতর। এটা ভালোই, যদি আধুনিক সাহিত্যের ঐশ্বর্যজটিল বিশাল প্রাসাদ ছেড়ে আমরা কখনো-কখনো বেরিয়ে পড়ি বাল্মীকির তপোবনে, পৃথিবীর কৈশোর-সারল্যে, মানব-জাতির শৈশবের স্বতঃস্ফূর্ততায়।

ভালো নিশ্চয়ই, কিন্তু যাতায়াতের পথ বিঘ্নবহুল। সে-পথ সম্প্রতি সুগম ক'রে দিলো শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু -কৃত বাল্মীকি-রামায়ণের সারানুবাদ। হাস্যরসিক আর ফলিত বিজ্ঞানীর, ভাষাবিজ্ঞানী আর ভাষাশিল্পীর যে সমন্বয় বসু-মহাশয়ে ঘটেছে, এই বিশেষীকরণের যুগে তা রীতিমতোই বিরল; এবং অধুনা তাঁর রঙ্গস্রোত প্রায় রুদ্ধ ব'লে আমরা যতই না আক্ষেপ করি, সেই সঙ্গে এ-কথাও বলতে হয় যে তাঁর অবিশ্রাম সক্রিয়তাই আমাদের সৌভাগ্য। বিশেষত এই রকম সময়ে, যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রুশ ও মার্কিন লেখকদের বঙ্গানুবাদে বাঙালির লেখনী এবং দুর্লভ কাগজ ও মুদ্রাযন্ত্র ভূরিপরিমাণে ক্ষয়িত হচ্ছে, তখনো যে বাল্মীকি অনুবাদ করবার মতো মানুষ দেশে পাওয়া গেলো, উপরন্তু সে-গ্রন্থের প্রকাশকও জুটলো, তাতে এমন আশা করবারও সাহস হয় যে বইখানা কেউ-কেউ প'ড়েও দেখবেন। অন্তত, বসু-মহাশয় সাধারণ পাঠকের পথে একটি কাঁটাও প'ড়ে থাকতে দেননি; সংক্ষেপীকরণের নৈপুণ্যদ্বারা গ্রন্থের কলেবর সাধারণের পক্ষে সহনীয় করেছেন, অনুবাদ করেছেন গদ্যে, সহজ সরল বাংলায়, অপরিহার্য অল্প কিছু পাদটীকা মাত্র দিয়েছেন, ভূমিকা যেটুকু লিখেছেন তাতেও পাণ্ডিত্যের ভার চাপাননি। বস্তুত, বইখানা উপন্যাসের মতো আরামে প'ড়ে ওঠার কোনো বাধা যদি থাকে, সে শুধু মাঝে-মাঝে উদ্ধৃত বাল্মীকির মূল শ্লোকাবলি; আর সেগুলিও, বসু-মহাশয় ভূমিকায় ব'লেই দিয়েছেন (বোধহয় আমাদের শ্রমবিমুখতাকে ব্যঙ্গ ক'রেই), পাঠক ইচ্ছে করলে 'অগ্রাহ্য করতে পারেন'। কিন্তু কোনো অর্থেই গ্রহণের অযোগ্য নয় সেগুলি; সংস্কৃতের সঙ্গে অল্পস্বল্প মুখচেনা যাঁদের আছে, এমন পাঠকেরও একটু খোঁচাতেই সন্ধি-সমাসের ফাঁকে-ফাঁকে রস ঝরবে, কেননা সৌভাগ্যক্রমে বাল্মীকির সংস্কৃত খুব সহজ। রাজশেখর বসুকে ধন্যবাদ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ষা ও শরৎঋতুর মধুর বর্ণনাটুকু বাল্মীকির মুখেই তিনি আমাদের শুনিয়েছেন—এ-বর্ণনা কৃত্তিবাস বেমালুম বাদ দিয়েছেন ব'লে তাঁকে প্রশংসা করা যায় না, কেননা কবিত্ব, নাটকীয়তা এবং চরিত্রণ—তিন দিক থেকেই এই ঋতু-বিলাস সুসংগত ও সুন্দর। ঘনজটিল বনের মধ্যে চলতে-চলতে হঠাৎ যেন একটি স্বচ্ছনীল হ্রদের ধারে এলুম, সেখানে নৌকো আমাদের তুলে নিয়ে জলের গান শোনাতে লাগলো; ওপারে জটিলতর পথ, কুটিলতম কাঁটা—কিন্তু এই অবসরটুকু এমন মনোহরণ তো সেইজন্যই। বনবাসের দুঃখ, সীতা-হারানোর দুঃখ, বালীবধের উত্তেজনা ও অবসাদ—সমস্ত

শেষ হয়েছে, সামনে প'ড়ে আছে মহাযুদ্ধের বীভৎসতা : দুই ব্যস্ততার মাঝখানে একটু শান্তি, সৌন্দর্য-সম্ভোগের বিশুদ্ধ একটু আনন্দ। এই বিরতির প্রয়োজন ছিলো সকলেরই—কাব্যের, কবির এবং পাঠকের, আর সবচেয়ে বেশি রামের। বর্ণনার শ্লোকগুলি রামের মুখে বসিয়ে বাল্মীকি সূতীক্ষ্ণ নাট্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বালস্বভাব লক্ষ্মণের সীতা-উদ্ধারের চিন্তা ছাড়া আর-কিছুতে মন নেই; শান্ত, শুদ্ধশীল রাম তাকে ডেকে এনে দেখাচ্ছেন বর্ষার বৈচিত্র্য, শরতের শ্রীলতা। বিরহী রামের সঙ্গে বিরহী যক্ষের তুলনা করলেই আমরা আদিকাব্যের সঙ্গে উত্তরকাব্যের চারিত্রিক প্রভেদ বুঝতে পারি : আদিকাব্যে সম্পূর্ণ সত্যের নিরঞ্জন প্রশান্তি, উত্তরকাব্যে খণ্ডিত সত্যের উজ্জ্বল বর্ণবিলাস। সীতার বিরহে রাম ক্লিষ্ট, কিন্তু অভিভূত নন; যদিও মুখে তিনি দু-চার বার আক্ষেপ করছেন, আসলে সীতার অভাব তাঁর প্রকৃতিসম্ভোগের অন্তরায় হ'লো না; আবার মেঘ দেখেই কালো চুল কিংবা চাঁদ দেখেই চাঁদমুখ স্মরণ ক'রে আকুল হলেন না তিনি। অথচ যক্ষের বিরহের চাইতে রামের বিরহ অনেক নিষ্ঠুর, রামের দুঃখ লক্ষ্মণের শতগুণ। সীতা কাছে নেই ব'লে প্রকৃতির সৌন্দর্যের উপর অভিমান করলেন না রাম, তার গলা জড়িয়েও কাঁদলেন না; সৌন্দর্যে তাঁর নিষ্কাম, নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ, যেমন শিল্পীর। এর আগে এবং পরে নিসর্গ-বর্ণনার আরো অনেক সুযোগ ছিলো, কিন্তু বাল্মীকি সে-সমস্তই উপেক্ষা ক'রে গেছেন, কেননা এর আগে এবং পরে রাম নিরন্তর কর্মজালে জড়িত—এইখানেই, এই যুদ্ধযাত্রার পূর্বাহ্নে রামের একটু সময় হ'লো : ভাবখানা এইরকম যেন নিরিবিলি ব'সে ঘাস, গাছ, আকাশ দেখতে তাঁর ভালোই লাগছে; যেন হৃদয়হীন যুদ্ধ আসন্ন জেনেই এই বিরল অবসরটুকুতে তিনি সীতার কথা ভাবছেন না, রাবণ বা সুগ্রীবের কথাও না—কিছু ভাবতে গেলেই যুদ্ধের কথা ভাবতে হয়, তাই কিছুই ভাবছেন না তিনি, মনকে শুধু ছাড়িয়ে দিচ্ছেন সেই সবুজ বনে, যে-বনভূমি,

> ক্বচিৎ প্রগীতা ইব ষট্‌পদৌঘৈ
> ক্বচিৎ প্রনৃত্তা ইব নীলকণ্ঠৈঃ
> ক্বচিৎ প্রমত্তা ইব বারণেন্দ্রৈঃ…*

*'কোথাও ভ্রমরকুল গুঞ্জন করছে, কোথাও ময়ূর নাচছে, কোথাও গজেন্দ্র প্রমত্ত হ'য়ে রয়েছে।' বসু-মহাশয়ের এই ভাষান্তর সাধারণ পাঠককে একটু বেশি খাতির করা হ'য়ে গেছে; বাংলা যথাসম্ভব সরল হয়েছে, কিন্তু মূলের জোরটুকু নেই। বনভূমি ভ্রমরকুলদ্বারা প্রগীত, ময়ূরদলদ্বারা প্রনৃত্ত এবং গজযূথদ্বারা প্রমত্ত—ভাষার এই বিশেষ ভঙ্গিতেই এর সরসতা। বিভক্তিহীন বাংলা

৩

আরো একটি কারণে কৃত্তিবাস যথেষ্ট নন, বাল্মীকির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের প্রয়োজন। সে-কারণ কী, এই গ্রন্থের ভূমিকাতেই তা বলা আছে, এবং বইখানা প'ড়ে আমারা শুধু সকৌতুকে নয়, সহর্ষেও জানি যে রাম-লক্ষ্মণেরা প্রচুর মাংস খেতেন, সব রকম মাংস খেতেন, গোসাপের মাংসও বাদ যেতো না—এমনকি অমাংসভোজনকে তাঁরা বলতেন উপবাস। সুরাতেও বিমুখ ছিলেন না তাঁরা—রাম নিজের হাতে সীতাকে মৈরেয় মদ্য পান করাচ্ছেন; আর হনুমান সীতার খবর নিয়ে লঙ্কা থেকে ফেরবার পর বানরদল যে-মাৎলামিটা করলে, রাম সেটার শাসন করলেন কিন্তু নিন্দা করলেন না। এই মধুবনের বৃত্তান্তটা—বোধহয় ভোক্তারা বানর ব'লেই কৃত্তিবাস গোপন করেননি; কিন্তু রামান্বেষী ভরতের সৈন্যদলকে ভরদ্বাজ যে-রকম আপ্যায়ন করলেন, সেটা কৃত্তিবাসের সহ্য হ'লো না। পাশাপাশি দুটি অংশ তুলে দেখালেই আমার বক্তব্য বোঝা যাবে:

এমন সময় ব্রহ্মা ও কুবের কর্তৃক প্রেরিত বহু সহস্র স্ত্রী দিব্য আভরণে ভূষিত হয়ে উপস্থিত হ'ল। তারা যে পুরুষকে গ্রহণ করে তারা উন্মাদের তুল্য হয়। কাননের বৃক্ষসকল প্রমদার রূপ ধারণ ক'রে বলতে লাগল

—সুরাপায়িগণ সুরা পান কর; বুভুক্ষিতগণ পায়স ও সুসংস্কৃত মাংস যা ইচ্ছা খাও।

এক এক জন পুরুষকে সাত আট জন সুন্দরী স্ত্রী নদীতীরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে অঙ্গসংবাহন ক'রে মদ্যপান করাতে লাগল। পানভোজনে এবং অপ্সরাদের সহবাসে পরিতৃপ্ত সৈন্যগণ রক্তচন্দনে চর্চিত হ'য়ে বললে,

—আমরা অযোধ্যায় যাব না, দণ্ডকারণ্যেও যাব না, ভরতের মঙ্গল হ'ক, রাম সুখে থাকুন।

যারা একবার খেয়েছে, উৎকৃষ্ট খাদ্য দেখে আবার তাদের খেতে ইচ্ছা হ'ল। সকলে বিস্মিত হয়ে আতিথ্যের উপকরণসম্ভার দেখতে লাগল— স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে অন্ন, ফলরসের সহিত পক্ব সুগন্ধ সূপ, উত্তম ব্যঞ্জন এবং ছাগ ও বরাহের মাংস, স্থালীতে পক্ব মৃগ ময়ূর ও কুক্কুটের মাংস, দধিদুগ্ধপূর্ণ অসংখ্য কলস, স্নান ও দন্তমার্জনের উপকরণ, দর্পণ, বস্ত্র, পাদুকা, শয্যা প্রভৃতি। ভরতের সৈন্যেরা মদ্যপানে মত্ত হ'য়ে নন্দনকাননে দেবগণের রাত্রি যাপন করলে। গন্ধর্ব অপ্সরা প্রভৃতি নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেল। (রাজশেখর বসুর অনুবাদ)

ভাষায় এর যথাযথ অনুবাদ অবশ্য সম্ভব নয়, তবে কোনো বাঙালি কবিকে যদি কথাটা বলতে হ'তো তাহ'লে তিনি বোধহয় এইরকম কিছু বলতেন—কোথাও ভ্রমর তাকে গাওয়াচ্ছে, কোথাও ময়ূর তাকে নাচাচ্ছে, কোথাও তাকে পাগল ক'রে দিচ্ছে হাতির পাল।

ভোজনে বসিল সৈন্য অতি পরিপাটি।
স্বর্ণপীঠ স্বর্ণথাল স্বর্ণময় বাটি॥
স্বর্ণের ডাবর আর স্বর্ণময় ঝারি।
স্বর্ণময় ঘরেতে বসিল সারি সারি॥
দেবকন্যা অন্ন দেয় সৈন্যগণ খায়।
কে পরিবেশন করে জানিতে না পায়॥
নির্মল কোমল অঙ্গ যেন যূথিফুল।
খাইল ব্যঞ্জন কিন্তু মনে হৈল ভুল॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পায়স।
নানবিধ মিষ্টান্ন খাইল নানারস॥
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সুগন্ধি সুস্বাদ।
যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ॥
কণ্ঠাবধি পেট হৈল বুক পাছে ফাটে।
আচমন করিয়া ঠাট কষ্টে উঠে খাটে॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে সুললিত।
কোকিল পঞ্চম স্বরে গায় কুহুগীত॥
মধুকর মধুকরী ঝংকারে কাননে।
অপ্সরারা নৃত্য করে গীত আলাপনে॥
অনন্ত সামন্ত সৈন্য সেই গীত শুনি।
পরম আনন্দে বঞ্চে বসন্তরজনী॥
সবে বলে দেশে যাই হেন সাধ নাই।
অনায়াসে স্বর্গ মোরা পাইনু হেথাই॥
এ-সুখ এ-সংসারে কেহ নাহি করে।
যে যায় সে যাউক আমি না যাইব ঘরে॥ (কৃত্তিবাস)

কত দূরে বাল্মীকি থেকে কৃত্তিবাস, দুয়ের আত্মায় ব্যবধান কী দুস্তর! অন্য সব প্রসঙ্গের মতো, ইন্দ্রিয়সুখের প্রসঙ্গেও বাল্মীকি একেবারে বিকুণ্ঠ, তাই—যদিও ক্ষণিক, যদিও অলীক—বৈকুণ্ঠকেই আমাদের চোখের সামনে এনেছেন তিনি, কাম-কল্পনার পরমতাকে; আর কৃত্তিবাসের মনে সংকোচ আছে ব'লে ভরদ্বাজের আশ্চর্য আতিথ্যে তিনি শুধু দেখেছেন ঔদরিকতার আকণ্ঠ উদারতা। বাল্মীকি ভরতসেনার মনে দেবত্বের বিভ্রম জন্মিয়েছেন, রাম-ভরত সম্বন্ধে তাদের উদাসীনতা যেন পদ্মভুকের আবেশ; আর কৃত্তিবাসের সৈন্যসামন্ত যেন প্রাকৃত জন, শাক-ভাত খেয়ে মানুষ, হঠাৎ বড়োদরের নেমন্তন্ন পেয়ে এত খেয়ে ফেলেছে

যে আর নড়তে পারছে না। বাল্মীকির ভোজ্যতালিকা সুষম, সম্পূর্ণ এবং রাজকীয়; মদ্য-মাংস বাদ দিতে গিয়ে কৃত্তিবাস সুবৃহৎ ফলারের বেশি কিছু জোটাতে পারেননি। জীবনের যেটা পার্থিব দিক, তাতে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা যে উদাসীন বা অনিপুণ ছিলো না, বাল্মীকিতে তার প্রমাণ প্রচুর—কিন্তু সেটা কিছু জরুরি কথা নয়, আর সে-কথা প্রমাণ করারই বা গরজ কিসের। শুধু এইটুকু ব'লে এ-প্রসঙ্গ শেষ করা যাক যে কৃত্তিবাস যে-সভ্যতার প্রতিভূ তার অশন-বসন রীতি-নীতি সবই অনেকটা নিচু স্তরের; আর বাল্মীকি, যদিও তপোবনবাসী ব'লে কথিত, তবু তিনি রাজধানীরই মুখপাত্র, শ্রেষ্ঠ অর্থে নাগরিক, তুলনায় কৃত্তিবাসকে মনে হয় রাজার দ্বারা বৃত হ'য়েও প্রাদেশিক, কেননা তাঁর রাজা নিজেই তা-ই। বিশ্বাসী বাল্মীকির পাশে কৃত্তিবাস বাঙালি মাত্র, শুধু বাঙালি; অর্থাৎ বাঙাল।

৪

রামায়ণের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা রাম-চরিত্র। যে-রামের নাম করলে ভূত ভাগে, সেই রাম নিষ্ঠুর অন্যায় করেছেন একাধিকবার। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে রামকে 'অন্য সমালোচনার আদর্শে' বিচার করাই চলবে না, ভেবে দেখতে হবে, যুগ-যুগ ধ'রে ভারতীয় মনে তাঁর কোন মূর্তিটি গ'ড়ে উঠেছে। রামচন্দ্রের এই প্রতিপত্তির মূল কোথায় তাও রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন: রাম বালীবধ ক'রে সুগ্রীবকে রাজা করলেন, রাবণ-বধ ক'রে বিভীষণকে; কোনো রাজত্বই নিজে নিলেন না; মিতালি করলেন চণ্ডালের সঙ্গে, বানরের সঙ্গে, এই উপায়ে, অভ্রান্ত কূটনীতির দ্বারা, আর্য-অনার্যে সম্পূর্ণ মিলন ঘটিয়ে বিশাল ভারতের ঐক্যসাধন করলেন, ভারতীয় ইতিহাস সম্ভবত প্রথমত সেই ঐক্যসাধন। কালক্রমে তাঁর আদি কাহিনীর 'মুখে-মুখে রূপান্তর ও ভাবান্তর' হ'তে লাগলো; গণমানসে তিনি প্রতিভাত হলেন লোকোত্তর পুরুষরূপে, এমনকি অবতার-রূপে। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা অনুসরণ ক'রে বলা যায় যে আদি রামের মহিমা অনেকটা জুলিয়স সীজারের অনুরূপ; যে রাম-রাজ্য আর সাম্রাজ্য আসলে অভিন্ন; যে সাম্রাজ্যবাদের উচ্চতম আদর্শের মহত্তম ব্যঞ্জনা যেমন সীজার-জীবনে, তেমনি রাম-চরিতে। তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ কূটনীতিজ্ঞ, বাল্মীকি প'ড়ে তা ভালোই জানা যায়; শ্রেষ্ঠ এই কারণে যে কূটনীতির সঙ্গে ধর্মনীতিকে তিনি মোটের উপর মেলাতে পেরেছেন, যদিও মুমূর্ষু বালীর কানে তার নিধনের

সমর্থনে যে-কথাগুলি তিনি জপলেন তাতে প্রকারান্তরে এই কথাই বলা হ'লো যে রাজনীতির ক্ষেত্রে নামলে অন্যায় থেকে অবতারেরও ত্রাণ নেই।...কিন্তু এইজন্যই কি রাম এত বড়ো? মস্ত বীর, মস্ত রাজা ব'লে? সাম্রাজ্যের অতুলনীয় স্থপতি ব'লে?

অনেকটা রবীন্দ্রনাথের কথাই মেনে নিয়ে বসু-মহাশয়ও ভূমিকায় বলেছেন যে আধুনিক যুগের সংস্কার নিয়ে রামায়ণ বিচার সম্ভব নয়। যেমন, তিনি যুক্তি দিয়েছেন, রাজ্যের খাতিরে ভার্যাত্যাগ আমাদের কাছে দুঃসহ, তেমনি রামচন্দ্রের আজীবন একপত্নীত্ব যে সেই হারেমবিলাসী যুগে কত বড়ো আদর্শের প্রতিরূপ, সেটাও আমাদের উপলব্ধির বহির্ভূত।...কিন্তু রামচন্দ্রকে কি আমরা বিচার করবো শুধু তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থা অনুসারে? তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্বের চিরকালের আদর্শ যদি দেখতে না-পেলাম, তবে তিনি রাম কিসের। একটি বই স্ত্রী তাঁর ছিলো না, সেইজন্য কি তিনি বড়ো? না কি আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ শত্রু ব'লে? শুধু এটুকুর জন্যই, কিংবা এই সমস্ত-কিছুর জন্যই, কি রামচন্দ্রের মহিমা?

আধুনিক পাঠকের চোখে রাম রীতিমতো অ-রাম হ'য়ে ওঠেন তাঁর সীতা-বর্জনের সময়। অগ্নিপরীক্ষা তো সীতার নয়, রামের, আর সে-পরীক্ষার বিচারক আমরা। যুদ্ধ শেষ হ'লো; রাবণের মৃত্যু হ'লো; রাম বিভীষণকে বললেন, সীতাকে নিয়ে এসো আমার কাছে, সে স্নান ক'রে শুদ্ধ হ'য়ে আসুক। সীতা বললেন, স্নান? তাতে দেরি হবে—আমাকে এখনই নিয়ে চলো। কিন্তু স্নান তাঁকে করতে হ'লো, সাজতেও হ'লো, পালকি থেকে নামলেন রামের সভায়, বানর রাক্ষস ভল্লুকের ভিড়ে। কতকাল পরে দেখা! কত দুঃখের পরে! 'লজ্জায় যেন নিজের দেহে লীন হ'য়ে' স্বামীর মুখের উপর চোখ রাখলেন সীতা, আর তখন, তখনই, সেই রাক্ষস বানর ভল্লুকের ভিড়ে এত দুঃখে ফিরে-পাওয়া সীতাকে প্রথম দেখে কী-কথা বললেন রাম? বললেন:

আমি যুদ্ধে শত্রু জয় ক'রে তোমাকে উদ্ধার করেছি, পৌরুষ দ্বারা যা করা যায় তা আমি করেছি। আমার ক্রোধ ও শত্রুকৃত অপমান দূর হয়েছে, প্রতিজ্ঞা পালিত হয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি চপলমতি কর্তৃক অপহৃত হয়েছিলে তা দৈবকৃত দোষ, আমি মানুষ হ'য়ে তা ক্ষালন করেছি।...তোমার মঙ্গল হোক। তুমি জেনো এই রণপরিশ্রম সুহৃদ্‌গণের বাহুবলে যা থেকে মুক্ত হয়েছি এ তোমার জন্য করা হয়নি। নিজের চরিত্র রক্ষা, সর্বত্র অপবাদ খণ্ডন এবং আমার বিখ্যাত বংশের গ্লানি দূর করবার জন্যই এই কার্য করেছি। তোমার চরিত্রে আমার

সন্দেহ হয়েছে, নেত্ররোগীর সম্মুখে যেমন দীপশিখা, আমার পক্ষে তুমি সেইরূপ কষ্টকর। তুমি রাবণের অঙ্কে নিপীড়িত হয়েছ, সে তোমাকে দুষ্ট চক্ষে দেখেছে, এখন যদি তোমাকে পুনর্গ্রহণ করি তবে কি ক'রে নিজের মহৎ বংশের পরিচয় দেব? যে উদ্দেশ্যে তোমাকে উদ্ধার করেছি তা সিদ্ধ হয়েছে, এখন আর তোমার প্রতি আমার আসক্তি নেই, তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও। আমি মতি স্থির ক'রে বলছি···লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ, যাঁকে ইচ্ছা কর তাঁর কাছে যাও, অথবা তোমার যা অভিরুচি তা কর। সীতা, তুমি দিব্যরূপা-মনোরমা, তোমাকে স্বগৃহে পেয়ে রাবণ অধিককাল ধৈর্যাবলম্বন করেনি। (রাজশেখর বসুর অনুবাদ)

ছী-ছি—আমাদের সমস্ত আত্মরাত্মা কলরোল ক'রে ব'লে ওঠে—ছী-ছি! বিশেষ ক'রে ওই শেষের কথাটা—লক্ষ্মণ ভরত সুগ্রীব বিভীষণ যার কাছে ইচ্ছা যাও—কী ক'রে রামচন্দ্র মুখে আনতে পারলেন, ভাবতেই বা পেরেছিলেন কী ক'রে! এ তো শুধু হৃদয়হীন নয়, রুচিহীন; 'নীচ ব্যক্তি নীচ স্ত্রীলোককে যেমন বলে,' এ তো তেমনি, সীতার এই উত্তর আমাদের সকলেরই মনের কথা। আর এখানেই শেষ নয়; অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর আবার সীতা-বিসর্জন; যদিও রামচন্দ্রের আত্মরাত্মা জানে যে সীতা শুদ্ধশীলা, তবু বাজে লোকেদের বাজে কথা কানে তুলে সীতাকে তিনি নির্বাসনে পাঠালেন—পাঠালেন ফাঁকি দিয়ে, যেন সীতার আশ্রমদর্শনের ইচ্ছা পূর্ণ করছেন, এই রকম ভান ক'রে। আবার বিরহ! কিন্তু রামের বিরহদুঃখের কোনো কথাই এবার আমরা শুনলুম না; রাজকার্যে নিবিষ্ট দেখলুম তাঁকে, যতদিন না অশ্বমেধ-যজ্ঞসভায় লবকুশকে দেখে তাঁর হৃদয় উদ্বেল হ'লো। তাঁর আহ্বানে স্বয়ং বাল্মীকি এলেন সীতাকে নিয়ে সেই সভায়। সে-বার লঙ্কায় দর্শক ছিলো শুধু রাক্ষস বানর ভল্লুকের দল; এ-বার রাজসভায়, যজ্ঞভূমিতে, সকল গুরুজনেরা উপস্থিত, শ্রেষ্ঠ মুনিগণ উপবিষ্ট, রাক্ষস বানর এবং 'বহু সহস্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কৌতুহলী হ'য়ে এল,' শেষ পর্যন্ত স্বর্গের দেবতারাও না-এসে পারলেন না। ত্রিলোকের অধিবাসীর সামনে আবার সীতার পরীক্ষা—কিন্তু এ-পরীক্ষাও রামচন্দ্রের, আর বিচারক আমরা। সীতা মুখ নিচু ক'রে নিঃশব্দ, তাঁর হ'য়ে কথা বললেন বাল্মীকি। উত্তরে রাম বললেন:

···ধর্মজ্ঞ, আপনি যা বললেন সমস্তই বিশ্বাস করি।···লোকাপবাদ বড় প্রবল, তার ভয়েই এঁকে অপাপা জেনেও পুনর্বার ত্যাগ করেছিলাম আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।···জগতের সমক্ষে শুদ্ধস্বভাবা মৈথিলীর প্রতি আমার প্রীতি উৎপন্ন হ'ক।

রাম সীতাকে গ্রহণ করবেন, সে-জন্য অনুমতি চাচ্ছেন জগতের! এত দুঃখ সইতে পেরেছেন যে-সীতা, এ-দুঃখ তাঁর সইলো না,

…রাম ভিন্ন আর কাকেও জানি না — এই কথা যদি সত্য ব'লে থাকি তবে মাধবী দেবী বিদীর্ণ হ'য়ে আমাকে আশ্রয় দিন—

এই ব'লে তিনি পৃথিবীর বিবরে প্রবেশ করলেন।

সীতার দুঃখে পুরুষানুক্রমে আমরা কেঁদে আসছি। শ্রীযুক্ত বসুও তাঁর ভূমিকায় প্রশ্ন করেছেন: 'দু-দুবার সীতাকে নিগৃহীত করবার কী দরকার ছিল?' উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির রচনা নয়, এই পণ্ডিতপোষিত অনুমানে সান্ত্বনা খুঁজেছেন তিনি।* কিন্তু উত্তরকাণ্ড না-থাকলে রামায়ণ এত বড়ো কাব্যই তো হ'তো না। লঙ্কায় অগ্নিপরীক্ষার পর সীতা লক্ষ্মী মেয়ের মতো রামের কোলে ব'সে পুষ্পকে চ'ড়ে অযোধ্যায় এলেন, আর তারপর ঘরকন্না ক'রে বাকি জীবন সুখে কাটালেন—এই যদি রামায়ণের শেষ হ'তো, তাহ'লে কি সমগ্র ভারতীয় জীবনে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে রামায়ণের প্রভাব এমন ব্যাপক, এমন গভীর হ'তে পারতো? বাল্মীকি যদি উত্তরকাণ্ড না-লিখে থাকেন, তবে সেইটুকু বাল্মীকিত্বে তিনি ন্যূন। উত্তরকাণ্ড যে-কবির রচনা তিনি বাল্মীকি না হোন, বাল্মীকিপ্রতিম নিশ্চয়ই: বস্তুত, রামায়ণকে অমর কাব্যে পরিণত করলেন তিনিই। যে-সীতার জন্য এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এমন সুদীর্ঘ ও সুতীব্র উদ্যম, সেই সীতাকে পেয়েও হারাতে হ'লো, ছাড়তে হ'লো স্বেচ্ছায়, এই কথাটাই তো রামায়ণের অন্তঃসার। যে-রাজ্য নিয়ে অত বড়ো কুরুক্ষেত্র ঘ'টে গেলো, সে-রাজ্য কি পাণ্ডবেরা ভোগ করেছিলেন? সব পেয়েও সব ছেড়ে গেলেন তাঁরা, বেরিয়ে পড়লেন মহাপ্রস্থানের মহানির্জনে। যুদ্ধে যখনই জয় হ'লো, রামও তখনই সীতাকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত। 'কর্মে তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে নয়।'…রামের যুদ্ধ, পাণ্ডবের যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলেছে তো এইজন্যই। তা না-হ'লে লোভীর সঙ্গে লোভীর যে-সব দ্বন্দ্ব মানুষের ইতিহাসে চিরকাল ধ'রে ঘ'টে আসছে, তার সঙ্গে এ-সবের প্রভেদ থাকতো না। লোভীর বিরুদ্ধে যে অস্ত্র ধরে, সে নিজেও লোভী ব'লে আধুনিক যুদ্ধে বীভৎসতা, শুধু হত্যার

*শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী তাঁর সংক্ষেপিত ইংরেজি অনুবাদে সপ্তম কাণ্ডটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন, কেননা তাঁর মতে সীতার দ্বিতীয় বর্জন কিছুতেই সহ্য করা যায় না!

—প্রবন্ধ-সংকলনের পাদটীকা।

বীভৎসতা ; কিন্তু পাণ্ডবের যুদ্ধে, রামের যুদ্ধে ফলে অধিকার নেই, অধিকার শুধু কর্মে—আর তাই তার শেষ ফল চিত্তশুদ্ধি।

৫

রাম তাঁর কর্মকে মেনে নিয়েছেন। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে কোন ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ তা তিনি জানেন, আর জীবনের প্রত্যেক অবস্থায়, সুখে এবং দুঃখে, সম্পদে এবং সংকটে সেই ভূমিকাটি সুসম্পন্ন করতে তিনি যথাসাধ্য সচেষ্ট। তাই তিনি অধৈর্যহীন, অক্লিষ্টকর্মা, শান্ত, শ্যামল, নিষ্কাম। বিপদে তিনি বিচলিত, কিন্তু বিহ্বল নন, সৌভাগ্যে তিনি প্রমত্ত নন, যদিও প্রীত। স্বর্ণমৃগ যখন মৃত্যুকালে স্বরূপ ধারণ করলে, তখন, রাক্ষসের মায়া বুঝতে পেরেও, রাম খুব বেশি ব্যস্ত হলেন না, 'অন্য মৃগ বধ ক'রে মাংস নিয়ে' তবে বাড়ি ফিরলেন। সীতা উদ্ধারের উদ্যোগ প্রারম্ভ হবার আগেই বর্ষা নামলো মাল্যবান পর্বতে, এই নিদারুণ সংকটে চার মাস চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হবে ব'লে মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হলেন না, বরং এই অনভিপ্রেত নিষ্ক্রিয়তাকে বর্ষা-শরতের লীলাক্ষেত্র ক'রে তুললেন, আর শরতের শেষে যুদ্ধারম্ভের জন্য লক্ষ্মণকেই দেখা গেলো বেশি উদ্‌গ্রীব। রাম অধৈর্যহীন, বৈক্লব্যহীন, রাম ধীর স্নিগ্ধ গম্ভীর ; যা করতে হবে সব করেন, কিন্তু এটা কখনো ভোলেন না যে এ-সমস্তই রঙ্গমঞ্চে তাঁর নির্দিষ্ট ভূমিকার অংশ মাত্র। বালীর মৃত্যুশয্যায় রাম নিজের সমর্থনের যে-চেষ্টা করলেন তা একেবারেই অনর্থক হ'তো, যদি-না তার মধ্যে এ-কথাটি থাকতো ; 'তোমাকে আমি ক্রোধবশে বধ করিনি, বধ ক'রে আমার মনস্তাপও হয়নি।' এই অপার্থিবতা, এই ঐশ্বরিক উদাসীনতার মুখোমুখি আবার আমরা দাঁড়ালুম যুদ্ধকাণ্ডের শেষে, রাম যখন সীতাকে বললেন : 'তোমার মঙ্গল হোক। তুমি জেনো এই রণপরিশ্রম…এ তোমার জন্য করা হয়নি।' তোমার জন্য করিনি, তার মানে, আমার নিজের জন্য করিনি, শুধু করতে হবে ব'লেই করেছি। শুধু একবার, শেষবারের মতো সীতা যখন অন্তর্হিত হলেন, সেই একবার তিনি 'মৈথিলীর জন্য উন্মত্ত' হলেন, 'জগৎ শূন্যময় দেখতে লাগলেন, কিছুতেই মনে শান্তি পেলেন না।' তবু তো তার পরেও—যদিও, যেহেতু তিনি নররূপী বিষ্ণু, স্বর্গে সীতার সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন তিনি ইচ্ছা করলে তখনই হ'তে পারতো—তার পরেও রাজত্ব করলেন 'দশ সহস্র বৎসর', সকল রকম ধর্মানুষ্ঠান করলেন, ভরত লক্ষ্মণের পুত্রদের রাজত্ব দিলেন, আর সর্বশেষে (এ-ঘটনাটা সর্বসাধারণে

তেমনি সুবিদিত নয়) প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে ত্যাগ করলেন প্রতিজ্ঞারক্ষার জন্য। 'সৌমিত্রি, তোমাকে বিসর্জন দিলাম', রামকে এ-কথাও নিজের মুখে বলতে হ'লো। প্রতিজ্ঞাপালন তো উপলক্ষ মাত্র; আসল কথাটা এই যে, যেমন সীতাকে, তেমনি লক্ষ্মণকেও, স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে হবে— নয়তো মর্তের বন্ধন থেকে রাম মুক্ত হবেন কেমন ক'রে। স্বর্গারোহণের পথে যুধিষ্ঠিরকেও একে-একে ছাড়তে হ'লো নকুল সহদেব অর্জুন ভীম আর প্রিয়তমা পাঞ্চালীকে। স্বর্গের পথ নির্জন।

বাল্মীকিতে এ-কথাটা একটু জোর দিয়েই বার-বার বলা হয়েছে যে রাম অবতার হ'লেও মানুষ, নিতান্তই মানুষ। মনুষ্যত্বের মহত্তম আদর্শের প্রতিভূ তিনি, বিশেষ-কোনো একটি দেশের বা যুগের নয়, সর্বদেশের, সর্বকালের। দেহধারী মানুষ হ'য়ে, স্থানে ও কালে সীমিত হ'য়ে, যতটা মুক্ত, শুদ্ধ, সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব, রামচন্দ্র তা-ই। যদি তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণই হবেন, তবে মারীচের রাক্ষসী মায়ায় মজবেন কেন? কেন সীতাকে তাঁর মনে হবে 'নেত্ররোগীর সম্মুখে দীপশিখা'র মতো? তাঁর এই উপমাতেই প্রমাণ করে যে তিনিও ছিলেন মনোবিকারের অধীন; সীতাকে দীপশিখার মতো বিশুদ্ধ জেনেও রাম যে তাঁকে সে-মুহূর্তে সহ্য করতে পারেননি, তাতে রামেরই রুগ্ন অবস্থা ধরা পড়ে। মানুষ তিনি, নিতান্তই মানুষ, এবং সম্পূর্ণ মানুষ, তাই মানুষের দুঃখ তাঁকে সম্পূর্ণ জানতে হবে, এমনকি মানুষী অবমাননা থেকেও তাঁর নিস্তার নেই। তাই তো তাঁকে স্বীকার ক'রে নিতে হ'লো বালীহত্যার হীনতা, সীতাবর্জনের কলঙ্ক, শম্বুকবধের অপরাধ।* যদি এ-সব না-ঘটতো, যদি তিনি জীবনে একটিও অন্যায় না-করতেন, তবে তাঁর নরজন্ম সার্থক হ'তো না, মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকতো, তবে তিনি হতেন নিয়তির অতীত, প্রকৃতির অতীত, অর্থাৎ আমরা তাঁকে আমাদের একাত্ম ব'লে অনুভব করতে পারতাম না— আর তাহ'লে রামায়ণের কাব্যগৌরব কতটুকু থাকতো? রাম করুণাময়, পতিতপাবন, তিনি পা ছোঁওয়ালে অহল্যা বাঁচে, রাবণ সুদ্ধ তাঁর

* রামচন্দ্রের বিবিধ অন্যায়ের মধ্যে এই শম্বুকবধটাই আধুনিক দৃষ্টিতে সবচেয়ে অক্ষম্য রবীন্দ্রনাথ একে প্রক্ষিপ্ত বলেছেন; কিন্তু রামায়ণকে যদি কাব্য হিশেবে দেখি, তাহ'লে বলতে হয় এর শিল্পগত প্রয়োজন ছিলো। রামচন্দ্রকে এতটা নিচে নামতে হয়েছিলো ব'লে তাঁর মানবিক স্বরূপ আমরা আরো বেশি উপলব্ধি করতে পারি।

হাতে মরতে পেয়ে ধন্য ; তবু তো কারোরই— কোনো অন্ধ ভক্তেরও— তাঁকে বুদ্ধ বা যীশুর মতো মনে হয় না। আদিকবির নির্ভুল বাস্তবতা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে যে তিনি মহামানব নন, কিন্তু তিনি যে মানব, এই সত্যটাই মহান।

রামায়ণের ঘটনাচক্র এই মনুষ্যত্বের বহুলবিচিত্র ব্যঞ্জনার উপলক্ষ মাত্র। 'মাইকেল' প্রবন্ধে আমি প্রশ্ন উত্থাপন করেছি ; রাবণ সীতাহরণ করেছিলেন কেন ? শ্রীযুক্ত বসুর বইখানাতে এ-প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করলাম ; যে-উত্তর আমার মন চেয়েছিলো, তা সে পেলো না। আমার মনে হয় যে রামের দিক থেকে সমস্তটাই ছল ; সমস্তটাই লীলা। রাম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ মুখস্থ ক'রেই রঙ্গমঞ্চে নেমেছেন, কিসের পর কী তা তিনি সবই জানেন, তবু যেন জানেন না ; মহৎ অভিনেতার মতো আমাদের মনে এই মোহ জন্মাচ্ছেন যে ঘটনাবলি তাঁর পক্ষে অপ্রত্যাশিত, নিয়তি তাঁর কাছেও স্বৈরিণী, যেন এটা অভিনয় নয়, জীবন। জটায়ুকে পরাস্ত ক'রে রাবণ যখন সীতাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন 'দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিগণ রাবণবধের সূচনায় তুষ্ট হলেন ;' সীতাহরণটা আর কিছু নয়, শুধু রাবণবধের ছল। আর রাবণবধও আর-কিছু নয়, শুধু রামের কর্ম-উদ্‌যাপনের উপলক্ষ। সীতা-উদ্ধারের জন্য এত পরিশ্রমই বা কেন, ইচ্ছে করলে রাম কী না পারেন। কিন্তু ঐ ইচ্ছে করাটা তাঁর ভূমিকায় নেই, কোনো অসম্ভবকে সম্ভব করেন না তিনি, তাঁকে মেনে নিতে হয় বর্ষার বাধা, সমুদ্রের ব্যবধান, ঘটনার দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিকূলতা ; বালীকে মেরে সুগ্রীবকে রাজত্ব দিয়ে সংগ্রহ করতে হয় বানর-সেনা, যে-বানর মানুষেরও অধম ; দীন, দুর্বল, বর্বর সৈন্যদল নিয়ে এগোতে হয় চতুর, সুসংবদ্ধ, যন্ত্রনিপুণ দানবের বিরুদ্ধে। কেন ? না, এটাই মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতার উপায়। হনুমান অনায়াসেই সীতাকে পিঠে ক'রে নিয়ে আসতে পারতেন, তা তিনি চেয়েওছিলেন, যুদ্ধের তাহ'লে প্রয়োজনই হ'তো না ;— কিন্তু সে তো হ'তে পারে না, তাতে রামের পূর্ণতার হানি হয়। সীতা-উদ্ধার হ'লেই তো হ'লো না, সেটা ত্যাগের ও দুঃখের দীর্ঘতম পথে হওয়া চাই ; কেননা সীতা-উদ্ধার তো উপলক্ষ, লক্ষ্য হ'লো রামের সর্বাঙ্গীণ মরত্ব-ভোগ। তাই হনুমানের প্রস্তাবে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন না সীতা, তা প্রত্যাখ্যান ক'রে বললেন :

…সমস্ত রাক্ষসদের বধ ক'রে যদি তুমি জয়ী হও, তাতে রামের যশোহানি হবে। রামের সঙ্গে তুমি এখানে এস, তাতেই মহৎ ফল হবে। যদি রাম এখানে এসে দশানন ও অন্য রাক্ষসদের বধ ক'রে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান তবেই তাঁর যোগ্য কাজ হবে। তুমি একাই কার্য সাধন

করতে পার তা জানি, কিন্তু রাম যদি সসৈন্যে এসে রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রে আমাকে উদ্ধার করেন তবেই তাঁর উচিত কার্য করা হবে।

রামায়ণের চরিত্র সাধারণত পুনরুক্তি করে না, কিন্তু সীতা হনুমানকে এই কথাটি দু-বার বলছেন। তাঁর এ-আগ্রহ কি উদ্ধারের জন্য? তা যদি হ'তো তবে তো তিনি তৎক্ষণাৎ হনুমানের পৃষ্ঠে আরূঢ় হতেন। না, আগ্রহ এইজন্য যাতে রামচন্দ্রের পূর্ণতা অবরুদ্ধ না হয়; আর সে-আগ্রহ শুধু সীতার নয়, কাব্যের স্রষ্টার, কাব্যের ভোক্তার।

৬

রামায়ণে অসংগতি অসংখ্য। অনেক ক্ষেত্রেই কবি আমাদের সম্ভাব্য কৌতূহলকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে গেছেন। উপেক্ষিতা উর্মিলাকে বিখ্যাত করেছেন রবীন্দ্রনাথ; শ্রীযুক্ত বসুও ভূমিকায় কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। আদি-কবির অবহেলার তালিকা ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছও নয়। উদাহরণত, বালীপত্নী তারাকে তিনি এমন ক'রে এঁকেছেন যেটা রীতিমতো মর্মঘাতী। পতির মৃত্যুতে চীৎকার ক'রে কাঁদতে শুনলুম তাঁকে, আর তার পরেই দেখা গেলো ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের সামনে তিনি বেরিয়ে এলেন সেই অন্তঃপুর থেকে, যেখানে 'সুগ্রীব প্রমদাগণে বেষ্টিত হ'য়ে রুমাকে আলিঙ্গন ক'রে স্বর্ণাসনে ব'সে আছেন', 'মদবিহ্বলা' তিনি, স্খলিতগমনা, এসে লক্ষ্মণের কাছে তৈলাক্ত ওকালতি করলেন সেই সুগ্রীবকে নিয়ে, যে-সুগ্রীব যথার্থ বালীহন্তা। আমাদের অবাক লাগে বইকি।···কিন্তু আদিকবি উদাসীন, আধুনিক কালের সচেতন শিল্পী তিনি নন; শিশুর শিল্প-হীনতার পরম শিল্পে তিনি অধিকার করেন আমাদের, কত বাদ দিয়ে যান, কত ভুলে যান, কত এলোমেলো, অতিরঞ্জন, অবান্তরতা; কোনো কৌশল জানেন না তিনি, সাজাতে শেখেননি; আমাদের ধ'রে রাখে শুধু তাঁর সত্যদৃষ্টি, তাঁর মৌল, সহজ, সামগ্রিক সত্যদৃষ্টি। তাঁর বাস্তবতা এতই বিরাট ও সর্বংসহ যে একদিকে যেমন ঘটনাবর্ণনে কি চরিত্রচিত্রণে নিছক বাস্তবসদৃশতার জন্য তিনি ব্যস্ত নন, তেমনি ডিকেন্স বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রত্যেকটি পাত্রপাত্রীর শেষ পর্যন্ত কী হ'লো, তা জানাবার দায় থেকেও তিনি মুক্ত। যে-রকম একটি সুযোগ পেলে আমরা আধুনিক লেখকরা ব'র্তে যাই, সে-রকম কত সুযোগ তিনি হেলায় হারিয়েছেন—সেগুলি কোনোরকম সুযোগ ব'লেই মনে হয়নি তাঁর। শুধু যে উর্মিলাকে একেবারে ভুলে গিয়েছেন তা নয়, লক্ষ্মণকেও ভুলেছেন,

কেননা একবার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো না লক্ষ্মণের, বনবাসযাত্রার সময় স্ত্রীর কাছে একটু বিদায় পর্যন্ত নিলেন না। আর কৈকেয়ীকেও বলতে গেলে সেই একবারই আমরা দেখলুম; কিন্তু পরে কি তাঁর অনুশোচনা হয়নি? আমাদের এ-সব জিজ্ঞাসার উত্তর রামায়ণে নেই, আছে আমাদের হৃদয়ে। আর সেই হৃদয়লিপির রচয়িতাও রামায়ণের কবি। আমরা যে উর্মিলার কথা ভাবি, লক্ষ্মণের হ'য়ে আমাদের যে মন-কেমন করে, কৈকেয়ীর হ'য়ে আমরা যে অনুশোচনা করি—এ-সমস্তই কি বাল্মীকিরই ব'লে দেয়া নয়? আদি কবির শিল্পহীনতার চরম রহস্য এইখানে যে আমরা তাঁর পাঠক শুধু নই, তাঁর সহকর্মী, তিনি নিজে যা বলতে ভোলেন, সে-কথা রচনা করিয়ে নেন আমাদের দিয়ে। কেউ হয়তো বলবেন যে রাম ছাড়া অন্য সকলেই তাঁর কাছে উপেক্ষিত; অন্য সব চরিত্রই খণ্ডিত, মাত্র একটি লক্ষণসম্পন্ন; লক্ষ্মণ শুধুই ভাই, হনুমান শুধুই সেবক, রাবণ শুধুই শক্তিশালী—রাম ও সীতা কেউ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নয়। কিন্তু রামের সম্বন্ধেই কবির উপেক্ষা কি কম! রাম প্রেমিক, রাম-সীতার জীবন দাম্পত্যের মহৎ আদর্শ, কিন্তু তাঁদের যুগল-জীবনের পরিধি কতটুকু! বলতে গেলে সারা জীবনই তো রামকে সীতাবিরহে কাটাতে হ'লো। এ-বিরহে সীতার প্রতি কবির করুণা প্রচুর, কিন্তু রাম সম্বন্ধে তাঁর মুখে বেশি কথা নেই। যখন সীতাহরণ, যখন পুনর্জিতার প্রত্যাখ্যান, যখন গণরঞ্জনী দ্বিতীয় সীতাবর্জন—এই তিনবারের একবারও রামকে তেমন শোকার্ত আমরা দেখলাম না; মনে-মনে বললাম, রাজধর্মের তাগিদে না-হয় বাধ্যই হয়েছিলেন, তাই ব'লে দুঃখও কি পেতে নেই!···কিন্তু রামের উদাসীনতায়, কিংবা রামের প্রতি কবির উদাসীনতায়, আমাদের মনে যে-দুঃখ, সেই দুঃখই তো রামের; যে-রাম সীতার জন্য কাঁদছেন, সে-রাম তো আমরাই। নাটক রঙ্গমঞ্চে আরম্ভ হ'য়ে শেষ হ'লো প্রেক্ষাগৃহে, কিংবা রঙ্গমঞ্চে শেষ হবার পর প্রেক্ষাগৃহে চলতে লাগলো; রঙ্গমঞ্চে একজন রাম যা করলেন, তার জন্য প্রেক্ষাগৃহের লক্ষ-লক্ষ রামের কান্না আর ফুরোয় না। হয়তো উদাসীনতাই অভিনিবেশের চরম; হয়তো উপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ নিরীক্ষা; হয়তো শিল্পহীনতার অচেতনেই শিল্পশক্তির এমন একটি অব্যর্থ সন্ধান ছিলো, যা ফিরে পেতে হ'লে মানব-জাতিকে আবার নতুন ক'রে প্রথম থেকে আরম্ভ করতে হবে।

'সাহিত্যচর্চা' (ঈষৎ পরিমার্জিত)

বাংলা শিশুসাহিত্য

আমরা ছোটো ছিলুম বাংলা শিশুসাহিত্যের সোনালি যুগে। দুই অর্থেই সোনালি সেই যুগ। প্রথমত, সে-ই আরম্ভ, সূত্রপাত—বলতে গেলে শিশু-সাহিত্যই শিশু তখনো; আমরা এখন যারা সসম্মানে কিংবা যে-কোনো প্রকারে মধ্যবয়সে অবস্থান করছি, বাংলা ভাষার লক্ষণযুক্ত শিশুসাহিত্য আমাদেরই ঠিক সমকালীন। দ্বিতীয়ত, গুণের বিচারেও সোনালি; শুদ্ধ, সরল, সুন্দর, স্বচ্ছন্দ—এই অর্থেও সোনালি। এই সমাবেশ সুলভ নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথমে যেটা করা হয়, সেটাই সব সময় ভালো হয় না। প্রায়ই দেখা যায় যে পথিকৃৎগণের ক্রিয়াকলাপ উত্তরকালের কাজে লাগে—আনন্দের আয়োজনে নয়, ইতিহাসের সূত্রসন্ধানে। বাংলা ভাষার শিশুসাহিত্য এ-বিষয়ে উল্লেখ্য ব্যতিক্রম। সেই প্রথম অধ্যায়ে প্রাচুর্য ছিলো না, মন-ভোলানো, অন্তত পক্ষে চোখ-ভোলানো রকমারি ছিলো না এত, কিন্তু যেটুকু ছিলো সেটুকু একেবারেই খাঁটি। বই ছিলো কম; কিন্তু যে-ক'টি ছিলো তাদের অধিকাংশেরই আজ পর্যন্ত জুড়ি মেলেনি, অধিকাংশই আজকের দিনে ক্লাসিক ব'লে গণ্য হয়েছে। তখনকার শিশু-চিত্তের যাঁরা প্রতিপালক, তাঁরাই যে বাল্যবঙ্গের নিরন্তরভোগ্য মধুচক্র বানিয়েছেন, এই কথাটা আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। সংখ্যায় তাঁরা মাত্রই কয়েকজন। প্রাতঃকালীন, প্রাতঃস্মরণীয়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নানা-রঙিন রূপকথার দক্ষিণারঞ্জন, আর সেই বিস্ময়কর রায়চৌধুরী পরিবার, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-একটিমাত্র পরিবারের আসন, মাত্রাভেদ যত বড়োই হোক না, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পরেই। কোনো-একটা সময়ে এ-রকমও আমাদের মনে হয়েছিলো যে বাংলা শিশুসাহিত্য এই রায়চৌধুরীদেরই পারিবারিক এবং মৌরশি কারবার ভিন্ন কিছুই নয়। উপেন্দ্রকিশোর এই উজ্জ্বল যুগের আদি পুরুষ। তিনিই আমাদের প্রথম শোনালেন রামায়ণ, মহাভারত; যাকে বলা যায় বাংলা দেশের অমর ছড়ার গদ্যরূপ, সেই 'টুনটুনির গল্প' শোনালেন। কুলদারঞ্জনের পুরাণের গল্পে প্রাচীন ভারতের হৃদয়ের পথ খুঁজে পেলুম আমরা; তাঁর রবিন হুডের কাহিনীতে, যাতে ভোরবেলার শিশির-ছোঁয়া গন্ধটুকুও যেন লেগে ছিলো, মধ্যযুগীয় 'সবুজ সুভগ' ইংলণ্ডের কত স্বপ্নেই মধুর হ'লো ছেলেবেলা। আর সুখলতা রাওয়ের 'গল্পের বই', 'আরো গল্প' সেই

দুটি—হায়রে দুটিমাত্র!—বইয়ের কথা কি বলবার! না কি তারা কখনোই ভোলবার! শৈশবের হৃদয়মন্থন এই বই ক-টি, সংখ্যায় বেশি নয় ব'লেই সম্ভোগে নিবিড়, অফুরন্ত বার প'ড়েও কখনো পুরোনো হ'তো না—আজকের দিনেও তারা পুরোনো হয়নি।

এটুকু হ'লেই যথেষ্ট মনে হ'তো, সাহিত্যের সেই প্রথম অবস্থায় খুব বেশি কেউ চাইতে শেখেনি, কিন্তু প্রাণের অব্যক্ত ইচ্ছা মূর্ত হ'য়ে উঠলো একটি পত্রিকায়। ছোটোদের আশার হরিণকে দিগন্তের দিকে ছুটিয়ে দিয়ে মাসে-মাসে আসতো 'সন্দেশ', আসতো তার আশ্চর্য মলাট আর ভিতরকার মনোহরণ রঙিন ছবি নিয়ে, আনতো দুটি মলাটের মধ্যে সাহিত্যের বিচিত্র ভোজে উজ্জ্বল পাইকা অক্ষরের পরিবেষণ। কবিতা, গল্প, উপকথা, পুরাণ, প্রবন্ধ, ছবি, ধাঁধা—'সন্দেশ'-এর ভোজ্য-তালিকায় এমন কিছু ছিলো না, যা সুস্বাদু নয়, সুপাচ্য নয়, যাতে উপভোগ্যতা আর পুষ্টিকরতার সহজ সমন্বয় ঘটেনি। শুধু তা ই নয়, সমস্ত বিভিন্ন রচনার মধ্যে এমন একটি সংগতি ছিলো সুরে, এমন একটি অখণ্ডতা ছিলো এই পত্রিকাটির চরিত্রে, যে অনেক সময় পুরো সংখ্যাটা একজনেরই রচনা ব'লে মনে হ'তো। এই ধারণার সমর্থন করতো অস্বাক্ষরিত রচনার প্রাচুর্য। স্পষ্টত একই হাতের কর্ম সে-সব। অনেক লেখাই অনামী বেরোতো 'সন্দেশ'-এ; সেই সব খেয়ালি কবিতা, ছন্দে-মিলে মন্ত্র-পড়ানো এবং অর্থহীনতায় অর্থময় সব কবিতা, পাতা খুলে প্রথমেই যার প্রিয় কণ্ঠের অভ্যর্থনা শুনতাম, আর কখনো-কখনো একই সংখ্যায় যার দুটি-তিনটি ক'রে পাওনা যেতো; আর সেই সব স্কুল-ছেলেদের হাস্যস্ফুরিত সমানুভাবী গল্প, বালকের প্রচ্ছন্ন জগতে নিত্যনতুন আবিষ্কারের কাহিনী, যেখানে অধ্যবসায়ী নন্দলাল নিয়তিনির্বন্ধে কিছুতেই প্রাইজ পায় না, পাগলা দাশুর রহস্যময় বাক্স শুধু কৌতূহলের অসারতা প্রমাণ করে, এবং মাতুলবিলাসী কল্পনাপ্রবণ যজ্ঞিদাস কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের বিরোধ সইতে না-পেরে মর্মাহত হয়,—এই সব অস্বাক্ষরিত গল্প-কবিতা যে কার লেখা, সে-বিষয়ে 'সন্দেশ'-এর তৎকালীন পাঠকরা ঠিক অবহিত না-থাকেও সারা বাংলায় তার প্রচার হ'তে বিলম্ব হ'লো না—যখন 'হযবরল' আর 'আবোল তাবোল' এই দুটি বই প্রকাশিত হ'লো। শুধু তো বই দুটি নয়, প্রকাশিত হ'লো প্রতিভা, অকালমৃত্যুর বেদনা-জড়িত সেই বিস্ময় বাংলার চিত্তলোকে তরঙ্গ তুললো সেদিন। সোনার খাতায় নতুন একটি নাম উঠলো, নতুন একটি তারা ফুটলো আকাশে: সুকুমার রায়।

২

আজ আমার সেই ছেলেবেলার পড়া, বাঙালি ছেলের চিরকালের পড়া রচনাবলির কিছু অংশ নতুন আকারে দেখতে পেয়ে আনন্দিত হচ্ছি। ইতিমধ্যে অনেক বছর কেটেছে; আমরা যারা এ-সব লেখার প্রথম ছোটো-ছোটো ভোক্তা ছিলুম, আজ আমাদেরই উপর ভার পড়েছে নবীন তরুণদের মনের খাদ্য জোগান দেবার। এই চেষ্টায় সম্প্রতি আমরা নানা ভাবে হৃতকাম হয়েছি। যে-সব বই বিশেষভাবে অপত্যপাঠ্য মনে করি, তা সংগ্রহ করা অনেক সময়ই সহজ হয়নি। বাংলা দেশে এত বড়ো দুর্ঘটনাও ঘটেছিলো যে 'আবোল তাবোল' অনেক বছর ছাপা ছিলো না। মাঝে কুলদারঞ্জন অবলুপ্তির প্রান্তে এসে ঠেকেছিলেন, সুখলতা রাওয়ের বই জোগাড় করতে প্রায় গোয়েন্দা লাগাবার প্রয়োজন হ'তো। এ-সব বইয়ের পুনঃপ্রকাশ তাই সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব'লে মনে করি। পাশাপাশি দেখছি সুকুমার রায় আর কুলদারঞ্জনকে, আর সুখলতা রাওয়ের বই দুটি যুক্ত হ'য়ে 'গল্প আর গল্প' নামে বেরিয়েছে। এই রচনাগুচ্ছে— রায়চৌধুরীদের সমগ্র রচনাগুচ্ছে—একটি পারিবারিক সাদৃশ্য দেখতে পাই। ব্যক্তিভেদে শক্তির তারতম্য আছেই, কিন্তু মৌল সাদৃশ্য যেখানে ধরা পড়ে, সেটি তাঁদের সহজ ভঙ্গিতে, গল্প বলার অবসাদহীন প্রবাহে, কণ্ঠস্বরের সেই লাবণ্যে, যে-কোনো লাইন চোখে পড়লেই মনের মধ্যে যার প্রভাব ছড়ায়। এই লাবণ্য গুণটি বুঝিয়ে বলা শক্ত—কিংবা খুবই সহজ, অর্থাৎ এটি সাহিত্য-রান্নায় সেই লবণ, যার অভাবে অন্য কিছুরই স্বাদ ওঠে না। এ-ক্ষেত্রে বলা যায় যে এঁরা ঠিক ছোটোদের মতো ক'রেই বলতে পারেন— মানে, ছোটোরা নিজেরা যে-রকম ক'রে বলবে সে-রকম অবশ্য নয়, কিন্তু যেমন বললে তাদের মনে হবে যে তাদের মতোই বলা হচ্ছে, ঠিক তেমনি ক'রেই বলতে পারেন এঁরা। তাই এঁদের লেখায় কৃত্রিমতা নেই; এক ফোঁটা পিঠ-চাপড়ানো নেই ছোটোদের উদ্দেশে, কোনোরকম ইস্কুল-মাষ্টারি করুণা কিংবা কর্তব্যবোধ নেই; ছোটোদের সম্মান সম্পূর্ণ বজায় রাখেন এঁরা, কিন্তু তাই ব'লে স্বকীয় সত্তা ভোলেন না, নিজেরাই ছেলেমানুষির ভুল করেন না কখনো, বন্ধুতাস্থাপনের চেষ্টায় অশোভন মুখভঙ্গি ক'রে শ্রদ্ধা হারান না। সুকুমার রায়ের প্রত্যেক গল্পেই উপদেশ আছে, কিন্তু সেটা বাইরে থেকে নিক্ষিপ্ত নয়, ভিতর থেকেই প্রকাশ-পাওয়া; সে-উপদেশ সেই জাতের, যা বালকেরা নিজেরাই মাঝে-মাঝে কৃতজ্ঞ চিত্তে নিয়ে থাকে জীবন থেকে। এইজন্যই তাদের

উপভোগ কখনো ব্যাহত হয় না; তাদের বয়সোচিত নানারকম ছলচাতুরী, বোকামি এবং দুষ্টুমির শেষে জব্দ হওয়ার দৃশ্যটিতে নিজেরাই তারা প্রাণ খুলে হাসে; ঐ জব্দ হওয়ার— যদিও তারাই এক-একজন এক-এক গল্পের নায়ক— সম্পূর্ণ সমর্থন করে তারা; সেটুকু না-থাকলেই ভালো লাগতো না, সত্যি বলতে। এতে প্রমাণ হয়, বয়স্ক লেখকের সঙ্গে তাঁর ছোটো-ছোটো পাঠকদের একাত্মবোধ কত নিবিড়।

তবু যুগ-বদলের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও স্বাদ-বদল ঘ'টে থাকে, আর সুকুমার রায়ের সমস্ত লেখার মধ্যে শুধু 'পাগলা দাশু'র গল্পগুলোই আজকের দিনে মনে হয় কালপ্রভাবে ঈষৎ মলিন, যেন সাল-তারিখ পেরিয়ে-আসা। যে-বিশেষ পরিবেশের সংলগ্নতায় এই গল্পগুলি জন্মেছিলো, সেই পরিবেশ আজ স্মৃতিকথায় পর্যবসিত; এই রকম ঐতিহাসিক ব্যবধান অনেক সময়ই রসগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু রূপকথা চিরন্তন, চিরকালের পুরোনো ব'লেই তারা নতুন থাকে;—আর এইখানেই সুখলতা রাওয়ের— কৃতিত্ব বেশি বলবো না, কিন্তু ভাগ্য ভালো। তাছাড়া যাকে লাবণ্য বলেছি, সহজ ভঙ্গি, সেই গুণটি সবচেয়ে বেশি প্রশংসা জাগায় তাঁরই লেখায়, কেননা 'পাগলা দাশু' বা কুলদারঞ্জনের কাহিনীর তুলনায় তাঁর গল্প আরো অনেকটা তরুণতরদের গ্রহণযোগ্য। 'গল্পের বই', 'আরো গল্প'— ঠিক 'টুনটুনির বই'-এর মতো—একেবারেই বালভাষিত গদ্যে লেখা— অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অর্থে নয়—সবেমাত্র যারা পড়তে শিখেছে একান্তভাবে তাদেরই উপযোগী; ছোটো-ছোটো কথা, মৃদু-মৃদু বাক্য, শাদাশিধে ঘরোয়া ধরনে নিচু গলায় বলা—যেন লেখা গল্পই নয় আসলে, বলা গল্প—অথচ দক্ষিণারঞ্জনের জাঁকজমকের বেড়া ডিঙোতেও হয় না, আবার একটুও পানসে নয় তাই ব'লে, ছোট্ট মাপের মধ্যে ভরপুর এক-একটি গল্প। বর্ণপরিচয় পেরোনো মাত্র ধরিয়ে দেয়া যায় এমন সুখপাঠ্য গল্পের বই এ-তিনটি ছাড়া বাংলা ভাষায় এখনো বেশি হয়েছে ব'লে মনে করতে পারি না।

সুখলতার গল্প অবশ্য মৌলিক নয়, বিদেশী রূপকথায়, প্রধানত গ্রিম্-ভ্রাতাদের অনুসরণে লেখা। কিন্তু তাতে তাঁর গৌরবের কোনো হানি হয়না। সাহিত্যের কোনো-কোনো অবস্থায় অনুবাদ বা অনুসারী রচনা মৌলিকতারই মর্যাদা পেয়ে থাকে; তাছাড়া বৈশ্বিকতা রূপকথার চরিত্রগত, একই কাহিনীর বিভিন্ন প্রকরণ বিভিন্ন এবং বহুবিচ্ছিন্ন দেশে উদ্গত হ'য়ে মানবজাতির আদিম ঐক্যের সন্ধান দেয়। গ্রিমের গ্রন্থও সূক্ষ্ম অর্থে মৌলিক নয়, জর্মান দেশের

আদিকালের রূপকথার সংগ্রহ, আর সে-সব গল্প সুখলতার হাতে এমন অবাধ-ভাবে দেশীয় হাওয়ায় প্রস্ফুটিত হয়েছে যে তারই জন্য বাঙালি শিশু বংশানুক্রমে কৃতজ্ঞ থাকবে তাঁর কাছে।

এই মৌলিকতার প্রসঙ্গটি আরো একটু অনুধাবনযোগ্য। সুখলতা, দৃষ্টিপাত মাত্র ধরা পড়ে, এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম নন। তখনকার শিশু-লেখকরা প্রায় সকলেই মধুকরব্রতী; তাঁদের সাহিত্যের প্রধান অংশই অনুবাদ বা অনুরচনা—যাকে বলে অ্যাডাপ্টেশন—কিংবা প্রচলিত লোকসাহিত্যের সংগ্রহ বা সংকলন। এর উদাহরণ উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, 'চারু ও হারু' সত্ত্বেও দক্ষিণারঞ্জন, এবং অজস্র স্বাধীন রচনা সত্ত্বেও স্বয়ং যোগীন্দ্রনাথ। নিজে গল্প তৈরি ক'রে কী হবে, তার প্রয়োজনই বা কী—এঁদের মনের ভাবখানা ছিলো এইরকম; দেশে ও বিদেশে যে-রত্নরাজি ছড়িয়ে প'ড়ে আছে, সেইগুলির যথাযোগ্য পরিবেষণেই এঁদের প্রযত্ন ছিলো। বাংলাদেশের সেটা ছিলো ফুটে ওঠার, হ'য়ে ওঠার সময়; এ-রকম সময়ে কোথাও-কোথাও অনুবাদের বড়ো-বড়ো যুগ এসেছে; যে-দৃশ্য আমরা দেখতে পাই চসারের কিংবা মার্লোর ইংলণ্ডেও; বাংলা শিশুসাহিত্যের আলোচ্য অংশ তারই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। এই ঐতিহাসিক অবস্থায় স্বাধীন এবং পরনির্ভর রচনায় ভেদচিহ্ন স্পষ্ট থাকে না; আর ভেবে দেখতে গেলে কোনো লেখাই তো সম্পূর্ণ 'স্বাধীন' নয়—বিশেষত, দেশে যখন কিছুই নেই, তখন অতীত থেকে, বিদেশ থেকে সংকলন-কর্মই স্রষ্টা-মনের যোগ্য হয়ে ওঠে।* পূর্বসূরিরা জঙ্গল কেটে সাফ করলেন, তৈরি করলেন পথ, নানা দেশের নানান বীজ ছড়িয়ে দিলেন মাটিতে—আর এমনি ক'রে ঘটিয়ে দিলেন, ফলিয়ে তুললেন সুকুমার রায়ের সুপরিণত ব্যক্তিস্বরূপ।

সুকুমার রায়কে আমি বরাবর শ্রদ্ধা করেছি শুধু হাস্যরসিক ব'লে নয়, শুধু শিশুসাহিত্যের প্রধান ব'লে নয়, বিশেষভাবে সাবালকপাঠ্য লেখক ব'লেও। তাঁর কথা ভাবলে অনিবার্যত মনে পড়ে ল্যুইস ক্যারল-এর যুক্তিচালিত বিস্ময়-

* এই অনুবাদের দ্বারা উনিশ শতকেই আরম্ভ হয়েছিলো— আর তা শুধু নাবালক সাহিত্যেই নয়— বিদ্যাসাগরের 'কথামালা'র পাশে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতও আমরা দেখতে পাই। পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথও অনেকাংশে অনুলেখক। এ-প্রসঙ্গে আরো স্মর্তব্য যে বাংলার 'স্বদেশী'

লোক, মনে পড়ে এডওঅর্ড লিয়র-এর লিমারিকগুচ্ছে ব্যক্তিবাদের পরাকাষ্ঠা। এই শেষের কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। য়োরোপে যন্ত্রযুগ এসে যখন বললো, 'সব মানুষকে এক ছাঁচে ঢালাই ক'রে দাও', সমাজের সেই স্পর্ধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জেগে উঠলো সাহিত্যের নানা বিভাগে। লিয়রের আপাত-লঘু পঞ্চপদাবলি সেই প্রতিবাদেরই অন্যতম দলিল। তাঁর প্রহসনের পাত্র-পাত্রী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চরম নমুনা; একদম বেপরোয়া তারা, মরীয়ারকম স্বাবলম্বী, বা স্বেচ্ছাচারী— কেউ তারা গাছে উঠে ব'সে থাকে, কেউ দাড়িতে টুপিতে যত রাজ্যের পাখি জোটায়, কেউ বা ঝাঁপিয়ে পড়ে এট্‌নার গনগনে উনুনটার মধ্যে— আর তাদের এ-সব কাণ্ড দেখে 'they' বা অন্যেরা যখন হাসে বা মারতে ওঠে, তখন তারা ম'রে গেলেও গোঁ ছাড়ে না। এই 'অন্যেরা' হ'লো সমাজ, যে-সমাজ মানুষকে কল বানাতে চায়। অ্যালিসের স্বপ্নলোকেও সবই অদ্ভুত, অবৈধ, অসামাজিক— নিয়মহারা নয়, কিন্তু উল্টো নিয়মের অধীন— যে-নিয়মে ওঅর্ডস্বার্থের সাত্ত্বিক বুড়ো ফাদার উইলিয়ম হঠাৎ খেপে গিয়ে অনবরত মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকে; যা-কিছু পোষ-মানা, আপোশে-চলা, অতিশয় আরাম-দায়ক এবং গতানুগতিক, তাকে 'মানি না' বলার সম্ভাবনাটাই ক্যারলের অসম্ভাবনার তাৎপর্য। ভিক্টরীয় যুগের অনেক নিন্দে শোনা গেছে, কিন্তু এই আশ্চর্য 'ননসেন্স' সাহিত্য— যার মরাল-গীতি চেস্টার্টন গেয়েছিলেন— তারও উত্থান এই সময়েই ঘটেছিলো, মৃদু-মসৃণ 'লর্ড টেনিসন'-এর আমলে। এই 'নন-সেন্স' আর কিছুই নয়: আধুনিক সমীকরণের বিরুদ্ধে তির্যক বিদ্রোহঘোষণা।

সুকুমার রায়ের জগৎটাতেও এই বিদ্রোহের আভাস দেখা যায়। সেখানেও রাজার পিসি কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলে, আর রাজা বিশ্ববিমুখ মুণ্ডিতমস্তকের সমস্যা নিয়ে আকুল হ'য়ে থাকেন; সেখানেও কেউ ছায়া ধরার ব্যাবসা করে, কেউ বা আপিশ-টাপিশ সব ভুলে শুধু গান গেয়ে দিন কাটায়। এই সাদৃশ্য শুধু প্রভাবজনিত নয়। উপরোক্ত দুই ইংরেজ লেখকের কাছে, বলা বাহুল্য, সুকুমার রায়ের ঋণ অনেক; সেই ঋণ সার্থক হয়েছিলো এইজন্যে যে এঁদের সঙ্গে তাঁর নানা রকম সাদৃশ্য ছিলো। সাদৃশ্য ছিলো গুণের দিক থেকে, প্রাণের দিক

যুগে দেশজ রত্ন উদ্ধার করার যে-আবেগ এসেছিলো, তা তথাকথিত শিশুসাহিত্যেই আবদ্ধ থাকেনি, যে প্রেরণায় যোগীন্দ্রনাথ ছড়া সংগ্রহ করলেন, উপেন্দ্রকিশোর লৌকিক গল্প আর দক্ষিণারঞ্জন রূপকথা সেই একই প্রেরণার মহার্ঘ ফল 'কথা ও কাহিনী'।

থেকেও। ক্যারলের মতো, তিনিও ছিলেন একাধারে শিল্পী ও বিজ্ঞানী; লিয়রের মতো, একাধারে চিত্রী ও লেখক; ক্যারলের মতোই শব্দতত্ত্বে সন্ধানী ছিলেন, আর উভয়ের মতোই জন্মেছিলেন লজিকনিষ্ঠ মনের সঙ্গে খামখেয়ালি মেজাজ নিয়ে। এ-দুয়ের মিলন ঘটলে তবেই সত্যিকার খেয়াল-খাতা লেখা যায়, নয়তো ও-বস্তু আক্ষরিক অর্থেই 'ননসেন্স' হ'য়ে পড়ে। এ-ক্ষেত্রে সুকুমার রায় তাঁর উত্তমর্ণদের—সমকক্ষ বললে ভুল হবে—কেননা তাঁর ব্যঙ্গের দিকেও ঝোঁক ছিলো—কিন্তু সমীপবর্তী। ব্যঙ্গরচনা খেয়ালি লেখার সধর্মী নয়, যেহেতু লক্ষ্যগোপনেই খেয়ালি লেখার লক্ষ্যভেদ, আর স্পষ্ট কোনো লক্ষ্য ছাড়া ব্যঙ্গ হয় না। যেখানে সুকুমার রায় ব্যঙ্গনিপুণ—যেমন 'সৎপাত্র' বা 'ট্যাঁসগরু'তে—সেখানে তাঁর উদ্দেশ্য আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই ব'লে অদ্ভুত রসটা বিশুদ্ধভাবে পাই না। 'হাত গণনা' 'নারদ, নারদ', 'গন্ধবিচার'—যে-সব কবিতায় চরিত্রসৃষ্টি আছে, মনস্তত্ত্ব আছে—সেখানেও স্পর্শসহ 'অর্থ' এসে রচনার জাত বদলে দেয়। এ-কথা ব'লে সুকুমার রায়ের মূল্য আমি কমাতে চাচ্ছি না—অমন অপচেষ্টা কোনো বাতুল যেন না করে—আমার উদ্দেশ্য শুধু এটুকু বলা যে তিনি ছিলেন অনেকটা চেস্টার্টনের মতো—একাধারে ঠাট্টায় আর আজগুবিত্বে স্বভাবসিদ্ধ; ক্যারলের মতো, লিয়রের মতো বিশুদ্ধভাবে অদ্ভুত রসের পূজারি ছিলেন না।

কিন্তু, এই ইংরেজ যুগলের তুলনায় একটি বিষয়ে তিনি মহত্তর; সেটি তাঁর কবিত্বগুণে। এই বিচার পরম নয়, আপেক্ষিক। অর্থাৎ এখানে 'এ বুক অব ননসেন্স-'এর সঙ্গে বা 'অ্যালিসে'র পদ্যাংশের সঙ্গে 'আবোল তাবোল'-এর তুলনা করছি না; ভেবে দেখছি আপন ভাষায় কাব্যের ক্ষেত্রে কার কী-রকম মূল্য। ইংরেজিতে লিয়র কিংবা লুইস ক্যারল আসন পেয়েছেন হালকা কবিতার বিভাগে; তাঁদের পদ্য কৌতুকের উৎস, কৌতূহলের বিষয়, গবেষণাযোগ্য বিরল মণিমুক্তোর মতো; কিন্তু সুকুমার রায়কে 'হাসির কবিতা'র গণ্ডির মধ্যে ধ'রে রাখা যায় না, কোনো বিশেষজ্ঞতার পরিধির মধ্যেও না—তিনি বেরিয়ে আসেন বাংলা কবিতার বড়ো মহলেই। 'আবোল তাবোল', আমার প্রথম থেকেই মনে হয়েছে, বাংলা ভাষার রীতিমতো একটি কাব্যগ্রন্থ, যাতে হাসির ছুতো ক'রে, ছবি এবং কৌতুকের সাহায্যে ভুলিয়ে এনে, শিশুদের এবং বয়স্কদেরও কয়েক ফোঁটা বিশুদ্ধ কাব্যরস অন্তঃস্থ ক'রে দেয়া হ'লো। 'মেঘ-মুলুকে ঝাপসা রাতে/রামধনুকের আবছায়াতে' ব'সে 'আলোয় ঢাকা অন্ধকারে'র গন্ধে ঘণ্টাধ্বনি

শুনতে পাবেন কি কবি ছাড়া অন্য কেউ? না কি অন্য কেউ 'পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা'কে 'জোছনা হাওয়ার স্বপ্ন-ঘোড়া'য় চড়িয়ে দেবেন? নাকি সংসারের হাজার হট্টগোলের মধ্যে অনবরত শুনতে পাবেন যে গানের মাঝে 'তবলা বাজে ধিনতা'? যাঁর মালপোয়ালোভী মার্জার বেরিয়ে আসে, যখন—

বিদ্‌ঘুটে রাত্তিরে ঘুট্‌ঘুটে ফাঁকা
গাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা,
জটবাঁধা ঝুলকালো বটগাছ তলে,
ধকধক জোনাকির চকমকি জ্বলে।...
পুবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা,
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা—

যাঁর হাস্যভীরু রামগরুড়-শাবক

যায় না বনের কাছে কিংবা গাছে-গাছে,
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে।
সোয়াস্তি নেই মনে মেঘের কোণে-কোণে
হাসির বাষ্প উঠছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে।
ঝোপের ধারে-ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে-ঠারে—

তাঁকে কবি ব'লে না-মানতে হ'লে 'কবি' কথাটায় অন্যায়ভাবে সীমানা টানতে হয়। সত্য, সুকুমার রায়ের পদ্যজাতীয় রচনা অধিকাংশই সর্বতোভাবে পদ্য, পদ্য যত ভালো হ'তে পারে তা-ই—তার বেশি আর-কিছু নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও সত্য যে মাঝে-মাঝে পদ্যের সীমা পেরিয়ে তিনি কবিতার স্তর স্পর্শ ক'রে যান—তখন আমরা যে-আনন্দ পাই, সেটা পরিহাসলব্ধ হ'তে পারে না। উদ্ধৃত অংশের উজ্জ্বল চিত্ররূপ, ছন্দের বিন্যাস, প্রথম দৃষ্টান্তে অন্তর্মিল-বহুল হসন্ত শব্দে নৌকোর দাঁড় পড়ার মতো ছপছপ-আওয়াজ—সবটা মিলিয়ে কৌতুকাবহ প্রসঙ্গ এরা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, কিংবা কৌতুকের সঙ্গে কল্পনা মিশে হ'য়ে উঠেছে অন্য কিছু। এখানে আমরা অন্য যে-আস্বাদটুকু পাই, তাকে কবিতারই অভিজ্ঞতা ব'লে তখনই আমরা চিনতে পারি। অর্থাৎ, 'আবোল তাবোল'-এর

আবেদন একাধিক স্তরে; ছোটোরা কুমড়োপটাশ আর বোম্বাগড়ের রাজাকে নিয়ে হাসে, দুলে-দুলে ছন্দ পড়ে, আবৃত্তি করে চেঁচিয়ে; আর বড়োরা— হয়তো কোনো-কোনো বালক-বালিকাও—উপভোগ করে 'দখিন হাওয়ার সুড়সুড়ি', মুগ্ধ হয় মিলের চমকে, দেখতে পায় ব্যঙ্গের দীপ্তি, লক্ষ করে বাতিক-গ্রস্তদের অবিশ্বাস্য ব্যবহারে সমাজবিধানের সমালোচনা।

এ ছাড়া অন্য দিক থেকেও তাঁর দাবি আছে। নিছক পদ্যরচনার কারিগরিতে, ছন্দ-মিলের অপ্রতিহত পরিচালনায় সুকুমার রায়ের দক্ষতা এমন অসামান্য যে শুধু তারই জন্য তাঁকে কবি ব'লে স্বীকার করার বাধা হয় না। বাংলা দেশ, এখানে স্মরণ করা ভালো, একই কারণে কবির সম্মান দিয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে; সত্যেন্দ্রনাথও পদ্যকার, পদ্য ছাড়া বেশি কিছু লেখেননি, কিন্তু সেই পদ্যই ওস্তাদের মতো, আর প্রচুর পরিমাণে লিখেছেন ব'লে কবি-সভায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে অমান্য করা যায় না। উপরন্তু সত্যেন্দ্রনাথের তুলনায় সুকুমার রায় অনেক বেশি পরিণত মনের মানুষ, তাঁর কলাকৌশলও অনেক বেশি সাবালক; তাই তাঁর পদ্য ছোটোদের জন্য লেখা হ'লেও বয়স্কদের ভোগ্যবস্তু হয়েছে, আর সত্যেন্দ্রনাথের লক্ষ্য যদিও বয়স্ক পাঠক, কার্যত তাঁর অধিকাংশ কবিতাই কিশোরপাঠ্য। গত দুই দশকে বাংলা কবিতা যতটা বদলে গেছে, তাতে আজকের দিনের তরুণ কবির পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ আর অপরিহার্য নেই, কিন্তু লেখা শেখার যে-কোনো ইস্কুলে 'আবোল তাবোল' এখনো আবশ্যিক।

'আবোল তাবোল'-এর সঙ্গী বই এবার প্রকাশিত হ'লো 'খাই-খাই' নামে। বইটি চোখে দেখে, এমনকি শুধু নাম শুনে, আমার মনে প'ড়ে গেলো 'খাই-খাই' কবিতা যখন প্রথম বেরিয়েছিলো অদূরবর্তী, সুদূরবর্তী অতীতে। সেই গ্রন্থবিরল যুগে বিধাতার আশীর্বাদের মতো এসেছিলো নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পার্বণী', তারই পাতায় এই অপ্রতিরোধ্য কবিতা প্রথম এবং অবিস্মরণীয়রূপে পড়েছিলাম। মনে পড়ে একটি বালককে অসংখ্য বার এটি আবৃত্তি করতে হয়েছিলো, আর তা-ই শুনে বয়স্কজনেরা কতই না হেসেছিলেন। হ্যাঁ—হাসির কবিতা সন্দেহ নেই, কিন্তু শুধু তা-ই নয়, শুধু আজব ভোজের রঙিন তালিকাই তৈরি হয়নি এখানে, মাতৃভাষার স্বরূপটিকেও প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলা ভাষার এক-একটি ক্রিয়াপদ কত রকম বিচিত্র অর্থে ফরমাশ খাটে, যা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু হঠাৎ কেউ জিগেস করলে বলতে পারি না—সে-বিষয়ে আমাদের মনোরম উপায়ে সচেতন ক'রে দিলেন সুকুমার রায়। তাঁর এ-ধরনের রচনায়

মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ 'শব্দকল্পদ্রুম', আর 'খাই-খাই' সবচেয়ে বিস্তারিত ও সম্পূর্ণ। 'খাই-খাই' পদ্যে লেখা হ'লেও আসলে একটি প্রবন্ধ বা অভিধানের ছিন্নপত্র; অথচ রঙে রসে উজ্জ্বল; পণ্ডিতের সঙ্গে রসিক এখানে মিলেছে. আর রসিকতায় শান দিয়ে যাচ্ছে ছন্দ-মিলের দাঁড়ি-কমা। ঐ মিল—স্বচ্ছন্দ, অভিনব, অনিবার্য এক-একটি মিল—ওর প্রয়োজন ছিলো ওখানে—নয়তো অতক্ষণ ধ'রে সহ্য করা যেতো না; কিন্তু পদ্যের ঘনিষ্ঠতা যে-সব রচনায় নেই, সেখানে লেখক পুরোমাত্রায় পুষিয়ে দিয়েছেন গল্প এনে, প্লট সাজিয়ে; 'অবাক জলপান' এবং অংশত 'চলচিত্তচঞ্চরী'কে বলা যায় 'খাই-খাই'-এরই গদ্য প্রকরণ, অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন প্রবন্ধ। সুকুমার রায়ের মাপজোক ঠিক নিতে হ'লে, তাঁর নানান গুণপনা বুঝতে হ'লে আমাদের আসতে হবে এখানেই—তাঁর রচনাবলির এই অংশে—যেখানে ভাষাতত্ত্ব শিল্পীর হাতে সজীব হ'য়ে উঠেছে, যেখানে তাঁর বৈজ্ঞানিক সার্কাসে কথার খেলা দেখানো হয়। এই কথা নিয়ে খেলা করার কাজটি লেখকদের পক্ষে লোভনীয়, কিন্তু রজ্জুপথে চলার মতোই বিপজ্জনক, একচুল ভুল হ'লেই সেখানে অপঘাত ঘটে। এর জন্য বিশেষ একরকম মনীষিতার প্রয়োজন হয়, সেটা সকলের থাকে না। এই ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার আধুনিক লেখকদের মধ্যে সুকুমার রায় অনন্যভাবে চোখে পড়েন; তাঁর কথা-খেলার ফলশ্রুতি বিনোদনেই ফুরোয় না, তাতে ভাষার লুকোনো কোণে আলো পড়ে, ভাষাপ্রয়োগের সম্ভাবনা যেন বেড়ে যায়। 'হাঁসজারু' বা 'বকচ্ছপ' শুনে ছোটোরা যত ইচ্ছে হাসুক, কিন্তু আমাদের মনে প'ড়ে যায় জেমস জয়সকে আর পূর্বসূরি ল্যুইস ক্যারলকে যিনি 'slithy' আর 'mimsy' উদ্ভাবন ক'রে জয়সকে পথ দেখিয়ে দেন।* অবশ্য 'হাঁসজারু', 'বকচ্ছপে' ক্যারলীয় গূঢ়তা নেই, কিন্তু ইঙ্গিত ঠিকরে পড়ে সুকুমার রায়ের শ্লেষপ্রয়োগে, যমকের ব্যবহারে।

* 'Slithy' কথাটাই পিছল-পিছল শোনায়, আর 'mimsy' মানে যে তুচ্ছ কিছু, তা আর ব'লে দিতে হয় না। প্রথম কথাটি—একটু ভাবলে বোঝা যাবে—তৈরি হয়েছে 'lithe' আর 'slimy' মিশিয়ে, আর দ্বিতীয়টিতে মিশেছে 'flimsy' আর 'miserable'। ইংরিজিতে এই প্রথম দেখা দিলো 'জোড়কলম-শব্দ' বা 'portmanteau word যাকে পরিণতির চরম সোপানে নিয়ে গেলেন জেমস জয়স। বাংলা ভাষায় 'womoon' বা 'hominous' এখনো সম্ভব হয়নি, কিন্তু 'গল্পসল্পে' রবীন্দ্রনাথ খেলাচ্ছলে দু-একটি নমুনা বানিয়েছিলেন, যেমন 'হিদিক্কার' বা 'বুদবুধি'। এর প্রথমটিতে 'হৃদয়', 'হিক্কা', 'ধিক্কার' এই তিনটি শব্দেরই আভাস দেয়, আর দ্বিতীয়টিতে 'বুধ' আর 'বুদ্বুদ' মিশে পাণ্ডিত্যের প্রতি কটাক্ষ পড়েছে।

ঐ শ্লেষ বা 'পান্‌' করার বিদ্যেটি বড়ো পিচ্ছিল—অনেকের হাতেই তা ছিবলেমি মাত্র হ'য়ে পড়ে। কিন্তু সুকুমার রায়, 'হাস্য-কৌতুক'-এ রবীন্দ্রনাথের মতো, ওর সাহায্যে ভাষার গাঁট খুলে দেখান। 'অবাক জলপান'-এ আমরা শুধু কৌতুকে আবিষ্ট হই না, সেই সঙ্গে 'জল' কথাটির সঙ্গে নতুন ক'রে আমাদের চেনা হয়।

৪

সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পরে 'সন্দেশ' যতদিনে বন্ধ হ'লো, তার আগেই শিশু-সাহিত্যে নতুন যুগ এনেছে 'মৌচাক' পত্রিকা। পরে অবশ্য 'সন্দেশ' বেরিয়ে আবার কিছুদিন চলেছিলো, কিন্তু 'প্রত্যাগত' শার্লক হোমস-এর মতোই সে আর তার পূর্বসত্তা ফিরে পায়নি। এর পর থেকে শিশুসাহিত্যে আসর জমালেন 'মৌচাক'-এর লেখকরাই; শিশুসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের এই পত্রিকাটিকেই প্রতিভূ বলা যায়।

এ-কথার অর্থ এই যে আধুনিক কালে, অর্থাৎ গত তিরিশ বছরের মধ্যে যাঁরা ছোটোদের জন্য উল্লেখ্যরূপে লিখেছেন, তাঁরা সকলেই এই পত্রিকার লেখক এবং কেউ-কেউ হয়তো ওরই প্রবোচনায় প্রথম ওদিকে মন দেন। প্রথম যুগের সঙ্গে দ্বিতীয় যুগের কিছু লক্ষণগত পার্থক্য দৃষ্টিপাতমাত্র ধরা পড়ে। আগে রচনার ক্ষেত্রে নাবালক-সাবালকের সীমান্তরেখা খুব স্পষ্ট ছিলো; যাঁরা ছোটোদের জন্য লিখতেন তাঁরা অন্য কিছু লিখতেন না, আর যাঁদের বলতে পারি অবিশেষ সাহিত্যিক, সর্বসাধারণের লেখক, তাঁরাও শিশুসাহিত্য এড়িয়ে যেতেন। (পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে বলছি, আর রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' কাব্যটি যে 'শিশুসাহিত্য' নয়, সে-কথা অবশ্য না-বললেও চলে।) আধুনিক কালে এ-ব্যবস্থার বদল হয়েছে। 'মৌচাক'-এর প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতার লেখক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, তার অনতিপরেই 'বুড়ো আংলা'র আবির্ভাব হ'লো সেখানে: 'ভারতী'-গোষ্ঠীর, তারপর 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর প্রায় সকলে দেখা দিলেন একে-একে; মোটের উপর এ-কথা বললে ভুল হয় না যে সম্প্রতি যাঁরা ছোটোদের জন্য লিখেছেন এবং লিখছেন, দু-একজনকে বাদ দিয়ে তাঁরা সকলেই সাবালক সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাবান। হয়তো এরই জন্য, কিংবা হয়তো অনিবার্য যুগপ্রভাবে, আমাদের শিশুসাহিত্যও অপেক্ষাকৃত বয়স্ক হয়েছে এখন: হয়তো শৈশবেরও চরিত্র বদলেছে এতদিনে; আমরা আমাদের ছেলেবেলায় যে-রকমের ছোটো ছিলুম, এই রেডিওমুখর সিনেমাচ্ছন্ন যুগে সে-রকম আর সম্ভব ব'লেই

মনে হয় না। এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে শিশুসাহিত্যে; রচনার বিষয় বেড়েছে, বিষয় বদলেছে; ভিন্ন সুরে বলা হয় আজকাল, ছোটোদের আর ততটা ছোটো ব'লে গণ্য করা হয় না, এবং বর্তমান কালের 'ছোটোদের' বই অনেক ক্ষেত্রে বয়স্করাও উপভোগ ক'রে থাকেন।

এই শেষের কথাটাকে একটু বিস্তার করা দরকার। শিশুসাহিত্যে বড়ো দুটো শ্রেণী পাওয়া যায়। তার একটা হ'লো একান্তভাবে, বিশুদ্ধরূপে নাবালক-সেব্য, যেমন যোগীন্দ্রনাথের, উপেন্দ্রকিশোরের রচনাবলি; আর অন্যটা হ'লো সেই জাতের বই, যাতে বুদ্ধির পরিণতিক্রমে ইঙ্গিতের গভীরতা বাড়ে, যেমন ক্যারলের অ্যালিস-কাহিনী, আণ্ডেরসেনের রূপকথা, বাংলা ভাষায় 'বুড়ো আংলা', 'আবোল তাবোল'। যাদের মনের এখনো দাঁত ওঠেনি, একেবারে তাদেরই জন্য প্রথম শ্রেণীর রচনা, তাদের ঠিক উপযোগী হ'লেই তা সার্থক হ'লো: কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা, বিশেষ অর্থে শিশুপাঠ্য থেকেও, হ'য়ে ওঠে বড়ো অর্থে সাহিত্য, শিল্পকর্ম; অর্থাৎ লেখক ছোটোদের বই লিখতে গিয়ে নিজেরই অজান্তে সকলের বই লিখে ফেলেন। বাংলা ভাষার সাম্প্রতিক শিশু-সাহিত্য, যা বয়স্করাও উপভোগ করেন, তা এ-দুয়ের কোনো শ্রেণীতেই পড়ে না; খুব ছোটোদের খাদ্য এটা নয়—বরং বলা যায় কিশোর-সাহিত্য—আর বয়স্কদের যখন ভালো লাগে, তখন এই কারণেই লাগে যে লেখক তা-ই ইচ্ছে করেছিলেন, অনেক সময় বোঝা যায় যে লেখক যদিও মুখ্যত বা নামত ছোটো-দের জন্য লিখেছেন, তবু সাবালক পাঠকও তাঁর লক্ষ্যের বহির্ভূত ছিলো না।

এর ফল—চারদিক মিলিয়ে দেখলে—ভালোই হয়েছে। প্রাচুর্য বেড়েছে, বেড়েছে উপাদানের বৈচিত্র্য, সেই সঙ্গে রূপায়ণেও সমৃদ্ধি এসেছে। বিস্তর বই বেরোচ্ছে আজকাল, বিস্তর বাজে বই বেরোচ্ছে—কিন্তু সেই সব খড়-বিচিলির স্তূপের মধ্যে শস্যকণারও পরিমাণ বড়ো কম নেই। রচনার নতুন ধারা নানা দিকেই বেরিয়েছে; তার একটা হ'লো বহির্জীবনের ঘটনাবহুল কাহিনী, যাকে বলে অ্যাডভেঞ্চার, আর কৌতুক-রচনা—'পরশুরাম'-এর অনন্য উদাহরণ বাদ দিলে—সম্প্রতি যেন বিশেষভাবে শিশুসাহিত্যেই আশ্রয় নিয়েছে। এই উভয় বিভাগেই দেখা যায়, লেখকরা নাবালক-বুদ্ধির গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে নারাজ; তাঁদের লেখাটা হয় ছোটদের মাপের, কিন্তু বিষয়টা সব সময় আন্দাজমতো হয় না, কখনো-কখনো পরিণত মনের প্রবীণতা তাতে ধরা পড়ে। আমি কী বলতে চাচ্ছি সেটা স্পষ্ট হবে হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের রোমাঞ্চিকার তুলনা

করলে। 'যখের ধন' খাঁটি কিশোর-সাহিত্য—আর লেখার জাত হিশেবেও বাংলা ভাষায় নতুন—কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের নতুন 'বৈজ্ঞানিক' অ্যাডভেঞ্চারে যেন আরো-কিছুর সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাই। শুধু সম্ভাবনা, সেটুকুই যা দুঃখ। তাঁর চান্দ্র ভ্রমণের রহস্যঘন কাহিনী বা দানবিক দ্বীপের লোমহর্ষক উপাখ্যান, এ-সব রচনাকে শিশুসাহিত্য বললে একটু কম বলা হয়, কিন্তু অন্য কোনো নামও এদের দেয়া যায় না। এতে এমন উপকরণ আছে, যাতে পরিণত মনেও কৌতূহলের উত্তেজনা আসে, কিন্তু সেই উত্তেজনার তৃপ্তির পক্ষে যথোচিত উপাদান বা ব্যবস্থাপনা নেই। আমরা বয়স্করা রুদ্ধশ্বাসে প'ড়ে উঠি, কিন্তু প'ড়ে উঠে মনে হয় যে আরো অনেক বিস্তার করলে, আরো অনেক বৈজ্ঞানিক ও মানবিক তথ্য যোগ করলে, তবে বিষয়টির প্রতি সুবিচার হ'তো, 'শিশুসাহিত্য' হবার জন্য গল্পটা যেন বাড়তে পেলো না। এর মানে এ-কথা নয় যে কিশোর পাঠকের ভাগে কোথাও কম পড়লো; আমার বক্তব্য শুধু এটুকু যে এদের যেন বয়স্কোচিত গল্প হবারই কথা ছিলো, অবস্থাগতিকে ছিটকে পড়েছে শিশুসাহিত্যে*। অনেকটা এই রকমের ধারণা দেয় হাস্য-রচনাও; সেখানেও, যেমন শিবরামের কোনো-কোনো গল্পে, অভিজ্ঞতাটা পাই বয়স্ক জীবনের, শুধু পরিবেষণটা কৈশোরোচিত।

শিবরাম চক্রবর্তীর উপাদান ছিলো প্রমাণসই হাস্যরসিকের, কিন্তু তিনি তাঁর পুরো আকারে পৌঁছতে পারলেন না; ঘটনাচক্রে—কিংবা হয়তো তাঁর স্বভাবেই একটা অসংশোধনীয় ছেলেমানুষি আছে ব'লে—শিশুসাহিত্যেই আবদ্ধ থাকলেন। অবশ্য 'বড়োদের জন্য'ও তিনি লিখেছেন, কিন্তু সে-লেখা তাঁর 'ছোটোদের' লেখারই আদিরসাত্মক প্রকরণমাত্র, এ ছাড়া আর তফাৎ কিছু নেই। এ-কথাটা প্রশংসার হ'লো না, কিন্তু আরো কিছু অপ্রশংসাকে

* 'অবস্থাগতিকে' কথাটা অনুধাবনযোগ্য। অ্যাডভেঞ্চারঘটিত গল্প জমাবার মতো উপকরণ বাঙালির জীবনে বেশি নেই: পুরো মাপে লিখতে গেলেই সম্ভাব্যতার সীমা ডিঙোবার আশঙ্কা বটে। হয়তো এই কারণেই প্রেমেন্দ্র মিত্র এইচ. জি. ওএলসের অনুগামী হ'তে পারেননি, আর হেমেন্দ্রকুমারও স্টীভেনসনকে সাত হাত তফাতে রেখেছেন। জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে অ্যাডভেঞ্চার নামক পদার্থটা পশ্চিমবাসীর জীবনের মধ্যে সত্য, তাই তার সাহিত্যেও সেটা জীবন্ত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের পক্ষে ও বস্তুটি এখনো অনেকটাই বানানো, অমূল কল্পনা বা ইচ্ছাপূরণ। এই একই কারণে, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রশংসনীয় হুকা-কাশি সত্ত্বেও, বাংলা ভাষায় সত্যিকার গোয়েন্দা গল্প এখনো হ'তে পারলো না, শুধু তার বিকৃতি জ'মে উঠলো কিশোর-সাহিত্যের কুপথ্যশালায়।

শিবরাম যেন নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে পাঠান; তিনি যে মাঝে-মাঝে, একটু ভিন্ন অর্থে লোক হাসান, তাঁর রচনাবলির অনেকটা অংশ যে চর্বিতচর্বণ, শ্লেষ, যমক ইত্যাদি অলংকারগুলোকে তিনি যে প্রায় বিভীষিকার স্তরে নিয়ে গেছেন, এ-সব কথা বলার জন্য সমালোচকের প্রয়োজন হয় না, তাঁর নাবালক পাঠকেরাও তা বলতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত দোষ যোগ ক'রে দেখলেও তাঁর গুণের অংশকে মলিন করতে পারে না; সব সত্ত্বেও এ-কথাটা সত্য থেকে যায় যে কৌতুকের কলাক্ষেত্রে তাঁর স্বাক্ষর জাজ্বল্যমান; যেখানে তাঁর রচনা উৎকৃষ্ট— আর সে-রকম গল্পও সংখ্যায় তিনি অনেক লিখেছেন— সেখানে তাঁর হাস্যরস এমন দুর্বার যে তার আঘাতে পাকা বুদ্ধির দেয়ালসুদ্ধু ভেঙে পড়ে। শিবরামের 'কালান্তক লাল ফিতা'— যেখানে আদালতের ব্যূহ থেকে সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা পরলোকে পৌঁছিয়ে দিয়েও থামলো না, বা 'পঞ্চাননের অশ্বমেধ'— যে-গল্পের শেষে 'ঘোড়াটা হাসতে-হাসতে ম'রে গেলো', বা যে-গল্পে তিনি কুশল-প্রশ্নের নিক্তিমাপা জবাব দেবার জন্য গাণিতিক ভাষা উদ্ভাবন করেছেন— এ-সব গল্প শিশুসাহিত্যের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলা ভাষার কৌতুকসাহিত্যে স্থান পায়। তুলনীয় গল্প তাঁর আরো আছে, সমসাময়িক অন্য লেখকদেরও আছে; উদাহরণত উল্লেখ করবো রবীন্দ্রলাল রায়ের 'দিনের খোকা রাতে', বা সেই জীবনের পক্ষে অতি সত্য গল্পটি, যেখানে নায়ক ছাতা ভুললেই ধারাবর্ষণ নামে আর বর্ষাতি নিলেই রোদ্দুর ওঠে দেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলো যে বিশ্বজগতে 'আমার জন্যই সব হচ্ছে';— সব মিলিয়ে বোঝা যায় যে আধুনিক লেখক উপাদানের জন্য বালকজীবনে আবদ্ধ থাকেন না, যদিও হাসির ভোজে ছেলে-বুড়োর অংশ থাকে সমান— কেননা এ-সব লেখায় ঠাট্টা থাকলেও উগ্রতা নেই। যা বিশেষ অর্থে ব্যঙ্গ নয়, শুধুই কৌতুক— এই বস্তুটি আমাদের শিশুসাহিত্যেই প্রচুর হ'য়ে দেখা দিয়েছে, এ-কথাটি আনন্দের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করি।

উপরন্তু প্রমাণ মেলে যে ব্যঙ্গরচনাও ঝিমিয়ে পড়েনি। যোগ্য কারিগর আছেন অন্নদাশঙ্কর, যাঁর হাতে বাংলাদেশের সনাতন ছড়া নতুন ক'রে জেগে উঠেছে। আধুনিক কবির হাতে ছড়া বেরোতে পারে শুধু এই শর্তে যে তাতে তিনি বক্তব্য কিছু দেবেন, অথচ সেটুকুর বেশি দেবেন না যেটুকু এই হালকা ছোটো চটুল শরীরে ধ'রে যায়। একেবারে সারাংশ কিছু-না-থাকলে তা নেহাৎই শব্দের টুংটাং হ'য়ে পড়ে, আবার মাত্রা একটু বেশি হ'লেও ছড়া আর থাকে না। অন্নদাশঙ্কর দু-দিকই ঠিক সামলে চলেন, তাঁর ছড়ায় একরত্তি

রূপের মধ্যে একটি ফোঁটা বস্তুও তিনি বসিয়ে দেন, সঙ্গে দেন কৌতুকের সেই আমেজটুকু, যার স্বাদ জিভে লেগে থাকে। তাঁর 'উড়কিধানের মুড়কি' প'ড়ে সাবালক পাঠকের সবিস্ময় প্রশংসা জেগেছে ; সেই একই ঝাল-মিষ্টি-মেশানো মুড়মুড়ে ঠাট্টা আবার তিনি ছড়িয়েছেন 'রাঙা ধানের খৈ'তে, এ-খই 'ছোটোদের' ব'লে আলাদা ক'রে চেনা যায় না।* ছোটোদের ভিড় জ'মে উঠবে সন্দেহ নেই, কিন্তু ঠাট্টার সবটুকু রস শুধু বয়স্ক পাঠকই পাবেন, কেননা লেখকের বক্তব্যবিষয়ে 'কেশনগরের মশা'র কাঁহুনিটাই শেষ কথা নয়, বই জুড়ে ঝলক দিচ্ছে যুদ্ধকালীন পলিটিক্যাল ব্যঙ্গ, ভারতভঙ্গের বেদনা, আর উঁচু হ'য়ে ফুটে আছে একটি আশ্চর্য সুলিখিত নাটিকা, সেখানে লেখক, হাস্যমুখর ছন্দ চালিয়ে, পিষ্টকগ্রাসী বিচারক বানরের পুরোনো নীতিকথায় ভারত-পাকিস্তান-ব্রিটিশ সম্বন্ধের বিবরণ দিয়েছেন। শিশুমহলে রাজনীতির প্রবেশ 'সন্দেশ'-এর সময়ে অভাব্য ছিলো, এখানেও এই দুই যুগের প্রভেদ বোঝা যায়।

কিন্তু এই প্রভেদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ লীলা মজুমদার। তার কারণ, তিনি নতুন যুগের স্বাদ এনেছেন, বিষয়গত বৈচিত্র্য দিয়ে নয়, রূপায়ণের অভিনবত্বে। নতুন বিষয়ের নিজস্ব একটি আকর্ষণ আছে, তার প্রভাবে লেখাটা গৌণ হ'য়ে যায় অনেক সময়, কিংবা ভুল কারণে মূল্য পায়। এই আকর্ষণ লীলা মজুমদারে নেই, আর নেই বলেই তাঁর লেখায় দুই যুগের পার্থক্য স্পষ্ট হয়েছে—বস্তুর দিক থেকে নয়, চরিত্রের দিক থেকে। প্রেমেন্দ্রের মতো, বা অন্নদাশঙ্করের মতো তিনি অপূর্ব কোনো উপাদান আমদানি করেননি ; তিনি লিখেছেন সেই পুরোনো ছোটো ছেলেরই গল্প, যে-ছেলে চেয়ে ত্যাখে, অবাক হয়, স্কুলে যায়—যেতে চায় না ; এখানে কৃতিত্বটুকু সমস্ত তাঁর লেখায়, নতুনত্ব সমস্ত তাঁর দৃষ্টিতে। বিষয়বস্তুর মিল থাকলে পূর্বাপর তুলনা করা সহজ নয়, এ-ক্ষেত্রে তার আরো একটা বড়ো রকমের সুবিধে আছে। লীলা মজুমদার সুকুমার রায়ের পিতৃব্যপুত্রী, রায়চৌধুরীদের বংশগত দীপ্তি পেয়েছেন, কিন্তু এই 'পারিবারিক সাদৃশ্য' ছাড়াও তিনি বিশেষ অর্থেই সুকুমার রায়ের উত্তরসাধক। তাঁর 'দিন দুপুরে'র সঙ্গে 'পাগলা দাশু' মিলিয়ে পড়লে তৎক্ষণাৎ কিছু সামান্য লক্ষণ ধরা

* অন্নদাশঙ্করের ছড়া বা অজিত দত্তের 'নইলে' নামক উৎকৃষ্ট কৌতুকাবহ কবিতা—এ-সবের জাত আসলে হালকা কবিতার, ইংরেজিতে যাকে বলে লাইট ভার্স, সেখানে বিষয়টাতেই সাবালক মনের খোরাক থাকে।

পড়ে : সেই একই রকম চাপা হাসি, মুখ টিপে হাসি, নকল-গম্ভীর বাচন-ভঙ্গি, এমনকি সেই বালিকার বদলে বালক-মনেরই নেপথ্যালোকে আল্লো ফেলা। 'দিন দুপুরে'র কুশীলব যে ছেলেরাই, কখনোই কোনো মেয়ে নয়, এতে একটু বিস্ময় জাগে, কোথায় একটু অভাব ব'লেই অনুভূত হয়—কিন্তু এই অভাব পূরণ ক'রে দেয় লেখিকার বালকজীবনের সহজবোধ, আর স্কুল-ছেলেদের অসাধু এবং বলশালী স্ল্যাং বুলিতে তাঁর এমন দখল, যাতে ফিরে-ফিরে তাঁর অগ্রজকেই মনে পড়ে।

এই সাদৃশ্যের পটভূমিতে লীলা মজুমদারের বৈশিষ্ট্য আরো উজ্জ্বল হয়েছে। মোটের উপর, পূর্বসূরির তুলনায়, তাঁকে মনে হয় বেশি অভিজ্ঞ, বেশি সচেতন, কিংবা যাকে ইংরিজিতে বলে সফিস্টিকেটেড—আশা করি কথাটায় কেউ অপরাধ নেবেন না। এর সমস্তটাকেই কালধর্মের প্রভাব ভাবলেও ভুল হবে, তাতে লেখকের স্বকীয়তাকে খর্ব করা হয়। যেমন তাঁর গল্পের স্বাদ 'পাগলা দাশু'র সীমাতিক্রান্ত, তেমনি সমসাময়িক কারো সঙ্গেও তাঁর সাদৃশ্য নেই। তিনিও কৌতুকের কারুকর্মী, কিন্তু শিবরামের মতো অতিরঞ্জনপন্থী নন, অন্নদাশঙ্করের ব্যঙ্গও তাঁর ধাতে নেই; তাঁর গল্পে কখনোই আমরা চেঁচিয়ে হাসি না, কিন্তু আগাগোড়াই মনে-মনে হাসি—আর কখনো-কখনো শেষ ক'রে উঠে ভাবতে আরো বেশি ভালো লাগে। এই কৌতুকের সঙ্গে কল্পনা এমন সুমিত হ'য়ে মিশেছে, এমনভাবে আজগুবির সঙ্গে বাস্তবের মাত্রা ঠিক রেখে, আর এমন নিচু গলার লয়দার গদ্যের বাহনে, যে লীলা মজুমদারকে—তাঁর পরিমাণের মন-খারাপ-করা ক্ষীণতা সত্ত্বেও—বাংলা শিশুসাহিত্যে স্বতন্ত্র একটি আসন দিতে হয়।

৫

বাংলা শিশুসাহিত্যে দুই যুগ দেখিয়েছি; প্রথমে সরল, সংকলনপ্রধান, বিশুদ্ধরূপে শিশুসেব্য; তারপর উদ্ভাবনে নিপুণ, উপকরণে বিচিত্র, অংশত প্রবীণপাঠ্য। দুই যুগের চরিত্রভেদও দেখিয়েছি, বলতে চেয়েছি আধুনিক লেখক একান্তভাবে ছোটোদের জন্য লেখেন না, আর ছোটোরাও তেমন ছোটো আর নেই। এর সঙ্গে কিছু-কিছু 'তবে' 'কিন্তু' যোগ করা সম্ভব হ'লেও মোটের উপর এই বিভাগের যাথার্থ্য নিয়ে তর্ক ওঠে না। কিন্তু এই সীমাচিহ্ন, ইতিহাসের খুঁটি, এই সুবিধা-জনক কাজ-চালানো ব্যবস্থা—সমস্ত ভেঙে পড়ে, অর্থ হারায় যখন আমরা অবনীন্দ্রনাথের সম্মুখীন হই। দুই যুগে ব্যাপ্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, এপার

গঙ্গা ওপার গঙ্গার সেতুবন্ধী সওদাগর। তাঁকে দুই শতকের অন্তর্বর্তী করেছে তাঁর আয়ুষ্কাল; লেখকজীবনের পরিধির মাপে তিন পুরুষের সমসাময়িক তিনি। তাঁকে উপেন্দ্রকিশোরের সতীর্থ ব'লে ভাবতে পারি, আবার আধুনিক রঙ্গমঞ্চেও তিনি প্রতীয়মান। উভয় যুগেরই চিহ্ন আছে তাঁর রচনায়; আরম্ভকালের লক্ষণ দেখি অনুরচনার উন্মুখতায়, আবার বর্তমানের ঝোঁক পড়েছে শিশুগ্রন্থের সর্বজনীন আবেদনে।

না—ভুল হ'লো, ঠিক কথাটি বলা হ'লো না। অবনীন্দ্রনাথ, বাল্যবঙ্গের রত্নবণিক তিনি, এ-কথা যেমন সত্য, তেমনি এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে শিশু-সাহিত্যের ফ্রেমের মধ্যে তাঁকে ধরানো যায় না। 'নালক', 'রাজকাহিনী', 'বুড়ো আংলা', 'আলোর ফুলকি', এ-সব বই আলাদা ক'রে ছোটোদের নয়, আলাদা ক'রে বড়োদেরও নয়; এখানেই তিনি খুঁজে পেলেন নিজেকে, বাস্তু-ভিটার দখল পেলেন। এটাই তাঁর ভাষা, তাঁর মনের ভাষা, প্রাণের ভাষা; এটাই তাঁর স্বর, তাঁর গলার স্বর, সত্তার স্বর; এটাই—তিনি। যে-সব লক্ষণের কথা বলেছি, যেখানে-যেখানে দুই যুগেরই সঙ্গে তাঁর মিল দেখিয়েছি, আসলে সেগুলোই তাঁর মনের অভিজ্ঞান, তাঁর চরিত্রের প্রমাণপত্র। যে-কালে তিনি জন্মেছিলেন, যে-কুলে তিনি জন্মেছিলেন, সেখানে তাঁকে খুঁজতে গেলে দিশে মিলবে না, বড়ো জোর টুকরো ক'রে পাওয়া হবে। 'নালক' থেকে 'আপন কথা' পর্যন্ত বইগুলো যখন চিন্তা করি, তখন মনে হয় যে তাঁর মতো অখণ্ড চরিত্র নিয়ে আর-কোনো বাঙালি লেখক জন্মাননি, আর-কেউ নেই তাঁর মতো একই সঙ্গে এমন উদাসীন আর চকিতমনা, এমন দূরে থেকেও সংবেদনশীল। তাঁর জীবৎকালে কত হাওয়া উঠলো সাহিত্যে, কত হাওয়া ঘুরে গেলো, কিন্তু সে-সবের একটিও খড়কুটো দেখতে পাই না এখানে, কারোরই কোনো 'প্রভাব' ধরতে পারি না, পাশের বাড়ির রবিকাকার পর্যন্ত না—যদিও সেই রবিকাকারই উৎসাহে তিনি তুলিতে অভ্যস্ত হাতে প্রথম কলম ধরেছিলেন। সমসাময়িক পরিবেশের মধ্যে তিনি যেন থেকেও নেই; তিনি লিখেছেন একলা ব'সে আপন মনে ঘরের কোণে, লিখেছেন যে-রকম ক'রে না-লিখেই তিনি পারেননি; ভাবেননি সে-লেখা কার জন্য, কে পড়বে;—কিংবা যদি-বা ছোটোদের কথা ভেবে থাকেন, সেই ছোটোরাও বিশ্বমানবেরই প্রতীক।

আরো বুঝিয়ে বলি কথাটা। যাঁরা সাবালকপাঠ্য লেখক, মাঝে-মাঝে ছোটোদের জন্য লেখেন, আর সেখানেও বয়স্ক জীবনের বক্তব্য বাদ দেন না,

অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের দলে পড়েন না। ইতিপূর্বে তাঁর নাম করেছি তাঁদের সঙ্গে, যাঁদের হাতে শিশুপাঠ্য রচনাও বড়ো অর্থে সাহিত্য হ'য়ে ওঠে, হ'য়ে ওঠে সাহিত্যশিল্পের চিরায়ত উদাহরণ। কিন্তু এখানেও একটু আলাদা ক'রে দেখতে চাই। একদিকে রাখতে চাই সুকুমার রায়, লুইস ক্যারলকে, শিশুসাহিত্যের অতি বিদগ্ধ লেখক যাঁরা, যাঁদের কৌতুকের অভিপ্রায় ভাষাব্যবহারে অসামান্য নৈপুণ্যদ্বারাই সার্থক। আর অন্য দিকে আছেন হান্স আণ্ডেরসেন, অবনীন্দ্রনাথ, যাঁদের শিশুসাহিত্যে জীবনের মূল্যায়ন পাই, বাণী শুনতে পাই মানবাত্মার উদ্দেশে। অর্থাৎ, এঁরা সেই বিরল জাতের বড়ো লেখক, যাঁদের আত্মপ্রকাশের বাহনই হ'লো শিশুসাহিত্য। কিংবা হয়তো এঁদের রচনা দৈবক্রমে শিশু-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; আসলে—এবং কার্যত—তা সর্বজনীন, যদিও একান্তভাবে বয়স্কপাঠ্য রচনায় এঁরা তেমন সপ্রতিভ নন। আণ্ডেরসেনের জগৎ-জোড়া খ্যাতির নির্ভর তাঁর রূপকথাই, অন্য কোনো রচনা নয়, আর অবনীন্দ্রনাথও 'পথে-বিপথে' লিখেছিলেন—'বড়োদের' বই সেটি—কিন্তু সেখানে তাঁকে চিনতে পারি না—যেন তিনি অন্য মানুষ, রীতিমতো 'শিক্ষিত', 'ভদ্রলোক'; —সেখানে মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের বোল দেয়—এমনকি, বঙ্কিমেরও—ভ্রমণচিত্রের কোনো-কোনো অংশে ছাড়া, সেটি 'ভারতী'-গোষ্ঠীর যে-কোনো ভালো লেখকের রচনা হ'তে পারতো। আর তাঁর মুখে-বলা বই—'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', এদেরও মূল্য প্রধানত তথ্যগত, শিল্পগত নয়। কিন্তু যেখানে তিনি শিল্পী, স্রষ্টা, যেখানে তিনি নিগূঢ় অর্থে মৌলিক, সেখানে তাঁকে দেখতে হ'লে আসতে হবে এই অনুরচিত বইগুলির কাছে—এই 'নালক', 'রাজকাহিনী', 'বুড়ো আংলা', 'আলোর ফুলকি'*—যে-সব বই তিনি লিখেছিলেন তাদেরই জন্য, যারা 'ছেঁড়া মাদুরে নয়তো মাটিতে ব'সে গল্প শোনে, ইতিহাসের সত্যিকার "রাজা-রানী-বাদশা-বেগম" ' যারা। তাঁর বিষয়ে এ-কথাও ঠিক বলতে চাই না যে তিনি ছোটোদের বই লিখতে গিয়ে সকলের

* এখানে 'ভূতপত্রী'র নাম করলুম না এইজন্য যে এ-বইটির গড়ন কিছু নড়বড়ে, গল্প, গুজব পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল, আজগুবি, এই সমস্ত মিলে-মিশে 'বুড়ো আংলা'র মতো নতুন এবং অবিকল একটা পদার্থ হ'য়ে ওঠেনি, কোথাও-কোথাও অসংলগ্নতার দোষ ঘটেছে। (যেমন হারুন-বাদশার উপাখ্যানের সঙ্গে সাগরতলের মাসিবাড়ির গল্পটিকে শুধু বাইরে থেকে জুড়ে দেখা হয়েছে, ভিতর থেকে ঘটকালি করা হয়নি।) অবশ্য এ-কথা বলার মানে এ-নয় যে বইটির অন্যবিধ মূল্য বিষয়ে আমি সচেতন নই।

বই লিখে ফেলেছেন, বলতে চাই তিনি প্রথম থেকেই সকলের বই লিখেছেন, শিশুর বইয়ের ছল ক'রে মানুষের বই লিখেছেন তিনি। তাঁর মনের মধ্যে সেই মানুষ ব'সে ছিলো—'সেই সত্যিকার রাজা-রানী-বাদশা-বেগম'—যে-মানুষ না-ছেলে, না-বুড়ো, কিংবা একই সঙ্গে দুই—যার বয়সের হিশেব নেবার কথাই ওঠে না, উপায়ও নেই—আজকের ভোরবেলাটির মতো নতুন আবার সভ্যতার সমান বুড়ো সেই রূপকথার চিরকালের যে শ্রোতা এবং নায়ক। আর এ-সব বই যে-ভাষায় তিনি লিখেছেন—সেটা তাঁর মনের ভাষা, প্রাণের ভাষা;—সে তো ভাষা নয়, ছবি, সে তো ছবি নয়, গান;—সুর তাতে রূপ হ'য়ে ওঠে, আর রূপ যেন সুরের মধ্যে গ'লে যায়;—তাতে ছবির পর ছবি দেখি চোখ দিয়ে, আর কানে শুনি একটানা গান গুনগুন;—তার সম্মোহন কেউ নেই যে ঠেকাতে পারে। আর এই জাদুকর গদ্যে যা-কিছু লিখেছেন, তাতে বুদ্ধিঘটিত বস্তু কিছু নেই, তার আবেদন ভাবনার কাছে নয়, কল্পনার কাছে, আমাদের কৌতূহলে নয়, ইন্দ্রিয়ে—চেতনায়। এই খেলার রসগ্রহণের জন্য 'শিক্ষিত' হ'তে হয় না, 'অভিজ্ঞ' হ'তে হয় না; মনের চোখ, মনের কান আর চলনসই গোছের হৃদয়টুকু থাকলেই যথেষ্ট। অর্থাৎ, নানা বয়সের নানা স্তরের মানুষের মধ্যে যে-অংশ সামান্য, সেই অংশই অবনীন্দ্রনাথের ছেঁড়া কাঁথার রাজপুত্তুর। তাই তাঁর শিশুগ্রন্থ সর্বজনীন।*

এই যিনি কথাশিল্পে রূপকার, সুরকার, বাংলা গদ্যের চিত্ররথ গন্ধর্ব যিনি, এবার তাঁকে বিশেষভাবে শিশুসাহিত্যের সংলগ্ন ক'রে দেখা যাক। প্রথমেই বলতে হয়—যা অন্যভাবে আগেই বলা হয়েছে—যে অবনীন্দ্রনাথ বই লিখেছেন, ছোটোদের জন্য নয়, ছোটোদের বিষয়ে। হান্স আণ্ডেরসেনের মতো, তিনিও প্রতিভাবান শিশুপ্রেমিক ও পশুপ্রেমিক; তাঁর বই আলো হ'য়ে আছে এক আশ্চর্য ভালোবাসায়, যা এই দুই প্রাকৃত জীবের ভিতর দিয়ে বিশ্বজীবনে ছড়িয়ে পড়ে। 'খাতাঞ্চির খাতা'য় পুতু সেখানে 'হিজুলিপাতার জামা বাতাসে

* ব্যতিক্রমস্বরূপ উল্লেখ করবো 'শকুন্তলা'। 'শকুন্তলা'র কালিদাসকেই কেটে-ছেঁটে পাৎলা ক'রে বলা হয়েছে, লেখক নিজের কিছু যোগ করেননি, নতুন কোনো সৃষ্টি নেই এখানে, তাই এটি সীমিত অর্থেই শিশুপাঠ্য। পক্ষান্তরে, 'আপন কথা'কে ছোটোদের বই ব'লে ভাবতে রীতিমতো প্রয়াসের প্রয়োজন হয়; 'ছেলেবেলা'র মতো, এরও মূল্য বিষয়ে নয়, বিষয়ীতে, আর গদ্য ভাষার বিশেষ একটি প্রকরণকলায়। অবনীন্দ্রনাথের সবচেয়ে পাৎলা-হাওয়ার বই এই 'আপন কথা;' পড়তে-পড়তে মাঝে-মাঝে ঈষৎ হাঁপ ধরে।

মেলে দিয়ে', 'জোনাকপোকার মতো একটুখানি আলো' নিয়ে ঘরের মধ্যে উড়ে এসে 'ঝুমঝুম ক'রে ঘুঙুর বাজিয়ে' খেলতে লাগলো; সেখানে, 'রাজকাহিনী'র নিষ্ঠুরতম হত্যার আগে, পাহাড়ের উপর ভাঙা কেল্লায় দুই নিরীহ দুর্ভাগা আফিংচি বুড়ো তাঁদের কুড়োনো কন্যাটিকে নিয়ে 'একটি পিদিমের একটুখানি আলোয় মস্ত একখানা অন্ধকারের মধ্যে' ব'সে আছেন, আর বুড়ো চাচার ছেলেবেলার গল্প শুনতে-শুনতে মেয়েটির 'চোখ ঘুমিয়ে পড়ছে'—সেখানে, আর এই রকমের আরো অনেক দৃশ্য, আমরা যা অনুভব করি, যাতে দ্রব হই, নন্দিত হই, সেটা লেখকের এই মজ্জাগত গুণ—ঠিক গুণও নয়, তাঁর হৃদয়ের ক্ষরণ—তাঁর অপরিমাণ স্নেহ, উদ্বেল বাৎসল্য। এই স্নেহ পরতে-পরতে মিশে আছে তাঁর রচনায়, যেন ছাপার লাইনগুলির ফাঁকে-ফাঁকে ব'য়ে চলেছে, কিন্তু কোথাও-কোথাও ঢেউ উঠেছে বড়ো-বড়ো—সবচেয়ে বড়ো ঢেউ 'ক্ষীরের পুতুল'-এ, ষষ্ঠীতলার সেই মহীয়ান স্বপ্নে, যেখানে লেখক বিশ্বশিশুর বর্ণনা দিতে-দিতে ছড়ার মন্ত্রে বাংলাদেশের প্রতিমায় প্রাণ দিয়েছেন। গল্পের উপসংহারের জন্য তুচ্ছ কোনো দৈব উপায় এটা নয়, গল্পের প্রাণের কথা এখানেই বলা আছে—এই স্বপ্নটিতেই অবনীন্দ্রনাথের আসল পরিচয়। এ তো স্বপ্ন নয়, দৃষ্টি, পরাদৃষ্টি—যাকে বলে vision—সেই একই, যে-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে—'জগৎপারাবারের তীরে ছেলেরা করে খেলা।'

এই একটা জায়গায় বড়ো রকম মিল পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের। রবীন্দ্রনাথেও বাৎসল্যবৃত্তি অসামান্য; ব্যাপ্ত হয়ে, বিচিত্র হ'য়ে তা প্রকাশ পেয়েছে, যেন প্রাণের পেয়ালা উপচে পড়েছে বার-বার, নানা রসে, নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিতে। তাঁর উপন্যাসে শিশুচরিত্র যেমন প্রচুর, তেমনি জীবন্ত; সেখানেই তারা দেখা দেয়, সেই অংশেই পুলক লাগে। 'গল্পগুচ্ছে'—শুধু 'কাবুলিওয়ালা' নয়, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'ছুটি', 'রাসমণির ছেলে', এই রকম অনেক গল্পই স্নেহসূত্রে বিকশিত, 'পোস্টমাস্টার'ও—শেষ পর্যন্ত—তা-ই, আর মৃন্ময়ী, গিরিবালা প্রভৃতি বালিকা-নায়িকাদের বিষয়ে নায়কের প্রণয় ছাপিয়ে প্রবল হ'য়ে উঠেছে লেখকের বাৎসল্যবোধ।* 'ছুটি'র ফটিককেই,

* অনেক সময় প্রেমের গল্পে লেখক নিজেই তাঁর নায়িকার প্রেমে পড়েন, কিন্তু—'নষ্টনীড়' বাদ দিলে—'গল্পগুচ্ছে' রবীন্দ্রনাথের মনের ভাবটি প্রেমিকের নয়, পিতার; তাঁর নায়িকাদের মধ্যে প্রিয়াকে ততটা দেখতে পাই না, যতটা কন্যাকে। বালক-বালিকার চরিত-কথা, 'সবুজ পত্র' যুগের

আবার আমরা দেখতে পাই 'দেবতার গ্রাস'-এর রাখালে, 'খাতা'র উমাকেই চিনতে পারি 'পলাতকা'র 'চিরদিনের দাগা'য়, আবার 'পুনশ্চ'র 'শেষ চিঠি'তে। নাটকে কাঁচা হাতে আরম্ভ হ'লো 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', তারপর 'বিসর্জন'; তারপর শিশুর মুখে ঋষির কথা শোনালেন 'শারদোৎসবে', 'ডাকঘরে'। আর 'শিশু'— সেই হাসিকান্নায় বিমুনি-করা কবিতা, অমন হালকা, চপল, গভীর, সুদূরস্পর্শী, একাধারে অমন পার্থিব আর স্বর্গীয়, যার অনুরূপ অন্য কোনো লেখার অস্তিত্বের কথা আমি জানি না, যার তুলনায় উইলিয়ম ব্লেকের শৈশব-গীতিকা অনেক বেশি গভীর ও বলীয়ান হ'লেও একটু বিশেষ অর্থে ধর্মীয় ও গম্ভীর— সেখানে স্নেহ, তার বাস্তবের রস ভরপুর বজায় রেখে, হ'য়ে উঠেছে পূজা, আর শিশু, রক্তে-মাংসে প্রামাণ্য থেকেও, হ'য়ে উঠেছে ভগবানের সঙ্গে মানুষের মিলনের উপায়। রবীন্দ্রনাথ, যেমন তিনি গাছের পাতায় সোনার বরন আলোটিতেই চিরপ্রেমের অঙ্গীকার দেখেছিলেন, তেমনি রাঙা হাতে রঙিন খেলনা দিয়ে তবেই বুঝেছিলেন বিশ্বসৃষ্টির আনন্দময় রহস্য।

কিন্তু এই তুলনার এখানেই শেষ। এই সহজাত স্নেহশীলতা, আর জীবনের মধ্যে চিরশিশুর উপলব্ধি— শুধু এই ভাবের দিকটিতেই সাদৃশ্য পাই অবনীন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথে; রূপায়ণের ক্ষেত্রে কিছুই মিল নেই। দু-জনের তফাৎ—মস্ত তফাৎ— এইখানে যে অবনীন্দ্রনাথের বই সর্বজনীন হ'য়েও আলাদা অর্থে ছোটোদেরও উপযোগী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ— পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে— সত্যিকার ছোটোদের বই একখানাও লেখেননি। সেটা সম্ভব ছিলো না তাঁর পক্ষে, তিনি যে বড্ড বেশি বড়ো লেখক। আমি অবশ্য ভুলিনি যে 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ'-এর কোনো-কোনো কবিতা ছোটোদের পক্ষে অফুরন্তভাবে উপভোগ্য, 'মুকুট'-এর

আগে পর্যন্ত, এখানে কিছু অত্যধিক মাত্রাতেই দেখা যায়: 'দিদি', 'খাতা', 'আপদ', 'অতিথি'; 'স্বর্ণমৃগে' বৈদ্যনাথের স্বহস্তে প্রস্তুত খেলার নৌকো, 'রাসমণির ছেলে'তে বাজনকারিণী মহার্ঘ মেম-পুতুলের সুন্দর ঘটনাটি—সমস্ত মিলিয়ে এই গ্রন্থ যেন স্নেহরসে পরিপ্লুত হ'য়ে আছে। আর এই শিশুচিত্রাবলি—শুধু 'গল্পগুচ্ছে' নয়—সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্যেই লক্ষণীয়: 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', শ্রীকান্ত ও দেবদাসের বাল্যপ্রণয়, তারপর 'পথের পাঁচালী'; 'রাণুর প্রথম ভাগ'—চারদিকে তাকিয়ে দেখলে ধরা পড়ে যে বাংলা কথা শিল্পের একটি বড় অংশ শৈশবঘটিত। হয়তো বাঙালির মনে স্বভাবতই বাৎসল্য বেশি; অন্তত কোনো-কোনো লেখক সার্থক হয়েছেন—দ্বন্দ্বজটিল বয়স্ক জীবনের ক্ষেত্রে নয়, শৈশবের সরল পরিবেশেরই মধ্যে।

কথাও মনে আছে আমার—কিন্তু সে-কথা উঠলে সেখানেই বা থামবো কেন আমরা, কেন উল্লেখ করবো না 'ব্যঙ্গকৌতুক', 'হাস্য-কৌতুক', তারপর 'অচলায়তন', 'শারদোৎসব', 'কথা ও কাহিনী', এমনকি 'ডাকঘর', 'লিপিকা' আর শেষ পর্যন্ত 'গল্পগুচ্ছের'ই বা নাম করতে দোষ কী। প্রায় সব বয়সেই পড়া যায় কিন্তু এক-এক বয়সে এক-এক স্তরে পড়া হয়, এমন রচনার অভাব নেই রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু শিশুসাহিত্যের প্রসঙ্গে তাঁকে আনতে হ'লে বেছে নিতে হবে সে-সব বই, যেগুলো ভেবে-চিন্তে পাৎলা ক'রে লেখা, যাতে কৈশোরোচিত চেহারা অন্তত আছে। আর এই ক্ষেত্রেই স্পষ্ট দেখতে পাই যে রবীন্দ্রনাথ, যতই চেপে-চেপে লিখে থাকুন, নিজেকে কথনো ছাড়াতে পারেননি—কোনো মানুষই তা পারে না। 'সে', 'খাপছাড়া', 'গল্পসল্প', এদের আমি রাখবো—শিশুসাহিত্যের বিভাগে নয়, স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীতে, এদের বলবো প্রতিভাবানের খেয়াল, অবসরকালের আত্মবিনোদন, চিরচেনা রবীন্দ্রনাথেরই নতুনতর ভঙ্গি একটি। 'ভূতপত্রী'র সঙ্গে 'সে' আর 'আবোল তাবোল'-এর সঙ্গে 'খাপছাড়া'র তুলনা করলে তৎক্ষণাৎ জাতের তফাৎ ধরা পড়ে; আগের বই দুটির স্বাচ্ছন্দ্য এখানে নেই, এরা বড়ো বেশি সাহিত্যিক, বড়ো বেশি সচেতন—এমনকি আত্মসচেতন; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক মহাকবিটি মাঝে-মাঝেই উঁকি দিয়ে যান, আর তাঁরই হাতের নতুন কৌশল আমরা অভিজ্ঞ পাঠকরা চিনতে পেরে খুশি হই। সুকুমার রায়ের ও অবনীন্দ্রনাথের—'সে'-র মুখের কথা দিয়েই বলছি—'কেরামতিটা কম ব'লেই সুবিধা' ছিলো।

অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিতুলনায় আরো একটু যোগ করবো। রবীন্দ্রনাথের নানা দিকের মধ্যে শুধু একটি ছিলো শৈশব-সাধনা, আর অবনীন্দ্রনাথে এটি প্রায় সর্বস্ব, অন্তত—তাঁর সাহিত্যে—সর্বপ্রধান। তাঁর ভিতরকার বালকটিকে রবীন্দ্রনাথ কখনো ভুললেন না, আর অবনীন্দ্র তাকে হারিয়ে ফেলতে অস্বীকার করলেন। রবীন্দ্রনাথের শিশুকাব্য, হাওয়ার মতো হালকা, তিনি তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন পূর্ণপরিণত জীবনের ওজন; আর অবনীন্দ্রনাথ, শৈশবের পরশমণি ছুঁইয়ে, জীবন নামক ব্যাপারটাকেই নির্ভার ক'রে তুলেছেন। বয়স্ক জীবনের বড়ো-বড়ো অভিজ্ঞতাকে স্থান দিয়েছেন তিনি—ঘৃণা, হিংসা, প্রেম—কিন্তু সেগুলোকে এমন ক'রে বদলে নিয়েছেন, এমন কোমল স্বপ্নের রঙে গালিয়ে নিয়েছেন, যে তাদের আর চেনাই যায় না, অথচ ঠিক চেনাও যায়। 'আলোর ফুলকি'তে কত কথাই বলা আছে! সুরের বিরুদ্ধে

অস্থরের চক্রান্ত, আলোর বিরুদ্ধে পিশাচশক্তির, শিল্পীর নিষ্ঠা, পুরুষের বীর্য, নারীর ছলনা, নারীর ত্যাগ। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের কথা—শুধু 'আলোর ফুলকি'তে নয়—বারে-বারেই দেখা দেয় তাঁর লেখায়, দেখা দেয় অনিবার্য-ভাবেই, সৃষ্টির এই মূলসূত্রটিকে দূরে রাখলে কিছুতেই তাঁর কাজ চলতো না। শিশুসাহিত্যে নিষিদ্ধ এই বিষয়টিকে তিনি 'গৃহীত' ব'লে ধ'রে নিয়ে নিঃশব্দ থাকেননি, কিংবা শুধু ভাবের দিক থেকেই দেখাননি তাকে, রীতিমতো তার ছবিও দিয়েছেন—সে-ছবি যেমন বাস্তব, তেমনি বস্তুভারহীন। মনে করা যাক 'বুড়ো আংলা'র সেই অর্থময় দৃশ্যটি, যেখানে খোঁড়া হাঁসের সঙ্গে সুন্দরী বালিহাঁসটির দেখা হবার পর, ওরা দু-জনে 'জলে গিয়ে সাঁতার আরম্ভ করলে',* আর একলা রিদয় পাড়ে ব'সে বেনার শিষ চিবোতে লাগলো; কিংবা—যেখানে 'কোটি কোটি আগুনের সমান' সূর্যদেবের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হ'তে হ'তে শুধু একটুখানি রাঙা আভা হ'য়ে 'সধবার সিঁদুরের মতো' সুভাগার বিধবা সিঁথি 'আলো ক'রে রইলো'—আর তারপরেই মানবীর কোলে জন্ম নিলো দেবতার সন্তান। এই প্রতীকচিত্র অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছেন—আইন-মাফিক শিশুসাহিত্যের সীমার মধ্যে থাকার জন্য নয়—তাঁর মনের ভাষাই ঐ-রকম ছিলো ব'লে। ও-রকম ক'রেই ভাবতেন তিনি, ও রকম ক'রেই দেখতেন, তাঁর স্বভাবই ছিলো রূপকথা ক'রে সব কথা বলা। যাকে তিনি গল্প শুনিয়েছেন, তিনি নিজেই সেই ছোটো ছেলে, তারই নিদ্রাতুর স্বপ্ন-জড়ানো অথচ স্বচ্ছ চোখ দিয়ে জগৎটাকে দেখেছেন তিনি; তাঁর জগৎটাই শিশুর জগৎ কিংবা শিশুজগৎ—বিরাট বিশ্বকে গুটিয়ে এনে এইটুকু কৌটোর মধ্যে তিনি ধরিয়ে দিয়েছেন। সেখানে সবই খুব ছোটো মাপের, বয়স্ক কিছু নেই, মায়েরা ছোটো মেয়ের মতো, দাড়িওলা রাজপুত রাজারা ঠিক যেন ছোটো ছেলেটি; যেন বিচিত্র মানুষের মধ্য থেকে সামান্য লঘিষ্ঠ সংখ্যাটিকে বের ক'রে নিতে হ'লো, বড়ো এবং বুড়ো লোকেদের মানিয়ে নেবার জন্য। নয়তো, এই একান্ত-রূপে প্রাকৃত জগতে, বয়স্কদের স্থান হ'তো না।

* 'আলোর ফুলকি', 'বুড়ো আংলা', এই দুটি গ্রন্থই বিদেশী গল্পের অবলম্বনে লেখা। মূল গ্রন্থ দুটি আমার পড়া নেই, ঘটনাবিন্যাসে অবনীন্দ্রনাথের নিজের অংশ কতখানি তা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু ঘটনাগুলির ভিতর দিয়ে তাঁর যে-মন প্রকাশ পেয়েছে, এই আলোচনার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ দূর থেকে শিশুকে দেখেছেন, তার সঙ্গে বিচ্ছেদবোধে ব্যথিত হয়েছেন, বার-বার তৃষিত হয়েছেন তাকে ফিরে পাবার জন্য। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথে এই বিচ্ছেদটাই কখনো ঘটেনি। আর তাই, যেহেতু তিনি ছোটো ছেলের সঙ্গে এক হ'য়ে ছিলেন, তাঁর স্নেহের চেয়েও বড়ো হ'য়ে উঠেছে আর-একটি বৃত্তি: একটি আশ্চর্য শ্রদ্ধা, জীবনের প্রতি বিস্ময়ে ভরা শান্ত ধীর গভীর একটি সম্ভ্রম। এই হচ্ছে সেই চোখ, যে-চোখ সত্যিকার শিশুর, রূপকথার শিশু-মানুষের, যে পায়ের তলার পিঁপড়েটিরও কথা শুনতে থেমে দাঁড়ায়, বিশ্বজগৎকে বন্ধু ব'লে ধ'রেই নেয়—ধ'রে নিয়ে ভুল করে না। এ-চোখ দেখতে ভয় পায় না, দেখতে পেয়েও আকুল হয় না, এতে কাছে ডাকা নেই, দূরে রাখাও না—একই সঙ্গে নির্লিপ্ত ও ঘনিষ্ঠ, একে বলতে পারি প্রাণপদার্থের পবিত্রতাবোধ। আকাশের উঁচু পাড় থেকে যে-বাজ অমোঘ হ'য়ে নেমে আসে তাকেও এ নমস্কার জানায়, আবার পায়রার রক্তমাখা ছেঁড়া পালকটিকেও করুণা দিয়ে ধুয়ে দেয়। অবনীন্দ্রনাথের পশুচিত্রণ, তাঁর প্রকৃতির বর্ণনা, সবই এই উৎস থেকেই নিঃসৃত হয়েছে; তাঁর পশুপাখিরা ব্যঙ্গকৌতুক উপদেশের উপায় নয়, তারা আছে ব'লেই মূল্যবান, আর ফুল, পাতা, জল, আকাশ—এরাও শুধু অলংকার নয় তাঁর কাছে, শুধু মানুষের মনের আয়নারও কাজ করে না, এরা নিজেরাই প্রাণবস্তু, ব্যক্ত, ব্যক্তিত্বধারী; তাঁর লেখায় 'বীর বাতাস' ব'য়ে যায়, আলো কথা 'বলেন',* 'বৃক্ষটি ভঙ্গি ধ'রে দাঁড়ান', আর কুঁকড়ো হ'য়ে ওঠে—হ'য়ে ওঠেন—শুধু কি কুক্কুটকুলচূড়ামণি, শুধু কি একজন মহাশয় ব্যক্তি? শিল্পী, প্রেমিক, বীর,—এত বড়ো চরিত্ররূপ যে তুচ্ছ একটা মোরগের মধ্যে ফুটে উঠতে পারলো, এতে মূল লেখকের যতটা অংশই থাক না, অবনীন্দ্রনাথের হৃদয়ের দানও দীপ্ত হ'য়ে আছে। সে-দান আর-কিছু নয়, এই শ্রদ্ধা, যাতে নিখিলজীবন একসূত্রে বাঁধা পড়ে। অবনীন্দ্রনাথের নির্যাস এটি, তাঁর সমস্ত লেখার মজ্জাস্বরূপ; এরই জন্য—হান্স আণ্ডেরসেনের মতোই—তিনি শিশু-

*এই 'তিনি'র আশ্চর্য ব্যবহার অবনীন্দ্রনাথে সর্বত্র পাওয়া যায়, 'নালক'-এর একটি অংশ উল্লেখ করি। 'রাত ভোর হ'য়ে এসেছে, শিশিরে নুয়ে পদ্ম বলছে—নমো. চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন—নমো, সমস্ত সকালের আলো পৃথিবীর মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে বলছেন— নমো—' এখানে এই 'বলছেন'টা হঠাৎ যেন পুজোর ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে চ'লে যায়।

পশুর গল্পের মধ্য দিয়ে শোনাতে পেরেছেন অমৃতবাণী ; সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে প্রেম, বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধ।*

৬

এমন মত পোষণ করা সম্ভব যে শিশুসাহিত্য স্বতন্ত্র কোনো পদার্থ নয়, কেননা তা সত্যিকার সাহিত্য হ'লে বড়োরাও তাতে আনন্দ পান, আর সাবালক—এমনকি আবহমান সাহিত্যের একটি অনতিক্ষুদ্র বিচিত্র অংশের ছোটোরাও উত্তরাধিকারী। যে-সব গ্রন্থ চিরকালের আনন্দভাণ্ডার, ছোটোদের প্রথম দাবি সেখানেই—সেই মহাভারত, রামায়ণ, বাইবেল, আরব্যোপন্যাস, বিশ্বের পুরাণ, বিশ্বের রূপকথা, আর সেই সঙ্গে আধুনিক কালের ভাস্বর চিত্রাবলি—ডন কিহোটে, রবিনসন ক্রুসো, গালিভার। শিশুসাহিত্যের বড়ো একটি অংশ জুড়ে এরাই আছে ; এই অমর সাহিত্যের প্রবেশিকাপাঠ শিশুদের আশুকৃত্য। পক্ষান্তরে, মৌলিক শিশুগ্রন্থ তখনই উৎকৃষ্ট হয়, যখন তাতে সর্বজনীনতার স্বাদ থাকে। অতএব, অন্তত তর্কস্থলে, সাহিত্যে এই 'ছোটো-বড়ো' ভেদজ্ঞানকে অস্বীকার করা সম্ভব।

কিন্তু এই মত একটা জায়গায় টেকে না। যারা আক্ষরিক অর্থে শিশু, নেহাৎ বাচ্চা, এইমাত্র পড়তে শিখলো কিংবা এবারে পড়তে শিখবে, তাদের জন্যও বই চাই ; আর সে-সব বইয়ে সাহিত্যকলার সাধারণ লক্ষণ আমরা খুঁজবো না, আলাদা ক'রেই তাদের দেখতে হবে। কত ভালো ক'রে কাজ চলবে, কত সহজে ক-খ শিখবে ছেলেরা, তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাস্য শুধু এইটুকু ; তার বেশি চাহিদাই নেই। কিন্তু এখানেও, আশ্চর্যের বিষয়, বাঙালির মন সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছে ; বাংলার মাটিতে এমন মানুষ একজন অন্তত জন্মেছেন, যিনি একান্তভাবে ছোটোদেরই লেখক—সেই সব ছোটোদের, যারা কেঁদে-কেঁদে পড়তে শিখে পরে হেসে-হেসে বই পড়ে। অবশ্য অশ্রুহীন বর্ণপরিচয় সম্ভব নয় ;

* আণ্ডেরসেনের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের তুলনা বার-বার এসে পড়ছে। কিন্তু একটি পার্থক্য উল্লেখ করবো। খৃষ্টান ঐতিহ্যে পাপবোধ প্রবল ; যে-মেয়ে ঘাঘরা বাঁচাতে রুটি মাড়িয়েছিলো, আর লাল জুতো প'রে দেমাক হয়েছিলো যার, তাদের অতি কঠিন শাস্তি দিয়ে তবে আণ্ডেরসেন পুণ্যলোকে পৌঁছিয়ে দিলেন। আর হৃদয়হীন নির্দয় ছেলেটার উপর গণেশের শাপ লাগলো বটে, কিন্তু যে উপায়ে তার ত্রাণ হ'লো সেটা বিপদসংকুল হ'লেও মনোরম। হিন্দুর মনে নরকের ধারণা স্পষ্ট নয় ; সেটা তার শক্তির কারণ, দুর্বলতারও।

ঠিক অক্ষর চিনতে হ'লে—আজ পর্যন্ত—বিদ্যাসাগরই আমাদের অবলম্বন; কিন্তু তার পরে—এবং তার আগেও—মাতৃভাষার আনন্দরূপের পরিচয় নিয়ে প্রস্তুত আছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। মুখে বোল ফোটার সঙ্গে-সঙ্গে বাঙালি ছেলে তাঁরই ছড়া আওড়ায়—সেই ধাবমান অজগর আর লোভনীয় আম্রফলের চিরন্তন নান্দীপাঠ—মায়ের পরেই তাঁর মুখে-মুখে কথা শেখে শিশুরা। যোগীন্দ্রনাথ, তাঁর হাসিখুশির দানসত্র নিয়ে, তাঁর উৎসর্গিত শুভ্র জীবনের রাশি-রাশি উপচার নিয়ে, আজকের দিনে একজন লেখকমাত্র নেই আর, হ'য়ে উঠেছেন বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান, শিশুদের বিদ্যালয়। ঠিক তাঁর পাশে নাম করতে পারি এমন কোনো বিদেশী লেখকের সন্ধান আমি আজও পাইনি; 'হাসিখুশি'র সঙ্গে তুলনীয় কোনো ইংরেজি পুস্তক এখনো আমাকে আবিষ্কার করতে হবে। অনুরূপ গ্রন্থে ইংরেজি ভাষা কত সমৃদ্ধ সে-কথা আমি ভুলে যাচ্ছি না; সেই সাহিত্যের বৈচিত্র্য, উদ্ভাবনকৌশল আর দক্ষতাকে শ্রদ্ধাও করি;—কিন্তু শেষ পর্যন্ত দক্ষতাটাই অত্যধিক ব'লে মনে হয়, মনে হয় সে-সব বই মাপজোক নিয়ে নিখুঁতভাবে কলে-তৈরি জিনিশ, কিংবা লেখক-চিত্রক-মুদ্রকের সমবায়শ্রমের যোগফল। এইখানে যোগীন্দ্রনাথের জিৎ। তিনি প্ল্যান ক'রে বই লেখেননি, প্রাণ থেকে লিখেছেন; তাঁর লেখা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁরই, তাঁর হৃদয়ের স্পন্দনটি সেখানে শুনতে পাই—শিশুর জন্য অনবরত খিল খুলে-রাখা দরাজ তাঁর হৃদয়। পুস্তক প'ড়ে শিশু-মনস্তত্ত্ব জানতে হয়নি তাঁকে, শিক্ষাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হ'তে হয়নি; বিভিন্ন বয়সের শিশুর মনের তারতম্য ঠিক কতটা, কিংবা সে-মনের উপর কোন বর্ণের কত মাত্রায় প্রভাব কী-রকম, এ-সব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যে কিছুই তাঁর প্রয়োজন ছিলো না। শিশুর মন সহজেই তিনি বুঝেছেন—তাঁর নাড়ির টান ছিলো ওদিকে, আর সেই সঙ্গে রুচি ছিলো নির্ভুল, রচনাশক্তি যথাযথ—যেটুকু হ'লে সংগত হয় সেইটুকুই, তার কমও না, বেশিও নয়। তাই তাঁর প্রতিটি বই ঠিক তা-ই, অতিতরুণ পাঠমালার যা হওয়া উচিত—আগাগোড়া শৈশবের রসে সবুজ, একেবারে কিশলয়ের মতো কাঁচা—লেখায় যেটুকু কাঁচা ভাব আছে, অপটুতাও আছে, তাও তার স্বাদের একটি উপকরণ, ওর চেয়ে 'পাকা হাত' হ'লে সে-হাতে অমন তার উঠতো না। অপটুতা মানে অক্ষমতা নয়—এমন নয় যে কিছু-একটা ইচ্ছে ক'রে তিনি পেরে ওঠেননি—তাকে বলতে পারি ঘরোয়া ভাব, সভাযোগ্য সৌষ্ঠবের বদলে গৃহকোণের অন্তরঙ্গতা যেন, আটপৌরে হবার সুখ, দুপুরবেলা মাদুর পেতে শুয়ে

মা যখন ছেলেকে ডাকেন, সেই অবসরের সতর্কতাহীন আরাম। যোগীন্দ্রনাথের রচনা একান্তভাবে অন্তঃপুরের ;— স্কুলের নয়, পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মতোও না, যেন মা-ছেলের বিশ্রম্ভালাপের ভাষা— ঠিক তেমনি স্নিগ্ধকোমল সহাস্য তাঁর গলার আওয়াজ। ঐ আওয়াজটিকে ফরমাশ দিয়ে পাওয়া যায় না ব'লেই যোগীন্দ্রনাথের জুড়ি হ'লো না ; তাই এই বিভাগে, পথিকৃৎ হ'য়েও এখনো তিনি সর্বোত্তম। 'হাসিখুশি'র প্রতিদ্বন্দ্বিতার উচ্চাশা নিয়ে অনেক বই উঠলো পড়লো ; তার সর্বাধুনিক প্রকরণটি বর্ণবিলাসে জাজ্বল্যমান। এই নব্য প্রকরণটি বিলেতি কিংবা মার্কিনি ; প্রসাধনসিদ্ধ, নয়নরঞ্জন, কিন্তু এ-সব বই ছবিরই বই, অন্তত ছবিটাই এখানে মুখ্য, আর লেখা নামক গৌণ অংশটি নির্দোষ হ'লেও, দক্ষ হ'লেও, তাতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না, লেখকের সঙ্গে শিশুর মনের অব্যবহিত সম্বন্ধটি নেই তাতে। আর বইয়ের পাতায় ইন্দ্রধনুকে উজাড় ক'রে দিলেও এই অভাবের পূরণ হয় না।

অন্য দিক থেকেও তফাৎ আছে। পড়া-শেখা পুঁথির সবচেয়ে জরুরি গুণ এই যে তা বস্তু-ঘেঁষা হবে, যাকে বলে কংক্রীট। এইটেই সব বইয়ে পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে ছবিটা শুধু ছবিতেই থাকে, আর সেইজন্য পাঠযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হয়। যেটা পাঠ্য বই, তাতে ছবিটা থাকা চাই লেখাতেই, রংটা লাগানো চাই ক্ষুদ্র এবং খুব সম্ভব অনিচ্ছুক পাঠকের মনটিতেই। সেই সঙ্গে দ্রষ্টব্য ছবি—থাকা ভালো নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা অতিরঞ্জিত হ'লে তাতে উদ্দেশ্যের পরাভব ঘটে। যদি বলি 'লাল ফুল, কালো মেঘ', সেটা তো নিজেই একটা ছবি হ'লো, মেঘলা দিনে মাঠের মধ্যে কোথাও একটি লাল ফুল ফুটে আছে এ-রকম একটা দৃশ্যেরও তাতে আভাস থাকে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে টকটকে লাল হুবহু একটি গোলাপফুল বসিয়ে দিলে তাতে চোখের সুখ কল্পনাকে বাধা দেয়। এখানে উদ্দেশ্য হ'লো—চোখ ভোলানো নয়, চোখ ফোটানো, আর দেহের চোখ অত্যধিক আদর পেলে মনের চোখ কুঁড়ে হ'য়ে পড়ে, কল্পনা সবল হ'তে পারে না। মনে ক'রা যাক 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'—রবীন্দ্রনাথের সেই আদিশ্লোক, তাঁর জীবনের কবিতা পড়ার প্রথম রোমাঞ্চ যাতে পেয়েছিলেন তিনি—সেটি বটতলার ছাপাতে ছিলো ব'লে আনন্দে কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি, বরং সেইজন্যই নিবিড় হয়েছে, অন্য কোনো উপকরণ ছিলো না ব'লেই বাণীচিত্র মূল্য পেয়েছে পুরোমাত্রায়। আমি অবশ্য নিশ্ছবিতার অনুমোদন করছি না ; আমার বক্তব্য শুধু এই যে লেখার মধ্যেই ছবির যেন ইঙ্গিত থাকে, আর আঁকা ছবি সেই

ইঙ্গিতকে ছাপিয়ে উঠে নষ্ট ক'রে যেন না দেয়, কল্পনাকে উশকে দিয়েই থেমে থাকে।* এখন যোগীন্দ্রনাথের লক্ষণ এই যে তাঁর লেখার মধ্যেই দৃশ্যতাগুণ ছড়িয়ে আছে : তাঁর বর্ণমালার উদাহরণে বিশেষ্য ছাড়া কিছু নেই, আর সেই বস্তুগুলিও অধিকাংশই সজীব, যথাসম্ভব পশুশালা থেকে গৃহীত—যেখানে শিশুর মন তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয়—আর নয়তো শিশুজীবনের অন্তরঙ্গ পরিবেশ থেকে বাছাই-করা।

কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি,
খেঁকশিয়ালি পালায় ছুটি।
গরু-বাছুর দাঁড়িয়ে আছে,
ঘুঘুপাখি ডাকছে গাছে।

জীবজন্তুর মেলা ব'সে গেছে একেবারে, আবার মাঝে-মাঝে সুন্দর এক-একটি পারম্পর্য ধরা পড়ছে, যেমন ধোপার পরেই নাপিত, কণ্ঠকণ্ডুয়নী গুলের পরই ঔষধ, বা টিয়াপাখির লাল ঠোঁটের সঙ্গে ঠাকুরদাদার শীর্ণ গণ্ডের প্রতিতুলনা। বস্তুত, বর্ণমালার উদাহরণ-সংগ্রহে 'হাসিখুশি' এমনই অব্যর্থ যে ঐ একটি বিষয়ে বাংলা ভাষার উপাদান সেখানে নিঃশেষিত ব'লে মনে হয়; পরবর্তীরা—আজকের দিন পর্যন্ত—লিখেছেন ওরই ছাঁচে, নতুনত্ব যা-কিছু শুধু চেহারায়। কিন্তু ঐ ছাঁচটা এমন যে ওর মধ্যে একাধিকের সম্ভাবনা নেই—নেই ব'লেই প্রমাণ হয়েছে; যোগীন্দ্রনাথের একটি লাইনও 'আরো ভালো' করা যায় না;

* বর্ণপরিচয় পুস্তকে ছবির স্থান কোথায় এবং কতটুকু, তার আদর্শ আছে রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠে'। যোগীন্দ্রনাথের বইগুলিও—লক্ষ করতে হবে—রঙিন কালিতে হ'লেও এক রঙে ছাপা; নানা রঙের সমাবেশে চিত্তবিক্ষেপ ঘটে, পাঠক্রিয়া ক্ষুণ্ণ হয়। লেখার সঙ্গে ছবির সৌষম্যসাধনের আর-একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'আবোল তাবোল'-এর আদি সংস্করণ।

এই প্রবন্ধ লেখা হবার পর আমি মর্মঘাতীরূপে আবিষ্কার করলাম যে 'হাসিখুশি'র নতুনতম সংস্করণে এই তিন পুরুষের চেনা, প্রিয়, পুরোনো, অম্লান, অন্নের ছবিগুলির বদলে 'আধুনিক' ধরনের পটুত্ব-অভিমানী অপটু চিত্রাবলি আমদানি করা হয়েছে। আমি নিশ্চয়ই বলবো যে এটা পাপাচরণের পর্যায়ভুক্ত, পুরোনো পাথরের মন্দির ভেঙে নব্য ফ্যাশনের বিদেশী মার্বেলের তথাকথিত মন্দির-রচনার তুল্য। জানি না কোন দুর্বুদ্ধির প্ররোচনায় যোগীন্দ্রনাথের প্রকাশক এবং উত্তরাধিকারী এই কর্মটি করেছেন, কিন্তু সমস্ত সাহিত্যজগতের দোহাই দিয়ে তাঁদের কাছে আমার নিবেদন এই যে তাঁরা যেন পরবর্তী সংস্করণে পুরোনো ছবির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ক'রে বাংলা সংস্কৃতির মুখরক্ষা করেন।

শুনেছি, পরবর্তী এবং অধুনা-প্রচলিত সংস্করণে তা-ই করা হয়েছে।—দ্বিতীয় সংস্করণের পাদটীকা

আর দীর্ঘ ঈ-তে ঈগলের বদলে ঈশান, বা ঋ-তে ঋষির বদলে ঋষভ লিখলে রকমারি হয় বটে, কিন্তু ব্যঞ্জনা হয় না, ছবিটা মারা যায়। তাই পরবর্তী কারো লেখাতেই স্বাদ পাওয়া গেলো না; 'হাসিখুশি' তার প্রসাদগুণে, প্রত্যক্ষতার গুণে, এমন জরাহীন জীবন্ত হ'য়ে থাকলো যে তার পরে অন্য ছাঁচের দ্বিতীয় একটি মৌলিক গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজন হ'লো আস্ত একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা।

শুভক্ষণে 'সহজ পাঠ' লেখায় হাত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রচনাকালের দিক থেকে এটি 'সে', 'খাপছাড়া'রই সমসাময়িক, কিন্তু ও-দুটি গ্রন্থের আত্মসচেতন বৈদগ্ধ্যের কোনো চিহ্ন নেই এখানে; পাঠ্যপুস্তক ব'লে এখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভাকে সীমার মধ্যে রেখেছিলেন, অথচ তার প্রয়োগে কোনো কার্পণ্য করেননি। এর ফলে সর্বাঙ্গে সার্থক হয়েছে 'সহজ পাঠ'—বাংলা ভাষার রত্নস্বরূপ এই গ্রন্থ, যেন প্রতিভার বেলাভূমিতে উৎক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র নিটোল স্বচ্ছ একটি মুক্তো। এর ছত্রে-ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে চারিত্র, আর সেই সঙ্গে ব্যবহারযোগ্যতা, পরিশীলিত বিরল হাওয়ার মধ্যে নিকটতম তথ্যচেতনা, মহত্তম বাণীসিদ্ধির সরলতম উচ্চারণ। কী ছন্দোবদ্ধ ভাষা, কী কান্তি তার, কী-রকম চিত্ররূপের মালা গেঁথে-গেঁথে চলেছে, অথচ কঠিনভাবে প্রয়োজনের মধ্যে আবদ্ধ থেকে, শিশু-মনের গণ্ডি কখনো না-ভুলে, বর্ণশিক্ষার উদ্দেশ্যটিকে অক্ষরে-অক্ষরে মিটিয়ে দিয়ে। পদ্যছন্দের বৈচিত্র্য, মিলের অপূর্বতা, অনুপ্রাসের অনুরণন*—সমস্তই এখানে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু সমস্তই আঁটো মাপের শাসনের মধ্যে রেখেছেন, কোনোখানেই পাত্র ছাপিয়ে উপচে পড়েনি। ভেবে দেখা যাক একেবারে প্রথম শ্লোকটি—

ছোটো খোকা বলে অ আ,
শেখে নি সে কথা কওয়া॥

কেমন সহজ অথচ অবাক-করা মিল, আর এ-রকম শুধু একটিই নয়, এর পরেই মনে পড়ে 'শাল মুড়ি দিয়ে হ ক্ষ / কোণে ব'সে কাশে থক্ খ', আর—

* বর্ণপরিচয় পুস্তকে অনুপ্রাস-প্রয়োগ অপরিহার্য, তার প্রকটতাও এড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু 'সহজ পাঠে' অনুপ্রাস অনেকটা বিনীত হ'য়ে আছে, যেন অলক্ষ্যে কাজ ক'রে যাচ্ছে, কোথাও কোথাও স্বর-ব্যঞ্জনের নমুনাগুলি, নিজেরা অনেকটা অগোচরে থেকে, দিয়ে যায় সাহিত্যেরই স্বাদ, ছন্দেরই আনন্দ।

সবচেয়ে আশ্চর্য—সেই নরম, অনতিস্ফুট 'ঘন মেঘ ডাকে ঋ / দিন বড়ো বিশ্রী—' এই যেটা এখন মনে হয় 'ঋ'র সঙ্গে অনিবার্য এবং একমাত্র মিল,' তার প্রতীক্ষায় কত কাল কাটাতে হ'লো বাংলা ভাষাকে। পদ্য ব্যবহারেও কারিগরি কিছু কম নেই—কোনো-কোনটি 'ছন্দ' বইয়ে নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত হ'তে পারতো—'আলো হয়, গেল ভয়'-এর ত্বরান্বিত বেগ 'কাল ছিল ডাল খালি'র দু-রকমের দোলা, 'আমাদের ছোটো নদী'তে দীর্ঘায়িত 'বৈশাখ' শব্দটির সুখস্পর্শ,

> 'গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন
> দু-মুঠো অন্ন তারে দুই বেলা দেন।'

এই মাত্রিক পয়ারে পিংপং বলের মতো লাফিয়ে-ওঠা এক-একটি যুক্তবর্ণ। অথচ এর কিছুই অত্যন্ত বেশি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি, সমস্তটাই মূল উদ্দেশ্যের অধীন হ'য়ে আছে, নম্র হ'য়ে শিশুশিক্ষার কর্তব্যটুকু সম্পন্ন ক'রে যাচ্ছে। এই সমন্বয়গুণ—এটি আরো বেশি বিস্ময় জাগায় গদ্যের অংশে—বিস্ময়ের চমক সেখানে নেই ব'লে, আপাতদৃষ্টিতে কারিগরিটা সেখানে অদৃশ্য ব'লে। কিছু নয়, ছোটো-ছোটো কয়েকটি কথা পাশাপাশি বসানো, পদ্যের ঢেউ নেই, একেবারে সমতল—হঠাৎ দেখলে মনে হ'তে পারে 'যে-কেউ' লিখতে পারতো, কিন্তু মনঃসংযোগ করা মাত্র ধারণা বদলে যায়। 'বনে থাকে বাঘ। গাছে থাকে পাখি। জলে থাকে মাছ। ডালে থাকে ফল।' আর তারপরে মাত্রা-বদলে-যাওয়া 'বাঘ আছে আম-বনে। গায়ে চাকা-চাকা দাগ। পাখি বনে গান গায়। মাছ জলে খেলা করে।'—এই গদ্য লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছরের অভ্যস্ত হাতেরই প্রয়োজন ছিলো; এর আগে 'লিপিকা' যিনি লিখেছেন, এবং এর পরে 'পুনশ্চ' যিনি লিখবেন, তাঁরই হাত থেকে বেরোতে পারে—'রাম বনে ফুল পাড়ে। গায়ে তার লাল শাল। হাতে তার সাজি। জবা ফুল তোলে। বেল ফুল তোলে। বেল ফুল সাদা। জবা ফুল লাল।' শুধু ছাপার অক্ষরে চোখ বুলিয়ে আশ মেটে না এখানে; এ-লেখা থেমে-থেমে, মনে-মনে পড়তে হয়, বলতে হয় গুনগুন ক'রে, এর সুন্দর সুনিয়ন্ত্রিত ছন্দটিকে মনের মধ্যে মুদ্রিত ক'রে নিতে হয়। আর এই ছন্দের ভিতরেই ছবির পর ছবি বেরিয়ে আসছে; বাঘ, মাছ, পাখি, ফুলের বাগানে লাল শালের উজ্জ্বলতা, জবার পাশে বেলফুল। যে-বয়সে ক-খ চিনলেই যথেষ্ট সেই বয়সেই সাহিত্যরসে দীক্ষা দেয় 'সহজ পাঠ';

এই একটি বইয়ের জন্য বাঙালি শিশুর ভাগ্যকে জগতের ঈর্ষাযোগ্য ব'লে মনে করি।

ছোটোরা কী চায়, কী পড়তে ভালোবাসে, আজ বাংলাদেশে তার সংখ্যাগণনা যদি করা হয়, তাহ'লে বিচিত্র রকমের ফল পাওয়া সম্ভব। হয়তো তাদের মোহন-তালিকা সীমিত হ'য়ে আছে ডট-ড্যাশ-বিস্ময়চিহ্ন-বহুল দুই অর্থে বীভৎস হত্যাকাহিনীতে; কিংবা, দৈনিক পত্রের শিশু-বিভাগ এবং সাধারণভাবে শিশু-পত্রিকার সাক্ষ্য থেকে, হয়তো প্রমাণ হবে যে ছোটোরা বেজায় কাজের লোক হ'য়ে উঠেছে আজকাল, বড্ড হিশেবি, নেহাৎই শুধু গল্প-কবিতা প'ড়ে ঠ'কে যাবার পাত্রটি আর নেই; 'দেশের উন্নতি', 'সমাজ-সংস্কার', এই রকম সব গুরুতর বিষয়ে ইস্কুলমাস্টারি এখন চায় তারা, আর সেই ভাতের বদলে পাথর-কুচি গলাধঃকরণ করার জন্য তার সঙ্গে চায় মাছি-আটকানো চিটগুড়ের মতো বিশুদ্ধ ন্যাকামির পলেস্তারা। কিন্তু এ-রকম দুর্লক্ষণ—শুধু তো শিশুসাহিত্যে বা সাহিত্যে নয়—দেশের মধ্যে চারদিকেই উগ্র হ'য়ে উঠেছে: কী সংগীতে, কী সিনেমায়, কী-বা দোল-দুর্গোৎসবে অথবা পঁচিশে বৈশাখের পুতুল-পুজোয়, রুচিহীনতার বিষব্রণ আজ সর্বত্রই প্রকট। এই দৃশ্যে ভাবুক ব্যক্তির মন খারাপ হ'তে পারে, উদ্বেগের কারণ নেই তাও নয়; পাছে, এই গণস্ফীতির কৃষ্ণপক্ষে, মন্দই প্রবল হ'য়ে উঠে ভালোকে ডুবিয়ে দেয়, এই আশঙ্কায় বিশ্বের সুধীচিত্ত আজ দোদুল্যমান। তবে আশার কথা এই যে সাহিত্য-ব্যাপারে সংখ্যা-গণনায় ঠিক ছবিটা পাওয়া যায় না; কেননা, ঐকাহিকের আবেদন যেমন বিপুল, তেমনি মানুষের মনে অমৃতের তৃষ্ণাও দুর্বার, আর সেই তৃষ্ণার তৃপ্তি হ'য়ে, প্রতিভূ হ'য়ে, যুগে-যুগে শিল্পীরা আসেন জীবনধর্মেরই আপন নিয়মে, তার প্রেরণা কোনোকালেই রুদ্ধ হয় না। বিশেষত, বাংলা শিশুসাহিত্যের কৃতিত্ব এমন অসামান্য যে তার সাম্প্রতিক বিকৃতি সে-তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। এমনও বলা যায় যে আমাদের সমগ্র সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ অংশই শিশুসাহিত্য; অন্তত পক্ষে এটুকু সত্য যে ছোটোদের ছোটো খিদের মাপে বাংলা ভাষায় সুপথ্য যত জমেছে, সে-তুলনায় সুপরিণত সবল মনের ভারি খোরাক এখনো তেমন জোটেনি। এর কারণ—কেউ হয়তো বাঁকা ঠোঁটে বলবেন—আমাদের জাতিগত ছেলেমানুষি এখনো ঘোচেনি; কিন্তু আমি বলবো এই শৈশবসিদ্ধি

শান্তশীল গৃহস্থ বাঙালির চিত্তবৃত্তিরই অন্যতম প্রকাশ। বাংলা শিশুসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে সারা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনো-কোনো বুদ্ধি, মহত্তম কোনো-কোনো মন : যার আদি পুরুষ বিদ্যাসাগর, যাকে রবীন্দ্রনাথ নানা স্থলে স্পর্শ ক'রে গেছেন, যাতে আছেন অবনীন্দ্রনাথের মতো হৃদয়বান ও সুকুমার রায়ের মতো গুণী পুরুষ, তার দুটো-একটা রোগলক্ষণে ভীত হবার কারণ দেখি না, কেননা তার আপন ঐতিহ্যেই আরোগ্যশক্তি সঞ্চিত আছে।

'সাহিত্যচর্চা' (ঈষৎ পরিমার্জিত)

সংস্কৃত কবিতা ও আধুনিক যুগ

সংস্কৃত কবিতার সঙ্গে আজকের দিনে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে। সেই বিচ্ছেদ দুস্তর না হোক, সুস্পষ্ট। আর তার কারণ শুধু এই নয় যে সংস্কৃত ব্যাকরণের চর্চা আমরা করি না। চর্চা করি না—এ-কথা সত্য কিনা তাও সন্দেহ করা যেতে পারে। ইংরেজ আমলে সংস্কৃত শিক্ষার মর্যাদাহ্রাস, আধুনিক যন্ত্রযুগে সংস্কৃত বিদ্যার আর্থিক মূল্যের অবনতি, কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিক জীবনে সংস্কৃতের ক্ষীয়মাণ প্রয়োজন—এই সব নৈরাশ্যকর তথ্য সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত ভাষার চর্চা ক'রে থাকেন; যাঁরা নামত এবং প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিত, তাঁদের সংখ্যাও খুব কম নয়। এমন নয় যে দেশসুদ্ধ সবাই সংস্কৃত ভুলে গেছে, স্কুলে-কলেজে তা পড়ানো হয় না, কিংবা আধুনিক বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের কোনো যোগ নেই। বরং, আধুনিক বাংলা ভাষায় দেশজ শব্দের বদলে তৎসম ও তদ্ভবের প্রচার বেড়েছে (তথাকথিত বীরবলী ভাষাও এর ব্যতিক্রম নয়), এবং রবীন্দ্রনাথ, যিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁর বিরাট মূলধনের বড়ো একটি অংশের নামও সংস্কৃত। অথচ, যাঁরা রবীন্দ্রনাথ পড়েন, তাঁদের মধ্যে হাজারে একজনও কোনো সংস্কৃত কাব্যের পাতা ওল্টান কিনা সন্দেহ। যে-সব শিক্ষাপ্রাপ্ত বা শিক্ষালাভেচ্ছু বাঙালি 'হ্যামলেট' প'ড়ে থাকেন, বা গ্যেটের 'ফাউস্ট', বা—এমনকি—'ঈডিপস রেক্স' অথবা 'ইনফার্নো', তাঁদের মধ্যে ক-জন আছেন যাঁদের 'মেঘদূত' বা 'শকুন্তলা' পড়ার কৌতূহল জাগে, কিংবা যাঁরা ভাবেন যে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে কিছু পরিচয় না-থাকলে তাঁদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'লো না? মানতেই হয়, তাঁদের সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর।

এই অবস্থার জন্য আমাদের অত্যধিক পশ্চিমপ্রীতিকে দোষ দেয়া সহজ, কিন্তু পশ্চিমের প্রতি এই আসক্তি কেন ঘটলো তাও ভেবে দেখা দরকার। আমি এ-উত্তর দেবো না যে সৃষ্টিশীল জীবিত ভাষায় রচিত পশ্চিমী সাহিত্যের আকর্ষণ এত প্রবল যে তার প্রতিযোগে সংস্কৃত দাঁড়াতে পারে না। পশ্চিমের আকর্ষণ নিশ্চয়ই দুর্বার, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে আমাদের যা পাবার আছে তাও মূল্যবান, এবং অন্য কোথাও তা পাওয়া যাবে না। এ-কথা পৃথিবী ভ'রেই সত্য, কিন্তু বিশেষভাবে প্রযোজ্য ভারতীয়ের পক্ষে; যিনি কোনো ভারতীয় ভাষা বা সাহিত্যের চর্চা করেন তাঁর পক্ষে সংস্কৃতের অভাবের কোনো

ক্ষতিপূরণ নেই। এই কথাটা তর্কস্থলে মেনে নেবার তেমন বাধা হয় না, কিন্তু কাজে খাটাতে গেলেই বিপদ বাধে। আসল কথা, আমরা সংস্কৃতের সম্মুখীন হ'লেই ঈষৎ অস্বস্তি বোধ করি. তার সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহ জেগে উঠলেও উপযোগী খাদ্য পাই না ;—যা পাই, তা শুধু তথ্য (তাও তর্কমুখর), নয়তো উচ্ছ্বাস, নয়তো হিন্দু-নামাঙ্কিত এক তুষারীভূত মনোভাব, যা কালের গতিকে অস্বীকার ক'রে নিজের মর্যাদায় স্থবির হ'য়ে আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের, সাহিত্য হিশেবে, চর্চার পথ তৈরি হয়নি ; চলতে গেলেই হুঁচট খেতে হয় ইতিহাসে, ঘুরতে হয় দর্শনের গোলকধাঁধায়, নয়তো ব্যাকরণের গর্তে প'ড়ে হাঁপাতে হয়। আসল কথা, আমাদের সমকালীন জীবনধারার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের কোনো সত্যিকার সম্বন্ধ এখনো স্থাপিত হয়নি।

প্রাচীন ভারত এবং প্রাচীন গ্রীস ও রোম একই জগতের অন্তর্ভূত ছিলো, কিন্তু য়োরোপ ও ভারতের মানস-বাণিজ্যে সারা মধ্যযুগ ভ'রে যে-অবরোধ বিস্তার লাভ করে, তার অবসান ঘটলো বলতে গেলে মাত্র সেদিন, যখন বের্নিয়ে উপনিষদ্-সমূহের একটি ফার্শি অনুবাদ য়োরোপে নিয়ে যান। অনুবাদটির সম্পাদনা করেছিলেন শাজাহান-পুত্র দারা শুকো ; তা থেকে দ্যু পের্ঁ নামক আর-একজন ফরাশি লাটিন, গ্রীক আর ফার্শি মেশানো এক অদ্ভুত ভাষায় যে-অনুবাদ রচনা করেন, তারই সাহায্যে আধুনিক য়োরোপ প্রথম ভারতীয় চিত্তের সংস্পর্শ পায়। দ্যু পের্ঁর অনুবাদের তারিখ ১৮০১ ; শোপেনহাওয়ার এই পুঁথি প'ড়েই বলেছিলেন যে উপনিষদ্ তাঁর 'জীবনব্যাপী সান্ত্বনা এবং মৃত্যুকালীন শান্তি।' কিন্তু তৎকালীন পাশ্চাত্ত্য সমাজে সংশয় জেগেছিলো, সংস্কৃত নামে কোনো ভাষা সত্যি আছে কিনা, না কি সেটা ব্রাহ্মণদের জালিয়াতি। ক্রমশ যখন প্রমাণ হ'লো যে সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব আছে, এবং সে-ভাষায় একটি বিরাট সাহিত্যও বিদ্যমান, তখন সারা য়োরোপে—জর্মানি, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, ইটালিতে—দেখা দিতে লাগলেন প্রাচীতত্ত্বজ্ঞের দল, বহু পুস্তক প্রণীত হ'লো, বহু সংস্কৃত পুঁথি ছাপা হ'লো, এবং আমরা, য়োরোপের হাত থেকে, আমাদেরই সংস্কৃত বিদ্যা ফিরে পেলাম।

অর্থাৎ, আধুনিক ভারতের সংস্কৃত চর্চা একটি বিলেত-ফেরৎ সামগ্রী। ভারতের তুলো বা পাট নিয়ে গিয়ে শ্বেতাঙ্গরা যেমন বস্তুটিকে বিবিধ প্রস্তুত পণ্যের আকার ভারতের হাটেই প্রচার করেছে, তেমনি তাদের বুদ্ধির প্রক্রিয়ায় সংস্কৃত বিদ্যাও রূপান্তরিত হ'লো নানা রকম ব্যবহারযোগ্য বিজ্ঞানে। সংস্কৃত

ভাষার আবিষ্কারের ফলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিস্থাপন করলেন পশ্চিমী পণ্ডিতেরা; 'আর্য' বা 'ইন্দো-য়োরোপীয়' বংশাবলির সন্ধান পেয়ে ইতিহাসের মূল ধারণা বদলে দিলেন; প্রত্নতত্ত্বের নতুন দ্বার খুলে গেলো, এবং ধর্মতত্ত্বে গবেষণার ক্ষেত্র তিব্বত, বর্মা, মহাচীন অতিক্রম ক'রে জাপানের দিগন্তসীমায় প্রসারিত হ'লো। এই আকারেই য়োরোপের হাতে সংস্কৃত বিদ্যা ফিরে পেয়েছি আমরা— ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্বের আকারে; এবং নিজেরা যেটুকু কাজ করতে সচেষ্ট হয়েছি তাও এই সব ক্ষেত্রে—ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব বা ধর্মতত্ত্বে।

এমন কেউ নেই, যিনি এ-সব বিষয়ে গবেষণা বা আলোচনার মূল্য স্বীকার না-করবেন। কিন্তু যে-কথাটা আমরা অনেক সময় ভুলে থাকি, এবং মাঝে-মাঝে যা নিজেদের এবং অন্যদের স্মরণ করাবার প্রয়োজন হয়, তা এই যে এ-সব বিষয় সাহিত্য নয়, এবং সাহিত্যের আত্মা বিষয়ে উদাস বা নিঃসাড় হ'য়েও এ-সব ক্ষেত্রে কৃতী হওয়া যায়। বস্তুত, সংস্কৃত বিষয়ে য়োরোপীয় ভাষায় গ্রন্থের সংখ্যা যেমন বিপুল, ঠিক তেমনি বিরল তার মধ্যে কোনো সপ্রাণ সাহিত্যিক মন্তব্য, কবিতা বিষয়ে কোনো অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় সংস্কৃতের কোনো মূল্যায়নের প্রয়াস: গ্যেটের শকুন্তলা-প্রশস্তি, এমার্সনের 'ব্রহ্ম', হুইটম্যানের 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া', এলিয়টের 'দি ওয়েইস্ট ল্যাণ্ড'*— এগুলো বিক্ষিপ্ত ও আকস্মিক উদাহরণমাত্র: সমগ্রভাবে এই কথাই সত্য যে সংস্কৃত ভাষার রচনাবলির মধ্যে শ্বেতাঙ্গরা দেখেছেন—গ্রীক বা লাটিনের মতো কোনো সাহিত্য নয়, রসসৃষ্টি নয়, সৃষ্টিকর্ম নয়—দেখেছেন ইতিহাস

* আমি লক্ষ করছি, এই চারজন লেখকের মধ্যে তিনজনই মার্কিন, আর এটাকে নেহাৎ আপতনও বলা যায় না। কলম্বাস চেয়েছিলেন সমুদ্রপথে ভারতে পৌঁছতে, তাঁর প্রাপ্ত দেশকেও ভারত ব'লে ভেবেছিলেন, ভারতের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক সম্বন্ধ মার্কিনের পক্ষে ভোলা সহজ নয় এবং যেকালে য়োরোপের পরাক্রান্ত জাতিরা প্রাচীলুণ্ঠনে লিপ্ত ছিলো, আমেরিকায় তখন ঐতিহ্য-সন্ধানের চেষ্টা চলেছে, যে-সন্ধানের প্রবক্তা ওঅল্ট হুইটম্যান, শ্বেতাঙ্গের ধর্মদ্রোহিতা ক'রে, সারা পৃথিবীকে এক ব'লে ভেবেছিলেন। বৈদেশিক সংস্কৃতি বিষয়ে অনীহামুক্তি য়োরোপে সাম্প্রতিক ঘটনা, কিন্তু মার্কিনেরা জাতি হিশেবে তরুণ ও বহুমিশ্রিত ব'লে, ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যময় মহাদেশের অধিবাসী ব'লে, অপরিচিত বিষয়ে প্রথম থেকেই সহজে সাড়া দিয়েছে। গ্যেটের কথা আলাদা, 'বিশ্বসাহিত্যে'র ধারণার তিনিই জনক এবং তাঁরই উত্তরসাধক টোমাস মান্ আধুনিক য়োরোপে বিশ্বচেতনার ভাস্বর প্রতিভূ।

ইত্যাদির উপাদান, আর ভারতীয় মনের পরিচয় পেয়ে ভারতবাসীকে বশীভূত রাখার একটি সম্ভাব্য উপায়। শেষের কথাটা, বলা বাহুল্য, ইংরেজ বিষয়ে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। স্বনামধন্য উইলসন 'মেঘদূত'-এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন; সেই অনুবাদ বিষয়ে কিছু না-বলাই ভালো, কিন্তু তাঁর সুখপাঠ্য টীকা প'ড়ে বোঝা যায়, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো ভারতের ভূগোল, জলবায়ু, পশুপাখি ও উদ্ভিদ বিষয়ে জ্ঞানদান, এবং এ-বিষয়ে তাঁর স্বদেশবাসীকে অবহিত করা যে ভারতীয় মানুষ বর্বর নয়, এমনকি কৃতজ্ঞতার অর্থ বোঝে ('ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায় / প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ ॥')। অক্সফোর্ডের বডেন-অধ্যাপকের পদ যাঁর দানের ফলে সম্ভব হয়, সেই লেফটেনান্ট-কর্নেল বডেন স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে এই পদস্থাপনে তাঁর লক্ষ্য সংস্কৃত ভাষায় বাইবেল-অনুবাদের উন্নয়ন, 'যাতে তাঁর স্বদেশীয়রা ভারতবাসীকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করাবার কর্মে অগ্রসর হ'তে পারে।' এই পদের প্রথম দুই অধিকারী প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য বিষয়ে সচেতন ও সশ্রদ্ধ ছিলেন: উইলসন-এর নিয়োগের সপক্ষে প্রধান অনুমোদন ছিলো বাইবেলের কতিপয় শব্দের তৎকৃত সংস্কৃত অনুবাদ; এবং মনিয়র-উইলিয়মস তাঁর বৃহৎ ও মহৎ অভিধানের ভূমিকায় জানাতে ভোলেননি যে তাঁর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ থেকে বাইবেলের জনৈক অনুবাদক প্রচুর সাহায্য পান। অবশ্য খৃষ্টধর্মের প্রচার বিষয়ে সব লেখক সরব নন, কিন্তু ভারতীয় বিষয় নিয়ে এমন কোনো ইংরেজ মাথা খাটাননি—হোক তা ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, স্থাপত্য, কৃষি বা ব্যাকরণ—যিনি মনে-মনে না-জানতেন যে তাঁর কর্ম সাম্রাজ্য-রক্ষা ও বিস্তারের অঙ্গবিশেষ। 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা' বলতে উনিশ শতকে যা বোঝাতো, সেই বিরাট দায়িত্বের মধ্যে সংস্কৃত চর্চাও গ্রথিত ছিলো। এ-কথা ব'লে পথিকৃৎ ইংরেজ লেখকদের সাধুতায় আমি সন্দেহপাত করছি না—সাম্রাজ্যশাসন ও সাধুতায় কোনো বিরোধ ছিলো না তাঁদের মনে—এবং তাঁদের কাছে সারা ভারতের ঋণ কত গভীর সে-বিষয়েও আমি সম্পূর্ণরূপে সচেতন। আমি শুধু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য বোঝাতে চাচ্ছি। রেনেসাঁসের সময় গ্রীসের অভিঘাতে য়োরোপীয় চিত্তের যে বৃত্তি জেগে উঠলো তার নাম সৌন্দর্যবোধ, ঐতিহাসিক ও অন্যান্য গবেষণাকে তারই শাখা-প্রশাখা বললে ভুল হয় না। কিন্তু ভারতের আবিষ্কার বা পুনরাবিষ্কার ঘটলো একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপনের প্রাক্কালে, সেইজন্য প্রথম থেকেই মনোযোগ পড়লো তথ্যের দিকে, রসের দিকে নয়, বিশ্লেষধর্মী

বিজ্ঞানের দিকে, সংশ্লেষধর্মী উপলব্ধির দিকে নয়। সারা য়োরোপের প্রাচ্য-বিদ্যার এ-ই হ'লো সামান্য লক্ষণ। সেইজন্য, সাহিত্য যেখানে কেবল সাহিত্য, সেই ক্ষেত্রে য়োরোপীয় ভারতজ্ঞের কাছে, আমাদের কিছু শেখবার নেই। এই একটা দিকে, আমাদের মনকে তাঁরা জাগাতে পারেননি; আর দুঃখের বিষয় আমাদের উনিশ-শতকী জাগরণও এ-বিষয়ে নিষ্ফল হয়েছে।*

ইংরেজি ভাষায় যে-সব গ্রন্থ নামত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, সকলেই জানেন তাদের মধ্যে ইতিহাসের অংশই মুখ্য, সাহিত্য সেই সম্ভার সাজাবার উপলক্ষ মাত্র। পুস্তকের বড়ো অংশ ব্যয় হচ্ছে কালনির্ণয়ে ও তথ্যবিচারে, তারপরে আছে গ্রন্থাদির তালিকা ও চুম্বক। সমালোচনা বা গুণগ্রহণের চেষ্টা বা ইচ্ছা নেই তা নয়, কিন্তু প্রায়শই তা ভীরু ও অর্ধমনস্ক, লেখক নিজেই তাঁর কথায় বিশ্বাসী কিনা সে-বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ থেকে যায়। যেখানে হয়তো নিন্দা তাঁর মনোগত ভাব, সেখানে তিনি শিষ্টতার আড়ালে আত্মগোপন করেন; আর তাঁর প্রশংসার মধ্যেও সে-ধরনের উৎসাহ খুঁজে পাওয়া যায় না, যাতে আলোচ্য কবি বা কবিতার কোনো নতুন অর্থ ধরা পড়ে। ফলত, পুরো ব্যাপারটা এক মৃদু, মোলায়েম ও পাণ্ডুবর্ণ বিবরণের আকার নেয়, যা পাঠ ক'রে কবির আনুমানিক কাল, কাব্যের বিষয়বস্তু ও প্রকরণ ও অন্যান্য সম্পৃক্ত তথ্য

* আমি ভুলিনি উনিশ শতকে সুকৃতি কত প্রচুর: কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের মহৎ অনুবাদ প্রণয়ন করেন; বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য লেখকদের অনুবাদে, অনুলিখনে ও প্রবন্ধাবলিতে সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ভারত সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তৎকালীন মনীষীরা যেন ধ'রে নিয়েছিলেন যে প্রাচীন ভারতে যা-কিছু ছিলো তা-ই মহিমান্বিত: তাঁরা অতীতকে শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছিলেন, যাচাই করতে শেখাননি। রেলগাড়ি-টেলিগ্রাফের যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের সংলগ্নতা কোথায়, এ-প্রশ্ন তাঁদের মনে জাগেনি: তাঁদের মুখে আমরা শুনেছি শুধু বর্তমানের নিন্দা ও লুপ্ত তপোবনের স্তবগান। এই মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সমগ্র রচনাবলি অন্বেষণ করলে দেখা যাবে, শুধু একটি স্থলে 'কালিদাসের কালে'র তুলনায় স্বকালকে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন (যদিও তির্যক পরিহাসের ভঙ্গিতে); কিন্তু 'বিদুষী বিনোদিনী'র সান্ত্বনা সত্ত্বেও 'উজ্জয়িনীর কানন-ঘেরা বাড়ি' বা কবিতাপাঠান্তে নায়িকার হাত-থেকে-পাওয়া 'বেলফুলের মালা'র জন্য তাঁর আক্ষেপ শেষ পর্যন্ত কিছুতেই ফুরোয় না। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা উঠলে এক মুগ্ধ আবেশ তাঁকে আচ্ছন্ন করে; তাঁর 'মেঘদূত' নামক কবিতায় ও প্রবন্ধে এমন কিছু নেই যা 'মেঘদূতম্'-এ না আছে, এবং 'মেঘদূতম্'-এ এমন অনেক কিছু আছে যা তাঁর রচনা দুটিতে নেই। যৌনতা ও ইন্দ্রিয়বিলাস ছেঁটে দিলে 'মেঘদূত'-এর কঙ্কালমাত্র বাকি থাকে, আর কালিদাসের যা বাকি থাকে; তা আর যা-ই হোক তাঁর চরিত্র নয়।

আমরা জানতে পারি, কিন্তু কাব্যটি কেমন, ভালো যদি হয় তো কোন ধরনের ভালো, বিদেশী কাব্যের এবং আধুনিক পাঠকের সঙ্গে সেটি কোন রকমের সম্বন্ধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—এই সব জরুরি বিষয়ে কিছুই জানতে পারি না। উইলসন তাঁর 'মেঘদূত'-এর টীকায় পশ্চিমী কাব্য থেকে বহু সদৃশ অংশ তুলে দিয়েছেন; কিন্তু পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে অংশগুলি জ্ব'লে ওঠেনি, কোনো ভাবনার প্রভাবে পরস্পরে প্রবিষ্ট হয়নি, জড় বস্তুর মতো শুধু পাশাপাশি প'ড়ে আছে। 'পরস্পরে প্রবিষ্ট' বলতে কী বোঝায়, তার উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় এলিয়টের কবিতা ও প্রবন্ধ, বা আঁদ্রে মালরো-র শিল্পবিষয়ক রচনাবলি, যেখানে দেশকালের দূরত্ব-দ্বারা আপাতবিচ্ছিন্ন ছবি বা কবিতা উদ্দেশ্যময় প্রতিবেশিতার ফলে একই বিশ্ব-ভাবনার অঙ্গ হ'য়ে পরস্পরকে বর্ধিত ও রঞ্জিত করে। এই সংশ্লেষ ঘটাবার জন্য কিছুটা কল্পনাশক্তিরও প্রয়োজন, এবং পণ্ডিতের কাছেও সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। কিন্তু য়োরোপীয় প্রাচীতত্ত্বজ্ঞেরা সাধারণত এই গুণে বঞ্চিত, এবং আমরা সম্প্রতি তাঁদেরই কাছে সংস্কৃত শিখেছি। ফলত, স্বদেশীয়দের রচনাও একই পথ নিয়েছে; এ-দেশেও সংস্কৃত বিদ্যার অর্থ দাঁড়িয়েছে সাল-তারিখ নিয়ে সংগ্রাম, তথ্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা, এবং বিবরণ। আমরা যারা সাধারণ পাঠক তাদের প্রায় ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে যে সংস্কৃত 'মৃত' ভাষা হ'লেও তার সাহিত্য জীবন্ত; প্রায় বিশ্বাস করানো হয়েছে যে গ্রীক, চীন, লাটিন, এবং সব দেশের আধুনিক সাহিত্যে যে-সহজ প্রাণস্পন্দন আমরা অনুভব করি, তা থেকে বঞ্চিত শুধু সংস্কৃত, পৃথিবীর মধ্যে শুধু সংস্কৃতই এক বিশাল ও শ্রদ্ধেয় শবে পরিণত হয়েছে, ব্যবচ্ছেদের প্রকরণ না-শিখে যার সম্মুখীন হওয়া যাবে না। আমাদের সঙ্গে সংস্কৃত কবিতার যে-বিচ্ছেদ ঘটেছে এই তার অন্যতর কারণ।

২

দ্বিতীয় কারণ—সংস্কৃত ভাষার ও ব্যাকরণের দু-একটি বৈশিষ্ট্য।

সংস্কৃতে শব্দসংখ্যা বিপুল, প্রতিশব্দ অসংখ্য। তার কিছু অংশ বাংলাতেও চ'লে এসেছে; আমরা যারা সংস্কৃতে শিক্ষিত নই আমরাও খুব সহজে যে-কোনো বহুব্যবহৃত বিশেষ্যপদের একাধিক নামান্তর ভাবতে পারি: গৃহ, ভবন, সদন, নিকেতন; তরু, বৃক্ষ, দ্রুম, পাদপ—এমনি সব ক্ষেত্রেই। কিন্তু বাংলার সঙ্গে—বা যে-কোনো জীবিত ভাষার সঙ্গে—সংস্কৃতের একটি ব্যবহার-

গত যৌন প্রভেদ দাঁড়িয়ে গেছে। বাংলায় আমরা 'প্রিয়ার ভবন',' 'রাজভবন' বা 'মহাজাতি-সদন' বলবো, কিন্তু 'যদু ঘোষের সদন' বা 'ভবন' বলবো না, 'যদু ঘোষের গৃহ' বললেও বেসুরো ঠেকতে পারে। অর্থাৎ, 'ভবন', 'সদন' বা 'নিকেতন' শব্দকে আমরা দৈনন্দিন ব্যবহার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি, তার সঙ্গে প্রেমের, সম্মানের বা প্রাতিষ্ঠানিক একটি ইঙ্গিত জড়িত হয়েছে। তেমনি, 'বটবৃক্ষ', 'তরুলতা', 'পাদপাদপ', 'বোধিদ্রুম'—এই প্রয়োগসমূহে শব্দগুলোর অর্থ ঠিক এক থাকছে না, আকারে প্রকারে গাছেদের মধ্যে প্রভেদ বুঝিয়ে দিচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে যখন লেখেন, 'বৃক্ষটি দাঁড়িয়ে আছেন,' তখন এই শ্রদ্ধার ভঙ্গিতে গাছের বৃক্ষত্ব আমাদের মনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, সংস্কৃতে প্রতিশব্দসমূহ বিনিময়ধর্মী, তাদের মধ্যে অনায়াসে অদলবদল চলে, তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনাও প্রায় অফুরন্ত। এবং এই প্রতিশব্দপ্রয়োগ সংস্কৃত কবিতার প্রকরণের একটি প্রধান নির্ভর; এমন পুঁথিও পাওয়া গেছে যা প্রতিশব্দের তালিকা, যা থেকে লেখকরা, ছন্দের প্রয়োজন বুঝে, যথোচিত মাত্রাযুক্ত শব্দ বেছে নিতে পারেন। এ ধরনের কোনো পুঁথি কালিদাসের হাতের কাছে ছিলো কিনা জানা যায় না, তবে সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে বহু প্রতিশব্দ ব্যবহার না-ক'রে সংস্কৃত ছন্দ রচনা অসম্ভব। অথচ প্রত্যেক আধুনিক ভাষা উত্তরোত্তর প্রতিশব্দ বর্জন ক'রে চলেছে—তাদের ধর্মই তা-ই; এবং এ-কাজে যে-ভাষা যত বেশি অগ্রসর তাকেই আমরা তত বেশি পরিণত বলি, তত বেশি সাহিত্যের পক্ষে উপযোগী।

একটা উদাহরণ নেয়া যাক। স্ত্রীজাতি—যাকে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের প্রধান উপাদান বললে ভুল হয় না—তার কতিপয় প্রতিশব্দের সংজ্ঞার্থ মনিয়র-উইলিয়মস-এর অভিধান থেকে উদ্ধৃত করি :

নারী : a woman, a wife, a female or any object regarded as feminine.

স্ত্রী : 'bearer of children', a woman, female, wife, the female of any animal.

রমণী : a beautiful young woman, mistress.

ললনা : (লল=ক্রীড়াশীল) a wanton woman, any woman, wife.

অঙ্গনা : a woman with well-rounded limbs, any woman or female.

কামিনী : a loving or affectionate woman; a timid woman, a woman in general.

বনিতা : (বনিত=প্রার্থিত, ঈপ্সিত, প্রণয়যোগ্য) a loved wife, mistress, any woman (also applied to the female of an animal or bird.)

বধূ : a bride or newly-married woman, young wife, spouse; any wife or woman, a daughter-in-law, any young female relation : the female of any animal, (esp.) a cow or mare.

মহিলা : a woman, female, a woman literally or figuratively intoxicated.

যোষিৎ (যোষণা) : a girl, maiden, young woman, wife (also applied to the females of animals and to inanimate things.)

দেখা যাচ্ছে, 'নারী' ও 'স্ত্রী' সাধারণ শব্দ, সমগ্র স্ত্রীজাতির পক্ষে প্রয়োজ্য, কিন্তু অন্য প্রত্যেকটির অভিপ্রায় ছিলো স্ত্রীজাতির মধ্যে বয়স, রূপ বা স্বভাবের প্রভেদ বোঝানো। অথচ একই সঙ্গে প্রত্যেকটি একটি সাধারণ অর্থেও উল্লিখিত হয়েছে— পশু-পাখির ও জড়ের স্ত্রীজাতিও বাদ পড়েনি— এবং সংস্কৃত সাহিত্যে যা গৃহীত হয়েছে তা এই শব্দসমূহের বিশেষ-বিশেষ অর্থ নয়, অর্থের অতিব্যাপ্তি। কিংবা— এটাই বেশি সম্ভব ব'লে মনে হয়—কবিদের ব্যবহার থেকেই অভিধানকার সংজ্ঞার্থ নির্মাণ করেছেন ('যোষিৎ'-এ কুমারী ও সধবা দু-ই বোঝাচ্ছে)। অর্থাৎ এই শব্দগুলোর মূল অর্থ উপেক্ষা ক'রে কবিরা তাদের নির্বিশেষে ব্যবহার করেছেন, ভিন্ন-ভিন্ন ধারণাকে মিশিয়ে দিয়েছেন নিরভিজ্ঞান সাধারণের মধ্যে। কালিদাস যখন বলেন—

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং

আর যখন বলেন—

সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্

আর—

স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু

আর—

নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্

আর—

লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু

তখন 'স্ত্রী', 'বধূ', 'কামিনী, 'যোষিৎ' ও 'বনিতা'য় বিন্দুমাত্র অর্থভেদ সূচিত হয় না; বিবাহিত কি কুমারী, গৃহস্থ কি গণিকা, তরুণী কি প্রৌঢ়া—কোনো দিকেই কোনো ইঙ্গিত নেই, প্রতি ক্ষেত্রে শুধু নিছক নারীকেই বোঝাচ্ছে। কিন্তু বাংলায় 'বধূ' বলতে নববধূ বা পুত্রবধূকেই বোঝায়, 'স্ত্রী' বলতে বিবাহিত পত্নী—আর

'রমণী' বা 'কামিনী' শব্দ আমরা ব্যবহারই করবো না, যদি না রূপের রমণীয়তা বা কামের প্রবণতা বোঝাতে চাই। একজন জীবনানন্দ দাশ যখন লেখেন—

> তোমার মতন এক মহিলার কাছে
> যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হ'তে গিয়ে
> অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
> শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে,
> দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।

তখন 'মহিলা' শব্দ 'নারী'র নামান্তরমাত্র থাকে না, তাতে সমকালীন বিভাব জেগে ওঠে, আমরা অনুভব করি এই শ্লোকের উদ্দিষ্টা সেই আধুনিকাদের এক-জন, বক্তারা যাঁদের 'ভদ্রমহিলাগণ' ব'লে সম্বোধন ক'রে থাকেন। আমাদের মনে এই মহিলার স্পষ্ট ছবি জেগে ওঠে: তিনি অত্যন্ত তরুণী নন, আমাদেরই মতো নগরে বাস করেন, এবং এই শব্দের প্রয়োগে 'কিন্নরকণ্ঠ' ও 'অমৃতসূর্যে'র সঙ্গে আধুনিক যুগের প্রতিতুলনায় বেদনাও প্রতিভাত হয়। এক-একটি শব্দের এই বিশেষ অভিঘাত, আমরা যাকে কবিতার প্রাণ ব'লে ধারণা করি, তা সংস্কৃতে সম্ভব হয় না। সেখানে, কোনো-একটি ধারণার জন্য, একের বদলে অন্য শব্দের ব্যবহার হয় শুধু ছন্দের তাগিদে, সন্ধি-সমাসের প্রয়োজনে, বা ধ্বনিমাধুর্য বৃদ্ধি পাবে ব'লে। কোনো শব্দই অসংগত নয়, কোনো শব্দই অনিবার্য বা অনন্য নয়।

তাছাড়া, বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিণত করবার যে-ক্ষমতা সংস্কৃত ব্যাকরণের আছে, তার ফলে—আমি যাকে অর্থের অতিব্যাপ্তি বলছি, তার প্রায় সীমা থাকে না। উপরোক্ত শব্দসমূহ কবির পক্ষে যখন যথেষ্ট হয় না, তখন আছে বিবিধ বর্ণনামূলক শব্দরাজি: বিম্বাধরা, নিতম্বিনী, ভামিনী, মানিনী—এই তালিকা ইচ্ছেমতো বাড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে। অধরের বর্ণ, নিতম্বের গুরুত্ব, কোপ অথবা অভিমানের অনুষঙ্গ থেকে চ্যুত হ'য়ে এরাও পরিণত বা অবনত হ'তে পারে শুধুই 'নারী'তে—এমনকি 'মৃগাক্ষী', 'চারুহাসিনী' বা 'ক্ষীণমধ্যমা'র পক্ষেও তা অসম্ভব নয়। সংস্কৃতে 'জলে'র যত প্রতিশব্দ আছে, তার যে-কোনোটির সঙ্গে -'দ', -'ধর', -'বাহ' যোগ করলে তার অর্থ দাঁড়াবে 'মেঘ'। ভাষার এই রকম স্বাধীনতা থাকলে শব্দের প্রাণশক্তি হ্রাস পেতে বাধ্য।

আমি ভুলে যাচ্ছি না যে প্রত্যেক শব্দেরই উৎপত্তিস্থল বর্ণনা; আমি বলতে চাচ্ছি, শব্দ যখন বর্ণনার স্মৃতি হারিয়ে ফেলে তখন তার বিকল্পের অভাবেই ভাষার পরিণতি সূচিত হয়। 'স্তন' শব্দের অর্থ—যে শব্দ করে (অর্থাৎ জানিয়ে

দেয় যৌবন আগত), এ-কথা আভিধানিক ছাড়া আর কেউ না-জানলেও ক্ষতি নেই, বস্তুবিশেষের নাম হিশেবেই তা আমাদের কাছে গ্রাহ্য। এবং এই নামের মধ্যে একটা ছবিও বিধৃত হ'য়ে আছে, যা তার উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে। কিন্তু এই ছবিটা স্পষ্ট হবার জন্যই এটা দরকার যে প্রত্যেকটি নাম-শব্দ একটিমাত্র উল্লেখের মধ্যে সীমিত থাকবে। 'বহ্নি' শব্দের আদি অর্থ বাহক (যে যজ্ঞের হবি দেবতাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়); সেই অর্থ আমরা ভুলেছি ব'লেই এই যজ্ঞহীন যুগেও তাতে আগুন বোঝায়, নয়তো বাতাস, মেঘ বা নদীও বোঝাতে পারতো—কেননা তারাও বাহকের কাজ করে। 'জল' শব্দের একটি সংজ্ঞার্থ মনিয়র-উইলিয়মস-এর মতে 'any liquid', কিন্তু যদি তা দুধ, মদ বা রক্তের বদলেও ব্যবহৃত হ'তো, তাহ'লে তার ব্যবহারই এতদিনে আর থাকতো না। লক্ষ করলে দেখা যাবে, সেই সব সংস্কৃত শব্দকেই আধুনিক ব্যবহারের পক্ষে সবচেয়ে অনুপযোগী মনে হয়, যারা একাধিক অসম্পৃক্ত অর্থের লোভ ছাড়তে পারেনি। 'পয়োধর' মানে মেঘ বা নারীর স্তন হ'তে পারে; এতে বোঝা যায় তা সম্পূর্ণ নাম-শব্দ হ'য়ে উঠতে পারেনি, বৈশেষণিক পরাধীনতায় কুণ্ঠিত হ'য়ে আছে। 'রত্নাকর'-এর চলিত অর্থ সমুদ্র, কিন্তু লিঙ্গভেদ-হীন বাংলা ভাষায় পৃথিবীকেও রত্নাকর বলা সম্ভব, আর সেইজন্যই আধুনিক কবি শব্দটিকেই বর্জন ক'রে চলেন। 'বিম্বাধরা', 'নিতম্বিনী', 'ভামিনী' ইত্যাদিতেও সেই আপত্তি : তারা কোনো বস্তুর নাম নয়, বর্ণনা মাত্র। যেখানে একই অর্থ বহন ক'রে বহু প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে শব্দের বর্ণনার অংশ ভোলা যায় না। আর সংস্কৃতে নিত্য ঠিক তা-ই ঘ'টে থাকে; 'নৃপ', 'ভূপ' 'ক্ষিতীশ', 'পৃথ্বীশ' প্রভৃতি শব্দের সংখ্যা এত বেশি যে তার কোনোটিকেই 'মানুষ' বা 'পৃথিবী' থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা যায় না (যদিও সে-ভাবে দেখানোই কবিদের উদ্দেশ্য), আর তা যায় না ব'লেই সেগুলোকে সন্দেহ হয় স্তুতিবাক্য ব'লে, রাজার রাজকীয় চিত্ররূপ—অন্তত আমাদের মনে—প্রকাশ পায় একমাত্র 'রাজা' শব্দে। 'রাজপথ' বলামাত্র আমরা চৌরঙ্গির মতো কোনো বড়ো রাস্তার ছবি দেখতে পাই, তার সঙ্গে 'রাজা'র সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়েছে, তার কোনো প্রতিশব্দ আমাদের পক্ষে অচিন্তনীয়। কিন্তু কালিদাস অনায়াসে 'নরপতিপথ' লিখতে পেরেছেন; তাঁর অনুকরণে আজকের দিনের কোনো বাঙালি কবি যদি 'মহীপালপথ' বা 'ভূপতিপথ' লেখেন, আমরা চেষ্টা ক'রে তার অর্থ করবো 'যে পথে রাজা যাতায়াত করেন'। সন্দেহ নেই, সংস্কৃতে অনেক সময় শব্দসংখ্যা

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥

এই শ্লোক শ্রুতিমোহন ও দৃষ্টিনন্দন, এবং সেই কারণেই মনোমুগ্ধকর। কিন্তু এতে যা বলা আছে তা সবই প্রত্যাশিত ও সম্ভবপর, বিস্ময়ের আঘাত নেই এতে, নেই মূর্ত ও অমূর্তের কোনো সম্বন্ধস্থাপন, যার ফলে কবিতা শুধু অধিকৃত হবার বিষয় থাকে না আর, আবিষ্কৃত হবার দাবি জানায়।

তোমায় সাজাব যতনে কুসুমে রতনে,
কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে।
কুন্তলে বেষ্টিব স্বর্ণজালিকা,
কণ্ঠে দোলাইব মুক্তামালিকা,
সীমন্তে সিন্দুর অরুণ বিন্দুর—
চরণ রঞ্জিব অলক্ত-অঙ্কনে।

এই পর্যন্ত কালিদাস লিখতে পারতেন, যোগ করতে পারতেন আরো কয়েকটি ললিত উপকরণ, কিন্তু তাঁর রচনায় সেখানেই সমাপ্তি ঘটতো, যা দৃশ্য ও স্পৃশ্য বস্তু নয় তার দ্বারা সখীকে সাজাবার কল্পনা কখনোই তাঁর মনে আসতো না। 'সখীরে সাজাব সখার প্রেমে / অলক্ষ্য প্রাণের অমূল্য হেমে'—এই সব কথা, যা না-থাকলে বাংলায় এটিকে কবিতা ব'লেই ভাবতুম না আমরা, কালিদাসে তার লেশমাত্র আভাস নেই। 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী / হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্'—এই অতিশয়োক্তিতে যা পাওয়া গেলো তা নাগরযোগ্য চাটুকারিতা মাত্র, কিন্তু সত্যিকার প্রেমিকের স্বর আমরা শুনতে পেলাম, যখন, আদিরসের মরচে-পড়া মুখস্থ-করা বুলির মধ্যে, কৃষ্ণ হঠাৎ ব'লে উঠলেন, 'ত্বমসি মম ভূষণম্'।

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্—

সারা 'গীতগোবিন্দে' এই একবারই ভাষা হ'য়ে উঠলো কবিতার দ্বারা আক্রান্ত—আক্রান্ত, উন্নত ও রূপান্তরিত, যেন এক ঝাপটে চ'লে গেলো যুক্তিনির্ভর কার্পণ্যকে ছাড়িয়ে। 'তুমিই আমার ভূষণ'—এই একটি কথাই ব'লে দিচ্ছে যে জয়দেব এক সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন: ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীনের অস্তরাগ তিনি, এবং আধুনিকের পূর্বরাগ। কবিতা যখন সংস্কৃতের বিধিবদ্ধতা থেকে

একবার বেরোতে পারলো, তখনই তার মধ্যে জেগে উঠলো অপূর্বতা ও আবিষ্কারধর্ম; মানুষের প্রত্যাশার যা অতীত, জাগতিক সম্ভাবনার যা বহির্ভূত, সেই অনির্বচনীয়কে বাঁধতে গিয়ে ভাষা সব লজ্জাভয় ত্যাগ করলে।

আমার অঙ্গের কাঁচুলি কৃষ্ণকরাঙ্গুলি, করের ভূষণ সেবা,
আর কটির অলংকার কৃষ্ণচন্দ্রহার, সে-ভূষা বুঝিবে কেবা?

'কে বুঝবে?' কালিদাস নিশ্চয়ই বুঝতেন না, তিনি এটাতে দেখতেন তাঁর চেনা কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে বর্বরের যুদ্ধঘোষণা, সভ্যতার অবক্ষয়ের লক্ষণ। 'মেঘদূত'-এর যক্ষ ভুলতে পারে না, আর বার-বার আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে তার বিরহিণী প্রিয়া সব ভূষণ ত্যাগ করেছে; এত বড়ো দুঃখের মধ্যেও এ-কষ্ট তার কম নয়। কিন্তু মেঘ যেন ভুল না বোঝে; যদিও বিরহদশায় তার পত্নী এখন 'অনুরূপা', স্বভাবত সে অতি রূপবতী, 'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা' ইত্যাদি। এই শ্লোক অঙ্গে-অঙ্গে যে-তিলোত্তমাকে রচনা করেছে, আমরা সেই প্রতিমাকে দূর থেকে মুগ্ধ হ'য়ে দেখি, কিন্তু—

সে দিন বাতাসে ছিল তুমি জানো—
আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো,
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো
তোমার হাসির তুলনা॥

এটি পড়ামাত্র, একই মুহূর্তে এবং বিনা চেষ্টায়, নায়িকার মায়াময় রূপ ও বক্তার বিরহবেদনা আমাদের অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, আমরা হ'য়ে উঠি কবির অভিজ্ঞতার অংশভাগী, তাঁর সঙ্গে একীভূত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনার বদলে এখানে যা আছে তাকে বলতে পারি ভাবনা—সব বস্তু ও তথ্যের আড়ালে নিত্য যা বিরাজমান, যার সংক্রাম থেকে মানুষের মন জড় প্রকৃতিকেও মুক্তি দেয় না। কবিতা যখন এখানে পৌঁছয় কবি তখনই বলতে পারেন—না ব'লে তখন উপায় থাকে না—'আমার এ-গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার।'

'কালিদাসের মেঘদূত' গ্রন্থের ভূমিকার অংশ

শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা

'প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের রাজা, এক সত্য দেবতা।' কথাগুলো লিখেছিলেন, শতবর্ষের ব্যবধানে কোনো পুস্তকপীড়িত প্রৌঢ় পণ্ডিত নন, তাঁর মৃত্যুর মাত্র চার বছর পরে এক অজাতশ্মশ্রু যুবক, তাঁরই অব্যবহিত পরবর্তী এক কবি, আর্তুর র‍্যাবো, তাঁর প্রথম সন্তানগণের অন্যতম। আর যেহেতু একজন কবির বিষয়ে অন্য এক কবির মন্তব্য, অত্যুক্তি হ'লেও, ভ্রান্ত হ'লেও, মূল্যবান (কেননা কেবল কবিরাই পারেন সংক্রামকভাবে সাড়া দিতে), তাই আমি এই চিরচেনা উদ্ধৃতি দিয়েই আমার এই বহুবিলম্বিত প্রবন্ধ আরম্ভ করছি। যে-পত্রে এই কথাগুলি গ্রথিত আছে তা ছত্রে-ছত্রে বোদলেয়ারে ভারাক্রান্ত; দু-দিন আগে অন্য এক ব্যক্তিকে লেখা দোসর-পত্রটিও তা-ই; আমরা অনুভব করি যে বোদলেয়ারের চিন্ময় সত্তা, হেমন্তের ঝোড়ো হাওয়ার মতো, ব'য়ে চলেছে এই যৌবনকুঞ্জের উপর দিয়ে—কুঁড়ি ঝরিয়ে, বীজ ছড়িয়ে, ফুল ঝরিয়ে, বীজ ছড়িয়ে, মরা পাতার মতো মরা ভাবনাগুলিকে উড়িয়ে দিয়ে কয়েকটি অকালপক্ক রক্তিম ফল ফলিয়ে তুলছে। 'অদৃশ্যকে দেখতে হবে, অশ্রুতকে শুনতে হবে', 'ইন্দ্রিয়সমূহের বিপুল ও সচেতন বিপর্যয়সাধনের দ্বারা পৌঁছতে হবে অজানায়', 'জানতে হবে প্রেমের, দুঃখের, উন্মাদনার সবগুলি প্রকরণ,' 'খুঁজতে হবে নিজেকে, সব গরল আত্মসাৎ ক'রে নিতে হবে', 'পেতে হবে অকথ্য যন্ত্রণা, অলৌকিক শক্তি, হ'তে হবে মহারোগী, মহাদুর্জন, পরম নারকীয়, জ্ঞানীর শিরোমণি। আর এমনি ক'রে অজানায় পৌঁছনো!'—আবার বোদলেয়ারীয় জগতে প্রবেশ করছি আমরা, পান করছি 'ফ্লর দ্য মাল'-এর সারাৎসার; আমাদের মনে প'ড়ে যাচ্ছে 'প্রতিসাম্য', 'ভ্রমণ' ও 'সিথেরায় যাত্রা', মদ ও মৃত্যুর কবিতাগুচ্ছ; প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গদ্যকবিতা ও 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'র সেই সব অংশ (আর কোন অংশই বা তেমন নয়), যেখানে কবি সাহস করেছিলেন আপন আত্মার অনাবরণ উন্মোচনে। আত্মসন্ধান, আত্মপরীক্ষা; দুঃখ, রোগ, মত্ততা; ইন্দ্রিয়সমূহের অতীন্দ্রিয় বিনিময়: সূত্রগুলি সবই বোদলেয়ারের, কিন্তু কণ্ঠস্বর নতুন, বাচনভঙ্গি নতুন, তাঁর 'শৌখিনতা' বা কৌলীন্য বা ক্লাসিক শিল্পচেতনার পরিবর্তে এখানে আছে এক সদ্য-জেগে-ওঠা সহজ আত্মচেতনা, যার তীব্র চাপে সারা অতীত, রাসীন ও ভিক্তর উগো সুদ্ধু, বন্যার মুখে মস্ত বুড়ো গাছের মতো ধ্ব'সে পড়ছে।

তখন ১৮৭১; ছয় বছর আগে, যখন পর্যন্ত বোদলেয়ার অন্তত শারীরিক অর্থে জীবিত, তেইশ বছরের যুবক মালার্মে একটি গদ্যকবিতায় প্রথম প্রণতি জানিয়েছেন তাঁর গুরুকে, আর প্রায় সমবয়সী ভেরলেন ঘোষণা করেছেন যে 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর রচনারীতি 'অলৌকিক শুদ্ধতাসম্পন্ন'। যে-খ্যাতিকে, আঁদ্রে জীদের ভাষায়, তাঁর জীবৎকাল এক পবিত্র স্তব্ধতা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলো, তার প্রথম মন্ত্রোচ্চারণ ইতিমধ্যেই শুরু হ'য়ে গেছে। ইতিমধ্যেই ভাবীকাল ছিনিয়ে নিয়েছে সেই নামটিকে, সহজীবীরা যার বানান পর্যন্ত নির্ভুল লেখার প্রয়োজন ভাবেননি। পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে তাঁকে আবিষ্কার করলেন উইসমান্স, ল্যমেৎর, লাফর্গ; আর লণ্ডনে, রাইমার্স ক্লাবের পত্তনের সময়, ইয়েটস অনুভব করলেন যে, বোদলেয়ার ও ভেরলেনের অনুসরণে, 'যা-কিছু কবিতা নয়, তা থেকে মুক্তি দিতে হবে কবিতাকে।' ইয়েটস ফরাশি জানতেন না; তাঁকে আর্থার সাইমন্স প'ড়ে শোনাতেন ফরাশি কবিতা, আর তাঁর স্বকৃত অনুবাদ; আর এমনি ক'রেই, বোদলেয়ারের প্রবর্তিত ধারা থেকে, ইয়েটস তাঁর নিজের কবিতার পক্ষে জরুরি দু-একটা ব্যাপার শিখে নিয়েছিলেন। ফ্রান্সের অভিঘাতে ইংলণ্ডে আরো প্রত্যক্ষভাবে যা ঘটেছিলো, সেই 'নব্বুই'-যুগের পীতাভ পাংশুতা বিষয়ে এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই; কিন্তু সেই ব্যর্থতাও অন্তত পক্ষে নতুন একটি চেতনার সাক্ষ্য দিচ্ছে। কেননা সেটাই সেই সময়, যখন ইংরেজি ভাষায় কোনে-কোনো লেখকের মনে এই সত্যটি প্রথম উঁকি দেয় যে টেনিসন থেকে সুইনবার্ন পর্যন্ত কবিরা শুধু রোমান্টিকদের চর্বিতচর্বণ ক'রে গেছেন, যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন ও সপ্রাণ কবিতার জন্য তাকাতে হবে সেই দেশের দিকে, যে-দেশ রাষ্ট্রবিপ্লবের পারম্পর্যে ক্ষতবিক্ষত এবং ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতায় বহু দূরে পেছিয়ে-থাকা। এ-কথাও স্মর্তব্য যে বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে, যখন পর্যন্ত তিমিরলিপ্ত ইঙ্গ-দ্বীপতটে দুই মার্কিন ত্রাতা এসে পৌছননি, তখনই ইয়েটস ধীরে-ধীরে ইংরেজি ভাষায় আধুনিক কবিতা সম্ভব ক'রে তুলছেন; আর প্রায় একই সময়ে এক কৃশতনু জর্মান ভাষার কবি প্যারিসে ব'সে রচনা করছেন 'মাল্টে লাউরিড্‌স ব্রিগ্‌গে'-র ছদ্মনামে তাঁর আন্তরিক আত্মজীবনী, যার কোনো-কোনো অংশে বোদলেয়ারের স্তবগান ধ্বনিত হ'লো। আর তারপর থেকে পশ্চিমী কবিতায় এমন কিছু ঘটেনি, সত্যি যাতে এসে যায় এমন কিছু ঘটেনি, যার মধ্যে, কোনো না কোনো স্তরে বা সূত্রে, বোদলেয়ারের সংক্রাম আমরা দেখতে না পাই। আজকের দিনে

কারোরই জানতে বাকি নেই যে তিনি শুধু প্রতীকিতার উৎসস্থল নন, সমগ্রভাবে আধুনিক কবিতার জনয়িতা। অনুভব না-ক'রে উপায় নেই পরবর্তী ফরাশি কবিতায় তাঁর অনুরণন, পরবর্তী পশ্চিমী কাব্যে তাঁর প্রত্যক্ষ বা দূরাগত, কখনো হয়তো অনেক ঘুরে-আসা, কিন্তু নির্ভুলভাবে তাঁরই চিত্ত-নির্যাস। এবং শুধু কবিতাই নয়, চিত্রকলাও তাঁর বাণে বিদ্ধ হয়েছে; তাঁর কবিতাকে ছবির ভাষায় সৃষ্টি ক'রে নিয়েছেন রদাঁ, রুয়ো ও মাতিসের মতো শিল্পীরা; এবং রদাঁ, তাঁর নিঃসঙ্গ ও অবজ্ঞাত যৌবনে, যে-দুই কবিকে ভেদ ক'রে ধীরে-ধীরে আপন পথটি দেখতে পান, তাঁরা দান্তে ও বোদলেয়ার। ফ্রান্সের প্রথম বিশ্বকবি তিনি, এত বড়ো বৈদেশিক বিস্তার তাঁর আগে অন্য কোনো ফরাশি কবির ঘটেনি। বহু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে তাঁর, সাহিত্যিকেরা বংশপরম্পরায় তা ক'রে গেছেন, ইংরেজিতে এক-একটি কবিতার শতাধিক অনুবাদ পর্যন্ত হয়েছে। এই বাংলাদেশেও কোনো-এক লেখক, পঞ্চাশের প্রান্তে এসে, আয়ু ও স্বাস্থ্যের অনিশ্চয়তা জেনেও, তাঁর কবিতার অনুবাদে অনেক ঘণ্টা, সপ্তাহ ও মাস সানন্দে নিবেদন ক'রে দিলেন। আজ তাঁর জগৎ-জোড়া প্রতিপত্তির দিনে, এই কথাটা মেনে নেয়া অত্যন্ত বেশি সহজ হ'য়ে গেছে যে তিনি 'প্রথম দ্রষ্টা, কবিদের রাজা, সত্য দেবতা।'

২

কিন্তু 'প্রথম' কেন? 'দ্রষ্টা'— সে তো কবির একটি সনাতন ও সাধারণ অভিধা; আত্মিক দৃষ্টি যাঁর নেই তিনি কি কবি হ'তে পারেন? পারেন না তা নয়; অনেকে, শুধু রচনার নৈপুণ্যের বলে, কবিখ্যাতি অর্জন করেছেন: ঈশপের ছন্দোবদ্ধ প্রকরণ লিখে লা ফঁতেন, সুবুদ্ধিকে আঁটো দ্বিপদীর চুড়িদার পরিয়ে আলেকজাণ্ডার পোপ। ঐতিহাসিকেরা, সরকারি সমালোচকেরা, এঁদেরও কবি ব'লে মানতে বাধ্য; কিন্তু যাঁরা নিজেরা দ্রষ্টা, অন্তত কবিতার বিষয়ে দ্রষ্টা, তাঁরা, র‍্যাঁবোর মতোই, এঁদের 'সমিল-গদ্যলেখক' ব'লেই জানেন। যাকে বলা হয় 'আলোকপ্রাপ্তি,' সেই প্রায় অমানুষিক যুক্তিবাদের গুমোট ভেঙে যখন রোমান্টিকতার ঝড় উঠলো, তখনও, কল্পনার স্বাধীনতালাভ সত্ত্বেও, কবিতা ঠিক স্বপ্রতিষ্ঠ হ'তে পারলে না, তার দেহে লগ্ন হ'য়ে রইলো আঠারো শতকের অনেক উচ্ছিষ্ট: জ্ঞানের ভার, উপদেশের ভার, হিতৈষণার জঞ্জাল। প্রভেদ এই যে 'আলোকপ্রাপ্ত' কবিরা মাস্টারি ধরনেই মাস্টারি করতেন, তাঁদের কবিতা

ছিলো শিক্ষিত সালঁর সংলাপ, শ্রোতাদের বিষয়ে সচেতন; আর রোমান্টিকেরা উপদেশ দিতেন মন্ময় ভঙ্গিতে, প্রবক্তার ধরনে, আর তাঁদের কবিতা ছিলো রাখাল, সন্ন্যাসী বা পর্যটকের স্বগতোক্তি। কবিতাকে এবার স্বগতোক্তি হ'তে হবে—সামাজিক আলাপ আর নয়—এই সূত্রটি তাঁরা ধরেছিলেন, কিন্তু 'স্ব' কথাটির অতিব্যাপ্ত অর্থ করেছিলেন তাঁরা। বলা যেতে পারে যে অকবি ও কবির মধ্যে যা তফাৎ, সেই তফাৎই পোপের সঙ্গে শেলির, এবং লা ফঁতেনের সঙ্গে ভিক্তর উগোর; আমরা মানতে বাধ্য যে রোমান্টিকেরা দ্রষ্টার গুণে দরিদ্র নন, তাঁরাও চেয়েছেন অদৃশ্যকে দেখতে এবং অশ্রুতকে শুনতে; কিন্তু যেহেতু তাঁরা কবিকে ভেবেছিলেন জগতের হিতসাধক, 'অস্বীকৃত বিধান-কর্তা', আর কবিতাকে ভেবেছিলেন আবেগের প্রবহণমাত্র, তাই, যা কবিতা নয় এমন অনেক পদার্থের চাপে তাঁদের দৃষ্টিকণিকা শুদ্ধভাবে প্রতিভাত হ'তে পারেনি। জগৎটাকে বদলানো যে কবির কাজ নয়, এই ধারণা গোতিয়ে-র ছিলো, কিন্তু তাঁর নিজের কবিতা মনোমুগ্ধকর পদ্যের স্তর ছাড়িয়ে বেশি উপরে উঠতে পারেনি ব'লে, তাঁকেও পরিহার না-ক'রে তরুণ র‍্যাঁবোর উপায় ছিলো না। উপায় ছিলো না, উগোর উচ্ছ্বাস, লেকঁৎ দ্য লিল্-এর কারুকার্য ও গোতিয়ে-র এলাচগন্ধী সন্দেশের মতো উপভোগ্যতার পর, 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর কবিকে প্রথম দ্রষ্টা ব'লে ঘোষণা না-ক'রে। র‍্যাঁবো যা বলতে চেয়েছিলেন (প্রায় তাঁর নিজেরই ভাষায় বলছি) তা এই যে রোমান্টিকেরা যা জানতেন না তা বোদলেয়ার জেনেছিলেন—যে কবি বক্তা অথবা প্রবক্তা নন, দ্রষ্টা, অর্থাৎ বিশ্ব-জগতে লুক্কায়িত সম্বন্ধসমূহের আবিষ্কারক, যে তাঁর স্বকীয় ও অনন্য দৃষ্টির কাছে একান্ত ও বিনীত ভাবে আত্মসমর্পণ করাই তাঁর স্বধর্ম। 'বাগ্মিতার শিরশ্ছেদ করো', 'আত্মার একটি অবস্থার নামই কবিতা'—ভেরলেন ও মালার্মের পক্ষে এ-রকম কথা বলা সম্ভব হ'তো না যদি না তাঁরা বোদলেয়ারের পরে জন্মাতেন।

রোমান্টিকতার নিন্দা করা আমার অভিপ্রায় নয়, বরং আমি দুর্মরভাবে রোমান্টিকতার পক্ষপাতী। 'রোমান্টিক' বলতে আমি বুঝি—শুধু একটি ঐতি-হাসিক আন্দোলন নয়, মানুষের একটি মৌলিক, স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি। তারই নাম রোমান্টিকতা, যা ব্যক্তি-মানুষকে মুক্তি দান করে, স্বীকার ক'রে নেয়—শুধু ইস্ত্রি-করা এটিকেট-মানা সামাজিক জীবটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে; তার মধ্যে যা-কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও রহস্যময়, যা-কিছু গোপন,

পাপোন্মুখ ও অকথ্য, যা-কিছু গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয়—সেই বিশাল ও স্বতোবিরোধময় বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোমান্টিকতা। এই শক্তি, যা কোনো যুগেই একেবারে রুদ্ধ হ'য়ে থাকেনি কিন্তু কোনো-কোনো যুগে—যেমন শেক্সপীয়রের ইংলণ্ডে—যার বিস্ফোরণ গগনস্পর্শী হয়েছে, তা রুসোর পর থেকে সর্বসাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ হ'য়ে উঠলো। আরম্ভ হ'লো ঐতিহাসিক রোমান্টিকতা, বিশ্বসাহিত্যে বিরাট এক ঘটনা, যা মানুষের চিন্তার পরতে-পরতে এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে সমগ্র আধুনিক সাহিত্যই রোমান্টিক; এলিয়ট অথবা ভালেরির মতো যাঁরা প্রকরণে বা মতবাদে ক্লাসিকধর্মী তাঁদেরও ভাষাব্যবহার পরীক্ষা করলেই রোমান্টিক অন্বয় বেরিয়ে আসে। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমাংশে রোমান্টিকতার চেহারা ছিলো বন্যার মতো; যেমন তা অনেক বাঁধ ভেঙে দিয়েছিলো তেমনি টেনে তুলেছিলো বহু আবর্জনা; মুছে দিয়েছিলো, উৎসাহের প্রথম নেশায়, অনেক প্রয়োজনীয় ভেদজ্ঞান, যাকে ভেরলেন বলে-ছিলেন 'নেহাৎ সাহিত্য', তার সঙ্গে কবিতার পার্থক্যটিকে স্পষ্ট হ'তে দেয়নি। বাকি ছিলো বোদলেয়ারের জন্য এই কাজ—রোমান্টিকতার পরিশোধন ও পরিশীলন; তার সব অবান্তরতা বর্জন ক'রে কবিতাকেই সর্বস্ব ক'রে তুললেন—তিনিই প্রথম। রোমান্টিকদের কবিতা ছিলো কবিত্বমণ্ডিত রচনা যার কোনো-কোনো পঙক্তি বা অংশ কবিতা হ'লেও অনেক অংশই কবিতা নয়; কিন্তু বোদলেয়ার কবিতা বলতে বুঝলেন এমন রচনা, যার মধ্যে কবিতা ছাড়া কিছুই নেই, যার প্রতিটি পঙক্তি ও শব্দ, মিল ও অনুপ্রাস, রসের দ্বারা সমগ্র সুপক্ব ফলটির মতো, কবিতার দ্বারা আক্রান্ত। তাই 'যা-কিছু কবিতা নয় তা থেকে কবিতার মুক্তি'র প্রথম দলিল 'ফ্লযর দ্য মাল', আধুনিক কবিতার জন্মক্ষণ ১৮৫৭।

আমি ভুলিনি যে পূর্ববর্তী অনেক কবিতে আধুনিকতার পূর্বাভাস আছে, তার কোনো-কোনো লক্ষণে তাঁরা সমৃদ্ধ। ইংলণ্ডে ব্লেইক, কীটস, কোলরিজ; জর্মানিতে নোভালিস ও হ্যেল্ডার্লিন; ফ্রান্সে নেরভাল ও গোতিয়ে, আমেরিকায় পো এবং হুইটম্যান—এঁদের আদর্শ বা পরামর্শকে, কোনো-না-কোনো দিক থেকে, আধুনিক কবিতার প্রকরণে অথবা মর্মস্থলে ফলপ্রসূ হ'তে দেখেছি আমরা। কিন্তু এঁদের পাশে বোদলেয়ারকে যদি রাখি, আর বোদলেয়ারের কবিতার পাশে তাঁর শিল্প-সমালোচনাকে, তাহ'লে আমরা উপলব্ধি করি যে, বিচ্ছিন্ন ও কিছুটা আকস্মিকভাবে, কবিতার যে-সব নতুন সূত্র এঁরা খুঁজে

পেয়েছিলেন, সেগুলিকে, যেন এক আশ্চর্য শুভক্ষণে, বোদলেয়ার বেঁধে দিলেন এক অনন্য গুচ্ছে, এমনভাবে সমন্বিত ক'রে দিলেন যাতে তা ভাবীকালের ব্যবহারযোগ্য হ'য়ে উঠলো। এঁরা কী করছেন, এঁদের কৃতির ফলাফল বা দ্যোতনা কী, সে-বিষয়ে এঁদের চেতনা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, ক্ষীণ অথবা খণ্ডিত ; কিন্তু বোদলেয়ারের চৈতন্য তাঁর নিজের বিষয়ে ও কবিতার বিষয়ে পূর্ণতাপে নিরন্তর ভাস্বর। কোলরিজ কবিতাকে ত্যাগ করলেন, ব্লেক চাইলেন নতুন ধর্মের প্রবর্তক হ'তে, হুইটম্যান নিজেকে ধ'রে নিলেন বিশ্বমৈত্রীর দূতপ্রধান ; অগ্রজদের মধ্যে একমাত্র যিনি সন্দেহ করেছিলেন—যদিও কাজে তা ক'রে উঠতে পারেননি—যে সবচেয়ে জরুরি কথা হ'লো কবিতাকে নতুন ক'রে তোলা, তিনি অ্যালান পো। আমরা জানি এই মার্কিন কবির বিষয়ে বোদলেয়ারের উৎসাহ ছিলো সীমাহীন, এবং পূর্বোল্লিখিত কবিদের মধ্যে যাঁরা বিদেশী তাঁদের আর কারো সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিলো কিনা, তা আমরা জানি না। ব্লেক অথবা কোলরিজকে জানলে, মনে হ'তে পারে, তিনি পো-র দ্বারা অত দূর পর্যন্ত মুগ্ধ হতেন না ; এবং এমন মতও আমরা শুনেছি যে এই মুগ্ধতার গূঢ় কারণ তাঁর (ও পরে মালার্মের) ইংরেজি ভাষায় যথোচিত জ্ঞানের অভাব। সত্য বোদলেয়ার পো-র রচনায় অংশত এমন কিছু পড়েছিলেন যা তাতে নেই ; কিন্তু তার জন্য দায়ী কি ইংরেজি ভাষায় তাঁর অনভিজ্ঞতা, না কি তাঁর স্পর্শময় কবি-মন, যা অন্য এক সবর্ণ কবিকে নিজের মধ্যে শোষণ ক'রে নিতে উৎসুক ? ভাষা এক হ'লেও, একজন কবি অন্য এক কবিকে দিয়ে নিজের কথাই বলিয়ে নিতে চান, ভাবনার কোনো স্তরে মিল দেখলে—বৈসাদৃশ্যগুলি ভুলে গিয়ে—তাঁকে কল্পনা ক'রে নেন নিজেরই বিকল্প ব'লে। আর পো-র বিষয়ে তা-ই করেছিলেন বোদলেয়ার। পো-র মধ্যে তিনি দেখেছিলেন 'সেই আধুনিক কবিকে, যিনি সর্বমানবের হ'য়ে দুঃখ পান' ; অর্থাৎ, পো-র মধ্যে নিজেকেই দেখেছিলেন। স্মর্তব্য তাঁর মনে প্রথম প্রবল নাড়া দিয়েছিলো অ্যালান পো-র দুঃখময় জীবন, আর তিনি অনুবাদ করেছিলেন প্রধানত পো-র গল্পকাহিনী, যার রহস্যময় ইন্দ্রিয়বিলাসে বোদলেয়ারের একাত্মবোধ অনিবার্য ছিলো। কবি হিশেবে দু-জনের মধ্যে তুলনার প্রস্তাব হাস্যকর ; অনর্থক, বোদলেয়ারের কবিতায় পো-র 'প্রভাব' সন্ধান করা*, কেননা পো-র

* প্রসঙ্গত উল্লেখ না-ক'রে পারছি না যে অ্যালান পো-র কবিতা থেকে প্রত্যক্ষভাবে আহরণ করেছেন একজন আধুনিক বাঙালি কবি : 'বনলতা সেন' ও 'Helen, thy beauty is to me',

সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই তিনি অধিকাংশ 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' রচনা শেষ করেছিলেন। 'কবিতার মূলসূত্র' প্রবন্ধে পো দু-একটি অভিনব ও আমাদের পক্ষে আদরণীয় কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাতেও এমন কিছু নেই যা বোদলেয়ার স্বাধীনভাবে নিজেই আবিষ্কার করেননি। কবিতা দীর্ঘ হ'লে যে আর কবিতা থাকে না— যে-কথা কোলরিজও প্রকারান্তরে বলেছিলেন— তা বোঝার জন্য পো-পঠনের প্রয়োজন ছিলো না তাঁর; 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এ সনেটের সংখ্যাই তার প্রমাণ দিচ্ছে।

কাব্যকলায় বোদলেয়ারের মহৎ কীর্তি এই যে ক্লাসিক ও রোমান্টিকের চিরাচরিত দ্বৈতকে তিনি লুপ্ত ক'রে দেন। প্রথম কবি তিনি, যাঁকে প'ড়ে আমরা উপলব্ধি করি যে ক্লাসিক ও রোমান্টি.কর ধারণা দুটি অমোঘভাবে পরস্পরবিরোধী নয়, বরং পরস্পরের জন্য তৃষিত, এবং একই রচনার মধ্যে দুই ধারার সংশ্লেষ ঘটলে তবেই কবিতার তীব্রতম মুহূর্তটিকে পাওয়া যায়। ছন্দোবন্ধের দার্ঢ্য, মিলের বিস্ময় ও পর্যাপ্তি, নিয়মনিষ্ঠ সনেটের প্রতি অমর আসক্তি তাঁর— এই সবই নির্ভুলভাবে ক্লাসিক লক্ষণ, কিন্তু এই কঠিন রূপকল্পের মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন রোমান্টিকতার আত্মা— এক দ্বন্দ্বপীড়িত আত্মভেদী চৈতন্য। আছেন রোমান্টিক ও ক্লাসিক গ্যেটে, রোমান্টিক ও ক্লাসিক রবীন্দ্রনাথ; দুয়ের পার্থক্য— অন্তত অস্পষ্টভাবে— আমরা অনুভব করতে পারি; এঁদের প্রত্যেক রচনায় সম্পূর্ণভাবে কবিদের পাই না। কিন্তু বোদলেয়ারের প্রায় প্রতিটি কবিতা— এবং অনেক গদ্যরচনাও— তাঁর পূর্ণ সত্তাকে ধারণ ক'রে আছে, আর সেইজন্যই তারা এমন প্রাণতপ্ত ও স্পন্দনময়; যিনি প্রথম বার 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' পড়ছেন তিনি প্রায় যে-কোনো পৃষ্ঠা খুলেই উত্তীর্ণ হবেন এক অজ্ঞাতপূর্ব, রোমাঞ্চকর যাত্রাপথে। 'আমি বেরিয়েছি অসীমের সন্ধানে— একা আমি, গুরু নেই, নেই কাণ্ডারী বা উপদেষ্টা, পাল পর্যন্ত নেই আমার তরীতে'— এই হ'লো রোমান্টিকতার মর্মকথা; কিন্তু এর উচ্চারণ 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এ যেমন শুদ্ধ, সংহত ও নির্ভীক, পূর্ববর্তী চিহ্নিত রোমান্টিকদের কারো কাব্যেই সে-রকম নয়।

এ-দুটি কবিতার সাদৃশ্য স্বয়ংপ্রকাশ। 'চুল', 'মুখ', 'সমুদ্র' ও 'ভ্রাম্যমাণ', এ-সবই আক্ষরিক অর্থে অ্যালান পো-র, কিন্তু যেমন 'হ'য় চিন' কবিতায়, তেমনি এ-ক্ষেত্রেও জীবনানন্দ তাঁর উত্তমর্ণকে বহুদূরে অতিক্রম ক'রে গেছেন। জীবনানন্দর প্রথম জিৎ তাঁর নায়িকার স্থানীয়তা ও সমকালীনতায় (ধ্রুপদী সৌন্দর্য পৌরাণিক হেলেনে অপ্রত্যাশিত নয়), এবং দ্বিতীয় ও আরো বড়ো জিৎ উভয় স্তবকের শেষ পঙক্তি দুটির আবেগময় আন্দোলনে, যার তুলনায় পো-র শেষ স্তবক বর্ণলিপ্ত পুত্তলির মতো নিষ্প্রাণ।

অথচ, নানা দিক থেকে, রোমান্টিকদের সঙ্গে দুস্তর তাঁর ব্যবধান। রোমান্টিকেরা ভালোবেসেছেন গ্রাম ও গ্রাম্যতাকে; তাঁর ছন্দে প্রথম ধরা পড়লো, সব ক্লেদ ও সন্তাপ নিয়ে, আধুনিক নগরজীবনের চঞ্চলতা। প্রকৃতির, নগ্নতার, স্বাভাবিকের পূজক ছিলেন রোমান্টিকেরা, আর বোদলেয়ার বন্দনা করেছেন প্রসাধনের, অলংকারের, কৃত্রিমের, অর্থাৎ শিল্পের, অর্থাৎ চেতনার—তাঁর বিখ্যাত ড্যাণ্ডিজম-এর অর্থই এই। তরুণ রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলেন, 'পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ', সেখানে তরুণ বোদলেয়ারের নায়ক, বহুবাঞ্ছিতা প্রণয়িনীকে প্রথম বার বিবসনা দেখে, সরোষে প্রতিবাদ করে। রোমান্টিকেরা স্বাভাবিককেই সুন্দর ব'লে— এমনকি ভালো ব'লে— জেনেছেন, কিন্তু রোদলেয়ারের কাছে তা-ই শুধু শ্রদ্ধেয়, যা রচিত, চৈতন্যের দ্বারা শোধিত, চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা প্রাপণীয়। যে-কামরূপ নারীকে ভিক্তর উগো মহিমান্বিত করেছেন 'স্বর্গীয় ভাস্করের আঙুলে গড়া আদর্শ কর্দম' ব'লে, তাকে বোদলেয়ার বলেছেন 'প্রোজ্জ্বল ক্লেদ', 'স্বা ভা বি ক ব'লেই ঘৃণ্য'। 'নারী চায় ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, যৌন কামনার তৃপ্তি— অতএব সে ড্যাণ্ডির ঠিক বিপরীত'— তাঁর এই বাক্যটি আঠারো-শতকী যুক্তিবাদের যেমন বিরোধী, তাঁর অগ্রজ রোমান্টিকদেরও তেমনি প্রতিকূল। দুই যুগেরই উপাস্য ছিলো প্রকৃতি; কিন্তু যুক্তিবাদীরা প্রকৃতি বলতে বুঝতেন স্বভাবী ও সংগতকে, আর রোমান্টিকেরা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তকে। আর উদ্ধৃত উক্তিটির অর্থ এই যে মানুষের মধ্যে সেই অংশই তার মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়, যা স্বভাবের বিরোধী। যে-ভাষা অধিকাংশ মানুষের পক্ষে সংবাদ-জ্ঞাপনের নির্বিশেষ বাহনমাত্র, কেউ-কেউ, স্বভাবের বিরোধিতা ক'রে, তাকে রূপান্তরিত করেন ছন্দোবদ্ধ ও চরিত্রবান কবিতায়। যে-সব প্রাকৃত ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন অধিকাংশ মানুষের নিত্যকর্ম, কেউ-কেউ, কখনো-কখনো, সেগুলিকে অতিক্রম ক'রে উপবাসী থাকেন বা ব্রহ্মচারী হন। শুধু কবিতা বা সন্ন্যাসই নয়; প্রকৃত পাপও চৈতন্যের ফল; তাই পাপকে বোদলেয়ার— প্রশ্রয় দেননি, কিন্তু শ্রদ্ধা করেছেন; তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো, হুইটম্যানের মতো, পাপবোধহীন পশুদের প্রতি অনুরাগ। তাঁর কাব্যে নারী যেমন জৈবতার, পশু তেমনি মনোহীনতার প্রতীক; একমাত্র যে-পশুকে তিনি ভালোবেসেছিলেন সে গৃহপালিত মার্জার, যার দৃষ্টির বহুলাঙ্গ দ্যুতিকে প্রায় একটি শিল্পকর্ম ব'লে ভুল হ'তে পারে। রোমান্টিক গ্যেটের সব-পেয়েছির দেশ সেখানে, যেখানে নীলিমার নিচে, কালো পল্লবের ফাঁকে-ফাঁকে, জ্বলজ্বল

করে সোনালি রঙের কমলালেবু; রবীন্দ্রনাথের, যেখানে প্রণয়ীযুগল আধো-আলোয় ঘুরে বেড়ায় আর 'পাখি তাদের শোনায় গীতি, নদী শোনায় গাথা'; কিন্তু বোদলেয়ার তাঁর প্রিয়াকে নিয়ে যেতে চান এক দর্পণশোভিত সুপ্রসাধিত ওলন্দাজ অন্তঃপুরে, যার জানলা দিয়ে দেখা যাবে— প্রকৃতির দান তরুপল্লব নয়, বুদ্ধির সৃষ্টি অর্ণবপোত। ওঅর্ডস্বার্থ ভজনা করেছেন 'মূক ও নিশ্চেতন বস্তু'কে, রবীন্দ্রনাথ গাছ হ'য়ে জন্মাতে চেয়েছেন; আর বোদলেয়ার ইচ্ছা করেছেন সব উদ্ভিদের উচ্ছেদ, শিল্পিত ধাতু ও প্রস্তরময় এক প্যারিস। একটি পাখির পালক বা ফুলের পাপড়িকে রোমান্টিকেরা যেমন ক'রে বর্ণনা করেন, তেমনি সপ্রেম মনোযোগ বোদলেয়ার অর্পণ করেন আসবাবপত্রে ও নারীর বেশবাসে; পর্দার বর্ণ ও ঘনতা, রেশম ও সাটিনের স্পর্শ, ধাতুর দীপ্তি, রত্নের রশ্মিময়তা— প্রথম তাঁর কাব্যেই মানুষের আত্মা এ-সবের মধ্যে প্রবেশ করেছিলো। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের ধারণাকে মূর্ত করেছিলেন উর্বশীতে, যার নাচের ছন্দে পুরুষের রক্ত 'আত্মহারা' হ'য়ে সাড়া দেয়, আর বোদলেয়ারের সৌন্দর্য এক পাষাণপ্রতিমা, স্ফিংকসের মতো স্থির ও দুর্বোধ, যে বলে: 'পাছে রেখা ভ্রস্ত হয়, ঘৃণা করি সব চঞ্চলতা', আর যাকে দেখে কবিরা উদ্বুদ্ধ হন, রতিবিলাসে নয়, 'পাঠে ও কঠিন চিন্তায়'। 'ইন্দ্রিয়ে যখন আগুন ধরে তখন সৌন্দর্যকে বাহুবন্ধে বেঁধে ভগবানকেই আলিঙ্গন করি আমরা'— এই হ'লো যৌন বৃত্তি বিষয়ে উগোর ধারণা; কিন্তু বোদলেয়ার বলেন যে 'পাপকর্মের চৈতন্যই মহত্তম রতিসুখসার'। আর সর্বোপরি, রোমান্টিকেরা যেখানে কবিকে ভেবেছিলেন আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম স্থপতি ব'লে, সেখানে বোদলেয়ার কবিকে বললেন পরম ড্যাণ্ডি, যে দর্পণের সামনে দিনযাপন করে ও নিদ্রা যায়। দর্পণের সামনে: তার মানে, আত্মদর্শন ও আত্মপরীক্ষাই কবি-কৃত্য; কবির চৈতন্য এমন ক্ষমাহীন যে ঘুমিয়েও তিনি আত্মবিস্মৃত হন না। যে-মধ্য-উনিশ শতকে ইংলণ্ডে উপযোগবাদের অভ্যুদয় হ'লো, সেই সময়ে বোদলেয়ার ঘোষণা করেন যে কবি কোনো 'কাজে লাগেন' না, যে বায়রনি বিদ্রোহের দিন গত হয়েছে, পূর্ণ হয়েছে সমাজের সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ; প্রতিবাদ করলেও প্রতিবাদের পাত্রকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়, অতএব একমাত্র যা সহনীয় ও সম্ভব তা উপেক্ষা ও স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসন। 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' ও 'প্যারিস-স্প্লীন' ভ'রে তাদেরই দেখা পাই আমরা, যারা নির্বাসিত ও নির্যাতিত: বন্দী পশু, বৃদ্ধ ভাঁড়, উন্মাদ নারী, ভিনদেশী বেশ্যা, রোগী, মাতাল ও নাস্তিমানেরা—

আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে এদের সকলের সঙ্গেই কবির একাত্মবোধ নিবিড়, এবং এরা, এদের বাস্তব আয়তন অক্ষুণ্ণ রেখেও, 'কবি' নামক ধারণাটিরই চিত্রকল্পের কাজ করছে। কবির বিষয়ে যে-বিশেষণটি বোদলেয়ার বার-বার ব্যবহার করছেন তা 'পুণ্যবান' (pieux); কিন্তু তাঁর পুণ্য তাঁর কর্মে নয়, চৈতন্যে ; সেই বিবেকময় চৈতন্যময় পুরুষ তিনি, যিনি, ডস্টয়েভস্কির প্রিন্স মিশকিনের মতো, জাগতিক ব্যাপারে একেবারেই অক্ষম, অব্যবহিত পারি-পার্শ্বিকেও তিলতম পরিবর্তন যিনি ঘটাতে পারেন না, অথচ নিজের মধ্যে নিখিলবেদনাকে ধারণ করেন। তাঁর কাজ জগৎকে বদলানো নয়, জগৎকে অনুভব করা। এবং সেই জ্ঞানের ও অনুভূতির শক্তিতেই তাঁর মহিমা।*

শুধু রোমান্টিক ও ক্লাসিকের ধারণাকে নয়, আরো কোনো-কোনো বিপরীতকে তিনি মিলিয়েছিলেন : কঠিন ছন্দোবন্ধের সঙ্গে ভাষার নির্ভার মৌখিকতা, এবং মৌখিকতার সঙ্গে অভিজাত শুদ্ধতাবোধ—যাকে লাফর্গ আখ্যাত করেন একাধারে 'ইয়াঙ্কি' ও 'হিন্দু' ব'লে। মিল ও স্তবকবিন্যাসের নৈপুণ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ রোমান্টিকদের সমকক্ষ ; কিন্তু আপন ক্ষমতায় মোহিত হ'য়ে স্তবকসংখ্যা তিনি এমনভাবে বাড়িয়ে চলেন না যাতে রচনার আয়তন বৃদ্ধি পেলেও, কবিতার ক্ষতি হয়। তাঁর রচনায়, উগো বা রবীন্দ্রনাথের তুলনায়, রূপকরণের বৈচিত্র্য কম, আর এতেও বোঝা যায় তাঁর চরিত্র কত নির্লোভ ছিলো, কত বিনয়ী, রোমান্টিক অহমিকা থেকে কত সুদূর। নিরন্তর তাঁর ধ্যানের বিষয় তাঁর কবিতাই—কবিতা-রচনায় উপলক্ষের মতো যা কাজ করে, সেই জীবনীগত ঘটনা নয়—তাই আবেগের নিবিড়তম মুহূর্তেও উচ্ছ্বাসের হাতে ধরা দেন না তিনি, কবির উপরে কবিতাকে স্থাপন করেন। 'সুন্দর জাহাজ' কবিতাটি, যাতে একটি তরুণী বা তরুণীর গতিভঙ্গি যেন ইন্দ্রিয়ের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, তার মনোমুগ্ধকর দোলাচল, মাত্র দশ স্তবকে সীমিত হ'য়ে, এবং বহু একতাল সনেটের পরে এসে, আমাদের মনের মধ্যে এক অপূর্ব আন্দোলন জাগিয়ে তোলে। যদি 'ফ্লর দ্যু মাল'-এ সনেটের সংখ্যা কম হ'তো, বা স্তবকের বৈচিত্র্য আরো বেশি, তাহ'লে ঠিক এই অভিঘাতটি ঘটতো না ; তাহ'লে হয়তো, দক্ষতায় বিস্মিত হ'য়ে কবিতাকে ভালোবাসতে

* এই অনুচ্ছেদে আমি পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও নাম করেছি, কেননা যদিও তিনি বোদলেয়ারের চল্লিশ বছর পরে জন্মেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক স্থান ওঅর্ডস্বর্থ, উগো, শেলি প্রভৃতি য়োরোপীয় প্রথম-রোমান্টিকদেরই সঙ্গে।

আমরা ভুলে যেতাম। 'ফ্লর দ্য মাল'-এর কোনো-কোনো লক্ষণ স্পষ্টত আঠারো-শতকী: আবাহন, সম্বোধন, অমূর্তকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা—এগুলি বোদলেয়ার বর্জন করেননি (কবিতার পক্ষে একেবারে বর্জন করা সম্ভবও নয়); তবু লক্ষণীয় যে 'O wild west wind' বা 'হে নূতন, এসো তুমি'-র মতো উচ্চস্বর তাঁর কাব্যে একবারও ধ্বনিত হয় না; তাঁর কণ্ঠস্বর নিরন্তর মৃদু, বাচন-ভঙ্গি স্বগতোক্তির; তিনি যখন বলেন, 'দুঃখ, এসো, হাত রাখো হাতে' তা একটি অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায়। 'মতো'-বিদ্বেষী হ'য়ে কবিতায় নূতনত্ব আনতে চাননি তিনি—তাঁর কাব্যে ঐ শব্দের ব্যবহার প্রচুর—উপমাকে অনিবার্য জেনে তিনি উপমাকে নতুন জন্ম দিয়েছেন। কী অর্থে নতুন, তার উপলব্ধির জন্য শুধু প্রয়োজন আমাদের পূর্বপরিচিত প্রিয় কবিতাগুচ্ছকে মুহূর্তের জন্য স্মরণ করা। শেলির কবিতায় হেমন্ত ঋতু মূর্ত হ'য়ে ওঠে 'প্রেতের মতো পলায়মান রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ রাশি-রাশি ঝরা পাতা'র চিত্রকল্পে; আর বোদলেয়ার, আঁটি-বাঁধা জ্বালানি কাঠ নামাবার শব্দে, শুনতে পান ফাঁসিমঞ্চ নির্মাণের ধ্বনি, কবরে পেরেক ঠোকার শব্দ, কার প্রস্থানের অলক্ষ্য পদপাত। যাকে রবীন্দ্রনাথ আবাহন করেন 'বন্ধু' ও 'জ্যোতির কনকপদ্ম' ব'লে, সেই সূর্য, বোদলেয়ারের কবিতায়, 'উদার রাজার মতো, একা, বিনা পাত্রপারিষদে/আসে সব হাসপাতালে, আর সব বিশাল প্রাসাদে।' প্রভেদ শুধু এখানে নয় যে বোদলেয়ারের ভাষা ও ভঙ্গি অনেক বেশি ঘরোয়া, এবং তিনি অনুকম্পায় বিশদতর; গভীরতর প্রভেদ এই যে রোমান্টিকদের উপমা বর্ণনাধর্মী, আর বোদলেয়ারের উপমা উপমেয়র বিষয়ে যতটা বলে কবির আত্মার বিষয়ে ততোধিক। 'সাবিত্রী' প'ড়ে ধারণা হয়, কোনো-এক কবিকে কাব্যরচনায় প্রেরণা জোগানোই সূর্যের কাজ; কিন্তু বোদলেয়ারের সূর্য খঞ্জকেও 'শিশুর আহ্লাদে' মাতিয়ে তোলে, এবং 'কবির মতো' হীন বস্তুকে মূল্য দেয়, অথচ খড়খড়ির আড়ালে কোনো-এক 'গোপন কাম'কে ব্যাহত করতে পারে না। কবিতাটির বিশেষ আকর্ষণ বিভিন্ন ও ভিন্ন-ধর্মী তথ্যের সমাবেশে, এবং তথ্যগুলিকে পরস্পরে প্রবিষ্ট করার ক্ষমতায়; আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে ঐ কবি, রাজা, খঞ্জেরা, ও গুপ্ত লম্পট—এদের সকলের মধ্যে বোদলেয়ারই বিরাজমান। চারটি 'বিতৃষ্ণা'য় ও একাধিক 'প্যারিস-চিত্রে' একই প্রক্রিয়া লক্ষ করি আমরা; কবিতার লেখক ও তথ্যের মধ্যে যে-ব্যবধান শেলি অথবা রবীন্দ্রনাথে অলঙ্ঘ্য, সেটি সরিয়ে দেবার ফলে বোদলেয়ারের উপমাসমূহে আত্মোদ্ঘাটনের গুণ বর্তেছে, যেন আত্মার কোনো

গোপন স্থলে হঠাৎ আলো ফেলা হ'লো ; তাঁর উপমাও এক প্রকার স্বীকারোক্তি। উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করি 'সুন্দর জাহাজ' কবিতার সেই আশ্চর্য স্তবক :

মহান জঙ্ঘার আঘাতে বসনের আলোড়ন
জাগায় যাতনার আঁধার বাসনার আবেদন।
যেন রে ডাকিনীরা দু-জনে
গভীর খলে নাড়ে কালিমাঘন এক পাঁচনে।

চলার সময়, বসনের আচ্ছাদনে, পদযুগ যে-ভাবে আন্দোলিত হয়, তার ছবিটি অতীকৃত সিনেমার মতো স্পষ্ট, অথচ উপমাটির মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ পেয়েছে তা কবির এই ধারণা যে যৌন কামনা যুগপৎ ভীষণ ও রমণীয়, মদির ও মারাত্মক। তেমনি, 'কবরের মতো গভীর' বাসরশয্যা, 'দরগলমান গ্লোসিয়ারে'র মতো চুম্বনজনিত নিষ্ঠীবন, বা 'কামুক ঝর্নার মতো' কঙ্কালের 'লেস-বোনা গলবন্ধ'। রতি ও ধ্বংসের একতা বোদলেয়ারের মনে নিত্যজাগ্রত ; মার্লো, রেনেসাঁসের সরল সন্তান, এক অমর পঙক্তিতে মানবের এক শাশ্বত আকৃতিকে বিধৃত করেন ; আর বোদলেয়ার, উনিশ শতকের নষ্ট, পরিশীলিত ও সজ্ঞান প্রতিভূ, যাতনাকে বর্জন ক'রে কামনাকে ভাবতে পারেন না। তাঁর কবিতায়, যেন 'make me immortal with a kiss'-এর প্রত্যুত্তরে, গরল ও ছুরিকা বলে :

পারিস তার রাজ্য থেকে পালাতে
আমরা যদি কর্মে করি ত্বরা—
কিন্তু তোরই চুম্বনের জ্বালাতে
বাঁচবে পুন তোর পিশাচীর মড়া!

যাকে বৈচিত্র্য বলে, বিস্তার বলে, এমনকি সাধারণত মৌলিকতা বলে, তার কিছুই বোদলেয়ারে নেই। ওঅর্ডস্বার্থের মতো, প্রায় পূর্ণ এক শতক পরে, তিনি নতুন একটি কাব্যরীতির প্রবর্তন করেননি ; হুইটম্যানের মতো, কবিতার প্রকরণে ও বিষয়বস্তুতে সঞ্চার করেননি অপূর্বতা ; গোতিয়ে বা মালার্মের মতো কোনো গোষ্ঠীর গুরু নন তিনি ; পাউণ্ড অথবা এলিয়টের মতো, কোনো 'আন্দোলনে'র নায়কও নন। এই মহত্তম ফরাশি কবিকে বিনম্রতম কবিও বলা যায় ; গোতিয়ে ও ভিক্তর উগোকে ভক্তি ক'রে পরিতৃপ্ত তিনি, স্যাঁৎ-ব্যভের তুষ্টিসাধনে অনবরত সচেষ্ট, এবং পূর্বসূরিদের অনুসরণে পরিশ্রমী। অথচ তাঁর

কাব্যের উপকরণ ; মিল, উপমা, চিত্রকল্প, এমনকি শব্দের সংখ্যাও পরিমিত। 'নির্বেদ', 'শূন্যতা', 'গহ্বর' ; 'সমুদ্র', 'জাহাজ', 'মাস্তুল' ; 'শব', 'কফিন', 'কবর', 'কঙ্কাল' ; 'তিক্ত', 'মধুর', 'কৃষ্ণ', 'শীতল', 'সুগন্ধি' ; 'ডাইনি', 'পিশাচী', 'স্ফিংক্স' ; 'গভীর', 'বিলাসী', 'অন্ধকার', 'উজ্জ্বল', 'রহস্যময়'—এ-সব শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার লক্ষ না-করা অসম্ভব। কোনো পঙক্তির শেষে 'mer' (সমুদ্র) বা 'amer' (তিক্ত) থাকলে আমরা প্রায় ধ'রে নিতে পারি যে অন্যটি আসন্ন ; 'te′ne`bre' (অন্ধকার) ও 'fune`bre'-এর (funereal, বাংলায় শোকাবহ বলা যায়) সহবাসেও অভ্যস্ত হ'তে হয় ; te′-প্রত্যয়ান্ত যে-কোনো বিশেষ্যপদের কাছাকাছি 'volupte′'-র (ইন্দ্রিয়বিলাস) ব্যবহারও, তাঁর রচনার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হ'লে, আর আশাতীত থাকে না। আর তাঁর কাব্যের বিষয় হিশেবে যা-কিছু উল্লেখ্য, তার একটি বড়ো অংশ—বিষাদ, বিতৃষ্ণা ও নির্বেদ, কামোন্মাদ ও কামদ্রোহ, ইন্দ্রিয়বিলাস ও 'শয়তানপন্থা', দরিদ্র ও পতিতের জীবন, মৃত্যু ও দূরপ্রয়াণ—এই সবই, উত্তরাধিকারসূত্রে, উগো, গোতিয়ে, সাঁ্যাৎ-ব্যভের কাছে তিনি পেয়েছিলেন, পেত্রুস বরেল ও ফিলতে ও'নেডির মতো ঐকাহিক কবিদের কাছেও। তিনি, চিত্রকর কঁস্তাতাঁ গী-র বন্ধু ও ভক্ত, যিনি সব ফ্যাশানকেই 'মনোমুগ্ধকর' বলেছিলেন, দেখেছিলেন প্রসাধনকলায় 'মানবাত্মার মহিমার একটি লক্ষণ', সাহিত্যিক ফ্যাশানকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন তিনি : 'ড্যাণ্ডি', 'ছোটো গোষ্ঠী', 'তরুণ ফ্রান্স'— তাঁর বালকবয়সে উচ্ছ্রিত এই সব প্যারিসীয় চলোর্মির বেগেই তাঁর প্রথম আত্মোপলব্ধি ; মনে হয় এ-সব গোষ্ঠী ও কবিদের পুঁজিপাটা সব তিনি তুলে নিয়েছিলেন— তাঁদের ইংরেজিয়ানা, বিতৃষ্ণাবোধ, মরণোল্লাস, কিছুই বাদ দেননি। হয়তো আরো বেশি বলা যায় : সমগ্র রোমান্টিকতাকেই তিনি আত্মসাৎ ক'রে নেন— তার মধ্যে যা দাগি, ময়লা বা রং-চটা, সব সুদ্ধ, সেই বহুব্যবহৃত স্তূপ থেকেই ছেঁকে তোলেন যে-কবিতা তাঁর ব্যক্তিগত এবং ভবিষ্যতের। তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত হ'লে বহুনিন্দিত 'ক্লিশে' সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কিছুটা বদলে যায় ; আমরা দেখতে পাই যে 'ক্লিশে'কে সভয়ে পরিহার ক'রে চলেন ক্ষুদ্র কবিরা, আর প্রতিভাবানেরা তাকে হাত পেতে নিয়ে রূপান্তরিত করেন। রোমান্টিকতার সূত্রগুলিকে কেমন ক'রে তিনি রূপান্তরিত করলেন, আর তাঁর নিজস্ব সংযোজনাই বা কতটুকু, প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশে তা-ই আমার আলোচ্য হবে।

আমি বলতে চাচ্ছি যে ক্লাসিক রীতি সত্ত্বেও— অথবা সেইজন্যেই— বোদলেয়ারই পরম রোমান্টিক, তাঁর কবিতা রোমান্টিকতার—'কামস্কাটকা' নয়— কৈলাস; রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতার মধ্যস্থলে তিনি অনন্যভাবে অবস্থিত। তাঁর রচনায় রোমান্টিক উচ্ছ্বাস যেমন নেই, তেমনি নেই আধুনিক দুর্বোধ্যতা; তাঁর প্রতিটি রচনা প্রাঞ্জলতার দৃষ্টান্তস্থল, অথচ ঘন ও গভীর, আকারে ক্ষুদ্র হ'য়েও ইঙ্গিতে দূরপ্রসারী। কোনো দৈব বরপ্রাপ্ত রাজপুত্রের মতো, তিনি যেন সহজেই কবিতাকে সব শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন: গ্যেটের দার্শনিকতা, হাইনের কৌতুক, গোতিয়ে-র চাপল্য, উগোর গুরুমশাইগিরি— এই সব সংকট কাটিয়ে তিনি কবিতাকে ক'রে তুলেছেন যুগপৎ নির্ভার ও ভাবনামগ্ন, গম্ভীর, সহৃদয় ও সুপ্রবেশ্য। এবং তাঁর উত্তরসাধকদের মধ্যেও, একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এই গুণগুলির সমন্বয় আমরা পাই না; তাঁর তুলনায় ভেরলেন কোমল, র‍্যাঁবো উদ্বেল, এবং মালার্মে নিস্তাপ। কবিতায় সাড়া দিতে পারলেই তাঁর কবিতায় সাড়া দেয়া যায়; কিন্তু মালার্মে ভাষ্যনির্ভর, এলিয়ট পাণ্ডিত্যের মুখাপেক্ষী, এমনকি ইয়েটস অথবা রিলকেরও কোনো-কোনো শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁদের জীবনী অথবা 'দর্শন' না-জানা পর্যন্ত, চাবি লুকিয়ে রাখে। তর্কাতীত এই কবিদের গৌরব, এবং এও স্বীকার্য যে দুর্বোধ্যতা, বিশেষ এক অর্থে, আধুনিক কবিতার মূল্য বাড়িয়েছে; কিন্তু যে-দুর্বোধ্যতা শুধুমাত্র জ্ঞানার্জনের দ্বারা অতিক্রম্য, তাকে, শেষ পর্যন্ত, কবিতার একটি দুর্বলতা ব'লে আমরা মানতে বাধ্য। তাঁর কবিতার উঁচু মিনারটিকে বোদলেয়ার সোপানহীন ক'রে গড়েননি; তিনি বর্জন করেননি কাহিনীর সূত্র, চিন্তার পারম্পর্য, ব্যাকরণের শৃঙ্খলা: আমাদের মনে রাখতে হবে যে তাঁর কোনো-কোনো গদ্যকবিতাকে প্রায় ছোটোগল্প বলা যায়, এবং তাঁর প্রাবন্ধিক গদ্য প্রসাদগুণে দীপ্যমান। এই গুণটি, আমরা জানি, প্রতিভার অপরিহার্য লক্ষণ নয়, একই লেখকের গদ্যে ও কবিতায় তা সমানভাবে বিরাজ করে না, কিন্তু বোদলেয়ারের কবিতা— এলিয়ট থেকে কিছুটা ভিন্ন অর্থে— তাঁর গদ্যের মতোই সুলিখিত। অর্থাৎ, তাঁর কাব্যে হেঁয়ালি নেই, নেই অতিসূক্ষ্ম সাহিত্যিক বা আত্মজৈবনিক উল্লেখ; তাতে গভীরতরভাবে প্রবেশ করার জন্য যা প্রয়োজন তা মল্লিনাথগণের মন্তব্য নয়, তাঁরই সঙ্গে দীর্ঘতর, নিবিড়তর সহবাস; —তাঁর প্রতিটি কবিতা স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বতোভাসিত। এবং সেইজন্যেই তাঁর আবেদন আজ বিশ্বব্যাপী।

'রোমান্টিকতা বিশ্বসাহিত্যে এক বিরাট ঘটনা'—আমার এই উক্তির সমর্থনে এবার দু-একটি কথা বলতে চাই। ভাবতে অবাক লাগে যে শিল্পকলা, বহু সৃষ্টি-শীল শতাব্দী ধ'রে, এমন কয়েকটি অভিজ্ঞতাকে অস্পৃষ্ট রেখে গেছে, যা মহত্তম অর্থে মানবিক। গ্রীক শিল্পে মৃদুহাস্য নেই; মানব-মুখে সভ্যতার এই আশ্চর্য স্বাক্ষরটি, যাতে বহু বিরোধী ভাব যুগপৎ বা বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত হ'য়ে থাকে, তা খ্রিষ্টপূর্ব দেহপূজকদের দৃষ্টিতে ধরা দেয়নি। আর যদিও, রীমস ক্যাথিড্রলের 'সহাস্য দেবদূতে'র বহু পূর্বেই বৌদ্ধ ও হিন্দু শিল্পে মৃদুহাসি উদ্ভাসিত হয়েছিলো, অন্য একটি ভাব, যা মৃদুহাসির সহচর ও পরিপূরক, মানবজীবনের বড়ো একটি তথ্য, হিন্দু, গ্রীক, চৈনিক ও খ্রিষ্টান শিল্পের পূর্ণোত্থম সত্ত্বেও, যুগের পর যুগ প্রচ্ছন্ন থেকে গিয়েছে। সেই ভাবটির নাম বিষাদ। বিষাদ, যা য়োরোপীয় রেনাসাঁসের একটি আবিষ্কার, যার প্রথম উদাহরণ পেত্রার্কার কবিতায়, তাকে, মানুষের এক জন্মান্তরক্ষণে, দা ভিঞ্চি হাসির মধ্যে দ্রব ক'রে দিলেন; কোনারকের বাদিনী-মূর্তির হাস্য যেমন আনন্দময়, তেমনি মোনা লিসার হাসি বিষাদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। এমনকি বতিচেল্লির ভেনাসের মুখেও আমরা নির্ভুলভাবে বিষাদের আভাস দেখতে পাই, যার জন্যে মনে হয় যে প্রতীচীর আনুপূর্বিক শিল্পধারায়, প্রেমের দেবী এই প্রথম একটি আত্মা লাভ করলেন। রেমব্রাণ্টের সারি-সারি প্রতিকৃতি, সারি-সারি বিষণ্ণ চোখ খুলে রেখে, আমাদের ভুলতে দেয় না মানুষ কত রহস্যময়, আর শেক্সপিয়র, সাহিত্যে রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ সন্তান, তাঁর বিশাল অর্কেস্ট্রার মধ্যে একটি মৃদু নিঃসঙ্গ বংশীধ্বনি মাঝে-মাঝে শুনতে পাই আমরা— যা ব'লে যায় মানুষের মনে এমন কোনো-কোনো সুর আছে যা কার্যকারণের অতীত। যে-বিষাদ, বেন জনসনের নাটকে, বাত পিত্ত শ্লেষ্মার মতো এক ধাতু বা 'humour' মাত্র, যান্ত্রিক ও বিবর্তনহীন এক উপসর্গ, তাকে শেক্সপিয়র দিলেন প্রাণ, গতি ও আধ্যাত্মিক অর্থ, প্রতিষ্ঠা করলেন মনুষ্যত্বের একটি কুললক্ষণ ব'লে। হ্যামলেট, যাকে সাহিত্যে প্রথম আধুনিক মানুষ বলতে আমরা লুব্ধ হই, তার ব্যাপ্ত বিষাদের তবু একটা কারণ বা উপলক্ষ ছিলো; কিন্তু 'দি মার্চেণ্ট অব ভেনিস'-এর অ্যাণ্টনিও চরিত্র—নাটকের প্রারম্ভেই যে ঘোষণা করে, 'In sooth I know not why I am so sad'— তার বিষয়ে কী ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি? শেক্সপিয়রের আশ্চর্য এক সৃষ্টি এই অ্যাণ্টনিও, হয়তো আরো আশ্চর্য 'অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা' নাটকের এনোবার্বস। যে-ঘটনাচক্রে

অ্যাণ্টনিও প্রথম থেকে লিপ্ত, তাতে তার নিজের লভ্য বা অংশ বলতে কিছু নেই; য়োরোপীয় খ্রিষ্টান হ'য়েও, সে যেন বিশুদ্ধভাবে গীতায় উক্ত নিষ্কাম কর্ম ক'রে যাচ্ছে; যেমন সে অবিচলভাবে বন্ধুর জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে উদ্যত হ'লো, সেই বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর মিলনমোদিত পঞ্চমাঙ্কেও তেমনি অনাসক্ত সে; অন্যেরা যেখানে সুখী বা সন্তপ্ত হয়, শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করে, সেই রঙ্গমঞ্চে অ্যাণ্টনিও (নামকরণ অনুসারে যে নাটকের 'নায়ক') যেন অর্ধাচ্ছাদিত এক মূর্তি, তার পা যেন ভূমিস্পর্শ করে না, এক নেপথ্য থেকে আর-এক নেপথ্যে ভেসে যাবার সময়টুকুতে, তাকে বার-বার দেখেও, তার বিষয়ে আমরা কিছুই প্রায় জানতে পারি না: শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বুঝি না তার এই বীর্যনাশক বিষাদের উৎস কোথায়। আর এনোবার্বস যেন উপনিষদের সেই দ্বিতীয় পাখি, যে কর্ম করে না শুধু লক্ষ করে, চৈতন্যের প্রতিভূ সে; ঘটনাবহুল নাটকটির মধ্যে একমাত্র সে-ই কষ্ট পাচ্ছে নিজের অথবা প্রভুর কর্মফলে নয়, বিবেকের দংশনে; একমাত্র সে-ই নয় দাস অথবা রাজা, বীর অথবা আজ্ঞাবহ; আর সেইজন্যই কোনো পূর্বচিহ্নিত স্থান নেই ব'লে, তাকে সচেতনভাবে চেষ্টা করতে হয় 'কাহিনীর মধ্যে একটি স্থান অর্জনে'র জন্য। আমরা মনে-মনে বুঝি যে এই স্থানটুকু 'অর্জন' করা তার পক্ষে অসম্ভব— কেননা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পাপের মধ্যে কোনোটাকেই সে বেছে নিতে পারবে না; কিন্তু তবু, চতুর্থ অঙ্কের সেই অবিস্মরণীয় ক্ষুদ্র দৃশ্যটিতে— যা মনে হয় শেক্সপিয়র তাঁর কলমের এক আঁচড়ে শেষ ক'রে নায়কনায়িকার গ্রন্থিমোচনের দিকে ছুটেছিলেন, অথচ যার মধ্যে মানবাত্মার এক মর্মবেদনা প্রোথিত হ'য়ে আছে— সেই দৃশ্যে তার প্রবেশমাত্র আমরা বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে যাই, কেননা তখন, রোমক কূটনৈতিকের ছদ্মবেশ সরিয়ে ফেলে, সে রেনেসাঁসের প্রতিভূ হ'য়ে দেখা দেয়; 'O sovereign mistress of true melancholy', চাঁদের উদ্দেশে এই একটি পঙক্তি উচ্চারণ ক'রে, আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চার করে এমন এক গভীর অনুভূতি, নাটকের ঘটনাসংস্থানে যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সে-ক্ষণে এনোবার্বস কি পাগল হ'য়ে গিয়েছিলো, তার মৃত্যু কি স্বাভাবিক না আত্মহত্যা— এই সবই শেক্সপিয়র অস্পষ্ট রেখেছেন ব'লে আমাদের রহস্যবোধ আরো ঘনীভূত হয়; আমরা যেন অনুভব করি যে এই বিষাদ ও মৃত্যুর অর্থ শুধু এনোবার্বসের আত্মশুদ্ধি নয়, নাটকের মুখ্য পাত্রপাত্রীদের পাপের জন্যও প্রায়শ্চিত্ত।

শিল্পকলার পূর্ব-ইতিহাসে আমরা কিছুই খুঁজে পাবো না, যা এই সব

নিদর্শনের সঙ্গে তুলনীয়। প্রাচীন সাহিত্যে কষ্ট আছে, আর্তি আছে, মনস্তাপ আছে, কিন্তু বিষাদ নেই। ধ'রে নিতে হবে যে বিষাদ ভাবটি মানবচিত্তে আবহমান; কিন্তু সে-বিষয়ে চেতনার উন্মেষ ঘটে রেনেসাঁসের যুগে, আর পূর্ণ বিকাশ রোমান্টিকতায়। লা রশফুকো বলেছিলেন যে মানুষ যদি প্রেমের কথা এত না শুনতো তাহ'লে সে প্রেমে পড়তো না। যা সাহিত্যে নেই তা জীবনেও অনুভূত হয় না: রেনেসাঁস-শিল্পে বিষাদের উদ্ভাস দেখে, তবে মানুষ জানতে পারলো যে বিষণ্ণ হওয়া তার স্বভাবের একটি লক্ষণ। এবং এই জ্ঞানকে যাঁরা চরমে নিয়ে গেলেন, তার সব সম্ভাবনাকে উদ্ঘাটন ক'রে দেখালেন যাঁরা, তাঁরাই রোমান্টিকতার প্রবর্তক। রুসো, শাতোব্রিয়াঁ, 'হ্বের্টের'-এর কবি গ্যেটে, জর্মান 'বিশ্ব-বিষাদ,' বায়রনি জীবনক্লান্তি; অশ্রু, হতাশা, আত্মহত্যা; —এই সবের মধ্য দিয়ে অন্তত এই মহাসত্য প্রতিভাত হ'লো যে ভলতেয়ারি 'ক্ষেত্রকর্ষণ'ই মানবজীবনের শেষ কথা নয়। রোমান্টিক অনুভূতি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছলো যেখানে পুলকদেউলের মণিকোঠায় ঘোমটা-পরা বিষাদের দেবী বিরাজ করেন, আর বিষণ্ণতম সংগীতই মধুরতম হ'য়ে ওঠে।

> কী এসে যায়, থাকলে তোমার সুমতি ?
> হও রূপসী, বিষাদময়ী ! অশ্রুজল
> নতুন রূপে করুক তোমায় শ্রীমতী— ('বিষাদগীতিকা')
>
> চারু চোখ দুটি বিষণ্ণতায় ভরা
> প্রেয়সী, খুলো না, থাকো আরো কিছুখন ! ('ফোয়ারা')
>
> ও-বরতনুতে চুম্বনরাশি দিতাম ঢেলে,
> শীতল পা থেকে কালো চুল পর্যন্ত
> ছড়িয়ে গভীর সোহাগের মণিরত্ন,—
>
> বিনা চেষ্টায় যদি এক ফোঁটা অশ্রু ফেলে
> কোনো সন্ধ্যায় —নিষ্ঠুরতমা হে রূপবতী
> ম্লান ক'রে দিতে ঠাণ্ডা চোখের তীব্র জ্যোতি। ('সে-রাতে ছিলাম···')

বার-বার, বোদলেয়ারের কাব্যে, আমাদের পক্ষে এই সুপরিচিত ধারণাটি ধ্বনিত হয়েছে যে কোনো নির্বিষাদ সত্তা, শুধু যে সুন্দর হ'তে পারে না তা নয়, পূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় না। 'রূপসী' ও 'বিষাদময়ী,' প্রায় সমার্থক, এবং যে-নারী চুম্বন-

যোগ্য তার চোখ অশ্রুতে মলিন। 'সৌন্দর্য', একটি 'স্ফুলিঙ্গে' তিনি লিখেছিলেন, 'আনন্দ তার এক ইতরোচিত ভূষণ, কিন্তু বিষণ্নতা তার মহীয়সী পত্নী। যার সঙ্গে দুঃখের কোনো সম্বন্ধ নেই এমন কোনো সৌন্দর্য আমার ধারণাতীত।' প্রেমের পূর্ণতাও বিষাদসাপেক্ষ, কেননা, 'কখনো তাদের মিলনসুখ এত মধুর হয়নি, যেমন বিষাদে ও ক্ষমায় ভরা সেই রাত্রে—দুঃখে ও মনস্তাপে পরিপ্লুত সেই সুখ।' এবং এ-সব ধারণায় তিনি তাঁর অগ্রজ রোমান্টিকদের সধর্মী।

কিন্তু বোদলেয়ারের অন্বেষণ আরো দূরস্পর্শী, মানবস্বভাবের আরো গভীরে তিনি নেমেছিলেন। রোমান্টিকদের বিষাদে বিলাসের একটি অংশ আছে; আছে ব'লে নিন্দা করি না তাঁদের, কেননা বিলাস বস্তুটিকে শুধু সুখের আনুষঙ্গিক ব'লে তাঁরাই ভাবতে পারেন যাঁরা আত্মার রহস্য বিষয়ে অজ্ঞান। তবু এ-কথাও স্বীকার্য যে বায়রনি বিষাদ একেবারে নির্ভাণ নয়, এবং শেলির খেদময় উক্তি-সমূহ একটি বালকোচিত সরলতায় আচ্ছন্ন। শেলি, বায়রন, ওঅর্ডস্বার্থ—এঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত দুঃখের জন্য দায়ী করেছেন অন্য মানুষকে, এবং অন্য মানুষের দুঃখের জন্য রাষ্ট্র বা সমাজকে; তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে প্রায় যেন এই ভাবটি ধরা পড়ে যে তাঁরাই একমাত্র ভালো এবং অন্য সবাই অসাধু। কিন্তু বোদলেয়ার সেই রোমান্টিকশ্রেষ্ঠ, যিনি জানেন যে তাঁর যন্ত্রণার কারণ তিনি নিজেই, এবং ডস্টয়েভস্কির নায়কনায়িকাদের মতো, দুঃখকে যিনি মানুষের একটি প্রয়োজন ব'লে অনুভব করেন। অর্থাৎ—আর এটাই রোমান্টিকদের সঙ্গে তাঁর মূল পার্থক্য—যে-মানবস্বভাব রোমান্টিক মতে সহজাতভাবে শুদ্ধ, তাকে বোদলেয়ার দেখেছিলেন দুর্বারভাবে পাপোন্মুখ ব'লে। 'What man has made of man,' তা নিয়ে তিনি ভাবিত নন; তাঁর জিজ্ঞাসা: 'আমি নিজেকে নিয়ে কী করেছি?' ওঅর্ডস্বার্থ, তাঁর নিজের সুবিধেমতো, 'মানুষ' নামক ধারণাটিকে দুই অংশে ভাগ ক'রে নিয়েছেন, এবং নিজের উপর কোনো দায়িত্বই রাখেননি, কিন্তু এই নিশ্চিন্ত আক্ষেপের বদলে আমরা বোদলেয়ারে পাই 'মধ্যরাত্রির পরীক্ষা' বা গদ্যকবিতা 'রাত একটাতে'-র মতো রচনায় নিজের প্রতি ক্ষমাহীনতা; পাই, যেন বিশ্বমানবের মর্মপীড়া থেকে উত্থিত এই ক্রন্দনধ্বনি: 'ভগবান, ভগবান, দাও সেই শক্তি ও সাহস, যাতে পারি / দেখে নিতে আমার শরীর মন, বিতৃষ্ণাব্যতীত।' রোমান্টিকেরা আত্মকরুণা করেন, বোদলেয়ার আত্মপরীক্ষা; তাঁরা দোষ দেন অন্যদের, তিনি নিজেকে; তাঁরা চান আদর্শ রাষ্ট্র—যার প্রভাবে সাপ পর্যন্ত নির্বিষ হবে—আর তিনি চান প্রার্থনার দ্বারা

আত্মশোধন; তাঁরা—ও পরে প্রকৃতিপন্থীরা—যেখানে পূজা করেছেন ইহুদি সুবিচারের ধারণাকে, সেখানে বোদলেয়ার বেদি গড়েছেন খ্রিষ্টীয় করুণার জন্য। তাই তাঁর দরিদ্রবিষয়ক কবিতায় উগো অথবা ওঅর্ডস্বার্থের ভাবালুতা নেই; ঐ কবিদের মতো তিনি ভাবেন না যে দরিদ্র বা গ্রাম্য হ'লেই সাধু হবে, বরং তাঁর 'কেক' নামক গদ্যকবিতায় দারিদ্র্যের পৈশাচিকতার এক ভীষণ ছবি এঁকেছেন তিনি। সত্য, 'গরিবের চোখ' গদ্যকবিতায় ধনীর নিঃসাড়তাও দুঃসহ; কিন্তু 'ধনী' ও 'নির্ধন' শব্দ দুটিকে মানুষের অভিজ্ঞান ব'লে কখনোই তিনি স্বীকার করেননি; তাঁর লাল চুলের ভিখারিনীর চোখেও শুভ্রতা প্রকাশ পায়, বস্তিবাসী ন্যাকড়া-কুড়নিরাও সুরার প্রভাবে বীরত্ব লাভ করে, এবং ক্ষুধিতেরাও মৃত্যুকালে ঈশ্বরের স্বপ্ন ছাখে। আদিপাপে বিশ্বাসী ব'লে, তিনি কদর্যতা বা মহিমায় ধনী দরিদ্রের সমান অধিকার স্বীকার করেছেন; বুঝেছেন যে শুধু তা-ই সর্বমানবের সাধারণ সম্পত্তি হ'তে পারে যা, সুরা, স্বপ্ন বা ঈশ্বরের মতো, মানুষকে তার দৈহিক অবরোধ থেকে মুক্তি দেয়।

এবং একই কারণে তাঁর বিষাদ পরিণত হয়েছে বিতৃষ্ণায়—শুধু জগতের প্রতি নয়, নিজেরও প্রতি; এবং বিতৃষ্ণা থেকে সঞ্জাত হয়েছে নির্বেদ—সেই বিরাট, বহুকথিত, বোদলেয়ারীয় নির্বেদ—যা 'ব্যাপ্ত হয় অমরত্বে, অন্তহীন যার পরিমাণ।' নির্বেদকে তিনি বলেছেন 'জড়ের সন্তান', যার প্রভাবে 'সময়ের মন্থরতা' অসহ্য হয়ে ওঠে, নিজেকে মনে হয় 'নামহীন ত্রাসে পরিবৃত এক শিলাখণ্ড' মাত্র। কিন্তু আসলে—'ফ্লর দ্যু মাল'-এর ছত্রে-ছত্রে তার প্রমাণ আছে—এই নির্বেদেরও উৎসস্থল চেতনার অবলুপ্তি নয়, চেতনার আতিশয্য। চেতনা যার ক্ষীণ, সে-মানুষ তার নির্বেদকে 'অমরতার সমায়তন' ব'লে অনুভব করে না; আড্ডা, নেশা বা যৌনতায় ম'জে তা থেকে অব্যাহতি পায়। 'পশুর মতো ঘুম', চুম্বনলব্ধ 'বলীয়ান বিস্মরণ', 'সময়ের ভয়ংকর ভার থেকে মুক্তি' তাঁর অনায়ত্ত ব'লেই এ-সবের জন্য বোদলেয়ারের প্রার্থনা এমন অবিরাম। সুরা, অহিফেন ও গঞ্জিকা নিয়ে, আমরা জানি, বহুবিধ পরীক্ষা তিনি করেছেন—প্রায়, তাঁর নিজেরই উপর, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা; সে-সবের উদ্দেশ্য চৈতন্যেরই তীক্ষ্ণতা-সাধন; তিনি যেন আকাঙ্ক্ষা করেছেন এমন এক তুরীয় অবস্থা যাতে সময় পর্যন্ত অজ্ঞাতসারে অতিক্রান্ত হবে না, অনুভূত হবে প্রতিটি মুহূর্তের নিঃসরণ, শ্রুতিগম্য হবে বর্ণ, এবং শব্দ দৃশ্যমান। সফল হয়নি সে-সব পরীক্ষা, হ'তে পারে না—'কৃত্রিম স্বর্গে' তার নিষ্করুণ বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন—কিংবা শুধু

সার্থক হয়েছে যন্ত্রণাকে তীব্রতর ক'রে, যে-যন্ত্রণা, অন্য সব অভিজ্ঞান যখন হারিয়ে যায়, চৈতন্যের সর্বশেষ প্রতিভূরূপে দাঁড়িয়ে থাকে। তেমনি, তাঁর পক্ষে যৌনতাও আত্মনির্যাতনেরই একটি উপায়; 'পাপকর্মের চৈতন্য,' তার পরম সুখ; যদি তা পাপ হয়—আর বোদলেয়ারের তা-ই বিশ্বাস ছিলো—তাহ'লে তাকে পাপ ব'লে জানতে পারাটাই মনুষ্যত্ব*। 'কঙ্কাল', 'সিথেরায় যাত্রা', 'এক শহীদ', এই সব কবিতায়, নানা ভয়াবহ চিত্রকল্পের সাহায্যে, তিনি তাঁর এই ধারণাটি উপস্থিত করেছেন যে কামনা ও যাতনা অন্যোন্যনির্ভর; কিন্তু এ-বিষয়ে সবচেয়ে নির্মল ও নিষ্ঠুর স্বীকারোক্তি পাই 'আত্ম-প্রতিহিংসা' নামক কবিতাটিতে:

> আমিই চাকা, দেহ আমারই দলি!
> আঘাত আমি, আর ছুরিকা লাল!
> চপেটাঘাত, আর খিন্ন গাল!
> আমি জল্লাদ, আমিই বলি।

রোমান্টিক বিষাদে আশা ছিলো; ছিলো, কৃতী যন্ত্র ও উত্তম আইনের দ্বারা প্রণীত স্বর্গরাজ্যের সম্ভাবনা; কবিরা নিজেদের ভাবতে পারতেন নিষ্পাপ হরিণ ও 'পৃথিবী'কে শ্বাপদ ব'লে। কিন্তু বোদলেয়ার যেহেতু নিজেকে একাধারে বলি ও জল্লাদ ব'লে উপলব্ধি করেছেন, তাই তাঁর দুঃখ অনেক বেশি সত্যবাদী, এবং দুশ্চিকিৎস্য।

কিন্তু অচিকিৎস্য নয়। 'প্রগতি'—অর্থাৎ রোমান্টিক সংস্কারস্পৃহার প্রতিবাদ ক'রে তিনি তাঁর 'উন্মোচিত হৃদয়ে' লিখেছেন—'সত্যকার প্রগতির অর্থ নৈতিক প্রগতি, এবং তা সাধিত হ'তে পারে শুধু ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তিরই মধ্যে।' 'সত্যকার সভ্যতা', একই গ্রন্থে কয়েক পৃষ্ঠা পরে আমরা পড়ি, 'আদি-পাপের লক্ষণহ্রাসেরই নামান্তর।' মানুষের পাপবৃত্তি যদি অমর হয়, তাহ'লে পুণ্যের প্রতি তার আকর্ষণও মৌলিক, এবং পাপলিপ্তি অনিবার্য হ'লে, পুণ্যের

* ইতিহাসের একটি কৌতুক এই যে যৌনতান্বেষী বোদলেয়ার তাঁর জীবৎকালে—এবং মৃত্যুর পরেও বহুদিন পর্যন্ত—সাধারণের মনে চিত্রিত হয়েছেন যৌনতার একটি 'রাক্ষস' রূপে; অনুরাগী পাঠকরাও তাঁকে 'গণিকালয়ের সন্ত' ব'লে ভুল করেছেন। এও স্মর্তব্য যে পো, কোলরিজ বা ডিকুইন্সির মতো তিনি জীবনের কোনো অধ্যায়েই নেশার দাসত্ব নেননি, এবং নেশার প্রভাবে চৈতন্যের কী অবস্থা হয় তার অমন নির্মম বিশ্লেষণ ডিকুইন্সিতেও নেই। ডিকুইন্সির 'কনফেশন্স' প'ড়ে যাঁরা অহিফেনসেবনে লুব্ধ হবেন তাঁদের মোহভঙ্গ হবে 'কৃত্রিম স্বর্গ' পাঠ করলে। বস্তুত, বোদলেয়ারের চরিত্র ছিলো যুগপৎ বিলাসীর ও সন্ন্যাসীর; তাঁর কাব্যের তীব্রতা এই দুয়ের দ্বন্দ্বপ্রসূত।

দিকে অগ্রসৃতিও সম্ভব। 'মাতাল হও,' একটি গদ্যকবিতায় তাঁর আজ্ঞা শুনি আমরা, 'সুরা, কবিতা, পুণ্য, যার দ্বারাই হোক, মাতাল হও।' 'ভগবান যদি না-ও থাকেন', 'স্ফুলিঙ্গে'র প্রথম উক্তিটি এই, 'তাহ'লেও ধর্ম কম পবিত্র নয়।' আর 'উন্মোচিত হৃদয়ে', শেষ পর্যন্ত, তাঁর সব অবমাননাকে 'ঈশ্বরের করুণা' ব'লে তিনি অঙ্গীকার করেন, লিপিবদ্ধ করেন এই অভিলাষ যে 'দিনে-দিনে, নিজের ধরনে, মহাপুরুষ ও সন্ত হ'য়ে উঠতে হবে', কেননা 'তা-ই একমাত্র, যাতে এসে যায়।' কেমন ক'রে, পাপ থেকে স'রে এসে, মানুষ পুণ্যের দিকে পা ফেলতে পারে, তাঁর মনে এই চিন্তা ছিলো নিত্যজাগ্রত। কোনো সংঘবদ্ধ উপায়ে, কোনো সামাজিক 'প্রগতি'র দ্বারা তা সাধিত হ'তে পারে না, তা সম্ভব শুধু 'ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তিরই মধ্যে'। অতএব তাঁর 'বিতৃষ্ণা'র পাশে তাঁর 'আদর্শ'কেও স্থাপন করতে হ'লো—একটি না-থাকলে অন্যটির অর্থ থাকে না—রতিপ্রতিমা 'কৃষ্ণ ভেনাস'-এর মুখোমুখি এক 'শ্বেত ভেনাস', ম্যাডোনা যিনি, সরস্বতী ও দেবদূত, ভোগক্লান্ত 'আধ্যাত্মিক উষা'য় মানসপটে যাঁর মূর্তি 'সূর্যের মতো' প্রতিভাত হয়, এবং যাঁর উদ্দেশে, বহু নরক মন্থন করার পর, ধ্বনিত হয় এই নম্র স্তবগান :

> প্রিয়তমা, সুন্দরীতমারে—
> যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার—
> অমৃতের দিব্য প্রতিমারে,
> অমৃতেরে করি নমস্কার।

এখানে আমরা যা পাচ্ছি, তা খোঁয়ারির ক্ষণে লম্পটের অনুতাপ নয়, বহু বিপরীতকে যিনি নিজের মধ্যে ধারণ করেন তেমন এক ভাবুক ব্যক্তির মুমুক্ষা। 'অন্তরঙ্গ ডায়েরি'র 'সংশোধক'রূপে এলিয়ট প্রস্তাব করেছেন 'ভিটা নুওভা' ও 'ডিভাইন কমেডি'; তাঁর কথার আমরা এ-রকম অর্থ করতে পারি যে বোদলেয়ারে নরক-পরিক্রমা থাকলেও স্বর্গ নেই, আর সেখানেই তাঁর কাব্যের ঊনতা। কিন্তু নরক, শোধনাগার ও স্বর্গের বিভেদ দান্তের মনে যেমন গাণিতিকভাবে সত্য ছিলো, আধুনিক মানুষ বোদলেয়ারের পক্ষে তেমনটি সম্ভব ছিলো না; বরং তাঁর বিশেষ গৌরব এখানেই যে, শেক্সপিয়র ও ডস্টয়েভস্কির মতো, তিনি মানবাত্মাকে বহুস্তর ব'লে চিনেছিলেন : ব্যাধি ও স্বাস্থ্য, প্রেম ও ঘৃণা, আনন্দ ও আতঙ্ক, দ্রোহ আর আত্মসমর্পণ—এই বিরোধী ভাবগুলি, তাঁর ধারণায়, পরস্পরসংবদ্ধ শুধু নয়, পরস্পরের পরিপূরক। 'মানবহৃদয় সেই

যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে ঈশ্বর ও শয়তানের সংগ্রাম চিরকাল ধ'রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে', দমিত্রি কারামাজভ্-এর এই ঘোষণার পাশেই প্যারিসীয় কবির উচ্চারণ স্মর্তব্য : 'প্রত্যেক মানুষের মধ্যে, নিরন্তর, দুই যুগপৎ আকর্ষণ কাজ ক'রে যাচ্ছে—একটি ঈশ্বরের, অন্যটি শয়তানের প্রতি।' যে-মহিলাকে 'অমৃতের প্রতিমা' জ্ঞানে বোদলেয়ার নমস্কার জানিয়েছেন তাঁরই উদ্দেশে যখন তিনি বলেন, 'আনন্দময়ী, তুমি কি জেনেছো যন্ত্রণা?' তখন ঐ প্রশ্নের পিছনে অনুক্ত কথাটি আমাদের অজানা থাকে না; তিনি চান 'আনন্দময়ী'ও জানুন কাকে বলে ব্যাধি, দুঃখ ও বিতৃষ্ণা, আর কাকে বলে মৃত্যুভয়, নয় তো তাঁর মানবতা খণ্ডিত থেকে যাবে। এই বৈপরীত্যবোধ, বা বিপরীতের সংযুক্তি-বোধের আর-একটি উদাহরণ 'ভ্রমণ' কবিতা—যার রঙ্গমঞ্চ সমগ্র মরজীবন; ঘাতক যেখানে সপ্রেম, উৎসব শোণিতগন্ধী, শক্তিমানেরা অবসাদগ্রস্ত, এবং সন্ন্যাসীর 'চটের কণ্টক' কামস্রাবী। স্বর্গে সব বৈপরীত্য অবসিত হয় ব'লে, বোদলেয়ারের কাব্যে স্বর্গের উপস্থিতি নেই; নেই, 'গীতাঞ্জলি'র মতো, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের উন্মাদনা; কিন্তু তার সমগ্র দেহ থেকে, মেঘের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের মতো, তীব্র, প্রোজ্জ্বল ও পৌনঃপুনিক, এই সত্যটি বিচ্ছুরিত হচ্ছে যে মানুষ অমৃতকে আকাঙ্ক্ষা করে, এবং সেই আকাঙ্ক্ষাই তার মনুষ্যত্বের পরম অভিজ্ঞান। দান্তের কাব্যে কাঙ্ক্ষিত লোকে পৌঁছনো আছে; আর বোদলেয়ারে আমরা পাই অলব্ধের জন্য অসহ্য বেদনাবোধ, যা আমাদের মনে হয় আরো বেশি মানবিক ও মনস্তত্ত্বের অনুগামী। বোদলেয়ারের দুঃখ, সর্বশেষ বিচারে, অমৃতের জন্য বিরহবেদনা ছাড়া আর-কিছু নয়—মানুষের সব দুঃখই মূলত তা-ই—আর সেইজন্যই, গভীরতম আধ্যাত্মিক অর্থে, তাঁর দুঃখ মূল্যবান; শুধু প্রেম বা সৌন্দর্য নয়, তার দ্বারা প্রজ্ঞাও লভ্য। 'হে আমার দুঃখ, তুমি প্রাজ্ঞ হও'—এই পবিত্র দীর্ঘশ্বাস শেলি অথবা বায়রনে আমরা শুনি না, এবং বোদলেয়ারে শুনি ব'লেই আমরা বুঝতে পারি তাঁর দুঃখসাধনা কত সার্থক।

৫

রোমান্টিক বিষাদের চরিত্রলক্ষণ এই যে তা অহেতুসম্ভব। কোনো কারণ যদি নির্দেশ করা গেলো তাহ'লেই ছিন্নমূল হবে সেই বিষাদ, যা, বর্ষায় আকাশে মেঘের মতো, অলক্ষ্যে, অগোচরে, স্তরে-স্তরে, সমগ্র সত্তায় ব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে। হেতু যে নেই সেটাই তার অস্তিত্বের হেতু। 'আমার মন ভালো নেই।' 'কেন?'

'জানি না।' 'আমি একজনকে ভালোবাসি।' 'সে কে?' 'কী ক'রে বলি। আমি কি তাকে দেখেছি?'— এই যুক্তিরহিত মনস্তত্ত্ব, আরব, বৈষ্ণব ও ত্রুবাদুর মরমীরা যার আভাস দিয়ে গেছেন, য়োরোপের যুক্তি-যুগের অবসানকালে তা সংহত ও বলীয়ানভাবে প্রকাশ পেলো রুসোর সেই প্রখ্যাত বাক্যাংশে, যার অনুকম্পন পরবর্তী বিশ্বসাহিত্যে অবিরল। 'Je ne sais quoi'—আমি জানি না কী— যা শেক্সপিয়রের অ্যান্টনিওতে ইতিপূর্বে আমরা পেয়েছি— এই কথাটি রোমান্টিকতার মূলমন্ত্র। বাঙালি পাঠককে মনে করিয়ে দিতে হবে না যে রবীন্দ্রনাথে 'অকারণ' বিশেষণটি অসংখ্যবার ধ্বনিত হয়েছে— এক-এক সময় প্রায় অকারণেই; মনে করিয়ে দিতে হবে না যে 'কী জানি', 'কে জানে', 'না জানি' প্রভৃতি সমাবেশ তাঁর শব্দরচনার মধ্যে সবচেয়ে ক্লান্তিহীন, যে এই অস্পষ্ট ব্যাকুলতাই তাঁর কাব্যকে সেই আস্বাদ দিয়েছে যাকে বিশেষভাবে রাবীন্দ্রিক ব'লে আমরা চিনতে পারি। 'নিশীথে কী ক'য়ে গেলো মনে / কী জানি, কী জানি'— ঠিক এই রকম সূচিমুখ অস্পষ্টতা অধিকতর যুক্তিনির্ভর য়োরোপীয় ভাষায় সম্ভব না-হ'লেও, পশ্চিমী রোমান্টিক কাব্যে তুলনীয় মনোভাব আমরা অনেক পেয়েছি। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে মানুষের মনের প্রক্রিয়ায় সত্যি কিছু অহেতুক হয় কিনা, এবং কবিরা যখন তাঁদের পুলক অথবা বিষণ্ণতাকে 'অকারণ' ব'লে ঘোষণা করেন, সেটাকে আমরা আক্ষরিক অর্থে, না কি উৎপ্রেক্ষা হিশেবে গ্রহণ করবো।

রোমান্টিক কবিরা দূরপ্রেমিক; বৈষ্ণব কবিদের মতো, কিন্তু কিছুটা ভিন্ন অর্থে, তাঁরা 'ঘরকে বাহির ও বাহিরকে ঘর' করেছেন— কিংবা কোনোখানেই বাসা বাঁধেননি। পার্নেসিয়ান, সিম্বলিস্ট, প্রি-র‍্যাফেলাইট— নাম যা-ই হোক না —টেনিসন ও ইংরেজ 'চার্টিস্ট'দের বাদ দিয়ে সমগ্র উনিশ শতকের কবিতাই এই লক্ষণদ্বারা আক্রান্ত। যেমন পেত্রার্কার আগে, নিছক কৌতূহলবশত, কেউ কোনো পর্বতে আরোহণ করেনি, তেমনি অন্য কোনো যুগে, নিরন্তর দিগন্তরেখা দেখেও, মানুষ এমন ক'রে দিগন্তকে ভালোবাসেনি, ভালোবাসেনি পাহাড়ের ওপার বা সমুদ্রের অন্য তীর। 'জীবনকেন্দ্রে গ্রামের বদলে নগর, সমাজে স্থিতির বদলে অস্থৈর্য এলে এমনিই হয়'— এই ব্যাখ্যায় তৃপ্ত হ'তে পারি না আমরা, কেননা আথেন্স বা রোমেও নাগরিক জীবন ছিলো, রোমের ছিলো বহু বৈদেশিক সংশ্রব, কিন্তু সাহিত্যে এই দূরতৃষ্ণা ছিলো না। কিংবা, রোমান্টিকদের 'বিরুদ্ধে' যীশুর এই অনুজ্ঞা উপস্থিত ক'রেও লাভ নেই যে প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে

হবে, কেননা নিকটের প্রতি ঈর্ষা যেমন মানুষের একটি কুবৃত্তি, অপরিচিতের প্রতি অবিশ্বাসও তা-ই। রোমান্টিকেরা, সন্দেহ নেই, দূরকে ভালোবেসে মানুষের সংবেদনার পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছেন, খুলে দিয়েছেন অসীমের দিকে একটি বাতায়ন। এই দূর, দেশে বা কালে বাস্তব আকার পেয়েছে মাঝে-মাঝে : প্রাচীন গ্রীস, খ্রিষ্টান মধ্যযুগ, ইটালি, আফ্রিকা, আমেরিকা, ভারত— এরা প্রত্যেকে, কোনো-না-কোনো সময়ে, ধারণ করেছে সেই রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষাকে, আসলে যার কোনো আধার নেই। আধার নেই— কেননা ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ে, বা কোনো ভৌগোলিক মণ্ডলে, হৃদয়ের 'আদর্শ'কে খুঁজে পাওয়া যায় না, কল্পলোক কল্পনাতেই থেকে যায়; শেষ পর্যন্ত থাকে শুধু গতিবেগ, শুধু সন্ধান, চাঞ্চল্য, অস্থিরতা। ওভিদের বিখ্যাত উক্তি, 'অজানাকে কেউ ভালোবাসতে পারে না'*— এই ক্লাসিক সূত্রের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ ক'রে রোমান্টিকেরা তারই জয়ধ্বনি তুললেন যা অজানা ও অসীম, অনির্ণেয় ও অপ্রাপণীয়। যা সীমিত, তাকে শাতোব্রিয়াঁর নায়ক কোনো মূল্য দেয় না, এক 'অজানা' তাকে নিরন্তর তাড়না করে। 'আমি বাসনায় দগ্ধ হচ্ছিলাম', রুসো তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'কিন্তু বাসনার কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিলো না।' এই মনোভাবের চরম পরিণতি কোনখানে তাও রুসোরই একটি মুখের কথায় ধরা পড়েছে : 'যা নেই তা ছাড়া আর-কিছুই সুন্দর নয়।'

শুধু যদি আমরা চিন্তা করি যে রোমান্টিক কাব্যে বায়ু অথবা ঝটিকা কত বার এবং কত বিচিত্রভাবে স্থান পেয়েছে, তাহ'লেই আমাদের সন্দেহ থাকে না যে গতিসাধনা রোমান্টিকতার একটি প্রধান লক্ষণ। ওঅর্ডস্বার্থের 'ইমর্টেলিটি', কোলরিজের 'ডিজেকশন', শেলির 'ওয়েস্ট উইণ্ড' ও রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ'— এই চারটি প্রতিভূস্বরূপ কবিতা, বাতাসকে অবলম্বন ক'রেই, তাদের আবেগের

* ওভিদের 'বিষাদ' কাব্যে যে-কষ্ট প্রকাশ পেয়েছে, বা 'মেঘদূত'-এর যক্ষের মুখে যে-অশ্রুল বিলাপ আমরা শুনতে পাই, তার বিষয়ে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে রোমে অথবা অলকায় প্রত্যাবর্তন-মাত্র তার চিহ্ন থাকবে না। কিন্তু রোমান্টিক কবি নিজেকে অনুভব করেন আদিস্বর্গ থেকে নির্বাসিত ব'লে— শুধুমাত্র কোনো রাজধানী বা ভূভাগ থেকে নয়। তাই, নিজে লাতিন সংস্কৃতির প্রেমিক ও উত্তরাধিকারী হ'য়েও, বোদলেয়ার বলতে পারেন :

'বঞ্চিত হ'য়ে লাতিন-স্বর্গ থেকে
ওভিদের মতো কোনোদিন কাঁদবো না' ('অনুকম্পায়ী ত্রাস')

ক্রন্দনের এত গভীরতর কারণ আছে যে 'লাতিন স্বর্গ' সে-তুলনায় তুচ্ছ; তাঁর 'দুরদৃষ্ট' মৌলিক।

চাপ সহ্য করতে পেরেছে। অন্যান্য প্রিয় চিত্রকল্পের মধ্যে নৌকো বা জাহাজ উল্লেখ্য, আর স্রোত, নির্ঝর বা নদী। তিনটি যাত্রার কবিতা অক্ষয়ভাবে মুদ্রিত আছে আমাদের মনে: বোদলেয়ারের 'ভ্রমণ', র‍্যাঁবোর 'মাতাল তরণী', ও রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। নানা রূপে ভ্রমণে আমরা অভিজ্ঞ হয়েছি: স্কটে ঐতিহাসিক, বায়রনে ও শাতোব্রিয়াঁতে ভৌগোলিক, কোলরিজে আধ্যাত্মিক ও অতিপ্রাকৃত, বোদলেয়ারে ভৌগোলিক ও আধ্যাত্মিক। আর রবীন্দ্রনাথের সব কবিতাকে একত্র ক'রে নিয়ে 'ভ্রমণ' নাম দিলে ভুল হয় না; 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' থেকে 'পূরবী'র 'ঝড়' পর্যন্ত এক অবিরাম আন্দোলনে আমরা প্রহত হচ্ছি; ঢেউ উঠছে, ঢেউ পড়ছে; ঔপনিষদিক ভারত, কালিদাসের কাল, মোগল-পাঠানের ভারত, বহুলক্ষণযুক্ত ভৌগোলিক পৃথিবী— এক-একটি স্তম্ভ রচনা ক'রে দিয়ে একে-একে এরা স'রে যাচ্ছে; আর যা স্থায়ী, যা অনবরত ও অপ্রতিহত, যা তাঁর উদ্‌ভ্রান্তিজনক বৈচিত্র্যের মধ্যে ভক্ত পাঠকের আশ্রয়স্বরূপ, তারই নাম তিনি যৌবনে দিয়েছিলেন 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। লক্ষণীয়, ঐ কবিতার যাত্রা শুধু নিরুদ্দেশ নয়, রহস্যময় কাণ্ডারিণীটি বিদেশিনী। এবং সেই নারীও 'বিদেশিনী', যাকে— আসলে চেনেন না ব'লেই— কবি চেনেন ব'লে আপন মনে অনুমান করেন, 'শারদপ্রাতে' বা 'মাধবীরাতে' মাঝে-মাঝে যাকে দেখা যায়, আর যার কাছে, শেষ পর্যন্ত, অতিথির অধিক মর্যাদা মেলে না। 'ভুবন ভ্রমিয়া শেষে / এসেছি নূতন দেশে / আমি অতিথি তোমারি দ্বারে / ওগো বিদেশিনী'— এই পঙক্তিগুলিতে একাধিক ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত; 'ভুবনভ্রমণ' শেষ ক'রে যদি 'নূতন' দেশে আসা যায়, তার মানে সেই 'দেশ' পৃথিবীর বাইরে, এবং যা পৃথিবীর বাইরে তার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিগ্ধ না-হ'য়ে উপায় নেই। 'আমি অতিথি তোমারি দ্বারে—'অতিথি, অর্থাৎ অস্থায়ী আগন্তুক; এবং সে 'দ্বারে' মাত্র এসে দাঁড়িয়েছে, প্রার্থনা করছে প্রবেশের অধিকার, সে-প্রার্থনা পূরণ ক'রে দ্বার মুক্ত হবে কিনা তাও অনিশ্চিত। এবং, বলা বাহুল্য, 'বিদেশিনী' শব্দটিতেই এক গভীর, গম্ভীর অপরিচয়ের দ্যোতনা আছে; গন্তব্য যেমন অজানা, প্রেমাস্পদাও তেমনি অনির্ণেয়। আমরা অবাক হই না, যখন স্থিতিশীল হিন্দু সমাজকে বিদীর্ণ ক'রে এই কবি বাঁশির মতো ব'লে ওঠেন: 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'; বা, আরো কিছুকাল পরে, ঘোষণা করেন 'ঝঞ্ঝারমদমত্ত বলাকা'র উৎকাঙ্ক্ষা: 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।'

এলিয়টের গুরু নব্যক্লাসিক আর্ভিং ব্যাবিট, কতিপয় বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ ক'রে, এই গতিস্পৃহাকে 'ঘূর্ণিপূজা' নামে ব্যঙ্গ করেছিলেন। গতি আছে, গন্তব্য নেই; বাসনা আছে, তার আধার নেই; প্রেম আছে, কিন্তু প্রেমের পাত্রকে শনাক্ত করা যায় না— এই ভাবটিতে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, আধ্যাত্মিকতা নয়, অবমানবিক উন্মাদনা। তিনি লক্ষ করতে ভুলেছিলেন যে গতিস্পৃহা অত্যন্ত তীব্র হ'য়ে উঠলে সেই সঙ্গে স্থিতিলিপ্সা অনিবার্য, এবং রোমান্টিকতায় কোনো-কোনো চরম মুহূর্তে তা-ই ঘটেছিলো। রবীন্দ্রনাথে— যদি 'গীতাঞ্জলি'-পর্যায় ছেড়েও দিই— এর নিদর্শনের অভাব নেই; 'চিত্রা'য় তিনি সেই সত্তার উপাসক, যা বহির্জগতে বহুবিচিত্র এবং অন্তরে এক ও অন্তরতম; বেদুইনের মাতাল মধ্যাহ্নের অনতিপরেই সন্ধ্যালগ্নে তিনি চান নতশিরে ক্লান্তি ও মৌনতা; তাঁর 'নিষ্ফল কামনা'র দাবদাহের সমান্তর সেই 'ধ্যান', যাতে 'সমস্ত প্রাণ মম / চাহিয়া রয়েছে নিমেষনিহত / একটি নয়ন-সম।'* 'মানসী'র 'ধ্যান' প'ড়ে

* কথাটাকে 'সরল গদ্যে' বলতে হ'লে আমরা রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণপঞ্জিগুলির দ্বারস্থ হবো; সেখানে গতি ও স্থিতি সাকার হয়েছে য়োরোপে ও ভারতবর্ষে, এবং লেখকের মনে পশ্চিমী জঙ্গমতার প্রতি আকর্ষণ যেমন দুর্বার, তেমনি দুরপনেয় বাংলার নিস্তরঙ্গ গৃহকোণের জন্য আকাঙ্ক্ষা। তাঁর বহু রচনাই এই দুই প্রবল উন্মুখতার দ্বন্দ্বপ্রসূত। হয়তো এমন প্রশ্ন করাও অবান্তর হয় না তাঁর 'বিদেশিনী' কেন 'সিন্ধুপারে' থাকেন, আর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র তরণীটি কেন পশ্চিমগামী। বোটে বাসকালীন কোনো চোখে-দেখা সূর্যাস্তের স্মৃতি নিশ্চয়ই কাজ করেছে তার মধ্যে, কিন্তু আমরা কি অত্যন্ত নিশ্চিত হ'তে পারি যে কোনো য়োরোপগামী জাহাজের স্মৃতিও কাজ করেনি, বা 'যাত্রা' বলতেই অস্পষ্টভাবে পশ্চিমী গতিধর্ম মনে পড়েনি তাঁর? বাংলা সাহিত্যে প্রথম 'য়োরোপীয়' রবীন্দ্রনাথ— এই সত্যের একটি ঘোষণা হিশেবেও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' পাঠ করা অসম্ভব নয়। সত্য, বৃদ্ধ বয়সে লেখা 'যাত্রী' গ্রন্থের কয়েক লাইন কবিতায় ('রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠার উর্ধ্বস্বরে ডাকি') তিনি আক্ষরিকভাবে নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু সেই রচনা গতির বিরুদ্ধে ততটা নয় যতটা প্রগতি ও প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে, রোমান্টিক গতিপ্রবণতা থেকে তিনি যে কখনোই মুক্ত হননি সমকালীন 'পূরবী' গ্রন্থে তার বহু প্রমাণ আছে। সেই গ্রন্থে ঝ'রে-পড়া শিউলিরা শুধু 'চলো, চলো' বলে, 'ঝড় বলে অবিশ্রান্ত, / তুমি পান্থ, আমি পান্থ, / জয়, তব জয়।' আর, যেন বৃদ্ধ কবিকে মন্থন ক'রে, উচ্ছ্রিত হয় 'বাসা'র জন্য অভিলাষ। যে-মানুষ বাসা পেয়েছে, সে বাসা নিয়ে কবিতা লেখে না।

এই প্রসঙ্গে বোদলেয়ার ও রবীন্দ্রনাথকে বন্ধনীভুক্ত করেছি ব'লে কেউ যেন না ভাবেন যে এ-দুয়ের বিপুল বৈসাদৃশ্য বিষয়ে আমি চিন্তা করিনি। কিন্তু যেখানেই সাদৃশ্য সবচেয়ে ব্যঞ্জনাময় সেখানে আকারে-প্রকারে শুধু পার্থক্যই ধরা পড়ে।

অসম্ভব নয় বোদলেয়ারের 'স্তোত্র' মনে পড়া, 'চিত্রা'র 'সন্ধ্যা' প'ড়ে 'আত্মহত্যা'; কিন্তু বোদলেয়ারের কবিতায় সর্বদাই দু-একটি কাঁটা লুকোনো থাকে ব'লে আমরা রক্তপাতে তাঁর বেদনা উপলব্ধি করি, আর রবীন্দ্রনাথ যেহেতু অবিরল-ভাবে মসৃণ ও কমনীয়, তাই, আরামে ম'জে, আমরা অনেক সময় লক্ষ করি না তিনি কী বলছেন। একই কারণে, এই গতি ও স্থিতির দ্বন্দ্ব বোদলেয়ারে অনেক বেশি প্রখর; রবীন্দ্রনাথে দুই বিপরীত ভাবের কবিতাগুলিকে আমরা স্পষ্টভাবে ভাগ ক'রে নিতে পারি, দুয়ের মধ্যে মিশ্রণ ঘটে না, তাঁর মন যখন যেদিকে উন্মুখ হয় তখনকার মতো সেখানেই আত্মসমর্পণ করে; কিন্তু বোদলেয়ার তাঁর সমগ্র রচনায়, আর কখনো বা একই কবিতার মধ্যে, বুঝিয়ে দেন যে তাঁর পক্ষে গতি যেমন নিরন্তর মোহময়, স্থিতিও তেমনি ক্ষমাহীনরূপে আহ্বানকারী, এবং উভয় আকর্ষণ তাঁর মনে যুগপৎ বিরাজমান। 'সিন্ধু ও মানব' কবিতায় অবিরাম আন্দোলনের ছবিটিকে একই সঙ্গে সুন্দর ও মায়াত্মক ব'লে আমরা অনুভব করি, একই বিড়াল তাঁর মুগ্ধতা কাড়ে 'মাথার মধ্যে আনাগোনা'র জন্য ও 'ঠাণ্ডার ভয়ে ঘরে থাকে' ব'লে, আর প্যাঁচারা প্রশংসা পায় যেহেতু তারা নিশ্চল ও আত্মদর্শী:

> জ্ঞানীর চোখ, তা দেখে যায় খুলে,
> হাতের কাছে যা আছে নেয় তুলে,
> থামার গতি, অবুঝ আন্দোলন;
> হায়, মানুষ, ছায়ার মোহে পাগল,
> শাস্তি তার এ-ই তো চিরন্তন—
> কেবল চায় বদল, বাসা-বদল! ('প্যাঁচারা')

এবং লক্ষণীয় যে বোদলেয়ারের সুন্দরীরা যদিও চঞ্চলা, নর্তকী সাপিনী বা তরঙ্গাহত তরণীর সঙ্গে তুলনীয়, যদিও প্রায়ই আমরা তাদের দেখতে পাই ঠাণ্ডা প্যারিসে অথবা রৌদ্রময় প্রাচ্য পুলিনে পথচারিণীরূপে, তবু তাঁর সৌন্দর্য এক পাষাণপ্রতিমা, স্তব্ধ, হিম ও ধবল, সব আবেগজনিত হৃৎস্পন্দনের অতীত। সুদূরের সেতুবন্ধ তাঁর রূপসীরা, ভ্রমণের উদ্বোধিনী, তাদের সংসর্গে কবি চ'লে যাচ্ছেন 'মোহন মণ্ডলে', শিথিল এশিয়া ও প্রদীপ্ত আফ্রিকায়, 'সুদূর, অনুপস্থিত ও লুপ্তপ্রায়' এক জগতে, কিন্তু সেই সব রূপের যিনি আবহমান অন্তঃসার, তিনি কবিকে বলছেন: 'পাছে রেখা ভ্রস্ত হয়, ঘৃণা করি সব চঞ্চলতা।' বোঝা যাচ্ছে, গতির অন্তরে স্থির কেন্দ্রের ধারণাটি বস্টনীয় ব্রাহ্মণবংশের একাধিকার নয়,

বোদলেয়ারে তা সোচ্চার, এবং যে-নবোদ্গত ভারতীয় কবিকে আর্ভিং ব্যাবিট ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, এমনকি সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেও তা সুস্পষ্ট।

'নিরন্তর আমার মনে হয় যে আমি যেখানে আছি সেখানে ছাড়া অন্য যে-কোনো দেশে আমি সুখী হ'তে পারি।' কে বলছেন? রোমান্টিকতার জনক জাঁ-জাক নন, ঐতিহাসিকেরা যাঁকে রোমান্টিকতার অবসান ব'লে চিহ্নিত করেন, সেই শার্ল বোদলেয়ার। কিন্তু, 'যা নেই তা ছাড়া আর-কিছুই সুন্দর নয়', এই কথার প্রতিধ্বনি কি শোনা যাচ্ছে না? কিন্তু একটু অপেক্ষা করা যাক, আর-একবার পড়া যাক সেই গদ্যকবিতাটি, উপরোক্ত পঙক্তিটি যার অংশ, বোদলেয়ার যার শিরোনামা দিয়েছিলেন ইংরেজি ভাষায়: 'পৃথিবীর বাইরে যে-কোনোখানে'। 'জীবনটা এক হাসপাতাল যেখানে প্রত্যেক রোগী অবিরাম চায় শয্যা-বদল। কারো ইচ্ছে চুল্লির উল্টোদিকে শুয়ে কষ্ট পায়, কেউ ভাবছে জানলার ধারে গেলে নিশ্চয়ই সেরে উঠবে।' এই মুখবন্ধেই ব'লে দেয়া হ'লো—যা 'প্যাচারা' কবিতাতেও বলা আছে—যে মানুষের মনে বাসা-বদলের ইচ্ছেটা যেমন দুর্মর তেমনি নির্বোধ। অন্য এক ফরাশি বচন মনে প'ড়ে যাচ্ছে আমাদের: 'মানুষের সব দুর্ভাগ্যের একটিই কারণ: সে তার ঘরে টিকতে পারে না।' পাস্কাল, মনে হ'তে পারে, রুসো জন্মাবার অনেক আগেই রুসোর উত্তর লিখে গিয়েছিলেন; কিন্তু আসলে এই দুটি উক্তি পরস্পরের পরিপূরক; আমাদের অভিজ্ঞতায় এই দুই ভাবই সমান সত্য; আমাদের হৃদয়ের তারা মৌলিক গুণ; আমাদের জীবনে তারা প্রতিবেশী ও পরস্পর-প্রবিষ্ট। এবং বোদলেয়ারের কবিতাটি এই দুই বিপরীতের টানে তীব্র হ'য়ে আছে; দূর, অজানা ও আশ্চর্য যার মধ্যে মূর্ত হ'য়ে উঠলো সেই ভৌগোলিক সুখধামগুলির বর্ণনা আমাদের শুধু প্রস্তুত ক'রে তুলছে সর্বশেষ ও সর্বনাশী বিস্ফোরণটির জন্য: 'যে-কোনোখানে! যে-কোনোখানে! পৃথিবীর বাইরে যে-কোনোখানে!' কিন্তু—কোথায়? পৃথিবীর বাইরে না-গেলে যার তৃপ্তি নেই তার তৃষ্ণা কোথায় মিটবে?

একটি গম্ভীর ও ভয়াবহ শব্দ আমাদের ঠোঁটে উঠে আসছে, হাওয়ায় হানা দিচ্ছে 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর সেই মহান কবিতাগুচ্ছ, যার নামপত্রে কবি লিখে দিয়েছিলেন: 'মৃত্যু'। কী আছে পৃথিবীর বাইরে, জীবনের বাইরে? যে-সব কবি শাস্ত্রসম্মত ঈশ্বরে বিশ্বাসী, বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে আস্থাবান, এই প্রশ্নের উত্তর তাঁদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ। তাঁদের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে স্বর্গরাজ্য, সুরলোক

অথবা ব্রহ্মলোক; ব্রাউনিঙের জন্য মৃতা প্রিয়ার বাহুবন্ধ; ব্রাউনিং ও রবীন্দ্রনাথের জন্য সেই সব সাধনা, যা জীবনে সারা হ'তে পারেনি। মৃত্যু মানে আদি উৎসে প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার পুনর্মিলনের মুহূর্তটির নামই মৃত্যু— এই ধারণার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য টেনিসনের 'ক্রসিং দি বার' ও 'গীতাঞ্জলি'র ১১৬ নম্বর কবিতাটি পড়াই যথেষ্ট। এর 'বিরুদ্ধে' আমরা দাঁড় করাতে পারি মরণমোদিত পূর্ব-রোমান্টিকদের, যাঁদের কাছে মৃত্যু দেখা দেয় 'নিদ্রার মতো সুন্দর' হ'য়ে, প্রেয়সীর মতো কাঙ্ক্ষণীয়, প্রেম ও মৃত্যুকে যাঁরা সম্পৃক্ত ক'রে, এমনকি প্রায় এক ক'রে দেখেছেন, কিংবা জর্মান কবি প্লাটেন-এর মতো যাঁরা অনুভব করেছেন যে 'একবার সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মৃত্যুর কাছে উৎসর্গিত হ'তে হয়।'* বোদলেয়ারে দুই দিকেরই লক্ষণ আছে, কিন্তু কোনো দিকেই তিনি পুরোপুরি ধরা দেন না। তাঁর কাছেও মৃত্যু একটি পরম নেশা, কিন্তু সে-নেশা শুধু ইন্দ্রিয়বিলাসের নয়, তাতে মিশে আছে মানবাত্মার দুরন্ত আবিষ্কারধর্মিতা। ধর্মকে পবিত্র ও যীশুকে 'তর্কাতীত দেবতা' ব'লে স্বীকার ক'রেও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি শাস্ত্রোক্ত ধ্রুবলোকের দিকে তাকিয়ে থাকা, বরং 'এক অদ্ভুত মানুষের স্বপ্ন' নামক নিষ্করুণ কবিতায় তিনি রূঢ়ভাবেই বলেছেন যে মৃত্যুর পরে আর-কিছু নেই— কিছুই নেই।

ঘটলো ভীষণ মরণ, এবং সেই ঊষায়
শুষ্ক, আবৃত, বিস্ময়হীন আমার মন;—
স'রে গেলো পট, আমি তবু ব'সে প্রত্যাশায়।

কিন্তু— আরো কথা আছে। 'পৃথিবীর বাইরে' একমাত্র যে-সত্য বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হ'তে পারি তার বিষয়ে বোদলেয়ারের ভাবনা— বা গবেষণা— আরো বিস্তীর্ণ। নিঃস্বের তা সান্ত্বনা ও ক্ষতিপূরণ, প্রেমিকের পক্ষে পুনরুজ্জীবনের আশা, শিল্পীর পক্ষে এক অতীন্দ্রিয় প্রতিশ্রুতি: এ-সব কবিতায় মৃত্যু যে-আসন

*লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ দুটি মনোভাবেরই অধীন হয়েছেন; কীটসের প্রতিধ্বনি ক'রে জীবনানন্দ দাশ যে-কথা লিখেছিলেন—'মৃত্যুরে ডেকেছি আমি প্রিয়ের অনেক নাম ধা'র—'তা রবীন্দ্রনাথেরও হ'তে পারতো। 'মরণ' কবিতায় ('অত চুপিচুপি কেন কথা কও') মৃত্যু প্রেয়সীরূপে কল্পিত; 'গীতাঞ্জলি'তেও এই ভঙ্গি নেই তা নয়, কিন্তু সেখানে মৃত্যুর অর্থ বদলে গেছে। 'ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা / মরণ, ওগো মরণ, তুমি কও আমারে কথা'— এখানে যা ধরা পড়েছে তা প্রেমের চাপে বিলীন হ'য়ে যাবার আবেগ নয়, ঈশ্বর যে আছেন; এবং মৃত্যুর পরে তাঁর মধ্যে নিমজ্জন সম্ভব, ধর্মের এই দুটি সূত্রই এখানে নিঃশব্দে স্বীকৃত।

পেয়েছে সেখানেই ব্রাউনিং ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ঈশ্বরকে বসিয়েছেন। 'না-জেনে ধায় তোমার পানে / সকল ভালোবাসা', 'গীতাঞ্জলি'র এই পঙক্তিতে মৃত্যু ও ভগবানকে প্রায় অভিন্ন ক'রে তোলা হয়েছে, কেননা কিছুক্ষণ আগেই কবির প্রার্থনা আমরা শুনেছি: 'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা / প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।' টেনিসনের মতো—প্রায় টেনিসনের অনুসরণে—রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তিম যাত্রায় মুক্তিদাতাকেই কর্ণধার ব'লে ঘোষণা করেছেন; কিন্তু বোদলেয়ারের 'ভ্রমণ' কবিতায়—যাকে বলতে পারি মৃত্যুর মহিমায় উদ্ভাসিত এক জীবনবেদ—মানবজীবনের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে অভিজ্ঞ হ'তে-হ'তে আমরা অকস্মাৎ মর্মাহত বিস্ময়ে উপলব্ধি করি যে এই মাতাল তরণীর যে হাল ধ'রে আছে সে আর-কেউ নয়—মৃত্যু, বৃদ্ধ, অমর ও সনাতন মৃত্যু। হাইনে তাঁর 'বিকিনি'তে মৃত্যুকে জীবনের গন্তব্যরূপে নির্দেশ করেছিলেন; বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে আমাদের জীবন—তাঁর কবিতাটির মতোই—এক বিরাট ঠাট্টা, যে কায়কল্পের সন্ধানে বেরোলে কালসদনেই পৌঁছতে হবে। স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গপ্রবণতা এড়াতে পারেননি ব'লে হাইনের কবিতাটিকে আমরা একটি নীতি-কথারূপে গ্রহণ ক'রে নিশ্চিন্ত হই, কিন্তু বোদলেয়ারে যেহেতু ব্যঙ্গের আভাস-মাত্র নেই, তার বদলে আছে 'শহীদ ও ঘাতকে'র আবেশ, তাই তাঁর কবিতাটির অভিঘাত প্রচণ্ড, তা আমাদের নিয়ে যায়—নিশ্চিত মৃত্যুতে নয়—জীবন ও মৃত্যুর এক রহস্যময় সম্বন্ধসাধনে। জীবন ও মৃত্যুর বৈপরীত্যের বদলে বোদলেয়ার লক্ষ করেছেন এ-দুয়ের সহবাসিতা; জন্মের মুহূর্ত থেকে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু ঘটছে আমাদের, বেঁচে থাকা নামক অবস্থাটাকে মৃত্যুরই একটা প্রক্রিয়া বলা যায়, তাকে আরো একটু কাছে না-টেনে কোনো কিছুই করতে পারি না আমরা, অতএব মৃত্যুই আমাদের সাধের তরণীর কাণ্ডারী। এই কথাটা একটা আদি-সত্য, পূর্বযুগেও কবিদের মনে প্রতিভাত হয়নি এমন নয়; কিন্তু বোদলেয়ারে তা এমনভাবে সোচ্চার হয়েছে যে তার পর থেকে এই ধারণাটি আধুনিক চৈতন্যের অংশ হ'য়ে গেছে। বোদলেয়ারে যা রশ্মির মতো নিঃসৃত, তাকে আমরা নক্ষত্রের মতো জ্বলতে দেখি রিলকের কাব্যে, যেখানে মৃত্যু আমাদের অন্তর্ভূত এক বীজ, যাকে আমরা অনবরত লালন ক'রে ফলিয়ে তুলছি, এবং যা সুপক্ক হ'লে আমাদের বিদীর্ণ ক'রে বেরিয়ে আসবে। টোমাস মান্-এর 'ভেনিসে মৃত্যু' গল্পে গুস্টাফ আশেনবাখ অকস্মাৎ ভ্রমণলালসায় চঞ্চল হ'য়ে উঠলো; জানলো না, তার সত্য বাসনা মৃত্যুর জন্য। এই অতল ও নামহীন লিপ্সাটি জীবনানন্দর

বেড়েছে অর্থের নতুনতর দ্যোতনার জন্য নয়, নেহাৎই বৈচিত্র্যের খাতিরে। এবং যে-শব্দ শুধুই বৈচিত্র্য দেয়, তা কবিতায় কিছু দিতে পারে না। সংস্কৃত ভাষাকে, তার বিপুল শক্তির জন্য, এই এক খেদজনক মূল্য দিতে হয়েছে।

শুধু প্রতিশব্দের স্তূপীকরণদ্বারা সংস্কৃত মাঝে-মাঝে যে সম্মোহন সৃষ্টি করতে পারে, তার মূল্য অস্বীকার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। মহাভারতের দ্রৌপদী যখন অর্জুনকে একই উক্তির মধ্যে কখনো 'পার্থ', কখনো 'কৌন্তেয়', কখনো 'গাণ্ডীবধন্বা' ব'লে সম্বোধন করেন, বা কোনো কামাতুর মুনি কোনো মানবী বা অপ্সরাকে আহ্বান করেন একবার 'মদিরেক্ষণা', একবার 'পদ্মগন্ধা', আর তার পরেই 'পীনস্তনী' ব'লে, সেই শব্দযোজনা আমরা মুগ্ধের মতো শুনতে বাধ্য। কিন্তু লক্ষণীয়, এগুলো সত্যিকার প্রতিশব্দ নয়, শুধু বৈচিত্র্যের জন্য বসানো হয়নি, প্রত্যেকটি নাম বা বিশেষণ বক্তার আবেগসঞ্চারে আন্দোলিত। উত্তর-মেঘে এর একটি সুন্দর উদাহরণ আছে মেঘের মুখে যক্ষ তার প্রিয়াকে যে-বার্তা পাঠাচ্ছে, তার মধ্যে সম্বোধনরূপে যথাক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে 'অবলা', 'চণ্ডী', 'গুণবতী', 'চটুলনয়না', 'কল্যাণী' ও 'অসিতনয়না'। এর মধ্যে 'চটুলনয়না' ও 'অসিতনয়না'কে আভরণমাত্র মনে হ'তে পারে, কিন্তু অন্য তিনটি যক্ষের আবেগস্পন্দনে বিশেষ অর্থ পেয়েছে। এই ধরনের ব্যবহার এখানে আমার আলোচনার লক্ষ্য নয়, আমি সংস্কৃত ভাষার সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য করছি। আধুনিক ভাষা এক-একটি শব্দের প্রতিশব্দ বা প্রতিদ্বন্দ্বী সরিয়ে দিয়ে-দিয়ে প্রত্যেকটি শব্দের শক্তির সম্ভাবনা বাড়িয়েছে; আধুনিক কবির কাছে শব্দগুলো নিরপেক্ষ ও বর্ণহীন বস্তু, বা শূন্য ও ঈষদচ্ছ ছোটো-ছোটো আধার, যাকে তিনি ভ'রে তুলবেন, তাঁর ভিন্ন-ভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসারে, তাঁরই ভিন্ন-ভিন্ন বিশেষ অর্থে, বিশেষ ব্যঞ্জনায়। শব্দ নিজেই তার নিজের বিষয়ে কোনো খবর দেবে, তা তিনি চান না; তিনি চান শব্দ হবে উপায়, কিন্তু বার্তা তাঁর নিজের। 'মেঘে'র বদলে 'জলদ' বা 'অম্বুবাহ' লিখলে, তাঁর মতে, কবিতার বেগটাকে শ্লথ ক'রে দেয়া হয়, কেননা মেঘের যে-সজলতা তাঁর রচনারই মধ্যে মূর্ত হবার কথা, ঐ শব্দ সেটাকে আগেই ফাঁশ ক'রে দিচ্ছে। 'জলে'র নামান্তররূপে 'বারি', 'নীর', 'অম্বু' প্রভৃতি গ্রহণ ক'রে তিনি প্রত্যক্ষতার ক্ষতি করতে চান না; তিনি চান, সব সময় শুধু 'জল'ই ব্যবহার করবেন, আর তারই মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলবেন অভিজ্ঞতার ভিন্ন-ভিন্ন স্তর—প্রলয়ের কল্লোল থেকে অশ্রুবিন্দু পর্যন্ত বাদ যাবে না। এক-একটি শব্দ থেকে কত বেশি কাজ আদায় ক'রে নেয়া যায়,

আধুনিক কবির লক্ষ্য সেই দিকে; আর সংস্কৃত কবির চেষ্টা যাতে প্রতিটি শব্দই স্বতন্ত্রভাবে সবর্ণ হয়। আধুনিক কবিতায় সব শব্দের মূল্য সমান নয়, মাঝে-মাঝে কোনো-কোনোটি চাবির মতো কাজ করে, রহস্যের দরজা তাতে খুলে যায়, হঠাৎ তার আঘাতে চারদিক আলো হ'য়ে ওঠে, চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ে সারা কবিতায়। 'অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি পড়ে মনের মাটিতে'—এই প্রথম পঙক্তিতেই পুরো কবিতার মূল অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে: 'মনের মাটি', তার মানে, এটা শুধু আষাঢ়ে বর্ষার বর্ণনা নয়, এ বর্ষা আমাদের মনের সৃষ্টিপ্রেরণার চিত্রকল্প, কবির কবিতার অনুপ্রেরণা, 'মরুময় দীর্ঘ তিয়াষা'য় সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার কথাই বলা হ'লো এবং শেষের দিকে 'সৃজনের অন্ধকার' আর 'রচিত বৃষ্টি'ও সেই তৃষ্ণারই তৃপ্তির আভাস দিচ্ছে। সংস্কৃতে এ-ধরনের শব্দব্যবহার হয় না, প্রতিটি শব্দ নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ এবং নিজগুণে সম্ভোগ্য, তাদের মধ্যে পারস্পরিক অনুরণন বা অনুরঞ্জন নেই। সেইজন্য সংস্কৃত কবিতা কোনো বিস্ফোরকের মতো পাঠকের মনের মধ্যে ফেটে পড়ে না; কবিরা বহুবিধ ইঙ্গিতে-বলার কৌশল জানেন, কিন্তু একই সঙ্গে অভিজ্ঞতার একাধিক স্তর প্রকাশ করেন না।

ব্যাকরণের আর-একটি নিয়মের উল্লেখ করবো, যাকে আমরা বাধা ব'লে অনুভব করি, সেটি এই যে সংস্কৃত বাক্যগঠনে কর্তার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। কিংবা, সত্যি বলতে, আমাদের অর্থে বাক্য বা পঙক্তির অস্তিত্ব নেই সেখানে। শুধু একটি কর্তা ও একটি ক্রিয়াপদ নিয়ে, সমাসবদ্ধ বিশেষণের সাহায্যে, সুদীর্ঘ বাক্য-রচনা তাতে সম্ভব; কর্তা ও কর্মের মধ্যে মস্ত বড়ো ছেদ থাকলেও এসে যায় না, পাঠক বিভক্তির দ্বারা চিনে নেবেন। 'মেঘদূত'-এর প্রথম শ্লোকের আসল কথাটা হ'লো, 'কশ্চিৎ যক্ষ বসতিং চক্রে'— 'এক যক্ষ বাস করলে'— বাকিটা যক্ষের ও তার বাসস্থানের বিশেষণ। শ্লোকটির আক্ষরিক অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়ায়:

> এক স্বকর্মে-অমনোযোগী যক্ষ, প্রভুর (দত্ত) প্রিয়াবিরহ-(হেতু)-দুঃসহ একবর্ষভোগ্য শাপের-দ্বারা-বিগতমহিমা (হ'য়ে), সীতার স্নানহেতু-পবিত্র, স্নিগ্ধছায়াতরু-(ময়) রামগিরি-আশ্রমে বাস করলে।

একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে মূলের একটি পদও এই বার্তার কোনো-একটি অংশকে সম্পূর্ণ ক'রে প্রকাশ করছে না; শ্লোকটির শেষ পর্যন্ত না-পৌঁছলে ধারণা হবে না, ব্যাপারটা কী। লেখক যখন কালিদাস, তখন ধ্বনিমাধুর্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ধীরে ও সাবধানে শ্লোকের অন্বয় ক'রে তবে আমরা বুঝতে পারি, কথাটা কী বলা হ'লো। অর্থাৎ, কবিতা ও পাঠকের মধ্যে

একটি বুদ্ধির ব্যবধান নিত্য উপস্থিত, পড়ামাত্র কোনো অভিঘাত হবার উপায় নেই— এবং আমরা যাকে পঙক্তি বলি, তারও কোনো সম্ভাবনা থাকে না। 'আমাকে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন'— এটা সংস্কৃতে অনায়াসে লেখা হ'তে পারে— 'নাটোরের দিয়েছিলো দু-দণ্ড আমাকে শান্তি সেন বনলতা'— উপরন্তু, কথাটা একাধিক পদে বিশিষ্ট হবারও বাধা নেই, 'দিয়েছিলো' বদলি হ'তে পারে প্রথম পদে, 'আমাকে' চ'লে আসতে পারে চতুর্থে। অর্থাৎ সংস্কৃত কবিতার চলন ঠিক ক'রে দেয় পুরো স্তবক বা শ্লোক, আর আধুনিক কবিতা পদের বা পঙক্তির চালে চলে। দুয়ের মূলমাত্রা বা unit স্বতন্ত্র। এবং এই প্রভেদ গুরুতর।

৩

আমি মনে-মনে যে কথাটা ভাবছি এবারে তা বলা যেতে পারে: সংস্কৃত কবিতা সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম, আদর্শ ও তত্ত্বের দিক থেকে তা-ই, অভ্যাসের দিক থেকেও তা-ই। সন্দেহ নেই, শিল্পমাত্রই রচিত, এবং সেই অর্থে কৃত্রিম, কিন্তু আধুনিক কবিতা অন্তত্পক্ষে স্বাভাবিকের অভিনয় করে, আর সংস্কৃত কবিতা সদম্ভে ও নির্লজ্জভাবে কৃত্রিমতাকে অঙ্গীকার ক'রে নেয়।

কোনো কবিতা যে-ভাষায় লেখা হচ্ছে সেই ভাষার চরিত্র তাকে বহুদূর পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যায়, আর সংস্কৃত ভাষার চরিত্র এমন যে তা সর্বতোভাবে কৃত্রিমতার পরিপোষণ করে। তার জটিল ও আশ্চর্য ব্যাকরণ সহজ কথাও সোজাসুজি বলতে দেয় না, শব্দের বিনিময়ধর্মিতা ও সন্ধি-সমাসের কৌশল এক উক্তিতে বহু অর্থ সম্ভব ক'রে তোলে। এই ভাষা শ্বেতাঙ্গ ককেশীয়গণ ভারতে নিয়ে আসেন; ভারতের প্রাগার্য সভ্যতা— আধুনিক পণ্ডিতেরা ব'লে থাকেন— অনেক বিষয়ে বেশি উন্নত ছিলো, তবু যে দেশ জুড়ে নবাগতদের ধর্ম ও সংস্কৃতির জয় হ'লো তার একটি প্রধান কারণ এই ভাষার তর্কাতীত শ্রেষ্ঠতা। তবু এ-বিষয়ে সন্দেহ ঘোচে না যে সংস্কৃতের প্রধান কাব্যসমূহ যে-সময়ে লেখা হয়, সে-সময়ে সংস্কৃত সত্যিকার অর্থে কথিত ছিলো কিনা; অন্তত মেয়েরা, শিশুরা ও প্রাকৃতজনেরা যে তাতে কথা বলতো না, তার প্রমাণ নাট্যসাহিত্যেই পাওয়া যাচ্ছে। এবং যে-ভাষায় শিশুর মুখে বোল ফোটে না, স্বামী-স্ত্রীতে প্রেমালাপ বা কলহ চলে না, যাতে ঘরকন্না বেচাকেনা ইত্যাদি নিত্যকার কাজ সম্পন্ন হবার উপায় নেই, সে-ভাষায় কেমন ক'রে কবিতা লেখা সম্ভব হয়েছে

তা ভেবে আজকের দিনে আমরা অবাক হ'তে পারি। আমাদের বুঝতে দেরি হয় না যে তা সম্ভব হ'তে পারে শুধু একটি শর্তে: কবিতাকে 'জীবন' বা 'স্বাভাবিক' থেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে দেয়া হবে, তাতে অপণ্ডিতের অধিকার থাকবে না, প্রত্যক্ষতা ও স্বতঃস্ফূর্তি বর্জন করা হবে, হার্দ্য আবেদনের বদলে প্রাধান্য পাবে কৌশল, নৈপুণ্য, বুদ্ধিগত প্রক্রিয়া।

প্রধান উপনিষদ্-সমূহ এই অর্থে কৃত্রিম নয়, বরং তার বিপরীত প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত; ভাষা সেখানে প্রাণের তাপে জ্বলন্ত, কবিতার উৎস মানুষের সমগ্র সত্তা, শুধু বুদ্ধি ও দক্ষতার শক্তি নয়। সংস্কৃতে যাকে কাব্য বলা হ'তো তার বহু লক্ষণ মহাভারত ও রামায়ণে পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের কাব্যগত প্রভাব কোনো মল্লিনাথের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে না, তৎক্ষণাৎ পাঠকের মনে আঘাত করে। বাল্মীকি রামায়ণের ঋতুবর্ণনায় আমরা যেন সশরীরে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হই, আর 'কুমারসম্ভব'-এর অকালবসন্ত যেন রঙ্গমঞ্চে বহু যত্নে সাজানো হয়েছে, আমরা যার দর্শকের বেশি হ'তে পারি না। মহাভারতের মৌষলপর্বের দ্বারা আমরা যে-কেউ যে-কোনো সময়ে অভিভূত হ'তে পারি; আর গীতার বিশ্বরূপ-দর্শনের অধ্যায় প'ড়ে গায়ে কাঁটা দেবে না শুধু সেই ব্যক্তির, যে স্বভাবতই কবিতার ডাকে সাড়া দিতে অক্ষম। কবিতার সঙ্গে পাঠকের এই যে অব্যবহিত সম্বন্ধ, তারই কথা মনে রেখে এলিয়ট গীতাকে বলেছিলেন পৃথিবীর 'দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কাব্য', শ্রেষ্ঠ এই জন্যে যে তার কবিতার গুণগ্রহণের জন্য তার দার্শনিক তত্ত্বে বিশ্বাসী হবার প্রয়োজন হয় না*। হয়তো এমন বললেও ভুল হয় না যে সংস্কৃত কবিতার মহত্তম মুহূর্তগুলি সে-সব গ্রন্থেই বিধৃত আছে, যাদের সাধারণত ধর্মশাস্ত্র বলা হয়।

কিন্তু পরবর্তী কাব্যসাহিত্য, আমরা দেখছি, ক্রমশই স্বাভাবিক থেকে দূরে স'রে আসছে, তার মধ্যে প্রধান হ'য়ে উঠছে সজ্জা, প্রসাধন, প্রকরণবিদ্যা। এই আদর্শের অবনতির দিনে সম্পূর্ণ অকবির পক্ষেও 'কাব্য' রচনা সম্ভব হয়েছে: কেউ যমকের সাহায্যে একই রচনার মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প সংশ্লিষ্ট

* 'The *Bhagavad-Gita* is the second greatest philosophical poem in my experience'—এলিয়টের মতে প্রথমটি অবশ্য 'দি ডিভাইন কমেডি'। লক্ষণীয়, সাহিত্যিক কারণে যাঁরা বাইবেল পড়েন বা তার প্রশংসা করেন এলিয়ট তাঁদের পক্ষপাতী নন, কিন্তু ঐশ্বরিক মহিমা থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে গীতাকে তিনি কবিতা হিশেবেই দেখেছেন ব'লে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই

করেছেন, কেউ বা কোনো অক্ষর বর্জন ক'রে কসরৎ দেখিয়েছেন, কেউ বা রচনা করেছেন ব্যাকরণের নিয়মাবলির ছন্দোবদ্ধ উদাহরণ। এবং যাঁকে সংস্কৃতের শেষ ভালো কবি বলা যায়, সেই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' তার অনুপ্রাস ও আদিরসের একঘেয়েমিতে আজকের দিনে অচিরেই আমাদের ক্লান্ত করে।

শিলার বলেছিলেন কবিরা দুই জাতের: 'নাঈভ' ও 'সেন্টিমেণ্টল'; হয় তাঁরা নিজেরাই প্রকৃতি, নয় তাঁদের আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতির জন্য। গ্যেটে এই শব্দ দুটিকে 'ক্লাসিক' ও 'রোমাণ্টিক'-এর নামান্তররূপে চিহ্নিত ক'রে দেন; একদিকে তাঁরা, যাঁরা আপন মানবিক ও নৈসর্গিক পরিবেশের মধ্যে নিবিষ্ট ও দ্বন্দ্বহীন; অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহীর দল, আধুনিক অর্থে ব্যক্তি, যাঁদের কবিসত্তা ও সামাজিক সত্তায় প্রতিকারহীন বিরোধ ঘটেছে। আধুনিক কালের সব কবিকেই দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভূত করা যায়; যাঁরা তথাকথিত 'ক্লাসিসিস্ট' (যেমন এলিয়ট বা বাংলাদেশে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) তাঁরাও এই বিচ্ছেদের মধ্যে গৃহীত, এবং সেই অর্থে রোমাণ্টিক। যে-কবিরা বেদ, উপনিষদ্ ও পুরাণসমূহ রচনা করেছিলেন, তাঁদের আমরা নিঃসংশয়ে 'নাঈভ' বলতে পারি, কিন্তু ঐতিহাসিকেরা যাকে সংস্কৃত সাহিত্যের 'ক্লাসিকাল' যুগ ব'লে থাকেন, তার অন্তর্ভূত কবিরা প্রকৃতির মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়েছেন অথচ সত্যিকার ব্যক্তিগত উক্তির জন্যও প্রস্তুত হননি। আমাদের কাছে তাঁদের ক্লাসিসিজম-এর অর্থ—প্রথার সুমিতি, নিয়মের দার্ঢ্য, বুদ্ধিগত শৃঙ্খলা, পরবর্তী কালে যার অর্থ দাঁড়ালো—নেহাৎ গতানুগতি। জয়দেবের স্বভাব ছিলো রোমাণ্টিকের, কিন্তু তাঁর কাব্যে এমন বিশেষণ বা উৎপ্রেক্ষা বিরল যাকে কবিপ্রসিদ্ধির সন্দেহ থেকে আমরা মুক্তি দিতে পারি। এমনকি, ক্ষুদ্রাকার সুভাষিতাবলি—যেখানে আমরা হার্দ্য উচ্চারণ আশা করতে পারতাম—তারাও আশ্চর্যরকম কৃত্রিম, নির্মিত ও পারম্পরিক পুনরুক্তিপ্রবণ। কবি স্বাধীনভাবে তাঁর একান্ত নিজের গলায় কথা বলছেন—যা রোমাণ্টিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ—তার উদাহরণ (ধর্মগ্রন্থের বাইরে) সারা সংস্কৃত সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। 'যঃ কৌমারহরঃ' ব'লে যে-বিখ্যাত কবিতার আরম্ভ, সেটি বিরলতার গুণেই বিখ্যাত ও আদৃত হয়েছে। তার লেখকের মতো খাপছাড়া মহিলা-কবি আরো দু-একজন থাকতে পারেন, কিন্তু সাধারণভাবে এ-কথা সত্য যে আমরা যাকে লিরিক বলি, তার প্রকাশ, সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুলতার তুলনায়, অত্যন্ত ক্ষীণ ও দুর্বল।

এটা কেন হ'লো যে রসতত্ত্বের সংস্কৃত নাম অলংকারশাস্ত্র? 'অলম্' কথাটার

অর্থ হ'লো যথেষ্ট ; 'অলংকার' মানে—যথেষ্টীকরণ, যার দ্বারা কোনো জিনিশ যথেষ্ট হ'য়ে ওঠে। যা অলংকৃত নয় তা পর্যাপ্ত নয় (বা প্রকাশ্য নয়), এই মৌল ধারণা নিয়ে সংস্কৃত কাব্যবিচারের আরম্ভ। এই কাজে যাঁরা হাত দেন তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন কবিতা কী-কী উপায়ে 'যথেষ্ট' হ'য়ে ওঠে ; অর্থাৎ তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিলো প্রকরণের বিশ্লেষণ। অলংকারের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগ করেছেন তাঁরা ; বহু তর্ক করেছেন, যা আমাদের কানে অনেক সময় ব্যাকরণ- বা আইনঘটিত বিতর্কের মতো শোনায়। উপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি যা-কিছু উপায় কবিরা ব্যবহার করেন, আমরা সেগুলোকে অলংকার ব'লে ভাবি না, কিংবা এ-কথাও ভাবি না যে তাদের অভাব মানেই কবিতার মৃত্যু। আমরা জেনেছি, এই তথাকথিত অলংকারগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন ক'রেও মহৎ কবিতা সম্ভব হ'তে পারে, এবং ভালো কবিতায় যখনই এদের ব্যবহার হয় তখনই এরা 'অলংকার' মাত্র থাকে না, অপরিহার্য অঙ্গ হ'য়ে ওঠে। কবিতাকে আমরা একটি অখণ্ড সত্তা ব'লে ধারণা করি ; তাতে, আদর্শ-অনুসারে, এমন-কিছুই থাকবে না যা তার হ'য়ে-ওঠার পক্ষেই প্রয়োজন ছিলো না, শুধু শোভাবৃদ্ধির জন্য যোগ করা হয়েছে। শোভিত বা শোভমান হওয়া কবিতার কাজ, এ কথা স্বীকার করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ভারতের গরীয়ান ভাস্কর্য-শালায় মিথুনমূর্তি অনেক আছে, কিন্তু বিশুদ্ধ নগ্নমূর্তি—জৈন তীর্থংকরের বিগ্রহ ছাড়া—একটিও দেখা যায় না। নগ্ন ব'লে যাদের মনে হয় তাদের নিম্নাঙ্গে থাকে বসনের আভাস, আর থাকে—স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে—বহু প্রথাসিদ্ধ, মর্যাদাবান অলংকার। বলা বাহুল্য, এর কারণ দেহ বিষয়ে কোনো কুণ্ঠা নয়—ভারতীয় চিত্ত বিষয়ে আর যে-কথাই বলা যাক, তাকে কেউ কখনো শুচিবায়ুগ্রস্ত বলবে না—এর পিছনেও এই ধারণা কাজ করছে যে ভূষণহীন সৌন্দর্য অসম্ভব। কিন্তু কোনারকের অপ্সরা বা অজন্তার মারকন্যার সঙ্গে তুলনীয় যে-সব মূর্তি বা ছবি য়োরোপীয় মহাদেশে রচিত হয়েছে, তারা সম্পূর্ণ নিরাভরণ ও নিরাবরণ। গ্রীক শিল্প চেয়েছে বিশুদ্ধ দেহকে সুন্দর ক'রে প্রকাশ করতে, কিন্তু পরবর্তীরা সুন্দরী নারীর প্রতিকৃতি আর আঁকেননি, সুন্দরকেই মূর্ত ক'রে তুলেছেন। বত্তিচেল্লির ভেনাসকে কোনো সুন্দরী নারী আর বলা যাবে না, কেননা ছবিটা নিজেই সুন্দর হ'য়ে উঠলো। এই শুদ্ধ নগ্নতার মধ্যে সৌন্দর্য তার স্বারাজ্য লাভ করলে, উচ্চারিত হ'লো শিল্পকলার স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

সকলেই জানেন, এই ছবির জন্মক্ষণেই য়োরোপীয় চিত্তের নবজন্ম ঘটে যার প্রভাব, আজ পর্যন্ত, সারা পৃথিবীতে কোনো-না-কোনো ভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে। ভারতের নিজভূমিতে তুলনীয় কোনো রেনেসাঁস ঘটেনি, কিন্তু ঘটলে যা হ'তে পারতো আমাদের ধ্যান-ধারণা আজকাল বহুলাংশে তা-ই ; হয়তো সেটাই মূল কারণ, যেজন্যে সংস্কৃত কাব্যাদর্শের সম্মুখীন হ'লে আমরা অপ্রস্তুত ও বিব্রত বোধ করি। একটা ছোটো দৃষ্টান্ত দিলে আমার কথাটা পরিষ্কার হ'তে পারে। সংস্কৃত 'শিল্প' বা 'কলা', আর য়োরোপীয় 'আর্ট'—এই শব্দ দুটির যাত্রাস্থল একই : দুয়েরই আদি অর্থ 'ক্রাফট', কারিগরি, যে-কোনো প্রকার হাতের কাজে দক্ষতা। 'কলা'র সংখ্যা যে চৌষট্টি হ'তে পারে এ-কথা শুনেই আমরা বুঝি এর অর্থ কত ব্যাপক এবং আমাদের পক্ষে অবান্তর। ঐ তালিকা যাঁরা রচনা করেন তাঁদের কাছে ভাস্কর্য আর মাল্যরচনায় প্রভেদ ছিলো ব্যবহার-গত, কিংবা হয়তো শ্রমের পরিমাণে— জাতের কোনো তফাৎ ছিলো না। যে-মহাশিল্পীরা এলিফ্যান্টা বা এলুরায় গুহামূর্তি গড়েছিলেন তাঁরা, আমাদের অর্থে, নিজেদের শিল্পী ব'লে ভাবতেই পারতেন না। তেমনি মধ্যযুগের য়োরোপেও চিত্রকরের সচেতন লক্ষ্য ছিলো— কোনো 'শিল্পকর্মে'র সৃষ্টি নয়, মন্দিরের প্রয়োজনমতো যীশুজীবনীর দৃশ্যরচনা, যাতে ভক্তের আত্ম-নিবেদনের পাত্র চোখের সামনে মূর্ত হ'য়ে থাকে। কিন্তু রেনেসাঁসের পরে 'আর্ট'-এর অর্থ একই সঙ্গে সংকুচিত ও বহুগুণে বর্ধিত হ'লো— এবং তা-ই থেকে অন্য সব পরিবর্তন ঘটেছে। আর্ট : তা বিচ্ছিন্ন হ'লো মানুষের ব্যবহারিক জীবন থেকে, দেবার্চনার সেবাদাসী আর থাকলো না, সিংহাসনের চামরধারিণীও নয়, সগর্বে বলতে পারলে, 'আমি কোনো কাজে লাগি না। আমি আছি।' আর্ট : তার মানে মুক্তি, শুদ্ধতা, এক ভূষণহীন স্বদীপ্ত নগ্নতা, যার সামনে এসে জগৎবাসীরা বলতে বাধ্য হয়— 'তোমার কাছে আর-কিছু চাই না, তুমি যে আছো, হ'তে পেরেছো, তারই জন্যে তুমি মূল্যবান।'

আধুনিক য়োরোপীয় চিত্তে কৃত্রিমের দিকে উন্মুখতা দেখা যায়নি তা নয়, কিন্তু তার অর্থ একেবারেই আলাদা। বোদলেয়ার-এর একটি কবিতা আছে, যার নাম 'অলংকার', বিষয় এক বিবসনা ও সালংকারা নারী। এই কবিতা পড়ার পরে সংস্কৃত কবিতার অলংকার বিষয়ে নতুন ক'রে ভাবতে হয়েছে আমাকে, কিন্তু দুই ধারণার মধ্যে কোনো সাদৃশ্যের কল্পনা থেকে নিজেকে সাবধানে বিরত করেছি। য়োরোপের যে-কবিরা, সদ্য-আগত যন্ত্রযুগে, সমাজের

সঙ্গে কবির বিচ্ছেদ বিষয়ে প্রথম সুতীব্রভাবে সচেতন হন, তাঁদের মধ্যে প্রধান পুরুষ বোদলেয়ার: তাঁর কবিতার মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেলো আর্টের আধুনিক ধারণা, রূপায়িত হ'লো প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের সেই দ্বন্দ্ব, শিলার যার তত্ত্বের দিক প্রকাশ করেছিলেন। আর তাই বোদলেয়ার-এর কবিতা কৃত্রিমের বন্দনায় মুখর: ভূষণের ধাতু ও রত্নদাম, বসনের রেশম ও সাটিন, সুরা, সুগন্ধ, আর স্বপ্নে-দেখা সেই প্যারিস, যেখানে সব উদ্ভিদ লুপ্ত হয়েছে, কোথাও আর তরুপল্লব নেই, চারদিকে শুধু ধাতু, পাথর ও লেলিহান রত্নমণির কারুকার্য, জল পর্যন্ত তরলিত সোনা, আর কালোর মধ্যেও বহু বর্ণ বিচ্ছুরিত— এই সব চিত্রকল্পের সাহায্যে সবলে প্রত্যাখ্যাত হ'লো প্রকৃতি, ঘোষিত হ'লো প্রতিভার পীড়া, নিঃসঙ্গতা ও মহিমা। তাঁর শৌখিনতা— dandyism— তাতেও আছে এমন এক জগতের আলেখ্য, যা সম্পূর্ণরূপে রচিত, স্ব-তন্ত্র ও অ-স্বাভাবিক: নারী সেখানে ঘৃণ্য কেননা মূর্তিমতী প্রকৃতির নামই নারী, আর ঘৃণ্য সমাজ-সংস্কারক, যেহেতু তিনি ঘনিষ্ঠভাবে 'জীবনে'র সঙ্গে যুক্ত থাকেন। এই 'জীবনে' (বা সমাজে) কবির আর স্থান নেই— একা সে, উদ্বাস্তু, দেশ, জাতি ও স্থিতিহীন—এখন সে সার্থক হ'তে পারে শুধু নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ হ'য়ে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরভাবে প্রতিভার শক্তিকে দাঁড় করিয়ে। তাই বোদলেয়ার বেশ্যা, জুয়াড়ি, ভিখিরি প্রভৃতি অন্ত্যজদের মধ্যে কবির প্রতিমূর্তি দেখেছিলেন, আর সমকালীন ফরাশি চিত্রকলায় সার্কাসের শস্তা নটনটী যে প্রিয় হ'য়ে উঠলো, তাও এইজন্যে। সামাজিক জীবনে, শিল্পী কি তাদেরই ভাগ্যের অংশিদার নয়?

এর সঙ্গে সংস্কৃত কবিদের অবস্থার অবশ্য কিছুই মিল নেই। তাঁদের পরিবেশের মধ্যে গৃহীত ছিলেন তাঁরা—শুধু গৃহীত নন, সম্মানিত। অনেকেই রাজার অনুগ্রহ পেয়েছেন, আর প্রচুর অবসর, সাংসারিক নিশ্চিতি। দশম শতকের আলংকারিক রাজশেখর কবির দৈনন্দিন জীবনের যে-বিবরণ রেখে গেছেন, তার সঙ্গে আরো অনেক পুরোনো 'কামসূত্রে' বর্ণিত নাগর বা নাগরিকের জীবন অনেক বিষয়ে মিলে যায়।

'কবি ছ-ঘণ্টা ঘুমোন, ভোরবেলা ওঠেন, প্রাতঃকৃত্য ও আহ্নিকাদি সেরে তিন ঘণ্টা পড়েন, আরো তিন ঘণ্টা লেখেন বা পূর্বদিনের রচনা সংশোধন করেন; অপরাহ্নে সাহিত্যিক বন্ধুদের সহযোগে স্বীয় রচনার সমালোচনায় লিপ্ত হন, তারপর আবার বসেন পরিশোধন করতে।' সারত তাঁর দিনগুলি রচনা, অধ্যয়ন ও সাহিত্যিক আলোচনায় পূর্ণ হ'য়ে থাকে এবং তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে

থাকেন 'রাজকন্যা, বারাঙ্গনা, এবং রাজপুরুষ ও নাগরদের বনিতাগণ।' শেষোক্ত ব্যক্তিরা—রাজশেখর জানাতে ভোলেননি—অনেক সময় বিদুষী হতেন, কবিতাও লিখতেন। আর কবিদের সম্মেলনের আয়োজন করা রাজকৃত্যের অন্যতম ছিলো। আমরা অনুমান করতে পারি, এই সমাজস্বীকৃত মসৃণ জীবন বহু শতক ধ'রে একই 'মন্দাক্রান্তা তালে' প্রবাহিত হয়েছে, কেননা ভারতে যদিও যুদ্ধ ও রাজ্য-বদল বহুবার ঘটেছে, সেই সব আন্দোলন সুদৃঢ় ঐতিহ্যবদ্ধ সমাজের গঠনকে স্পর্শ করতে পারেনি; অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা যুগ-যুগ ধ'রে হুবহু এক থেকে গেছে। বাৎস্যায়নের সঙ্গে রাজশেখরের কালের ব্যবধান দীর্ঘ, অথচ দু-জনে একই রকম আরাম ও নিশ্চিতির কথা লিখেছেন।

মনিয়র-উইলিয়মস 'কবি' শব্দের যে-সব অর্থ দিয়েছেন তার মধ্যে 'প্রাজ্ঞ' থেকে 'চতুর' ও 'ঋষি' থেকে 'মনীষী' পর্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সব স্তরই পাওয়া যায়। দেখা যাচ্ছে, এর ভাগ্য 'শিল্পী' শব্দের উল্টো। 'শিল্পে'র আরম্ভ কারুকর্মের নিম্নভূমিতে; আমরা আজকের দিনে তাকে 'art'-এর পদবিতে উন্নীত করেছি, যদিও এখনো সে 'craft'-এর সংসর্গ ছাড়তে পারেনি, এমনকি আর্টের জাতশত্রু 'industry'-র মহলেও সে মাঝে-মাঝে মুজরো খাটে। আর 'কবি'র যাত্রাস্থল ঋষিপদ, সেই উচ্চাসন থেকে তার পতন হ'লো যখন তার অর্থ দাঁড়ালো 'কবিতার লেখক'। কিংবা এটাকে পতন না-ব'লে বিবর্তনও বলা যায়; কবির আদিপিতা যে পুরোহিত এ-কথা পৃথিবী ভ'রেই সত্য; সংস্কৃতে যাজ্ঞিক পুরোহিতের নামান্তর ছিলো 'কব্য', এতে সম্বন্ধটি আরো স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

অন্তত পক্ষে কবিতা লেখা 'হাতের কাজ' নয়; আর এই কর্মের উপায় যখন সংস্কৃত ভাষা, তখন তাতে প্রকৃষ্ট হ'তে হ'লে শুধু সাধারণ অর্থে শিক্ষিত হ'লে চলে না, রীতিমতো পণ্ডিত হ'তে হয়। এবং সে-যুগে পণ্ডিত হবার মতো অবস্থা শুধু তাঁদেরই ছিলো যাঁদের জাতিগত পেশা পৌরোহিত্য। যে-সব ব্রাহ্মণ চিত্র- বা মূর্তিরচনায় কাজ নিতেন তাঁদের যাজনকর্মে আর অধিকার থাকতো না, বিশেষজ্ঞরা এই রকম ব'লে থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ যাঁরা কবিতা লিখেছেন—আর, অন্তত খ্যাতনামাদের মধ্যে অব্রাহ্মণ কেউ আছেন ব'লে ভাবা যায় না—তাঁদের কাউকে কখনো ব্রাত্য হ'তে হয়েছে এমন কথা কোনো ঐতিহাসিক বলেননি। বরং, কাব্য ও কাব্যের আলোচনা থেকে, এর উল্টোটাকেই সত্য ব'লে ধ'রে নিতে পারি। স্পষ্ট বোঝা যায়, ভারতের উন্নত, দর্পিত ও ঈর্ষাপরায়ণ ব্রাহ্মণসমাজ যুগ-যুগ ধ'রে বংশপরম্পরায় যে-সংস্কৃতিকে রক্ষা ও প্রচার করেছে,

সংস্কৃত ভাষার মুখ্য কবিরা তারই অন্তরঙ্গ ছিলেন—কাব্যের প্রকরণের দিক থেকে, বৌদ্ধ অশ্বঘোষকেও এর ব্যতিক্রম বলা যায় না। শুধু যে তাঁরা সমাজ থেকে চ্যুত হননি তা নয়, স্বপ্রতিষ্ঠ সম্মানের আসন পেয়েছেন। এই অবস্থার মধ্যে কবিতা যদি কৃত্রিমতার পথ নেয়, তাহ'লে তার বিকাশ হ'তে পারে শুধু এক ধনবান, সুখী ও ভঙ্গিপ্রধান শোভনশিল্পে—যাকে য়োরোপীয় ভাষায় বলে ডেকরেটিভ।

'ক-বোতল টানিলে মদ রঘুবংশম্ যায় গো লেখা?' অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের এই প্রশ্নের উত্তর আমরা কেউ জানি না, তবে প্রশ্নটিকে সংগত ব'লে মানতে পারি। সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণ সরিয়ে দিলে যা বাকি থাকে, সেই অভিজাত, বিধিবদ্ধ ও পরিশীলিত কাব্যসাহিত্যে কোথায় সেই প্রেরণার স্থান, যাকে মানুষ চিরকাল প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ ব'লে মেনেছে, একমাত্র যার প্রভাবে ভাষা হ'য়ে ওঠে দৈববাণী, সার্থক হয় বিদ্যা, প্রযত্ন, পরিশ্রম? এর উত্তর প্রাচীনেরা অমোঘভাবে দিয়ে গেছেন—শাস্ত্র লিখে নয়, প্রবচন রচনা ক'রে। হোমর যেমন অন্ধ, তেমনি বাল্মীকিও দস্যু ছিলেন; এমনকি কালিদাস—যাঁর ছত্রে-ছত্রে আত্মচেতনা ও উত্তরাধিকারবোধ পরিকীর্ণ—সেই বিদগ্ধ উত্তর-সূরিকেও বরপ্রাপ্ত জড়বুদ্ধি ব'লে রটনা করা হ'লো। কবিপ্রতিভার গভীরতম অন্তর্দেশ এই প্রবাদসমূহের লক্ষ্য। কবি—তিনি কখনো অবিকল সামাজিক বা স্বভাবী মানুষ হ'তে পারেন না—তাঁকে হ'তে হবে কোনো-না-কোনো দিক থেকে অভাবগ্রস্ত, যে-অভাবের ক্ষতিপূরণ করে 'দৈব' অথবা অবচেতনের ক্ষমতা। এই কথাটা আধুনিক মানুষের, আর এই কথাই চিরকালীন।

তবু ইতিহাসে মাঝে-মাঝে এমন অধ্যায় দেখা যায়, যখন কোনো আলোক-প্রাপ্ত রাজার বা কোনো নিশ্চল সমাজব্যবস্থার প্রভাবে, কবির সঙ্গে তাঁর পরিবেশের সামঞ্জস্য ঘটে, তিনি তাঁর শাশ্বত অশান্তি ভুলে যান, রাজসভার পার্শ্ববর্তী একটি বিদগ্ধ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে রচনাদ্বারা সেই গোষ্ঠীরই প্রীতি-সাধন করেন। সংস্কৃতে যাকে কাব্য বলে, সন্দেহ নেই তার প্রধান অংশ এমনি একটি অধ্যায়ের মধ্যে উদ্গত হয়েছিলো। তাই তার অলংকারবিলাসে কোনো প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ নেই, তার সুবিস্তৃত প্রসাধনশিল্প ব্যবহৃত হয় শুধু একটি ভঙ্গির সেবায়—যে-ভঙ্গিকে নির্দিষ্ট ও নিয়মাবদ্ধ ক'রে তোলাই সমগ্র 'অলংকার'-শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ফলত, যাকে ব্যক্তিগত বা প্রত্যক্ষ বলা যায় সংস্কৃত কবিতায় তার সম্ভাবনা ছিলো ন্যূনতম। বলা বাহুল্য, এই ধরনের কৃত্রিমতার

সঙ্গে বোদলেয়ার-এর ব্যবধান বিরাট: দুয়ের মধ্যে যুগান্তর ছড়িয়ে আছে। বোদলেয়ার কৃত্রিমের বন্দনা করেছিলেন স্বাভাবিক ভাষায়, অর্থাৎ তাঁর যেটা স্টাইল সেটা তাঁরই ব্যক্তিগত সৃষ্টি, কোনো সামাজিক ও সাধারণ ভঙ্গি নয়; যে-আবেগে তাঁর কবিতা সংরক্ত সেটাও সম্প্রদায়গত নয়, তাঁরই নিজস্ব। পক্ষান্তরে, সংস্কৃত কবিরা কৃত্রিম উপায়ে প্রকৃতির স্তব করেছেন; স্বাভাবিককেই ভালো ব'লে জানতেন তাঁরা ('শকুন্তলা'র বিখ্যাত চতুর্থ অঙ্ক স্মর্তব্য), অথচ ভূষণহীন স্বাভাবিকে তাঁদের সভাসদ-রুচির তৃপ্তি ছিলো না। নববধূ সালংকারা না হ'লে 'যথেষ্ট' হয় না, এ-কথাটা বিবাহসভায় মানা যেতে পারে, কিন্তু দম্পতির মিলনের কালে সেই ভূষণদাম যে আবর্জনামাত্র, তা মানুষ চিরকাল ধ'রে জেনেছে—যদিও ভারতসাহিত্যে বৈষ্ণব কবিদের আগে কেউ মুখ ফুটে বলেননি। একই রকম নিবিড় ও সম্পূর্ণ মিলন কবিতার সঙ্গে আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, কিন্তু সংস্কৃত কবিতায় অলংকারের ব্যবধান ঘোচে না।

কবিতা কোন গুণে ভালো হয়? বা কবিতা হয়? 'নীরসতরুবরঃ পুরতো ভাতি'— এটা, ছেলেবেলায় আমাদের শেখানো হয়েছে, 'রসাত্মক বাক্যে'র উদাহরণ। কেউ বলেনি যে এটা রাংতার মতোই চকচকে ও তুচ্ছ; শুকনো গাছকে 'তরুবর' বলা যায় না, তার প্রসঙ্গে কোনো 'আভা'র উল্লেখ হাস্যকর। তথ্যের সঙ্গে ভাষার এখানে শোচনীয় বিসংগতি ঘটেছে। কিন্তু 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে'—এর শব্দযোজনায় ও অনুপ্রাসে তথ্যটির যথাযথ ছবি পাওয়া যায় 'কাষ্ঠ' শব্দ বুঝিয়ে দিচ্ছে গাছটা কতদূর মৃত, নেহাৎ গদ্যভাবাপন্ন 'তিষ্ঠতি' ক্রিয়াপদেও রুক্ষতা প্রতিফলিত। এটা কবিতা কিনা জানি না, কিন্তু এর সফলতার প্রমাণ এই যে 'শুষ্কং কাষ্ঠং' আমাদের জীবিত ভাষার অংশ হ'য়ে গেছে। রুচি দূষিত না-হ'লে এই বাক্য নিন্দনীয়ের দৃষ্টান্ত হ'তে পারতো না।

বাংলাদেশের ঘুম-পাড়ানি ছড়ার একাধিক পাঠান্তর প্রচলিত আছে। যিনি লিখেছিলেন—

> ঘুম-পাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ি যেয়ো,
> বাটা ভ'রে পান দেবো গাল পুরে খেয়ো—

তাঁর ছিলো র‍্যাশনাল বা ন্যায়সম্মত মন, নিদ্রাদেবীকে তিনি ধারণা করেছেন একজন মাননীয়া প্রতিবেশিনী-রূপে, যাঁকে পান খাইয়ে খুশি করলে শিশুর নিদ্রারূপ বরলাভ সম্ভব হবে। এই কার্য-কারণ সম্বন্ধস্থাপনেই বোঝা যায় যে এর লেখক সুগৃহিণী ও সুমাতা— কিন্তু কবি নন, বড়ো জোর পদ্যকার। কিন্তু—

ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি মোদের বাড়ি এসো,
খাট নেই, পালঙ্ক নেই, চোখ পেতে বোসো—

এই পদ্যে সাংসারিক জ্ঞানের পরিচয় নেই, কিন্তু কবিত্ব আছে। 'চোখ পেতে বোসো'—মাসিপিসি-নাম্নী অতিথির কাছে এ-রকম একটা অসম্ভব প্রস্তাব তিনি করতে পারতেন না যদি-না তাঁর কল্পনার সাহস থাকতো। এই সেই যুক্তিহীনতা, যার সংক্রামে ভাষা হ'য়ে ওঠে ভাবনার দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা, কবিতা মুক্তি পায়। কিন্তু কোনো সংস্কৃত কবি কোনো মাতৃস্বসাকে শিশুর চোখের মতো অপরিসর ও বিপজ্জনক স্থানে বসতে বলতেন কিনা, আমি সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দিহান।

আজকের দিনে সকলেই স্বীকার করেন যে ভাষা দুই ভাবে কাজ করে: একদিকে সে খবর দেয়, অন্যদিকে সে জাগিয়ে তোলে। তথ্য বা জ্ঞানের জগতে আমরা চাই স্পষ্ট ও সুসংলগ্ন ভাষা, যার আয়তন তার সংবাদের সঙ্গে খাপে-খাপে মিলে যাবে। কিন্তু কবিতার ভাষায় আমরা খুঁজি প্রভাব, যা তার ব্যাকরণ-নির্দিষ্ট 'অর্থ'কে অতিক্রম ক'রে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে, যার বেগে আমাদের মনের অনেক স্বপ্ন, স্মৃতি, চিন্তা ও অনুষঙ্গের যেন ঘুম ভেঙে যায়, ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি অনবরত প্রহত হ'তে থাকে। অলংকারশাস্ত্রে—বিশেষত 'ধ্বনি' বাদে—তুলনীয় পরিভাষার অভাব নেই; কিন্তু যাঁরা বলেন, কবিতায় ভাষা কী-ভাবে কাজ করে, সে-বিষয়ে আধুনিক ধারণার পূর্বাভাস সেখানে পাওয়া যায়, তাঁদের কথায় আমার মন কোনোরকমেই সায় দেয় না। তত্ত্বের দিক থেকে ধ্বনিবাদীরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নৈয়ায়িক অভ্যাস কাটাতে পারেননি। পারেননি, তার কারণ তাঁদের সামনে উপযোগী উদাহরণ ছিলো না, রোমান্টিক মানস বৈষ্ণব কবিদের আগে জন্ম নেয়নি, সমগ্র ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এক আচারনিষ্ঠ, অনুষ্ঠানধর্মী, জাতিভেদবিভক্ত কঠিন কৌলীন্যের দুর্গে বাস করেছে। আমরা তাই অবাক হ'তে পারি না, যখন বামন বলেন—'কাব্যং গ্রাহ্যং অলংকারাৎ' বা 'সৌন্দর্যং অলংকারম্'—আমরা শুধু মর্মাহত হ'তে পারি।

ভামহ, যিনি ঐতিহাসিকের পরিচিত প্রথম আলংকারিক, তিনি স্বভাবোক্তিকে বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন এই ব'লে যে তা শুধু খবর দিতে পারে, আর কিছু পারে না।* তাঁর মতে বক্রোক্তি ও অতিশয়োক্তি নিয়েই কবিতার বাণিজ্য। ব্যঙ্গ্যার্থ বিষয়েও বলা হয়েছে যে হয় সেটি কবিতার একমাত্র অর্থ

হবে, নয়তো বাচ্যার্থের চেয়ে তার উৎকৃষ্ট হওয়া চাই। আবার, ব্যঙ্গ্যার্থ থেকেও 'ধ্বনি' বা রসের ব্যঞ্জনাকে আলাদা করা হ'লো। এই শেষোক্ত মতই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে আকর্ষণযোগ্য, কিন্তু 'ধ্বনি'র বিখ্যাত উদাহরণ—'লীলাকমল-পত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী'—এতে আমরা দেখতে পাই, মহৎ কবিতার নমুনা নয়, এক চারু ও সুকুমার বক্রোক্তি, যা তার ছন্দোবদ্ধতার গুণে উদ্ধৃতিযোগ্য হয়েছে। তেমনি, আমরা যখন ভামহ বা বামনের বিরোধী মত শুনতে পাই যে অলংকার থাকলেই কবিতা হয় না আর না-থাকলেও কবিতা হ'তে পারে—তখন এই তত্ত্বে আমরা উৎসাহ বোধ না-ক'রে পারি না, কিন্তু দৃষ্টান্ত দেখলেই নিরাশ হ'তে হয়। 'মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে…' 'কুমারসম্ভব'-এর এই বিখ্যাত শ্লোকটিকে আমরা নিশ্চয়ই হৃদয়গ্রাহী বা মনোরম বলবো, কিন্তু তার বেশি বলবো না; এটি স্বভাবোক্তি হ'তে পারে, কিন্তু এর অভিপ্রায় বর্ণনামাত্র, যার আড়ালে অন্য কিছু নেই, আর যার চিহ্নসমূহ বর্ণিত বিষয়েরই তথ্য থেকে সংগৃহীত। 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র একটি গান—

শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে
অতল জলের আহ্বান।
মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে,
চঞ্চল প্রাণ॥

এরও বিষয় বসন্ত, বা যৌবন, বা কামোন্মাদনা, কিন্তু এতে 'বর্ণনা' নেই, বসন্ত, যৌবন বা তার সম্পৃক্ত কোনো তথ্য উল্লিখিত হয়নি, কিন্তু যৌবনের বেগ অনেক বেশি তীব্রতার সঙ্গে সঞ্চালিত হয়েছে। এখানে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা যে-ভাবে পাওয়া যাচ্ছে, ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির ব্যাখ্যাতাদের তা ধারণার মধ্যে ছিলো না।

আলংকারিকদের মধ্যে মতভেদ প্রচুর, কিন্তু তাঁদের প্রশংসিত শ্লোকাবলিতে, আমরা দেখতে পাই, হয় কোনো অলংকার আছে, নয় ব্যঙ্গ্যার্থ, নয় কোনো বর্ণনার বিস্তার। এদিকে আধুনিক কালে এমন অনেক পঙক্তি বা কবিতা আমরা জেনেছি, যা নিতান্তই নিরলংকার, সরল একটি স্বভাবোক্তি মাত্র, এবং যেখানে বাচ্যার্থই অনন্য, পরম ও মহাশক্তিমান। এর অনেক উদাহরণ মনে পড়ছে, কিন্তু আমি আপাতত ইচ্ছে ক'রেই বৈদেশিক উদ্ধৃতি থেকে বিরত হলাম।

ফুল বলে ধন্য আমি মাটির 'পরে।
কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে!
তোরা কেউ পারবি নে গো / পারবি নে ফুল ফোটাতে

উদ্ধৃত পঙক্তিগুলির প্রত্যেকটিতে ব্যঙ্গ্যার্থ বা অলংকারের বদলে যা পাওয়া যাচ্ছে তা একটি দূরস্পর্শী ও বিকীর্যমাণ প্রভাব। 'ফুল' থেকে কোনো আভিধানিক অর্থ কিছুতেই বের করা যাবে না, তার সরল অর্থ বাতিল হচ্ছে না কোনোখানেই, অথচ একটি থেকে অন্যটিতে পৌঁছনোমাত্র আমরা অনুভব করি যে শব্দটির ইঙ্গিত বদলে-বদলে যাচ্ছে: কখনো তাতে মরত্বের ভাব পাচ্ছি, কখনো ব্যর্থতার, কখনো বা সৌন্দর্যের। এই ইঙ্গিতের বিচ্ছুরণ, যাকে বিভিন্ন পাঠক (বা একই পাঠক বিভিন্ন সময়ে) ভিন্ন-ভিন্ন ভাবনায় রঞ্জিত ক'রে দেখবেন, কবিতার কাছে এটাই আমাদের প্রধান প্রার্থনা। সম্ভবত অলংকারবাদীরা এদের মধ্যেও কোনো-না-কোনো 'অলংকার' আবিষ্কার করতেন (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সংজ্ঞার্থরচনার ক্ষমতা তাঁদের অসীম ছিলো), কিন্তু যে-তত্ত্ব অলংকারহীন কবিতার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তা 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' বিষয়ে নিঃসাড় ও নীরব থাকতে বাধ্য। আর সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে এই কৃশ, নগ্ন ও একান্ত বাণীর তুলনা কোথায়?

তত্ত্বের পরিচয় তার প্রয়োগে। রবীন্দ্রনাথের 'ফুল'—বা 'পথ' বা 'প্রদীপ'—আমরা এদের বলতে পারি চিত্রকল্প (বা হয়তো প্রতীক), এবং এই দুই আধুনিক পরিভাষার সঙ্গে কোনো কোনো অলংকার-সূত্রের সাদৃশ্য অনুমান করা অসম্ভব নয়। কিন্তু ব্যবহারগত পরীক্ষা করলেই নির্ভুলভাবে প্রভেদ ধরা পড়ে। 'চিত্রকল্প' ও 'প্রতীকে'র ব্যাখ্যা যা-ই হোক না, কার্যত তাদের এক দিকে থাকে চিত্ররচনা, আর অন্য দিকে এক গভীর রহস্য, যাতে জাল ফেলে আমরা তুলে আনতে পারি—হয়তো শূন্যতা, হয়তো এক মুঠো শামুক, হয়তো কখনো মুক্তো বা আশ্চর্য উদ্ভিদ, আর কখনো যার স্তরে-স্তরে ডুবে গিয়ে বহু রত্ন উদ্ধার ক'রে আনি। কিন্তু রহস্য—বা যে-কোনো প্রকার অস্পষ্টতা—সংস্কৃত কবিতার ধর্মবিরোধী; তার 'লক্ষণা' বা 'ব্যঙ্গ্যার্থে'ও নিশ্চয়তা চাই। এক শ্লোকের একাধিক অর্থ আদৃত হ'তো, কিন্তু এই গুণের উদাহরণস্বরূপ অনেক সময় যা উদ্ধৃত হয়েছে তা শুধু কথা নিয়ে খেলা, যমক বা শ্লেষের চাতুর্য।

প্রসন্নাঃ কান্তিহারিণ্যো নানাশ্লেষবিচক্ষণাঃ। ভবন্তি কস্যচিৎ পুণ্যৈর্মুখে বাচো গৃহে স্ত্রিয়ঃ॥

মুখে বাক্ ও গৃহে স্ত্রী কোন শর্তে পুণ্যমণ্ডিত হয়, একই শ্লোকের মধ্যে তা বলা হচ্ছে। 'প্রসন্ন': 'যার অর্থ নির্মল' অথবা 'যার মেজাজ ভালো'; 'কান্তিহারিণী'; 'মধুর রসমণ্ডিত' বা 'যার কণ্ঠহার মনোহর'; 'নানাশ্লেষবিচক্ষণা: নানা শ্লেষ

(pun) বা আশ্লেষে (আলিঙ্গনে) নিপুণ। প্রত্যেকটি বিশেষণে দুটি ক'রে অর্থ পোরা আছে, কিন্তু দ্বিতীয়টি বের করামাত্র সমস্তটাই ফুরিয়ে গেলো—তার বেশি আর-কিছু নেই।

আমি জানি, অনামা লেখকের এই রচনা সংস্কৃত কবিতার প্রতিভূ নয়; যদি ছন্দোবদ্ধ রচনামাত্রই কবিতার নাম দাবি করতে পারে তাহ'লেও এটি জাতে ছোটো থেকে যাবে, এবং আলংকারিকদের মধ্যেও অন্তত ধ্বনিবাদীরা এর নিকৃষ্টতা স্বীকার করতেন। যদি এটি সংস্কৃত সাহিত্যে আকস্মিক হ'তো তাহ'লে এটি উল্লেখ্য হ'তো না। কিন্তু এর সধর্মী রচনা সুভাষিতাবলিতে অপর্যাপ্ত এবং মহাকবিরাও শব্দব্যসনের মোহ থেকে মুক্ত নন। এর বীজ লক্ষ্য করা যায় এমনকি বাল্মীকিতেই, যিনি যথার্থ শিলারীয় অর্থে 'নাঈভ', প্রকৃতির দুলাল, যাঁর কাব্যের সহজ শ্রী আধুনিক কবির প্রার্থিত হ'লেও অপ্রাপণীয়। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে শরৎবর্ণনায় একটি শ্লোক :

চঞ্চচ্চন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিততারকা। অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতু স্বয়মম্বরম্॥

এখানেও এক ঢিলে দুই পাখি মরেছে—'চন্দ্রকর': চাঁদের কিরণ বা হাত; 'তারকা': আকাশের বা চোখের তারা; 'রাগবতী': অস্তরাগবতী বা অনুরাগবতী; 'অম্বর': আকাশ বা বসন। 'সন্ধ্যা, চাঁদের আলোয় হৃষ্ট হ'য়ে তারা ফুটিয়ে তুলেছে, এখন সে নিজেই আকাশ ছেড়ে চ'লে যাক'—এই সরল অর্থের সংলগ্ন হ'য়ে আছে নায়িকারূপিণী সন্ধ্যার ছবি, চাঁদের হস্তস্পর্শে যার চোখ পুলকে উন্মীল, এবং এখন যে নিজেই বসন ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এই যুগ্মচিত্রের রমণীয়তা আমরা মানতে বাধ্য, তবু এই সুখ ক্ষণকাল পরেই ভেঙে যায়, যখন দেখি দুয়ের মধ্যে কোনো পারস্পরিক সম্বন্ধ নেই, তাদের জুড়ে দেয়া হয়েছে শুধু যান্ত্রিক কৌশলে, একটি অপরটিকে কিছু দান করছে না, দুই অপরিচিতের মতো দূরে-দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এই ধরনের পদ রচনা না-করলে বাল্মীকির কোনো ক্ষতি ছিলো না, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা, তার সন্ধি সমাস প্রতিশব্দ নিয়ে, এই দিকে বিরাট ফাঁদ পেতে রেখেছে।

তবু, বাল্মীকি নিজে অন্তত জানতেন না যে 'রাগবতী সন্ধ্যা'য় তিনি 'সমাসোক্তি অলংকার' ব্যবহার করছেন, আর 'বাচ্যার্থ' ও 'ব্যঙ্গ্যার্থে'রও তিনি নাম শোনেননি ব'লে ধ'রে নেয়া যায়। কিন্তু একই কথা কালিদাস বিষয়ে বলা যায় কি? তিনি যে ভামহের পূর্ববর্তী এ-বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত;

কোনো লুপ্ত, প্রাচীনতর অলংকারশাস্ত্র তাঁর কালে চলিত ছিলো কিনা, সে-বিষয়ে জল্পনা ক'রে লাভ নেই। কিন্তু তাঁর গ্রন্থাবলি আমাদের আছে, আর আছে এই সাধারণ জ্ঞান যে ব্যাকরণ যেমন ভাষার, তেমনি কবিতার অনুগামী রসতত্ত্ব। উদাহরণ জ'মে না-উঠলে ব্যাখ্যায় কোনো প্রয়োজন ঘটে না। এ-কথাও সত্য যে দ্বাদশ শতকের মল্লিনাথ কালিদাসের কাব্যে যত বিচিত্র অলংকার খুঁজে পেয়েছেন তার অনেকগুলোই আমাদের মনে হয় কবিতার সাধারণ ভাষা, যা তার প্রকাশের পক্ষেই প্রয়োজন। কিন্তু তবু কালিদাসের উপর জ্ঞানের বা চাতুর্যের সন্দেহপাত অনিবার্য; তাঁর রচনা পড়ামাত্র বোঝা যায় বাল্মীকির চেয়ে—এমনকি অশ্বঘোষের চেয়ে—তিনি কত বেশি আত্মসচেতন, বিদগ্ধ, এবং বিনষ্ট। 'মেঘদূত'-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মল্লিনাথ যত অভিধান ও শাস্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, তার সবই কালিদাসের পরবর্তী ব'লে ধ'রে নেবার কারণ নেই; যদি তার কিয়দংশের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘ'টে থাকে, তাহ'লে তাঁকে আলংকারিকের ভাষায় 'শাস্ত্রকবি' ব'লে মানতে হয়। অর্থাৎ শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ দু-মুখো; যেমন আলংকারিকেরা সম্ভবত তাঁরই কাব্য থেকে তাঁদের কোনো-কোনো ধারণা আহরণ করেছিলেন, তেমনি তিনিও মাঝে-মাঝে শ্লোক লিখেছিলেন কোনো নীতি বা কামশাস্ত্রের আক্ষরিক অনুসরণে।

হ'তে পারে, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস এখনো নিশ্চিত নয়, কিন্তু নিশ্চিত হ'লেও আমি শুধু কালক্রমের উপর নির্ভর ক'রে কিছু বলতে চাই না। রচনার মধ্যে যা পাওয়া যায়, আমার আলোচনার পক্ষে তারই সাক্ষ্য জরুরি। অলংকার বিষয়ে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন উক্তি পাশাপাশি চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, কবিতার বিষয়ে আধুনিক ধারণা কত ভিন্ন। মনস্তত্ত্বের হিশেবে, বনিতার ও কবিতার অলংকারে তফাৎ নেই; প্রথমটির বিষয়ে আমাদের যা আদর্শ, তা-ই দ্বিতীয়টিতে প্রতিফলিত হ'য়ে থাকে। এখন কালিদাস সর্বান্তঃকরণে অলংকারে বিশ্বাসী; তাঁর কাব্যের মেয়েরা দেখতে কেমন তা তিনি কোনো-কোনো সময়ে না-জানাতে পারেন, কিন্তু বসনভূষণের উল্লেখ করতে কখনো ভোলেন না। 'মেঘদূতে' যক্ষনারীদের তিনি যে পুষ্পাভরণে সাজিয়েছেন সেটাও তাঁর উচ্চতর বৈদগ্ধ্যেরই প্রমাণ দেয়। অলকায় সোনা ও মণিরত্নের প্রাচুর্য এত বিপুল যে তার মেয়েদের মোহিনী ক'রে দেখাতে হ'লে ফুলের গয়নাই পরানো দরকার—যে-সব ফুল, ছয় ঋতুর সংকলন ব'লে, আমরা কখনো একসঙ্গে দেখবো না।

আত্মঘাতী যুবকও অনুভব ক'রে গেছে ('আরো এক বিপন্ন বিস্ময় / আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে / খেলা করে'), এবং রবীন্দ্রনাথও যৌবনে একবার লিখেছিলেন : 'ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে / বেঁধেছিস বাসা।' কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথ যখন 'জীবনবধূ'কে 'নিত্য অনুগতা' ব'লে চিহ্নিত করলেন, যার সঙ্গে 'একটি শুভ দৃষ্টিপাতে' মৃত্যুর মিলন হবে, তখন, পূর্ববর্তী 'খেয়া'র 'বালিকা বধূ' ('ওগো বর, ওগো বঁধু',) কবিতাটি স্মরণে রেখে, আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না 'মৃত্যু' এখানে কিসের নামান্তর।

মানুষের মনে সত্যি অকারণ কিছু আছে কিনা, এই প্রশ্নের মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি। রোমান্টিকের দুরন্ত বাসনা কিসের জন্য? কিছুতেই কেন তৃপ্তি নেই তার? 'পৃথিবীর বাইরে' কিসের সন্ধানে যেতে চায়? আকাঙ্ক্ষা তার অমেয়র জন্য, পরমের জন্য, অমরতার জন্য। তৃপ্তি নেই, কেননা সংরাগের চরম আনন্দ ও চরম নির্যাতন সহ্য ক'রেও, কাম, কোহল ও দুষ্ক্রিয়ার পরিশ্রমী সোপান পার হ'য়েও, এবং ত্যাগের, দুঃখের, প্রায়শ্চিত্তের কণ্টকশয্যা বরণ ক'রেও, সে অমেয়কে, পরমকে, অমরতাকে লাভ করে না। কিন্তু তাই ব'লে আকাঙ্ক্ষা তার নষ্ট হয় না, বন্ধ হয় না সাধনা, নূতন থেকে নূতনতরতে অনবরত চলে তার সন্ধান—তার ভ্রমণ। সেই নূতন, সেই নিত্য অজানা, সেই অবিরল-দূরে-স'রে-যাওয়া দিগন্ত—তারই মধ্যে বোদলেয়ার দেখেছেন মৃত্যুর সার্থকতা ও অন্তঃসার :

> হে মৃত্যু, সময় হ'লো! এই দেশ নির্বেদে বিধুর।
> এসো, বাঁধি কোমর, নোঙর তুলি, হে মৃত্যু প্রাচীন!
> কাণ্ডারী, তুমি তো জানো, অন্ধকার অম্বর সিন্ধুর
> অন্তরালে রৌদ্রময় আমাদের প্রাণের পুলিন.
>
> ঢালো সে গরল তুমি, যাতে আছে উজ্জীবনী বিভা!
> জ্বালো সে-অনল, যাতে অতলান্তে খুঁজি নিমজ্জন!
> হোক স্বর্গ, অথবা নরক, তাতে এসে যায় কী-বা,
> যতক্ষণ অজানার গর্ভে পাই নূতন— নূতন! ('ভ্রমণ')

এই সঙ্গে 'আলোকস্তম্ভ' কবিতার শেষ স্তবকটি পাঠ করলে আমরা বুঝতে পারবো যে বোদলেয়ার যাকে মূল্যবান ব'লে জেনেছেন, তা প্রাপ্তি নয়, অমৃতের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও অন্বেষণ :

আর কী প্রমাণ আছে? ভগবান, এ-ই তো পরম,
এ-ই তো নির্ভুল সাক্ষ্য আমাদের দীপ্ত মহিমার,
এই যে আকুল অশ্রু যুগে-যুগে করে পরিশ্রম
অবশেষে লীন হ'তে অসীমের সৈকতে তোমার!

এই 'প্রমাণ'গুলি, পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চাই, চিত্রকলার বিবিধ নিদর্শন, রচিত শিল্পকর্ম, চৈতন্যের প্রসূন। কিন্তু রুবেন্স-প্রমুখ মহাশিল্পীরা শুধু নন, বোদলেয়ারে এমন কেউ নেই—খুনে, মাতাল, লম্পট কিংবা অভাজন,* কেউ নেই যে চৈতন্যের দ্বারা আক্রান্ত ও পীড়িত নয়, ভাবনা যার অস্ত্রে-তন্ত্রে দংশন করেনি, কিংবা যার বিবেকের ভার প্রতিভূ-কবি বহন করছেন না। মানুষ দুঃখী, কিন্তু সে জানুক সে দুঃখী; মানুষ পাপী, কিন্তু সে জানুক সে পাপী; মানুষ রুগ্ন, কিন্তু সে জানুক সে রুগ্ন; মানুষ মুমূর্ষু, এবং সে জানুক সে মুমূর্ষু; মানুষ অমৃতাকাঙ্ক্ষী, এবং সে জানুক সে অমৃতাকাঙ্ক্ষী: বোদলেয়ারের সমগ্র কাব্যে, যেমন ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে, এই বাণী নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে। সকলে জানবে না, জানতে পারবে না বা চাইবে না; কিন্তু কবিরা জানুন। এই জ্ঞানেই আধুনিক সাহিত্যের অভিজ্ঞান।

'শার্ল বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকা

* ব্যতিক্রম শুধু নারীরা, কিন্তু নারী তো 'স্বাভাবিক', অর্থাৎ মনোহীন। 'ফ্লর দ্যু মাল' ও 'প্যারিস স্প্লীন'-এ নারীদের উদ্দেশে বা বিষয়ে অনেক কবিতা আছে, কিন্তু নারীর কোনো স্বগতোক্তি নেই; একমাত্র 'বিধবারা' নামক গদ্যকবিতাটিতে ছাড়া, কোথাও নারীকে আমরা চিন্তা করতে শুনি না।

ভাষা, কবিতা ও মনুষ্যত্ব

একমাত্র মানুষের ভাষা আছে, এবং মানুষমাত্রেরই ভাষা আছে। সমস্ত জীব-জগতে অন্য কারো ভাষা নেই।

জীবের কাছে প্রকৃতির চাহিদা এই যে সে বংশানুক্রমে পৃথিবীতে টিঁকে থাকবে। এই চাহিদা মেটাবার জন্য ভাষার কোনো প্রয়োজন হয় না। আত্ম-রক্ষা, প্রজনন ও সন্তানপালন— এই তিন কর্মই বিনা ভাষায় সম্পন্ন ও সুসম্পন্ন হ'তে পারে।

এমনকি মানুষের পক্ষেও ভাষা ব্যতিরেকে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ব্যক্ত করা সম্ভব, এবং যৌন কামনা জানাতে ও জাগাতে হ'লে বরং ভাষার চেয়ে কটাক্ষই বেশি কাজে লাগে। শিকার বা যুদ্ধ যখন মানুষের জীবিকার উপায় ছিলো তখন চীৎকার তার বলবৃদ্ধি করেছে, এবং সন্তানের জন্মের ভূমিকাস্বরূপ আজ পর্যন্ত নরনারীর কণ্ঠ যা উচ্চারণ ক'রে থাকে, আমাদের পূর্বপুরুষ তার নাম দিয়েছিলেন শীৎকার। চীৎকার বা শীৎকার, এর কোনোটাকেই ভাষা বলে না।

প্রজাপতির সংকল্পপূরণ ভাষানিরপেক্ষ ব্যাপার। দুই অংশিদার, পরস্পরের ভাষা না-জেনেও, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব লাভ করতে পারে। যদি আণবিক অস্ত্রে মানবজাতির ধ্বংস ঘটে, টিঁকে থাকে শুধু কতিপয় কাফ্রি পুরুষ ও কতিপয় এস্কিমো নারী, তাহ'লে— যদি ঐ দু-দলে সাক্ষাৎ হয়— তারাই মানবজাতিকে আসন্ন লুপ্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না তা নয়। তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারে না ব'লে সেই মহৎ কর্মে বিঘ্ন হবে না।

অন্যান্য প্রাণীর গলা দিয়েও আওয়াজ বেরোয়। খিদে পেলে, আঘাত পেলে, কামের বা বাৎসল্যের আবেগে অধিকাংশ স্থলচর পশু নিজ-নিজ বিধিবদ্ধ ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহার ক'রে থাকে। পুরুষ-পাখি ইনিয়ে-বিনিয়ে সঙ্গিনীকে আহ্বান করে, আমাদের কানে তা সুশ্রাব্য ব'লে বোধ হয়, আমরা তার নাম দিয়েছি 'গান'। কিন্তু সেই ধ্বনিসমূহের পরপারে, অন্য এক দিগন্তে, মানুষের ভাষার উদয় হয়েছিলো।

পিঁপড়ে ও মৌমাছি সংঘবদ্ধ সামাজিক জীবন যাপন করে; মৌচাক বা

সরকারি ভাষা-কমিশনের বিবৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

বল্মীকের গঠনপটুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই প্রাণীদের বিষয়ে বিস্ময়কর তথ্য বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। এরা ব্যূহরচনা জানে, পারে দূরে কাছে খবর পাঠাতে, বিপৎকালে স্বজাতিকে সতর্ক ক'রে দিতে। অর্থাৎ, সামাজিক জীবন ভাষা বিনাও সম্ভব।

২

ভারতীয় ভাষা-কমিশনের যে-বিবৃতি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তার মুখবন্ধের সংস্কৃত বচন উদ্ধৃতিযোগ্য :

…যদ্বৈ বাঙ্ নাভবিষ্যৎ ন ধর্মো নাধর্মো ব্যজ্ঞাপয়িষ্যৎ ন সত্যং নানৃতং ন সাধু নাসাধু ন হৃদয়জ্ঞো নাহৃদয়জ্ঞো বাগেবৈতৎ সর্বং বিজ্ঞাপয়তি বাচমুপাস্স্বেতি। (ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ (৭।২।১)

যদি বাক্ না থাকতো তবে ধর্ম বা অধর্ম বিজ্ঞাপিত হ'তো না; সত্য বা অসত্য, শুভ বা অশুভ, মনোজ্ঞ বা অমনোজ্ঞ— কিছুই বিজ্ঞাপিত হ'তো না। বাক্‌কে উপাসনা করো।

বাক্ যদি উপাস্য হয় তা কি শুধু এইজন্য যে তার অভাবে 'কিছুই বিজ্ঞাপিত হ'তো না'? ভাষা ছাড়া কিছুই জানা যায় না, এ-কথা কি সত্য? নিমের পাঁচন মুখে পড়লেই আমরা জানতে পারি সেটা মনোজ্ঞ নয়, আর মধু যে মনোজ্ঞ তার প্রমাণ রসনাতেই নির্ভুলভাবে পাওয়া যায়। ভঙ্গিতে ও চোখের দৃষ্টিতে মিথ্যা ধরা পড়ে; শীতে আচ্ছাদন বা তৃষ্ণায় জল যে শুভ বস্তু তা স্বতই ও সেই মুহূর্তেই বিজ্ঞাপিত হ'য়ে থাকে। যে-লোকটার এইমাত্র পকেট কাটা গেলো তাকে ধর্ম ও অধর্মের তফাৎ বোঝাবার জন্য শাস্ত্র প'ড়ে শোনাতে হয় না। অতএব, যদিও উপনিষদের বচন, ভাষার এই সংজ্ঞার্থ অগ্রাহ্য।

কিন্তু উপনিষদ্-সমূহেই ভাষা বিষয়ে অন্য যে-সব বাণী আছে, সেগুলিকে উপেক্ষা ক'রে যে ভাষা-কমিশন এই বিশেষ বচনটিকে বীজমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছেন —তা দৈবাৎ নয়, রীতিমতো সুচিন্তিতভাবে। ভাষা বিষয়ে অধিকাংশ সদস্যের যা মনোভাব— ভাষা বলতে তাঁরা যা বোঝেন— তার নিকটতম সংহত রূপ এই বচনে বিধৃত আছে। সে-মনোভাব তাঁদের ২৬৯ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘায়িত আলোচনার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, এবং ২৬৯ পৃষ্ঠা ধ'রে যে-কথা তাঁরা প্রচ্ছন্ন রেখেছেন তা স্পষ্টভাবে, নির্ভুলভাবে প্রকট হ'য়ে উঠেছে গ্রন্থের সর্বশেষ অনুচ্ছেদটিতে :

Language is in a sense profoundly important and in another sense of little or no consequence! It is important at the level of

instrumentality. It is a loom on which the life of a people is woven. It is, however, of no intrinsic consequence in itself because it is essentially an instrumentality: the loom, not the fabric; only a vehicle of thought and not thought itself; a receptacle for the traditions, usages aud cultural memories of a people, but not their substance. It is not language but education that is aimed at in the schools; it is not language but good government that is aimed at in the field of public administration; it is not language but justice that is sought in the law courts. That which lends itself to the most convenience is the correct solution of the languege proplem in the various fields. Surely, there does not have to be heat and passion over the issue of Language, ever the instrumentality and not the substance! (ভাষা-কমিশনের রিপোর্ট : পরিচ্ছেদ ১৫, অনুচ্ছেদ ১৮, পৃ ২৭৯)

ভাবানুবাদ :

ভাষা এক অর্থে অত্যন্ত বেশি জরুরি, অন্য অর্থে এতে প্রায় কিছুই এসে যায় না! ভাষা যেখানে যন্ত্র, সেখানে তা মূল্যবান। ভাষা সেই তাঁত, যাতে জাতির জীবন বোনা হ'য়ে থাকে। কিন্তু তার নিজস্ব মূল্য কিছু নেই, কেননা তা সারত একটি যন্ত্র মাত্র, শুধু তাঁত, বস্ত্র নয়, শুধু চিন্তার বাহন কিন্তু চিন্তা নয়; একটি জাতির আচার, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক স্মৃতির আধার, কিন্তু তাদের সারবস্তু নয়। বিদ্যালয়ে আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, শিক্ষা; সরকারি কর্মের ক্ষেত্রে আমাদের যা লক্ষ্য তা ভাষা নয়, সুশাসন; আদালতে আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, সুবিচার। সুবিধা যাতে সর্বাধিক, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাষাসমস্যার সেটাই নির্ভুল সমাধান। ভাষার প্রশ্ন নিয়ে নিশ্চয়ই হৃদয়াবেগ ও উত্তেজনার প্রয়োজন করে না— যে-ভাষা কখনোই সারবস্তু নয়, শুধু যন্ত্র!

অনুচ্ছেদটির প্রথম ও শেষ বাক্যে একেবারে সরলভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে ভাষা নামক বস্তুটা কোনো বস্তুই নয়, তাতে প্রায় কিছুই এসে যায় না। এই বক্তব্যকে জোরালো ক'রে তোলার জন্য এর প্রণেতাগণ দু-দুটি অবজ্ঞাসূচক বিস্ময়চিহ্নেও বিদ্ধ করেছেন একে— যেন ভাষা ব্যাপারটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চান। 'Instrument'-এর বদলে 'instrumentality' ব'লে ঠিক কী তফাৎ করা হ'লো, তা বোঝার মতো সুগভীর ইংরেজি জ্ঞান আমার নেই; কিন্তু এ-কথা সহজেই অনুমেয় যে 'যন্ত্র'রূপে স্বীকার করলেও যেটুকু স্বকীয় মর্যাদা দিতে হয় তাও তাঁরা ভাষাকে দিতে নারাজ, তাকে তাঁরা অতি কষ্টে মানতে পারেন বড়ো জোর একটি 'যান্ত্রিকতা' হিশেবে—যা সম্পূর্ণ নির্বস্তুক, বিমূর্ত, প্রায় অস্তিত্বহীন। কিন্তু শব্দপ্রয়োগের সূক্ষ্ম বিচারে যদি প্রবৃত্ত

না-ও হই, তাহ'লেও সন্দেহ করা যায় না যে ভাষা-কমিশনের অধিকাংশ সদস্য ভাষা বলতে বোঝেন একটি যন্ত্র বা বাহন, একটি আধার বা উপায় মাত্র; যার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন ক'রে থাকি। এবং আমি এই মুহূর্তেই ব'লে নিতে চাই যে ভাষা বিষয়ে এই ধারণা সারত ভুল, মূলত মিথ্যা, মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতিবাদী।

ভাষা যে-অর্থে উপায়মাত্র— 'means of communication'— সে-অর্থে ইতর প্রাণীরও ভাষা আছে। পাখি ডাকে, পশু গর্জন করে, পিঁপড়ে প্রভৃতি কীটেরা স্পর্শের দ্বারা বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়। শুধু বার্তা পৌঁছিয়ে দেবার জন্য মানুষেরও সব সময় ভাষার দরকার করে না। চোখের দ্বারা প্রেম, ঘৃণা, অনুরোধ, নিষেধ, ভয়, বিতৃষ্ণা ব্যক্ত করা যায়; হাতের স্পর্শে প্রকাশ করা যায় সেবা, কামনা, শুভেচ্ছা, আবার সেই স্পর্শেরই ওজন বাড়িয়ে দিলে হিংসাবৃত্তি প্রকট হ'য়ে ওঠে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসংখ্য সাংকেতিক ভঙ্গি মানবসমাজে প্রচলিত আছে: চিমটিও একপ্রকার বার্তা— 'communication', চিমটিভোগীর 'উঃ' শব্দও তা-ই। ভাষা বাদ দিয়েও যদি এতদূর পর্যন্ত বিনিময় করা যায়, আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধিতে বিঘ্ন না ঘটে, এবং সামাজিক জীবনও সম্ভব হয়, তাহ'লে মানুষের ভাষার প্রয়োজন হ'লো কেন?

উত্তরে বলা যেতে পারে যে চিমটি, চুম্বন বা হ্রেষাধ্বনির তুলনায় ভাষা অনেক ব্যাপকতর অর্থে বার্তাবহ; মানবসমাজের বহুবিচিত্র কর্মের যথাযোগ্য সম্পাদনের পক্ষে যথেষ্ট হবে এমন চিহ্নসমূহ শুধু ভাষাতেই পাওয়া যায়;— স্পর্শে, ভঙ্গিতে বা নিনাদে নয়। 'আমার খিদে পেয়েছে' বা 'আমি তোমাকে কামনা (বা ঘৃণা) করি'— এ-রকম কথা ভঙ্গির দ্বারা বলা গেলেও 'কংগ্রেসকে ভোট দিন', 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক' বা 'একনায়কত্বের অবসান চাই' বলতে হ'লে ভাষা ভিন্ন চলে না। 'গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আসে', 'ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি হিন্দি প্রচার ক'রে থাকেন', 'একটি ত্রিভুজের দুই ভুজ যুক্ত হ'লে তৃতীয় ভুজের চেয়ে দীর্ঘ হবেই'— এ-সব বলার জন্য ভাষা চাই। এবং এ-সব কথা বাংলায় যত ভালোভাবে বলা যায়, কানাড়া, মারাঠি, হিন্দি বা উড়িয়াতেও ততটাই— উনিশ-বিশের বেশি তফাৎ এখানে হ'তে পারে না। যে-বস্তু একটা 'উপায়মাত্র, সারবস্তু নয়', যার 'নিজস্ব মূল্য কিছুই নেই', তা হিন্দি হোক বা ইংরেজি হোক বা রাশিয়ান হোক, তাতে কী-ই বা এসে যাচ্ছে। অতএব— এই হ'লো ভাষা-কমিশনের অধিকাংশ সভ্যের পরামর্শ— আসুন আমরা সর্বভারতে সবাই মিলে

হিন্দিকে গ্রহণ করি, তাতে জাতীয় ঐক্য দৃঢ় হবে এবং সারা দেশে সর্বপ্রকার কাজ চালাবার পক্ষে সুবিধে হবে সবচেয়ে বেশি।

যদি ভাষার কাজ হ'তো শুধু বার্তাজ্ঞাপন, তথ্যপরিবেষণ ও স্লোগান বা বিজ্ঞাপনধর্মী স্থূল আবেগের প্রকাশ, যদি তার দ্বারা শুধু সরকারি পত্র, রিপোর্ট, দলিল, সাংবাদিক প্রবন্ধ বা জনসভার বক্তৃতা রচনা করতে হ'তো, তাহ'লে এ-কথা মেনে নেবার তেমন বাধা ছিলো না। যদি ভাষার দ্বারা মানুষ ইতিহাস, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, আইন, বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা ছাড়া আর-কিছুর চর্চা না করতো, তাহ'লেও এ-কথা মেনে নেয়া একেবারে অসম্ভব হ'তো তা নয়। কেননা ইতিহাসে দেখা যায় যে মানুষ পরভাষায় এই সব কাজই চালাতে পেরেছে। মোগল আমলের ভারতে পারস্য যখন রাজকার্যের ভাষা ছিলো তখন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিরা তা শিখে নিয়েছেন; মধ্যযুগের য়োরোপে ইটালি, হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সব দেশেই পণ্ডিতেরা লাতিন ভাষায় সূক্ষ্ম জটিল বিতর্ক ও সারবান গ্রন্থরচনা করেছেন; উনিশ শতকের রাশিয়াতে ফরাশি ছিলো— শুধু দরবারি আমির-ওমরাহের নয়, সমগ্র শিক্ষিত শ্রেণীর সামাজিক ও পারিবারিক ভাষা, যাতে এমনকি মা ছেলেকে আদর করেন বা তরুণযুগলের প্রেমালাপ চলে। গত দেড়শো বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব থেকে আরম্ভ ক'রে সেন্সাস-রিপোর্ট পর্যন্ত বহু বিষয়ে মূল্যবান গবেষণাপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বহু পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, যার ভাষা ইংরেজি এবং প্রণেতাগণ ভারতীয়। ইংরেজিতে আমরা যা পেরেছি, হিন্দিতেই বা তা পারবো না কেন?

কিন্তু একটি প্রশ্ন বাকি থেকে যায়। কেন, যে-কালে য়োরোপ ভ'রে বিদগ্ধজন লাতিনে ভিন্ন চিন্তা করতেন না, সেই কালেই য়োরোপের কবিরা তাঁদের নিজ-নিজ মাতৃভাষায় রচনা ক'রে গেছেন শৌর্য এবং প্রেমসম্পৃক্ত অসংখ্য রোমান্স— যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আর্থারের রাজসভায় কাহিনীমণ্ডল -- আর কেনই বা পরবর্তী পশ্চিমী সাহিত্য সেই দেশীয় সাহিত্যের প্রভাবেই ভরপুর? কেন, প্রভাঁসালের মতো লৌকিক ভাষায় লাতিনপ্লাবিত য়োরোপ তার আধুনিক গীতিকাব্যের মূলসূত্র আবিষ্কার করেছিলো? কেন ক্যাথলিক ধর্মের যেটি শ্রেষ্ঠ সপ্রাণ অভিব্যক্তি, সেই 'ডিভাইন কমেডি'র ভাষা লাতিন হ'লো না, হ'লো তখনকার অবহেলিত ইটালিয়ান? উনিশ শতকের রুশ লেখকেরা যখন অমর সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, সেই সাহিত্যের ভাষা কেন ফরাশি হ'লো না, হ'লো রাশিয়ান— যাতে তাঁরা ভৃত্য, পিতামহী ও কৃষকদের সঙ্গে ভিন্ন পারতপক্ষে

কথা বলতেন না? আর কেনই বা গত দেড়শো বছরের মধ্যে, বিদেশীর পক্ষে যতদূর সম্ভব উত্তমরূপে ইংরেজি শিখেও, কোনো ভারতীয় ইংরেজিতে কোনো মৌলিক সাহিত্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেনি, যা সাহিত্যের সম্পদরূপে স্বীকৃত হয়েছে?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর দিতে মুহূর্তের বেশি সময় লাগে না। মানুষ পরভাষায় প্রায় যে-কোনো কাজই চালাতে পারে, পারে না শুধু কাব্য, নাটক, উপন্যাস লিখতে, সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা করতে। কেন পারে না? যেহেতু সাহিত্য যেখানে সৃষ্টিশীল সেখানে মানুষের সমগ্র অন্তরাত্মা সক্রিয় হ'য়ে ওঠে— শুধু তার বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়বোধ ও হৃদয়বৃত্তি নয়, তার নির্জ্ঞান মন, তার আত্মায় অধিষ্ঠিত নরক ও স্বর্গ, তার পূর্বপুরুষের ধূসর স্মৃতিপুঞ্জ। স্পষ্ট দিবালোকে যুক্তিনির্ভর জীব ও প্রজা হিশেবে যা-কিছু কর্ম আমরা ক'রে থাকি— সন্তানপালন, রাষ্ট্রচালনা, শিক্ষাদান, বিচার-বিতরণ, তার বিধিবদ্ধতার থাপে-থাপে প্রায় যে-কোনো ভাষাকেই মানিয়ে নেয়া যায়, এবং সুবিধে বুঝে একটা ফেলে আর-একটাকে গ্রহণ করলেও আপত্তি ওঠে না। যদি মানবিক ভাষার বদলে চিহ্ন ব্যবহার করলে গণিত অথবা বিজ্ঞানের বেশি সুবিধে হয়, নিশ্চয়ই তা-ই করতে হবে। উদ্দেশ্য যেখানে সুনির্ণীত, যেখানে আমরা জ্ঞান দিতে চাই, কিছু প্রমাণ করতে চাই, চাই বিরোধী মতকে পরাস্ত করতে অথবা দেশপ্রেমের মতো কোনো সমষ্টিগত আবেগ জাগাতে, সেখানে ভাষা জিনিশটাকে নেহাৎই একটা উপায় হিশেবে স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু এ ছাড়াও অন্য একটা জীবন আছে মানুষের, তা না-থাকলে সে পূর্ণ মানব হ'তো না। সে-জীবন গোধূলির, আধো অন্ধকারের, স্বপ্নের। এই বিজ্ঞানপোষিত বিশ শতকেও স্বপ্নে আমরা ছেলেমানুষ বা আদিম মানুষে রূপান্তরিত হই, সেখানে আমাদের দিনের আলোর সব শিক্ষা ধ্ব'সে পড়ে, ত্রাস, আশা, উদ্যম কোনো যুক্তি মানে না— স্বল্পালোকিত সুড়ঙ্গের মধ্যে হাৎড়ে-হাৎড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয় আমাদের। সেই অচিন্তিত চলার কোনো চিহ্ন যদি খুঁজে পাই আমরা, সে-চিহ্ন একটিমাত্র উপায়ে বিধৃত হ'তে পারে: তা মাতৃভাষা। সেই আদিম ও আবিল অন্ধকার থেকে যদি কোনো স্বচ্ছ মণি আমরা ছেঁকে তুলতে চাই, চাই কোনো স্মৃতি, আবিষ্কার বা অভিজ্ঞানকে ছিনিয়ে আনতে, সে-কাজ সম্ভব হ'তে পারে একমাত্র সেই ভাষাতে, যা আমাদের অচেতনের অন্তরঙ্গ, এবং যার মধ্যে পরতে-পরতে জড়িত হ'য়ে আছে আমাদের সমস্ত পূর্বপুরুষের বহুযুগব্যাপী জীবনসূত্র। এবং এই কাজই কবিরা ক'রে থাকেন: সচেতন জীবনের সঙ্গে অচেতনের ঘটকালি করেন তিনি;

আমাদের বন্য বিশৃঙ্খল স্বপ্নসত্তাকে চিন্ময় রূপ দান করেন, চৈতন্যকে পূর্ণতা দেন স্বপ্নযামিনীর সংস্পর্শে এনে। মানুষের এই একটি কাজ, যা ভাষা বিনা সম্ভব হয় না, এবং বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ ভাষায় ভিন্ন সম্ভব হয় না। অতএব এই কাজটিকে পরীক্ষা না-করা পর্যন্ত আমরা জানতে পারি না, ভাষা বলতে সত্যি কী বোঝায়, মানবজীবন ও মনুষ্যত্বের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী। ভাষা ও সাহিত্য অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর-সম্পৃক্ত; একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির আলোচনা অসম্ভব। কিন্তু ভাষা-কমিশনের বিবৃতিটি নানা বিষয়ে আলোচনা ক'রেও ঠিক এই প্রসঙ্গের সীমান্তে এসে থেমে গেছে। 'বিদ্যালয়ে আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, শিক্ষা; সরকারি কর্মের ক্ষেত্রে আমাদের যা লক্ষ্য তা ভাষা নয়, সুশাসন, আদালতে আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, সুবিচার।' কিন্তু এর পরে কবিতার কথা উল্লেখ করতে হ'লে বলতে হ'তো, 'কবিতায় আমাদের লক্ষ্য ভাষা নয়, কবিতা'—যার অর্থ দাঁড়াতো, 'কবিতায় আমাদের লক্ষ্য ভাষা ভিন্ন আর-কিছু নয়।' কিন্তু এ-কথা কমিশনের অধিকাংশ সদস্য বলতে পারতেন না ও বলতে পারেননি, কেননা তাহ'লে মহোদয়গণের সকল যুক্তি ভেঙে পড়ে। যদিও তাঁদের আলোচনার বিষয় ভাষা, সৃষ্টিশীল সাহিত্য বিষয়ে আদ্যন্ত একটি গভীর নীরবতা বজায় রেখেছেন তাঁরা। ভালোই করেছেন; আমাদের পক্ষে বোঝা আরো সহজ হয়েছে যে তাঁদের সচেতন উদ্দেশ্য, মুখবন্ধের উদ্ধৃতি থেকে আরম্ভ ক'রে সর্বশেষ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত, পদে-পদে ভ্রান্তিপ্রচার।

আইন, শিক্ষা, শাসন প্রভৃতিকে যথাবিহিত সম্মান জানাবার পর আমরা যখন সাহিত্যের আহ্বান শুনতে পাই, তখনই ভাষা বিষয়ে অন্য একটি ধারণায় আমাদের অন্তঃস্থল উদ্ভাসিত হ'তে থাকে; এই একটি ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে আমরা উপলব্ধি করি যে ভাষা কোনো উপায়মাত্র নয়, ভাষাই উৎস; চিন্তা থেকে ভাষা নির্গত হয় না, ভাষাই চিন্তাকে জন্ম দেয়। স্বপ্নে আমরা যা দেখি সেই ছবিগুলোকে বলা যায় বিশ্বপুরাণের চিত্রকল্প, মানবাত্মার আবেগসমষ্টির আদিরূপ; সেই ক্ষণিক, চঞ্চল ও অসংলগ্ন চিত্রসমূহ তাদের অব্যবহিত আবেগ-সঞ্চার পরিহার ক'রে যখন ভাষার মধ্যে স্থিরতা, স্থায়িত্ব ও স্বচ্ছতা পেলো, তখনই চিন্তা নামক কাজটি সম্ভব হ'লো মানুষের পক্ষে। তার আগে চিন্তা ছিলো না, ছিলো শুধু আবেগের আঘাত আর ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি। বাঘ যখন ক্ষুধার আবেগে আকুল শুধু তখনই সে হরিণটাকে লক্ষ্য করে, অন্য সময়ে হরিণের কোনো অস্তিত্বই নেই তার কাছে। কিন্তু মানুষ যখন হরিণকে আহার অথবা

আদর করতে না চায় তখনও হরিণের সত্তা তার কাছে সুস্পষ্ট, কেননা 'হরিণ' নামক শব্দটাকে সে পেয়েছে। ঐ শব্দ আছে ব'লেই, হরিণ বিষয়ে কোনো ব্যক্তিগত আবেগের অধীন না-হ'য়েও, তাকে ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব না-ক'রেও, ঐ জন্তুকে মনে-মনে ধারণা করতে পারে সে, অর্থাৎ তার বিষয়ে চিন্তা করতে পারে। যদি স্বপ্নের চিত্রভাষা ছাড়া আর-কিছু না-থাকতো, তাহ'লেও পুরাণের অস্তিত্ব থাকতো না তা নয়, কিন্তু ইতিহাস সম্ভব হ'তো না। যদি মানুষ তার স্খলমান মুহূর্তগুলির অব্যবহিত প্রভাবের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতো, তাহ'লেও ভ্রূণাবস্থায় রূপকথা সম্ভব হ'তো না তা নয়, কিন্তু বিজ্ঞান হ'তো না। তাঁরই নাম কবি, যিনি আবেগের দৈহিক অভিঘাত থেকে যাত্রা ক'রে সেই দৈহিক অভিঘাত থেকে মুক্তি দেন মানুষকে, ইন্দ্রিয়গত সংবেদনকে রূপান্তরিত করেন সেই আধ্যাত্মিক সামগ্রীতে, যাকে আমরা অভিজ্ঞতা ব'লে থাকি। আমাদের এই আদিকবি একাধারে কাব্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের জনক: তাঁর চিত্তে আবেগ থেকে জ্ঞান নিষ্কাশিত হ'য়ে জ্ঞান আবার সঞ্জীবিত হয়েছে আবেগে; বিশ্বপুরাণ থেকে মানবেতিহাস বিশ্লিষ্ট হবার পর ইতিহাস আবার পুরাণের স্রোতে মিশ্রিত হ'য়ে নতুন ক'রে প্রাণ পেয়েছে। এবং তাঁর ও ভাষার জন্ম একই লগ্নে; তাঁর সত্তা একান্তরূপে ভাষানির্ভর। মানুষের ভাষা আছে, এতেই প্রমাণ হয় যে তার সারাৎসার কবির। মানুষ যদি কবি না হ'তো তাহ'লে তার ভাষার প্রয়োজন হ'তো না।

এইজন্যে জর্মান দার্শনিক হামান্ বলেছিলেন যে 'কবিতাই মানবজাতির মাতৃভাষা।' য়োহান্ গেয়র্গ হামান্, যাঁর প্রভাবের বশবর্তী হ'য়ে প্রথমে হের্ডের ও পরে য়াকবি আধুনিক ভাষাতত্ত্বের ভিত্তিস্থাপন করেন, তাঁর এই বাক্যের সমর্থন আছে পৃথিবীর বহু পুরাণে ও ধর্মগ্রন্থে। ইহুদির অতি-সরল সৃষ্টি-কাহিনীতে চিন্তনীয় অংশ সেখানে আরম্ভ হ'লো, যেখানে ভগবান, ছয় দিনে বিশ্বনির্মাণ ও সপ্তম দিনে বিশ্রাম করার পর, যাবতীয় জন্তু ও প্রাণীকে আদমের সামনে উপস্থিত করলেন নামকরণের জন্য। প্রত্যেক প্রাণীর একটি ক'রে নাম চাই, এবং সে-নাম আদমকেই দিতে হবে। ভগবানের এই নির্দেশেই বোঝা যায় যে আদমের পতন অনিবার্য, এবং সে-পতন ভগবানেরই অভিপ্রেত ছিলো। কেননা যে-মানুষ নামকরণ করে সে অমরকাননের অজ্ঞান অবস্থা ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গেছে, হ'য়ে উঠেছে একাধারে কবি ও বিজ্ঞানী। জ্ঞানের ও আনন্দের আকাঙ্ক্ষা, মানুষের এই দুই বৃত্তি সমভাবে সজাগ, একটিকে বাদ দিয়ে তার

অন্যটি সম্পূর্ণ হয় না। 'হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম / কী তোমার নাম / হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে / নামেতে কী হবে। / আর কিছু নয়, / হাসিতে তোমার পরিচয়'।— লেখক যদিও রবীন্দ্রনাথ, তবু এই কথাকে পূর্ণ মানবের উক্তি ব'লে মানতে পারি না আমরা ; কোনো অচেনা ফুল দেখলে আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রথমেই জিগেস করি, 'এর নাম কী ?', এবং রবীন্দ্রনাথও তা-ই করেছিলেন। সেই নামের সংজ্ঞার্থ উদ্ভিদবিজ্ঞানীর পক্ষে এক প্রকার, কবির পক্ষে অন্য প্রকার ; কিন্তু নাম জিনিশটা দু-জনেরই চাই, তা না পাওয়া পর্যন্ত ঐ ফুল মানুষের পক্ষে আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যবহার্য হয় না। মানুষের ভাষাকে শেষ পর্যন্ত বলা যেতে পারে নামের সমষ্টি ; হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এই জগৎ নাম ও রূপের দ্বারা গঠিত। আর এ-বিষয়েও বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে মতভেদ নেই যে শুধু পরমেশ্বরের নাম আবৃত্তি ক'রে মানুষ ত্রাণ পেতে পারে।

'প্রারম্ভে ছিলো বাক্', এই ব'লে সন্ত ইয়ন তাঁর যীশুজীবনী আরম্ভ করেছেন। রনাল্ড নক্স-কৃত বাইবেলের নূতন অনুবাদে কথাটা ঈষৎ ভিন্নভাবে বলা আছে— 'কালের যখন আরম্ভ তখনই বাক্ ছিলেন ; পরমেশ্বরের সহচর ছিলেন বাক্ ; সেই বাক্ই পরমেশ্বর। তিনি (বাক্) ছিলেন, কালের প্রারম্ভে, পরমেশ্বরের সহচর হ'য়ে। তাঁরই মধ্য দিয়ে সর্বভূত উদ্ভূত হ'লো ; যা-কিছু হয়েছে তাঁর বিহনে কিছুই হয়নি। তাঁরই মধ্যে ছিলো প্রাণ, সেই প্রাণ মানবের আলোকস্বরূপ।' এবং, সন্ত ইয়নের মতে, যীশুর মধ্যে 'the word was made flesh,' যীশু এই বাক্-এরই অবতার। উপনিষদ্-সমূহে ব্রহ্মের নামান্তর 'অক্ষর', এবং সংস্কৃতে ঐ শব্দের অর্থ একাধারে 'অপরিবর্তনীয়' বা 'ধ্বংসহীন', এবং 'শব্দ' বা 'বর্ণমালার চিহ্ন'। বাক্ ও ব্রহ্মকে এক ব'লে ভাবা হয়েছে এখানে, এক ব'লে বিশ্বাস করা হয়েছে। 'অক্ষর' বলতে ওঙ্কারকেও বোঝায়, যে-ওঙ্কার জীবাত্মারূপ বাণের ধনুস্বরূপ (মুণ্ডকোপনিষদ্ : ২।২।৪), আত্মা থেকে অভিন্ন (মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ : ৮); ধ্যানের অবলম্বন (মুণ্ডকোপনিষদ্ : ২।২।৬) এবং সর্ববেদের প্রধান ও স্বয়ং পরমেশ্বর (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ : ১।৪।১)। অক্ষরকে না-জানলে বেদজ্ঞান বৃথা, কেননা পরমাকাশরূপ অক্ষরেই (ব্রহ্মেই) ঋগাদি বেদ ও সর্বদেবতা আশ্রিত আছেন (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ : ৪।৮)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে, সর্বজীবের প্রাণের উৎসই বাক্ ; পশু, মানব ও দেবগণের মধ্যে সকলেই বাঙ্‌নির্ভর, বাক্ ধ্বংসহীন, সনাতনের আদিসন্তান, বেদাদির মাতা ও বিশ্বের নাভিস্বরূপ। প্রাচীন পারসীকের ধর্মগ্রন্থ— যেখানে শুভ ও অশুভের

ধ্বনিকে সৃষ্টির মূলসূত্র ব'লে কল্পনা করা হয়েছে— তার সৃষ্টিকাহিনী অনুসারে ভগবানের পরম শক্তি বাক্, বাক্ পার্থিব সৃষ্টির পূর্বজ ও শয়তানের শক্তির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। বহু আদিম জাতির পুরাণেও এই বিশ্বাস পাওয়া যায় যে বাক্ ও সৃষ্টিকর্তা অভিন্ন এবং বাক্ থেকে সৃষ্টি উৎসারিত হয়েছে।

বাক্ থেকে সৃষ্টি উৎসারিত হয়েছে, জীবনের বহু ক্ষেত্রে এর কোনো নিদর্শন আমরা পাই না, বরং উল্টো দিকেই অনেক সাক্ষী সংগ্রহ করা যেতে পারে। কথাটা আজকের দিনে উচ্চার্য হ'তো না, যদি না, হার্বার্ট স্পেন্সারের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ ক'রে, মানবজাতি নির্ভুলভাবে জানিয়ে দিতো যে কবিতা না-হ'লে তার চলে না। যন্ত্র এবং উপযোগবাদের এই ব্যাপ্তির দিনেও কবিতার সত্তা যে অনাক্রমণীয়, এতেই বোঝা যায় যে মানুষের আদি পুরাণসমূহ ভুল করেনি। বাক্ থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, কবিতাই এ-কথার তর্কাতীত প্রতিষ্ঠা-ভূমি। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি, বা স্মরণ করি, তখনই বুঝি ভাষার মূল্য তার নিজেরই মধ্যে, তার অভিধানগত অর্থের মধ্যে সে-মূল্যকে ধরানো যায় না; বাহনমাত্র নয় সে, নিজেই দেবতা। কবি যখন কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন তিনি তখনই বোঝেন যে সৃষ্টির উৎসস্থলই ভাষা, তাঁর রচিত কাব্যটি যতটা তাঁর ঠিক ততটাই তাঁর ভাষার সৃষ্টি; যে ভাষা তাঁর হাতে একটি যন্ত্র হওয়া দূরে থাক, তিনি বরং তখনকার মতো ভাষার একটি নিমিত্তে পরিণত হন, এবং নিমিত্ত হিশেবে তিনি কতদূর পর্যন্ত বাধ্য, মনোযোগী ও তন্ময় হ'তে পারেন তারই উপর তাঁর কৃতার্থতা নির্ভর করে। এবং ভাষার উচ্চতম ও সত্য রূপও এখানেই আমরা দেখতে পাই— কবিতায় বা সৃষ্টিশীল সাহিত্যে।

৩

ভাষা-কমিশন যে-ঔপনিষদিক বচন উদ্ধৃত করেছেন এবারে সেটিতে ফিরে আসা যাক। 'যদি বাক্ না থাকতো তবে ধর্ম বা অধর্ম বিজ্ঞাপিত হ'তো না, সত্য বা অসত্য, শুভ বা অশুভ, মনোজ্ঞ বা অমনোজ্ঞ— কিছুই বিজ্ঞাপিত হ'তো না।' এই উক্তির প্রকৃত অর্থ এই নয় যে ভাষা একটি উপায়মাত্র— কেননা শিশুও জানে যে ভাষা বিনাও মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞের তফাৎ বোঝা যায়; এর আসল অভিপ্রায় এ-বিষয়ে আমাদের সতর্ক ক'রে দেয়া যে ভাষা বস্তুটি উভমুখী। সত্য ও মিথ্যা, ভালো ও মন্দ, ধর্ম বা অধর্ম, প্রীতিকর ও কষ্টকর— ভাষা একাধারে ও নির্বিচারে সবই জানাতে পারে, এই সব বিপরীত-

যুগলের নিরপেক্ষ প্রকাশক সে। ভাই ভাইকে গুলি ক'রে মারার পর আদালতে নির্দোষ ব'লে প্রমাণিত হয়, তা উকিলের ভাষারই সাহায্যে; যুদ্ধের সময় প্রত্যেক দেশের প্রচারকর্তারা শত্রুপক্ষকে পিশাচরূপে প্রতিপন্ন করেন, তারও মূলে আছে ভাষা। এবং কোনো সরকারি কমিশন, পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ভাষা ব্যবহার ক'রেই, এমন কোনো প্রস্তাবকে সারা দেশের পক্ষে হিতকর ব'লে ঘোষণা করতে পারেন, যাতে স্বল্পসংখ্যকের স্ফীতি ঘটিয়ে অধিকাংশকে বিনষ্ট করা হবে। ব্যবহারের অসাধুতা সঙ্গে-সঙ্গেই ধরা পড়ে, ভাষার অসাধুতা সূক্ষ্ম ব'লেই আরো বেশি ভয়াবহ। বাণিজ্যে, সংসারকর্মে, রাষ্ট্রচালনায় এই ভাষাগত অসাধুতা ব্যাপকভাবে দেখা যায়— শুধু আজকের দিনে নয়, ইতিহাসের যুগে-যুগে। যে-বস্তু এত বেশি বিকারপ্রবণ তাকে উপাস্য বলি কেমন ক'রে?

হয়তো এই অর্থেই হ্যেল্ডার্লিন বলেছিলেন যে 'ভাষা মানুষের সবচেয়ে বিপজ্জনক সম্পত্তি'। বুদ্ধিমানের হাতে ভাষার বিকৃতি সহজেই ঘ'টে থাকে; এবং যাঁর যত বেশি বুদ্ধি তিনি ভাষাকে তত বেশি বিকৃত করতে পারেন। 'গালিভার্স ট্র্যাভলস'-এর শেষ অধ্যায়ে সুইফট যে-অশ্বরূপী আদর্শ জীবের কল্পনা করেছিলেন তাদের পরিমিত ভাষায় 'মতামতে'র প্রতিশব্দ নেই, কেননা সেই পরম যুক্তিবাদী অশ্বসমাজ একান্তভাবে প্রমিতির প্রবক্তা, তাদের মধ্যে কখনো কোনো মতভেদ ঘটে না। আঠারো-শতকী আদর্শ-অনুযায়ী মানুষ একটি যুক্তিময় যন্ত্র হয়নি ব'লে আক্ষেপ করবো না আমরা, কেননা আমরা সকলেই জানি যে মানুষ যেমন কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদি রিপুর বশবর্তী, তেমনি তার মধ্যে প্রেম ভক্তি ত্যাগ ও সৃষ্টিশীলতার মতো মহৎ বৃত্তিও বিদ্যমান, এবং এই প্রবৃত্তি ও বৃত্তিসমূহ অন্যোন্যনির্ভর। একদিকে কামুক হিংসুকী লোভী প্রভৃতি না-হ'লে অন্যদিকে সে সন্ত, বীর বা ঋষিও হ'তে পারতো না; সুইফট-এর 'উইনিম'-সমাজে সকলেই নৈতিক অর্থে ও নীরসভাবে ভালো, কিন্তু মহৎ কেউ নয়। মানুষ যেখানে জান্তব সেখানে সে অযৌক্তিক, আর যেখানে সে দেবতার মতো সেখানে সে অতিযৌক্তিক: তার নিম্নতম ও উচ্চতম স্তর সমানভাবে যুক্তিবহির্ভূত। এবং সাধারণত এই দুই স্তরের অস্তিত্ব যুগপৎ ও অবিচ্ছেদী ব'লে মানবসমাজে কোনো বিশুদ্ধ যুক্তি সম্ভব হয় না; দার্শনিক দূরকল্পনায় তার ধারণা থাকলেও, কার্যত সব যুক্তির মধ্যেই প্রবেশ করে কোনো প্রবৃত্তি বা বৃত্তি, কোনো স্বার্থপর কামনা বা কোনো উন্নত আদর্শপ্রসূত আবেগ, এবং ঐ দুই বস্তুর একটি থেকে অন্যটিকে চিনে নেয়া যে সব সময় সহজ

হয় না তার কারণই মানুষের উভমুখী প্রকৃতি। যে-কোনো প্রশ্ন উঠুক, সভ্য মানুষ তার দুই দিকেই প্রায় একই রকম প্রভাবশালী তর্ক করতে পারে; নিজে যা বিশ্বাস করে না তার সমর্থন ক'রে ডিবেটিং ক্লাবে বাহবা পায় কলেজের ছাত্র; যখন যে-সরকার প্রতিষ্ঠা পান তাঁদেরই পছন্দমতো মতপ্রচারে রাজ-পুরুষের যুক্তির অভাব ঘটে না। শয়তান শাস্ত্র আওড়ায়; জুলিয়স সীজার বীর না অত্যাচারী, সে-বিষয়ে জনতার ধারণা ব্রুটাস বা মার্ক অ্যাণ্টনির বক্তৃতা অনুসারে বদলে যায়। যাকে আমরা যুক্তি বলি তার সাহায্যে অনেক সময়ই সত্যকে জানা যায় না; যে-ভাষা যুক্তির বাহন, সেই ভাষাই নানা বিভ্রমের সৃষ্টি করে। ভাষা যেখানে বাহন বা উপায়মাত্র, সেখানে তার বিকারপ্রবণতা অচিকিৎস্য।

কিন্তু এমন কোনো ক্ষেত্র কি নেই, ভাষা যেখানে মিথ্যাচারী হ'তে পারে না, আর তা যদি না থাকে তাহ'লে ভাষার নিজস্ব মূল্যই বা কোথায়। এই প্রশ্নের উত্তরে হোল্ডার্লিনেরই আর-একটি কথা উদ্ধৃত করবো: 'মানুষের সবচেয়ে অনপকারী কর্ম কবিতা।' 'অনপকারী'— কথাটাকে খুব কমিয়ে, অত্যন্ত মৃদু-ভাবে বলা হয়েছে; এর আসল অর্থ বুঝতে হ'লে কবিতার সঙ্গে ভাষার সম্বন্ধের কথা ভাবতে হবে। কবিতা সবচেয়ে অনপকারী কর্ম এই অর্থে যে কবিতায়— সৃষ্টিশীল সাহিত্যে— এবং একমাত্র সেখানেই— ভাষা হ'য়ে ওঠে অধিকার, নিষ্কলুষের, অমোঘভাবে সত্য। সাহিত্যের মহত্তম মুহূর্তগুলিতে সত্যের বদলে অসত্য, ধর্মের বদলে অধর্ম, মনোজ্ঞের বদলে অমনোজ্ঞের প্রকাশিত হবার উপায় নেই; কিন্তু আইন, বাণিজ্য বা রাষ্ট্রচালনা যেখানে সবচেয়ে উন্নত সেখানেও ভাষায় মিথ্যাচার সম্ভব হ'তে পারে এবং হ'য়ে থাকে। কেননা আমাদের বোঝা ব্যাপারটা বুদ্ধির কাজ, আর উপলব্ধি প্রজ্ঞার; বুদ্ধি যদি আপন গুণেই নির্ভরযোগ্য হ'তো তাহ'লে মানবসমাজে ভুল বোঝা ব'লে কিছু থাকতো না; বুদ্ধির এই অপলাপী স্বভাব শোধন ক'রে নিতে হ'লে প্রজ্ঞার সঙ্গে তার যোগসাধন চাই। প্রজ্ঞার উপলব্ধিতে কখনো ভুল হয় না কিন্তু প্রকাশের ক্ষমতা তার নেই; সে যখন বুদ্ধিকে তার সেবকরূপে গ্রহণ করে তখনই ভাষা হ'য়ে ওঠে সত্য, আর কবিতা সেই সত্য ভাষারই নামান্তর। এই ভাষা, মানুষের সমগ্র অন্তরাত্মা যাতে দীপ্যমান, তা তার মাতৃভাষা ভিন্ন আর-কিছু হ'তে পারে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা উপযোগ বুঝে ভাষা বদলাতে পারি, যেমন পারি সুবিধেমতো বিভিন্ন বেশ ধারণ করতে, কিন্তু ভাষা যেখানে অধিকার ও

সত্য সেই সাহিত্যের প্রসঙ্গে ভাষা বলতে শুধু মাতৃভাষাকেই বুঝতে হবে। মাতৃভাষা আমাদের চিন্তার জননী, আমাদের আত্মিক জীবনের পরিচালিকা। এবং সেই ভাষা 'কখনোই সারবস্তু নয়, শুধু যন্ত্র', আর তা নিয়ে 'হৃদয়াবেগ বা উত্তেজনা'র প্রয়োজন করে না, এ-কথা যাঁরা বলেন ভাষা বিষয়ে তাঁদের কোনো পরামর্শ বিষয়ে শ্রদ্ধাবান হওয়া অসম্ভব।

৪

কিন্তু—কেউ-কেউ আপত্তি তুলতে পারেন—হিন্দি ভারতের সরকারি ভাষা হ'লে অন্যান্য সাহিত্যের ক্ষতি হবে কেন? যেমন লাতিনপ্লাবিত য়োরোপে ভিন্ন-ভিন্ন মাতৃভাষায় কাব্য রচিত হয়েছিলো, উনিশ-শতকী রুশ মনীষীরা ফরাশির আধিপত্য সত্ত্বেও খাঁটি রুশীয় সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, এবং ইংরেজ-শাসিত ভারতের কোনো-এক অংশে মাতৃভাষা ও তার সাহিত্যের নবজন্ম ঘটেছিলো, তেমনি নিখিল ভারতের সরকারি কাজে হিন্দি ব্যবহৃত হ'লেও ভিন্ন-ভিন্ন সাহিত্যের বিকাশ হবার বাধা কী? মাতৃভাষা যদি আত্মিক ব্যাপারই হয় তার উন্নতিসাধন তো আমাদেরই হাতে আছে, রাষ্ট্র সেখানে কী করতে পারে? একই রকম যুক্তি অনুসারে ইংরেজ আমলে কেউ-কেউ বলতেন যে পরাধীনতা একটা কথার কথা মাত্র, তার অবসান ঘটাবার চেষ্টাও অনর্থক; কেননা পরাধীন অবস্থাতেও আমরা আকাশের নীলিমা দেখে খুশি হ'তে পারি, এবং যোগাসনে মোক্ষলাভেরও বাধা হয় না। আর আজকের দিনে, এই যুক্তি অনুসারেই, অনেকে ব'লে থাকেন যে অন্তরের স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে পারে না, অতএব একনায়কত্বে দোষ নেই। ভাষা বিষয়ে আসল কথাটা এই যে কোনো পরভাষার আধিপত্য—সেই পরভাষা মাতৃভাষার তুলনায় অনেক উন্নত হ'লেও—মানুষ বেশিদিন সহ্য করতে পারে না: এত যে বলশালী সংস্কৃত ভাষা তাকেও হার মানতে হ'লো বিভিন্ন অপরিণত কথ্য ভাষার কাছে; লাতিন ভাষার আদিভূমি ইটালিতে মধ্যযুগীয় য়োরোপের প্রথম 'ভার্নাকুলর'-সাহিত্যের প্রোজ্জ্বল অভ্যুদয় ঘটলো; ইংরেজ সাহিত্যের গরীয়ান এলিজাবেথীয় যুগ, আর গ্যেটের যুগে জর্মান সাহিত্যের উত্থান—এ-দুয়েরই পটভূমিতে আছে বাইবেলের জেমসীয় ও লুথারীয় অনুবাদ—অর্থাৎ ধর্মের ক্ষেত্রে লাতিন থেকে মুক্তিপ্রাপ্তি; এবং উনিশ শতকে রুশ সাহিত্যের আকস্মিক ও আশ্চর্য আবির্ভাবের একটি কারণ এই যে রাশিয়া, আদিচার্চের অধীন হ'লে, প্রথম থেকেই মাতৃভাষাকে

ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করেছে। আর উনিশ-শতকী বাংলাদেশে—ইংরেজি শিক্ষা সত্ত্বেও, বা তারই ফলে—স্বীয় ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে যুগান্তরকারী জাগরণ ঘটলো, যার পরিণতি 'স্বদেশী' আন্দোলনে। বাংলার সেই নবজন্মক্ষণেই আধুনিক ভারতের ভিত্তি স্থাপিত হয়, এ-কথা ভারতবর্ষীয় সকলেই জানেন, যদিও অনেকে আজকাল স্বীকার করতে চান না।

ভারতে ইংরেজি ভাষার অবস্থা বিষয়ে আর-একটু বলা দরকার। প্রথমেই স্মর্তব্য যে ইংরেজি শাসকেরা তাঁদের ভাষাকে জোর ক'রে আমাদের উপর চাপাননি; এ-দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগী ও সচেষ্ট হয়েছিলেন আমাদেরই রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত মহাপুরুষগণ। কেন সচেষ্ট হয়েছিলেন? যেহেতু তাঁরা বুঝেছিলেন যে ভারতের শ্বেতাঙ্গ শাসকগণ আধুনিক জগৎ ও মানসতার প্রতিভূ, এবং তাঁদের ভাষাকে বাহনরূপে ব্যবহার ক'রে আমরা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কালে বদলি হ'তে পারি। সেকালে দেশের যে-সব অংশে পাশ্চাত্ত্য চিন্তার অনুপ্রেরণা প্রত্যাখ্যাত হয়, বাদশাহি স্মৃতিমন্থর সেই উত্তরভারতে মধ্যযুগের অবসান ঘটতে বিলম্ব হ'লো, কিংবা এখনো সম্পূর্ণভাবে ঘটেনি—এবং একই কারণে হিন্দি ভাষায় ও সাহিত্যে আধুনিক জীবন স্বাভাবিক-ভাবে বিম্বিত হ'তে পারছে না। কিন্তু যেখানে পশ্চিমের দিকে পুরোপুরি দরজা খুলে গেলো—যেমন বাংলাদেশে—সেখানেও ইংরেজি ভাষা গৃহীত হ'লো একটি মূল্যবান উপায় হিশেবে, তার বেশি নয়; মধুসূদনের ব্যর্থ প্রয়াসের পরে প্রায় সকলেই বুঝে নিলেন যে ইংরেজিতে আমরা কাব্য রচনা করতে পারি না, আত্মাকে প্রকাশ করতে পারি না, যে বিশ্বমানসে স্থান পেতে হ'লে মাতৃভাষারই চর্চা করা আমাদের কর্তব্য। এবং সেই মাতৃভাষার চর্চায় ইংরেজি কখনো আমাদের প্রতিবন্ধক হয়নি, উল্টে প্রেরণা দিয়েছে, এবং এখনো দিচ্ছে। গত দেড়শো বছরে, অন্তত বাংলাদেশে, ইংরেজি যেটুকু প্রসারলাভ করেছে, তার তুলনায় বহুগুণ বেশি বিস্তার ও মর্যাদাবৃদ্ধি ঘটেছে মাতৃভাষার। স্যর আশুতোষ যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যে এম. এ. উপাধির প্রবর্তন করেন তখন ব্রিটিশ রাজ পূর্ণপ্রতাপে অধিষ্ঠিত; যখন রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের অভিভাষণ বাংলাভাষায় রচনা করেন তখনও ইংরেজের ভারত-ত্যাগ কল্পনামাত্র; এবং যখন বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে ইংরেজির বদলে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠিত হ'লো, বা সরকারি কার্যের উপযোগী বাংলা পরিভাষা রচনার জন্য প্রথম সমিতি গঠিত হ'লো, তখন পর্যন্ত ইংরেজ আমলের অবসান ঘটেনি। ইংরেজি

ভাষা, ইংরেজের রাজত্বকালেই, একে-একে বহু ক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু আজকের দিনের স্বাধীন ভারতের ভাগ্যাকাশে হিন্দি যে-ভাবে দেখা দিয়েছে তাকে মদমত্ত ও ব্যভিচারী বললে ভুল হয় না। দাবি তার প্রকাণ্ড, উদ্ধত তার উচ্চাশা। আমাদের সংবিধানপত্রে ভারতের সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃত হয়েছে হিন্দি, সেই স্বীকৃতিও প্রামাণিক কিনা সন্দেহ করা যেতে পারে, কেননা এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো লোকসভায় নয়, অতি সংকীর্ণ মতাধিক্যের জোরে বিধানসভায়। তৎসত্ত্বেও, শুধু সরকারি ভাষা নিয়ে কথা হ'লে এই স্বীকৃতিকে গ্রহণ করা অনেকের পক্ষে হয়তো একেবারে অসম্ভব হ'তো না। কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী দশ বছর ধ'রে হিন্দি সর্বভারতে প্রচারিত হয়েছে— সরকারি ভাষা হিশেবে নয়, তাকে বলা হয়েছে রাষ্ট্রভাষা বা 'জাতীয় ভাষা'— the national language। সেইসঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রধান ভাষাগুলির জন্য অন্য একটি বিশেষণ উদ্ভাবিত হয়েছে : 'regional', অর্থাৎ 'আঞ্চলিক' বা 'দৈশিক'। এই দুটো শব্দকেই আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করছি। যে-ভাষা কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের মাতৃভাষা, তাকেই 'আঞ্চলিক' বলা যেতে পারে ; আর সে-অর্থে তামিল, বাংলা, কানাড়া, মলয়ালি যতটা 'আঞ্চলিক', হিন্দিও ঠিক ততটাই তা-ই ; এবং ফরাশি, জর্মান, জাপানি, রুশ প্রভৃতি ভাষা যতটা আঞ্চলিক, বাংলা, তেলুগু, মরাঠি, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষাও ঠিক তা-ই। অতএব এই বিশেষণের কোনো অর্থই হয় না ; এর ব্যাপক ব্যবহার— যা সরকারি ভাষা-কমিশনের বিবৃতিতেও বিরাজমান— তার উদ্দেশ্যই হ'লো হিন্দি ভিন্ন অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মর্যাদাহানি। 'রাষ্ট্রভাষা' কথাটার দুটো অর্থ হ'তে পারে : রাষ্ট্রিক কর্মের জন্য ব্যবহৃত ভাষা বা সরকারি ভাষা, এবং 'জাতীয় ভাষা'— অর্থাৎ যে-ভাষা দেশের সমগ্র প্রজাগণের মাতৃভাষা। প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে প্রশ্ন ওঠে : কোন সরকারের কথা ভাবা হচ্ছে ? পশ্চিম বাংলা, মান্দ্রাজ না নয়া দিল্লি ? আসাম, উড়িষ্যা, অন্ধ্র বা পশ্চিম বাংলার সরকার হিন্দি ভাষায় তাঁদের কাজকর্ম চালাবেন, এ-রকম কল্পনা সম্ভব হয় শুধু হিটলারের মতো মতিগতি হ'লে। এ-রকম কল্পনা কোথাও দেখা দিয়েছে কিনা সেটা এই আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রকাশ পাবে; এখানে ব'লে নেয়া দরকার যে হিন্দি-প্রচারকদের অত্যুগ্র উৎসাহ— যাতে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি অবিরল ইন্ধন জুগিয়ে আসছেন— 'রাষ্ট্রভাষা'র দ্বিতীয় অর্থ চালাবার জন্যই বদ্ধপরিকর ; হিন্দির সঙ্গে যাঁদের স্বার্থ

জড়িত বা যাঁদের স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা নেই, এমন অনেকে ধ'রে নিয়েছেন যে ভারতের 'জাতীয়' অর্থাৎ সার্বভৌম ভাষার নামই হিন্দি। এই কথাটা শুধু ভুল নয়, অসত্য; শুধু অসত্য নয়, মিথ্যা। যে-অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'জাতীয়' ভাষা ইংরেজি, সে-অর্থে কোনো-একটি স্বাভাবিক সার্বভৌম ভাষা ভারতের এখনো নেই, কথনোই ছিলো না। ইতিহাসের কোনো অধ্যায়েই নিখিলভারত এক ভাষায় কথা বলেনি; এই বৈচিত্র্যই তার ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য, তার ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণশক্তি; এই বৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্র-নায়কেরাও প্রতিশ্রুত আছেন। যদি 'জাতীয়' কথাটার ব্যবহার করতেই হয় তাহ'লে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে সংবিধানপত্রে গৃহীত চোদ্দটি ভাষাই আমাদের 'জাতীয় ভাষা'। এই চোদ্দটি ভাষার মধ্য থেকে হঠাৎ একটিকে ভিত্তিহীন সার্বভৌমতার সিংহাসনে বসিয়ে, অন্য বারোটি জীবিত, সমকক্ষ ও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অনেক বেশি উন্নত ভাষাকে 'আঞ্চলিক'রূপ অবাস্তব ও অপমানজনক বিশেষণের আড়ালে প্রচ্ছন্ন রাখার এই যে দুশ্চেষ্টা, তা সম্ভব হ'তে পারে শুধু সেই যুক্তির বলে, যে-যুক্তিতে ইংরেজ সরকার একদা বিনা বিচারে বহু ভারতীয়কে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবরুদ্ধ রেখেছিলেন। ইংরেজের যুক্তি ছিলো 'ল অ্যাণ্ড অর্ডার'; হিন্দি-প্রচারকদের যুক্তি হ'লো 'সর্বভারতীয় ঐক্য'। নিজগুণে উভয় বস্তুই বাঞ্ছনীয় ও শ্রদ্ধেয়, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু সেদিন ইংরেজ যেমন আইন ও শৃঙ্খলার নামেই সুবিচারকে হত্যা করেছিলো, তেমনি হিন্দি-প্রচারকরাও আজ উদ্যত হয়েছেন ভারতীয় ঐক্যের নামেই সর্বভারতীয় ঐক্য, সংবিধানে প্রতিশ্রুত মৌলিক অধিকার ও ভারতের সদ্যোজাত গণতন্ত্রকে একই সঙ্গে বিধ্বস্ত করতে।

ভাষা-কমিশন গঠিত হয়েছিলো একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে; ভারতের সরকারি ভাষা কী হ'তে পারে সে-বিষয়ে ভারত-সরকারকে পরামর্শ দেবেন তাঁরা কিন্তু এই কমিশন কার্যত তাঁদের অধিকার লঙ্ঘন ক'রে গিয়েছেন; সর্বভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়েও আলোচনায় তাঁরা কার্পণ্য করেননি। এবং যেহেতু শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সাধারণত সাহিত্যের পাঠক ও লেখক হ'য়ে থাকেন, আমাদের প্রসঙ্গের পক্ষে এই অংশই প্রয়োজনীয়। শিক্ষার বাহন পরভাষা হওয়া অনুচিত, এই সূত্র অবলম্বন ক'রে কমিশনের অধিকাংশ সভ্য ইংরেজির

বিরুদ্ধে প্রভূত বাক্যব্যয় করেছেন; এবং শিক্ষার বাহন হিশেবে ইংরেজির অপসারণ বিষয়ে আমরা তাঁদের সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে একমত। এর পরের প্রশ্ন: শিক্ষার বাহন কী হবে— এর আংশিক মীমাংসা ইতিপূর্বেই হ'য়ে গেছে; ভারতের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই আজ শিক্ষার বাহন সেই-সেই রাজ্যের মাতৃভাষা; ইংরেজি এখনো বাহনরূপে স্বীকৃত আছে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়িক উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থায়, তাও সর্বত্র ও সর্বতোভাবে নয়। এখানে মাতৃভাষার দাবি এতই অপ্রতিরোধ্য যে কমিশনের সদস্যেরাও তা ঠেলতে পারেননি, অন্তত মৌখিকভাবে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন; এবং প্রসঙ্গত ভারতীয় মাতৃভাষা-সমূহের (তাঁদের মতে 'আঞ্চলিক' ভাষা) উদ্দেশে যে-সব সহৃদয় মন্তব্য করেছেন, তাঁদের মূল বক্তব্য মনে রাখলে সেগুলোকে মনে হয় কুম্ভীরের অশ্রুপাতের মতোই করুণাশীল। শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এই মর্মে স্বীকারোক্তির পর তাঁরা বলছেন যে নিখিলভারতের সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের চোদ্দ বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত হিন্দি ভাষা শেখানোই চাই। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে বাহন কী হবে সে-বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ তাঁরা দিচ্ছেন না; কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মাতৃভাষা, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হিন্দি, এমনকি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজি থাকতে পারে, এই তাঁদের পরামর্শ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এ-বিষয়ে তাঁদের নিজ-নিজ বুদ্ধি-অনুসারে মনস্থির করুন, এতেও তাঁদের মৌখিক আপত্তি নেই। কথাটা শুনতে মন্দ না, কিন্তু এর পরেই তাঁদের আসল অভিপ্রায় অব্যর্থভাবে বিদ্ধ করে আমাদের, যখন তাঁরা বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়িক স্বারাজ্যই শেষ কথা নয়, রাষ্ট্রভাষা-প্রয়োগের নীতিকে শেষ পর্যন্ত সবার উপরে স্থান দিতে হবেই ('...the principle of "autonomy of Universities" can, in the final analysis, have only a qualified bearing and the national language policy must ultimately prevail.')। এ-কথার অর্থ কী, তা বুঝতে একটুও দেরি হয় না। যদি কমিশনের অনুমোদনসমূহকে ভবিষ্যতের পূর্বাস্বাদ ব'লে ধ'রে নেয়া যায়, যদি ভারত-সরকারের ভাষাসংক্রান্ত নীতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন না ঘটে, তাহ'লে সরকারি তরফ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে হিন্দি বিষয়ে কী-রকম পরামর্শ, নির্দেশ, প্রলোভন বা তর্জনবাক্য পৌছতে থাকবে, তা ধারণা করতে হ'লে দৈবজ্ঞ হবার প্রয়োজন করে না। এবং যে-ভাষা হবে লোকসভার, আইনপ্রণয়নের, সুপ্রীম কোর্টের ও সর্বভারতীয় সরকারি পরীক্ষাসমূহের অনন্য

বাহন, যে-ভাষায় হাইকোর্টের বিচারপতিরা রায় দিতে বাধ্য থাকবেন, যে-ভাষা প্রাদেশিক সরকারের পরীক্ষাগুলিতে ব্যবহৃত হ'তে পারবে, এবং 'যে-ভাষায় নিম্নতর আদালতেও ওকালতি করায় বাধা থাকবে না— সেই ভাষাকে অহিন্দিভাষী সর্বভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কণ্ঠনালীতে প্রেরণ করা খুব বেশি কঠিন হবে না, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সহ্য না হোক, গিলতেই হবে; মরতে হ'লেও গিলতে হবে। যদি তার ফলে কালক্রমে ভারতের অহিন্দিভাষী বিশালতর অংশে শিক্ষা, স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটে, তাহ'লেও 'রাষ্ট্রভাষা'কে সবার উপরে স্থান দিতে হবে— 'the national language policy must prevail'। ভাষা-কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের যেগুলি বিশেষ অনুমোদন— বিদ্যালয়ে হিন্দি শিক্ষার আবশ্যিকতা যার অন্যতম— তার সার অর্থ এই যে হিন্দি-না-জানা ভারতীয় প্রজা আর ভারতীয় প্রজা বা নাগরিক ব'লেই গণ্য হ'তে পারবে না। উচ্চশিক্ষার বাহন হিশেবে মাতৃভাষা ও ইংরেজির সম্ভাবনা স্বীকার ক'রে নিয়েও সদস্যেরা বহু যুক্তিসহকারে বুঝিয়েছেন যে সর্বভারতে উচ্চশিক্ষার অনন্য বাহন যদি হিন্দি হয়, তাহ'লেই ভারতীয় ঐক্য বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি— অতএব সেই পন্থাই সবচেয়ে প্রশস্ত। প্রসঙ্গত আর-একটি কথা তাঁরা বলছেন, যা প'ড়ে তাঁদের ভয়াবহ অভিসন্ধি বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। ভারতের সব 'আঞ্চলিক' ভাষা থেকে শব্দসংকলন ক'রে হিন্দিকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলা হোক, তাহ'লে হিন্দিও সর্বপ্রকার কর্মের পক্ষে উপযোগী হ'য়ে উঠবে, এবং কালক্রমে ভারতের সবগুলি আত্মীয় ভাষা পরস্পরে মিশ্রিত হ'য়ে একটিমাত্র হিন্দিতে পরিণত হ'তে পারবে— যে-ভাষা হবে সত্যিকার অর্থে সার্বভৌম বা ন্যাশনাল, এবং ভারতীয় ঐক্যের স্থায়ী ভিত্তি। অর্থাৎ, অধিকাংশ সদস্যের ইচ্ছা, ভারতের অন্যান্য প্রধান ভাষাগুলি অশিক্ষিতের উপভাষায় পরিণত হোক, হ'য়ে যাক কালক্রমে অচলিত ও লুপ্তপ্রায়, ত্রয়োদশ-ভুজধারী হ'য়ে বিরাজ করুক একমাত্র হিন্দি। এবং তাঁদের সব অনুমোদনের পিছনে, প্রকাশ্য-বা প্রচ্ছন্নভাবে, এই উদ্দেশ্যই কাজ করছে। বলা বাহুল্য, এই দেশপ্রেমী পরিকল্পনার মধ্যে সংস্কৃতের স্থান হ'তে পারে না, কেননা শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দির এক বিরাট প্রতিযোগী হবে সংস্কৃত। বাংলা অসমিয়া উড়িয়া আর থাকবে না, থাকবে না গুজরাটি বা মরাঠি, পঞ্জাবি আর উর্দু তো ইতিমধ্যেই হিন্দির মধ্যে গৃহীত হয়েছে, তামিল তেলুগু কানাড়া মলয়ালি আবদ্ধ হবে ঠাকুমা-দিদিমার প্রবচনে— এমনকি সংস্কৃতের শেষ স্থান

হবে জাদুঘরের শ্মশানভূমিতে। এক পক্ষের এই আত্মত্যাগ ও অন্য পক্ষের এই পরস্বাপহরণের হেতু কী? না, ভারতীয় ঐক্য রক্ষা করা চাই। ঐক্যের নামে এই রকম ভাষামেধ-যজ্ঞের ষড়যন্ত্র অন্য কোনো জাতির ভাগ্যে ইতিপূর্বে ঘটেছে কিনা জানি না।

আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি না; সদস্যগণের সুখস্বপ্নকে বাস্তবের ভাষায় অনুবাদ করছি। যদি তাঁদের অনুমোদনগুলি কার্যে পরিণত হয়, আর তার পরে এক শতক বা অর্ধ শতক ধ'রেও ভাষাবিষয়ে একই ব্যবস্থা টিঁকে থাকে, তাহ'লে ভারতের অন্যান্য প্রধান ভাষার, এবং সেই সব ভাষাশ্রয়ী সাহিত্য ও সংস্কৃতির, ক্রমিক অবক্ষয় অনিবার্য। এক শতক বা অর্ধ শতক জাতির জীবনে অত্যল্পকাল এ-কথা এখন আর সত্য নেই; আধুনিক সংঘপ্রকরণ ও যন্ত্রবিদ্যা তথাকথিত প্রগতির বেগ অত্যন্ত দ্রুত ক'রে দিয়েছে। আমরা যেন না ভুলি যে আজকের দিনে রাষ্ট্রের শক্তি অপরিমেয়; অতীতের কোনো অধ্যায়ে, ইতিহাসের নৃশংসতম অত্যাচারী সম্রাটের যুগেও, রাষ্ট্র এমন পরাক্রান্ত ছিলো না। ছিলো না, তার কারণ এমন কোনো যন্ত্র বা ব্যবস্থা তখন আবিষ্কৃত হয়নি, যার দ্বারা প্রত্যক্ষ-ও পরোক্ষভাবে, দিনের পর দিন, কর্মের ও বিশ্রামের প্রতিটি মুহূর্তে সমগ্র প্রজা-বৃন্দের মনের উপর রাষ্ট্র তার অভিপ্রেত প্রভাব বিস্তার করতে পারে। উপরন্তু, গণতান্ত্রিক দেশ হ'য়েও ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রে একনায়কত্বের কোনো-কোনো লক্ষণ অঙ্গীকৃত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রসমূহের তুলনায়, এখানে স্বাধীন উদ্যমের ক্ষেত্র অনেক সংকীর্ণ। আমাদের বাণিজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, পঞ্চবার্ষিকী সংকল্পের অনুগামী। আমাদের শিক্ষাতন্ত্র সম্পূর্ণ আত্মবশ নয়, কেননা বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি ধনীর বদান্যতায় পুষ্ট হ'তে পারে না, তাদের জীবিকার প্রধান বা অনন্য নির্ভর রাজকোষ। আমাদের রেডিওতে ইংলণ্ডের মতো স্বাবলম্বিতা বা মার্কিনদেশের মতো স্বাধীনতা নেই; তা একান্তভাবে রাষ্ট্র-কর্তৃক অধিকৃত। আমাদের সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা আইনত বহুদূর পর্যন্ত আছে তা সত্য, কিন্তু সে-স্বাধীনতা তাঁরা যে সব সময় ব্যবহার করতে চান বা করতে পারেন এমন প্রমাণ আমরা এখনো পাইনি; কোনো নেপথ্যসংকেতে তাঁদের কোনো মূলনীতি বা কর্মসূচির রাতারাতি বদল হ'তে আমরা দেখিনি তা নয়। আর যেখানে প্রত্যক্ষভাবে কর্তৃত্ব চলে না, সেখানেও পরোক্ষভাবে প্রভাববিস্তারে আমাদের রাষ্ট্র ক্রমশই অধিকতর সচেষ্ট হচ্ছেন। সাহিত্য, নাট্য ও ললিতকলার অকাদেমি এর উদাহরণ; গ্রন্থ ও চিত্রের জন্য পুরস্কার ঘোষণা এর উদাহরণ,

রেডিও-কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'সাহিত্য-সমারোহ' এর উদাহরণ, আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয়িক যুব-উৎসবও এর উদাহরণ। সাহিত্য ও শিল্পকলার পরিপোষণের জন্য আমাদের রাষ্ট্র যে অকস্মাৎ ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রজার অর্থ ব্যয় ক'রে বড়ো-বড়ো কার্যালয় স্থাপন করেছেন, এই ব্যাপারটাকে, একজন সাহিত্যিক হিশেবে, আমি সুলক্ষণ ব'লে মনে করতে পারি না : আমার মতে আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষে শিল্পীদের বিষয়ে উদারতম আচরণ হ'লো উপেক্ষা—একটি পরিচ্ছন্ন ও নিরভিমান উপেক্ষা। সেকালে রাজাদের পোষকতায় সৎসাহিত্যের সৃষ্টি হ'তে পেরেছিলো, এই নজির এখানে একেবারেই অচল; কেননা সেকালে রাজা ছিলেন একজনমাত্র ব্যক্তি; তাঁর শক্তি ছিলো, আধুনিক মানে, অতিশয় সংকীর্ণ, এবং কখনো-কখনো তিনি সজ্জনও হতেন। তার উপর, বিক্রমাদিত্য থেকে ফ্রেডেরিক দি গ্রেট পর্যন্ত, কবিদের পোষণ ক'রে তাঁরা ব্যক্তিগত অহমিকারই তৃপ্তিসাধন করেছেন, অন্তরালে কোনো রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্য তাঁদের ছিলো না। ফলত, কবিরা তাঁদের মৌখিক চাটুকারিতা করলেও—ভলতেয়ার ফ্রেডেরিককে তাও করেননি—স্বকর্মে স্বাতন্ত্র্যরক্ষা ক'রে চলতে পারতেন। কিন্তু একালের নৈর্ব্যক্তিক, যান্ত্রিক, অতিকায় ও সার্বিক-শক্তিশালী রাষ্ট্র যখন শিল্পকলার পৃষ্ঠ-পোষণের ভার নেয়, তার অর্থ দাঁড়ায় সেই স্বাধীনতার সংকোচন বা বিলুপ্তি, যে-স্বাধীনতা শুধু শিল্পীর নয়, দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ ও সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। শিল্পীর জীবিকার জন্য সুখদায়ক ব্যবস্থা ক'রে রাষ্ট্র তার জন্য যে-মূল্য আদায় ক'রে নেয় সেই মূল্যই পরম ও একমাত্র; তা ধ্বংস হ'লে শিল্পীর পক্ষে আরাম, সম্মান বা নিরাপত্তার কোনো অর্থ আর থাকে না, সমাজ হ'য়ে ওঠে কারাগারের মতোই সুশৃঙ্খল, নিয়মাধীন ও দুঃসহ। স্বাধীনতাই এই মূল্য, চিন্তার স্বাধীনতা, 'মানবো না' বলার স্বাধীনতা, দল ছেড়ে একলা হবার স্বাধীনতা। এরই ফলে যুগে-যুগে সমাজের নাড়ি নতুন ছন্দে সাড়া দেয়, সভ্যতার স্রোত ব'য়ে চলতে পারে। এই মূল্য যেখানে দলিত, যেখানে শিল্পীকে খাইয়ে-পরিয়ে মোটা ক'রে তুলে তার স্বাধীনতা হরণ করা হয়, সেখানে শিল্পের নামে কী-ধরনের প্রভুরঞ্জন জড়বস্তু নির্গত হ'তে থাকে, তার উদাহরণ আজ বহুদিন ধ'রে সোভিয়েট দেশ পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করছে।

সমাজের মধ্যে যে-অংশ স্বভাবত সজাগ ও স্বনিষ্ঠ, সেই শিল্পীদেরও ক্রীড়নকে পরিণত করার শক্তি যখন আধুনিক রাষ্ট্র ধারণ করে, তখন তার পক্ষে এক দেশের বারোটি বা তেরোটি ভাষার বিলোপ ঘটিয়ে মাত্র একটিকে স্ফীত

ক'রে তোলাও সম্ভবপরতার পরপারে নয়। এই কথাটিকে খুব স্পষ্ট ক'রে বুঝে নিতে হবে আমাদের: আজ ভাষা-কমিশন কাগজে-কলমে যে-সুখস্বপ্ন দেখছেন আগামী পঞ্চাশ বছর, এমনকি পঁচিশ বছরের মধ্যেও তাকে বাস্তবে পরিণত করার ক্ষমতা আছে রাষ্ট্রের, সত্যি-সত্যিই 'রাষ্ট্রভাষা'র প্রচণ্ড দাবিতে অন্য প্রত্যেকটি ভাষার অস্তিত্ব সুদ্ধ বিপন্ন হ'তে পারে, যদি না এখনই, এই মুহূর্তে আমাদের ভস্মাচ্ছাদিত শুভবুদ্ধি জ্বালাতে পারে একটি প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ, দাঁড় করাতে পারে একটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রতিরোধ। 'কেন্দ্রিক ভাষা হিন্দি হয় তো হোক না, রাজ্যের মধ্যে মাতৃভাষা তো রইলোই,' সরকারি কাজে ক-জন লোক আর যোগ দেবে, আর সেই ক-জনকে হিন্দি শিখতে হ'লে ক্ষতি কী,' আমরা বাঙালিরা হিন্দির চাপে বাংলার চর্চা ভুলে যাবো? পাগল!'—এই ধরনের চিন্তা বা চিন্তাহীনতার মূলে কত বড়ো আত্মপ্রতারণা বিরাজ করছে, একটুখানি বিশ্লেষণেই তা ধরা পড়ে। যদি—কমিশনের দুটি মাত্র অনুমোদন বেছে নেয়া যাক—যদি ভারতের সরকারি সিংহাসনে হিন্দিকে অনন্যভাবে বসানো হয়, আর প্রত্যেক ভারতীয় প্রজাকে বাধ্য করা হয় শৈশব থেকে বা শৈশবকালে হিন্দি শিখতে, তাহ'লে অন্যান্য ভাষা প্রথমে যদি বা চামরধারিণী বা করঙ্কবাহিকার মর্যাদা পায়, শেষ পর্যন্ত তাদের স'রে যেতে হবে নেপথ্যে, ভারতীয় পটভূমি ছেড়ে অপরিচয়ের ধূসরতায়। ভারতবাসী তাদের ভাষা বলতে হিন্দিকেই বুঝবে, সারা জগৎ ভারতীয় ভাষা বলতে শুধু হিন্দিকেই বুঝবে। আর তা ঘটতে খুব বেশি দেরিও হবে না, কেননা ইতিমধ্যেই—স্বাধীনতার পর মাত্র এই দশ বছরের প্রচারের ফলে—ভারতের বাইরে কোনো-কোনো দেশ হিন্দিকেই মেনে নিয়েছে ভারত-ভাষার নামান্তর ব'লে, পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে হিন্দির চর্চা বর্ধমান, এবং আমরা নিজেরা—এমনকি বাঙালিরাও—মাতৃভাষাকে 'আঞ্চলিক' ও হিন্দিকে 'জাতীয়' ভাষারূপে অক্লেশে উল্লেখ ক'রে থাকি। হিন্দি ভারতের একমাত্র সরকারি ভাষা—শুধু এই সূত্রটি গৃহীত হ'লে অন্য সব স্বতই ঘটতে থাকবে; আইনত আবশ্যিক না-হ'লেও ছাত্রগণ নিজের গরজেই হিন্দি শিখবেন—যাঁরা রাজনৈতিক বা রাজপুরুষ, বাণিজ্য- বা জ্ঞানজীবী হবার উচ্চাশা রাখেন শুধু তাঁরাই নন, কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে থাকার উপরে অল্প একটু আকাঙ্ক্ষা করলেও হিন্দি ভিন্ন এগোনো যাবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সরকারি কাজে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগ দেবেন, এমন লোকের সংখ্যা অচিরেই নগণ্য ছেড়ে অগণ্যে পৌঁছবে;

পঞ্চবার্ষিকী সংকল্পের পারম্পর্যের ফলে রাষ্ট্রের সূক্ষ্ম কুটিল শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়বে লৌকিক জীবনের স্তরে-স্তরে, জীবিকার এমন ক্ষেত্র কমই থাকবে যাতে সরকারি প্রভাব কোনো-না-কোনো ভাবে প্রবিষ্ট হবে না। আর এ-কথাও ভুলে থাকা অসম্ভব—কেননা এখনই তার বহু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে—যে একবার 'রাষ্ট্রভাষা' বা 'জাতীয় ভাষা'রূপে প্রতিষ্ঠা পেলে হিন্দি হ'য়ে উঠবে কৌলীন্যের ধ্বজা, ফ্যাশানের আশ্রয়, স্নবারির একটি প্রধান সরঞ্জাম; শুধু চাকরিতে উন্নতির জন্য নয়, জাতে উঠতে হ'লেও প্রয়োজন হবে তার; এমন সুধীজন যাঁরা অবশিষ্ট থাকবেন যাঁদের দায়ে প'ড়ে শিখতে হবে না তাঁরাও অনেকে গায়ে প'ড়ে হিন্দি শিখবেন। এবং যাঁরা রাষ্ট্রপোষিত কৌলীন্যের বাইরে নিজ-নিজ বিনীত কর্ম নিয়ে জীবন কাটাবেন, সেই বিরাট জনসাধারণের মনেও হিন্দির একটি বিশেষ স্থান অবধারিত হবে: জাতীয় পতাকা বা জাতীয় সংগীতের মতো 'জাতীয় ভাষা'ও হ'য়ে উঠবে একটি প্রতীক, চিন্তাহীন ভক্তি ও আত্মনিবেদনের পাত্র; গ্রামের চাষি, ঘরের বৌ, মফস্বলের ছোটো দোকানদার—এমন কেউ থাকবেন না যিনি এক বর্ণ হিন্দি না-জেনেও, বা হিন্দির দ্বারা কোনো সুবিধে না-পেয়েও, ঐ ভাষাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা না করবেন। সব ভাষাকেই শ্রদ্ধা করা ভালো; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তার সঙ্গে থাকবে নিজ-নিজ মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা, এবং সেই অবস্থাটা মারাত্মক। এই যে মনস্তত্ত্বগত প্রভাব, এর শক্তি হিশেব ক'রে বোঝা যায় না; আইনের দ্বারা হিন্দির অধিকার যতই বেঁধে দেয়া হোক, সংবিধানে অন্যান্য ভাষাকে যে-কোনো ভাবেই স্বীকার করা হোক না—'হিন্দি ভারতের জাতীয় ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা', শুধু এই সূত্রটি সর্বসাধারণের মনে জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করবে। এরও প্রমাণ ইতিমধ্যেই আমরা পাচ্ছি না তা নয়; পশ্চিম বাংলার বহু বেসরকারি বিদ্যালয়ে হিন্দি এখনই আবশ্যিকভাবে পড়ানো হচ্ছে, যদিও সে-বিষয়ে সরকারের কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। স্কুল-কর্তৃপক্ষের যুক্তি বোধহয় এই: 'কিছুদিন পরে তো শিখতেই হবে, এখনই আরম্ভ করা ভালো।' আজ যেটা প্রস্তাব, সেটা যদি দু-দিন পরে তথ্য হ'য়ে ওঠে তাহ'লে এই যুক্তি আরো কত বিরাট আকারে সর্বভারতে ব্যাপ্ত হবে, সে-কথাও কি বুঝিয়ে বলা দরকার? সর্বসাধারণ কোনো কথাই তলিয়ে ভেবে ছাখে না—সেটা আশা করাও সম্ভব নয়—'জাতীয় ভাষা'র প্রতীকী মূল্যের জন্যই তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে তারা। তাছাড়া উন্নতি জিনিশটা সকলেরই কাম্য, ব্যক্তিগত- ও বংশগতভাবে

এক ধাপ উপরে উঠতে না চায় এমন লোক সর্বত্রই বিরল; এবং হিন্দি না-জানলে উন্নতি যদি অসম্ভব হয় তাহ'লে, কাগজে-কলমে তার 'চাপ' যতই মৃদু হোক না, অহিন্দিভাষী ভারতীয় প্রজা মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করতে ইচ্ছুক অথবা বাধ্য হবে।

এখানে ইংরেজির কথা আর-একবার বিবেচ্য: কেন, যদি ইংরেজ আমলে ইংরেজির প্রভাবে মাতৃভাষাকে আমরা উপেক্ষা না-ক'রে থাকি, হিন্দির জন্যেই বা মাতৃভাষাকে ভুলতে হবে? এর উত্তরে বহু কথা বলা যেতে পারে, আমি শুধু একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। আজকের দিনে হিন্দি যেমন সর্বভারতে সর্বসাধারণের সমগ্র জীবনকে অধিকার করতে চাচ্ছে, এই রকম বিরাট দাবি ইংরেজি ভাষার কখনোই ছিলো না, তা সম্ভবও ছিলো না তার পক্ষে। ইংরেজ রাজত্ব ছিলো বৈদেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী; দেশের জনসাধারণের সঙ্গে ক্ষীণ ছিলো তার সংযোগ; কলকাতা-দিল্লির ঘটনাবলি বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন থেকে কোটি-কোটি গ্রামীণ মানুষ বংশপরম্পরায় তাদের অভ্যস্ত জীবন যাপন ক'রে গেছে। কিন্তু আজকের দিনে রাষ্ট্রের প্রভাব সর্বত্র পরিকীর্ণ, এবং সেই প্রভাব থেকে সর্বসাধারণের হৃদয়াবেগও মুক্ত নয়, কেননা তার পিছনে আছে স্বাধীনতা লাভের গৌরব, স্বাজাত্যবোধের অভিমান। বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রের প্রভাব যত ব্যাপক, 'রাষ্ট্রভাষা'র প্রভাবও ঠিক তা-ই হবে। ইংরেজির যা ছিলো না— আর এখনও নেই— হিন্দির আছে সেই স্বদেশীয়তার স্বাক্ষর; সেটা তার মস্ত সুবিধে, আর সেইজন্যই তা এত বেশি বিপজ্জনক। হিন্দিকে আত্মনিবেদনের চরম অর্থ যে মাতৃভাষার প্রতি প্রতারণা— এই কথাটা অধিকাংশের মনে ধরা দেবে না, এবং অধিকাংশকে বোঝানো কঠিন হবে। প্রশংসনীয় দেশপ্রেমের প্ররোচনায় হিন্দিকে গ্রহণ করবো আমরা, নিজে না-জেনে ও না-বুঝে ক্রমশ মাতৃভাষাকে ভুলতে থাকবো। ভুলতে থাকবো, তার কারণ এই মনোভাব তৈরি হ'তে দেরি হবে না (এখনই কিছুটা তৈরি হয়েছে) যে হিন্দি যেহেতু ভারতীয় ভাষা, এবং আমরা সকলেই ভারতীয়, তাই হিন্দিকে আমাদেরই স্বভাষা বললে ভুল হয় না। অন্য দিক থেকেও মাতৃভাষার বিনাশের আশঙ্কা ভয়াবহরূপে বাস্তব— বিশেষত উত্তরভারতের পক্ষে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে বাংলা আর হিন্দি খুব কাছাকাছি ভাষা ব'লেই, বাঙালি শিশুকে হিন্দি শেখানো হ'লে, সে বাংলা নামে যে-ভাষাটি শিখবে সেটি আর ঠিক বাংলা থাকবে না। এই দুই ভাষায় বহু সামান্য শব্দ

আছে, কিন্তু তাদের বানানে ও উচ্চারণে মিল নেই: একই সঙ্গে 'দশ' ও 'দস', 'কাহিনী' ও 'কহানী' শেখানো হ'তে থাকলে শিশুর শুদ্ধাশুদ্ধ-জ্ঞান বিপর্যস্ত হবে। ফলত সে খুব সম্ভব বাংলা বা হিন্দি কোনোটাই ঠিকমতো শিখবে না, দুয়ের মিশ্রণে তৈরি ক'রে নেবে এক হিন্দি-ঘেঁষা বাংলা অথবা বাংলা-ঘেঁষা হিন্দি। এবং এই দুর্বিপাকের সম্মুখীন হবে উত্তরভারতের প্রত্যেকটি ভাষা, দক্ষিণী ভাষাগুলিও এই সংকট পুরোপুরি এড়াতে পারবে না। আর যেহেতু ভাষা-কমিশনের পরামর্শ অনুসারে সর্বভারতের সকল প্রজাকে হিন্দি শিখতে হবেই, কিন্তু হিন্দিভাষীকে অন্য কোনো ভাষা না-শিখলেও চলবে, তাই এই চোদ্দমিশেলি নবব্যঞ্জনের প্রধান উপাদান হবে হিন্দি, অন্যান্য ভাষা হিন্দির গড়ন এড়াতে পারবে না। কিংবা অন্য সব ভাষা ক্রমশ ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে পুষ্ট ক'রে তুলবে একটি মাত্র ভারতীয় ভাষাকে, যা ঠিক এখনকার হিন্দিও হয়তো আর থাকবে না, কিন্তু যাকে হিন্দি ব'লেই নির্ভুলভাবে চেনা যাবে— বাংলা অথবা মরাঠি অথবা তেলুগু ব'লে কখনোই ভুল হবে না। অর্থাৎ, ভাষা-কমিশনের উন্মত্ত উচ্চাশা পূর্ণ হবে তখন, হিন্দির মধ্যে অন্য সব ভারতীয় ভাষার বিলুপ্তি ঘটবে।

স্বাভাবিক 'জাতীয়' ভাষা তাকেই বলে, যে-ভাষা একটি দেশের সমগ্র বা বহুলভাবে অধিকাংশ প্রজাবৃন্দের মাতৃভাষা। এই অর্থে ভারতবাসীর কোনো সামান্য বা 'জাতীয়' ভাষা অতীতের কোনো অধ্যায়েই ছিলো না। তা নিয়ে কোনো আক্ষেপও ছিলো না কারো মনে, কেননা কোনো পূর্বযুগে নেশন অর্থে জাতি ছিলুম না আমরা। 'নেশন' শব্দের কোনো প্রতিশব্দও নেই ভারতীয় ভাষায়, ন্যাশনাল অর্থে 'জাতীয়' কথাটা এখন পর্যন্ত কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক শোনায়। অন্য অনেক কিছুর মতো, নেশনত্বের ধারণাও আমরা পশ্চিম থেকে আহরণ করেছিলাম, এবং আজকের দিনে, স্বাধীনতার পরে, বৈশ্বিক ন্যাশনালিজম-এর সায়াহ্নকালে, আমরা কিছুটা করুণভাবে বদ্ধপরিকর হয়েছি পুরোপুরি ও পাকাপাকি একটি নেশন হ'য়ে উঠতে। যেহেতু ভারতবাসীরা এক জাতি বা নেশন, সেহেতু ভারতে একটি 'ন্যাশনাল' ভাষাও চাই, এই যুক্তির যান্ত্রিক উপযোগে অনেকেই সম্মোহিত হ'য়ে আছেন। তাঁরা, পুরোপুরি হিন্দিকে সমর্থন না-ক'রেও, প্রায়ই ব'লে থাকেন, 'অতীতে ছিলো না ব'লে ভবিষ্যতেও কি একটি সামান্য ভাষা হ'তে পারবে না আমাদের? তা হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নয়?' —কিন্তু কোনো কিছুকে বাঞ্ছনীয় ব'লে স্বীকার করলে তার জন্য সচেষ্ট হওয়া নিশ্চয়ই আমাদের কর্তব্য, এবং সামান্য বা 'জাতীয়' ভাষাকে বাঞ্ছনীয় বলায়

অর্থই হ'লো হিন্দির একাধিপত্যে সানন্দ সম্মতিদান। আসল প্রশ্নটা এই : কোনটা বেশি বাঞ্ছনীয়— একটি 'জাতীয়' ভাষাকে নির্মাণ ক'রে নেয়া, না কি আমাদের নিজ-নিজ মাতৃভাষার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ? কোনটা আমাদের মনুষ্যত্বের পক্ষে বেশি জরুরি— নিজ-নিজ মাতৃভাষার সমৃদ্ধি, না কি এমন একটি ভাষা যা এই মহাদেশতুল্য ভারতভূমিতে সকলেরই ব্যবহার্য হবে? সংলগ্ন আর-একটি প্রশ্নও উত্থাপন করতে হয়; ভারতীয় চিত্তের পুষ্টি ও প্রকাশের পক্ষে কোনটা বেশি অনুকূল : বৈচিত্র্য না একীকরণ, স্বরসংগতি না ঐকতান? এবং এ-দুয়ের মধ্যে যেটি কাম্যতর, অন্যটি যদি স্পষ্টত তার বিরোধী হয়, তাহ'লে আমাদের কর্তব্য কী?

খুব সম্ভব আগামী পঁচিশ বা পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই একটি 'জাতীয়' ভাষার অধিকারী হ'তে পারি আমরা, যদি ভাষা-কমিশনের মূল প্রস্তাবগুলিতে সম্মত হই। সেই প্রস্তাবগুলি— শুধু মেনে নিলে নয়— প্রয়োগের জন্য একযোগে সচেষ্ট হ'লে, তবেই তা সম্ভব হ'তে পারে, নচেৎ কোনোমতেই নয়। যদি 'জাতীয়' ভাষাই কাম্যতর মনে হয়, তাহ'লে মাতৃভাষার প্রতি ওষ্ঠপ্রীতি পরিহার ক'রে হিন্দিকেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হবে আমাদের। মাতৃভাষার বিকাশ ও 'জাতীয়' ভাষার উত্থান— এ-দুই ভারতভূমিতে যুগপৎ সম্ভবপর, কেউ যেন এমন মোহকে ভ্রমক্রমেও প্রশ্রয় না দেন। ভারতবর্ষে একটি 'জাতীয়' ভাষা বা সামান্য ভাষা তৈরি হ'য়ে উঠতে পারে শুধু এই শর্তে যে অন্য প্রত্যেকটি ভাষার গতিপথ রুদ্ধ ক'রে দেয়া হবে, এবং সেই অবরোধে সহায়তা করবেন তাঁরাই, যাঁদের বলা যেতে পারে সেই-সেই ভাষারই সন্তান। সে-দুর্দিন যদি কখনো আসে, যদি জাতীয়তাবাদের ফুটন্ত কটাহে ভারতবাসীরা তাঁদের প্রাণরস পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হন, তাহ'লে দুটির মধ্যে একটি সম্ভাবনাকে নিশ্চিত ব'লে ধ'রে নেয়া যায়। এক হ'তে পারে— বাঙালি, মরাঠি, তামিল প্রভৃতি অভিজ্ঞান ভুলে গিয়ে আমরা সকলেই 'ভারতীয়' নামক এক অর্ধ-কাল্পনিক ধারণার মধ্যে নিবিষ্ট হবো; আমরা যে মূলত মানুষ, সেই মহাসত্যকে অস্বীকার ক'রে হ'য়ে উঠবো শুধু মাত্র প্রজা, একটি প্রয়োজনীয় জীব— কিংবা জীব পর্যন্ত নয়, বৃহদাকার রাষ্ট্রযন্ত্রের একটি আণুবীক্ষণিক অংশ মাত্র। কিংবা, যেহেতু তামিল, মরাঠি, বাঙালি প্রভৃতি অভিজ্ঞান এক-একটি সপ্রাণ পদার্থ, যার পিছনে আছে বহুযুগের বিশেষ-বিশেষ সাধনার ধারা, সেইজন্য এমন সম্ভাবনাও প্রবল যে কিছুদিন পরে, আপন-আপন ভাষা ও সংস্কৃতির অবমাননা ও অবক্ষয় লক্ষ

ক'রে, অহিন্দিভাষী সমগ্র ভারতে বিচ্ছেদপ্রবণ বিদ্রোহ জেগে উঠবে। দুয়ের মধ্যে প্রথমটি মনুষ্যত্বের প্রতিকূল, দ্বিতীয়টি আমাদের রাষ্ট্রিক ঐক্যের পক্ষে মারাত্মক। প্রথমটির অর্থ ভারতবর্ষের আবহমান ইতিহাসের প্রত্যাখান, দ্বিতীয়টির অর্থ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎকে বিপন্ন ক'রে তোলা। যে-বৈচিত্র্যবিন্যাসে ভারতবর্ষীয় প্রতিভার মৌলিক বৈশিষ্ট্য তারই মূলোচ্ছেদ হবে প্রথমটিতে, আর দ্বিতীয়টি ঘটলে আমাদের স্বাধীনতাই রক্ষা পাবে কিনা সন্দেহ। এ-দুয়ের মধ্যে কোনোটাকেই কাম্য বলা যায় না। অতএব এই সমস্যার সমাধানে আপোশ অথবা বিলম্বের অনুমোদন করলে কিছুই লাভ হবে না; সবচেয়ে ভালো এখনই এমন কোনো ব্যবস্থা করা, যাতে আমরা নিজেদের বাঙালি ব'লে অনুভব করতে পারি, ভারতীয় ব'লে জানতে পারি, আর সর্বোপরি ভুলে না যাই যে আমরা মানুষ এবং ব্যক্তি, রাষ্ট্রের কলে তৈরি পুতুল নই।

'স্বদেশ ও সংস্কৃতি'

চার্লস চ্যাপলিন

নাটক প্রোজ্জ্বল শিল্প, কিন্তু বড়োই সীমাবদ্ধ। জীবনের ছবি রক্তে-মাংসে দেখাতে পারে ব'লে সে প্রোজ্জ্বল, আর তার সীমাবদ্ধতার কারণ এই যে তাকে সব কথাই সংলাপের দ্বারা জানাতে হয়। যেহেতু বাস্তব জীবনে মুখের কথা অধিকাংশই কপট কিংবা অসার, আর জীবনের সবচেয়ে জরুরি কথাগুলি প্রায় কখনোই আমরা মুখে উচ্চারণ করি না, নাটকে তাই কৃত্রিমতা অপরিহার্য, অর্থাৎ সেখানে মানুষ এমন সোচ্চার স্পষ্টতায় মনের কথা মুখে রটায় যা বাস্তবে অভাবনীয়। ফলত, নাটকমাত্রেই অতিনাটকীয়, ড্রামার অনন্য আশ্রয় মেলো-ড্রামা; এবং মেলোড্রামা শুধু অতিবাস্তব ভঙ্গিতেই সহনীয় ব'লে নাটকের শ্রেষ্ঠ বাহন কাব্য অথবা রূপক। আধুনিক— কিন্তু ইতিমধ্যেই অনাধুনিক— বস্তুবাদী গদ্যনাটকের প্রচার যদিও বিপুল, তবু তার অক্ষমতাও প্রকট এবং সেই অক্ষমতা উপলব্ধি ক'রেই ইউজিন ও'নীল স্বগতোক্তিকে ফিরিয়ে এনেছেন, আর বর্নার্ড শ নাটকের সঙ্গে মিশিয়েছেন উপন্যাস।

গদ্য উপন্যাস বর্তমান কালে এপিকের প্রতিভূ; এবং এপিকের স্বাধীনতা বিশ্বম্ভর। স্থান-কালের সীমা সে মানে না, অন্তত কার্যত মানে না। এমন কিছু নেই, যার ধারণে বা অঙ্গীকরণে সে অক্ষম। ঔপন্যাসিক যেহেতু তাঁর রচনা-রাজ্যের ভগবান, কিছুই তাঁর অগোচর বা অবোধ্য নয়, তাই যে-কোনো স্থানে, যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো মানুষের কথা, চিন্তা, কাজ, অনুভূতি, স্বপ্ন, সমস্তই তাঁর অধিকারের অন্তর্ভূত; অর্থাৎ বাস্তবসদৃশতার ব্যতিক্রম না ক'রে জীবনের সমগ্র সত্য একমাত্র উপন্যাসেই প্রকাশ করা যায়। একমাত্র উপন্যাসেই সম্ভব মানবচিত্তের প্রত্যক্ষ অন্বেষণ, এবং সাধারণ অভিজ্ঞতার ভাষায় রহস্যময় মানবচরিত্রের রূপায়ণ। শ্রেষ্ঠ নাটকের— আর অবশ্যই কবিতার— পূর্ণ অভিঘাত অনেক সময় মন্তব্যের মুখাপেক্ষী; কিন্তু উপন্যাস নিজেই নিজের ভাষ্যরচনার ক্ষমতা রাখে।

নাটক আর উপন্যাসের মধ্যবর্তী স্থান নিয়েছে সিনেমা। নাটকেরই একটি ঐতিহাসিক উৎপাদন হ'লেও রূপের বিচারে সে উপন্যাসের নিকটতর। শুধু একটা বিষয়ে সে নাটকের মতোই দুর্বল; মানুষ কী ভাবছে, তা জানাবার শক্তি সিনেমারও সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই দুর্বলতা সে অংশত পূরণ ক'রে নিয়েছে

দুটি উপায়ে : প্রথমত, দৃশ্য ও ঘটনার তুলনায় সংলাপকে গৌন ক'রে ; দ্বিতীয়ত, ক্যামেরার দ্বারা সহজলভ্য বিকৃতি ও অতিরঞ্জনের সাহায্যে। উপরন্তু, সিনেমা গতির স্বাচ্ছন্দ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ; এবং এই তরল, অবিভাজ্য প্রবাহ উপন্যাসের অনুপযোগী হ'লেও সিনেমায় কোনো-কোনো ক্ষণস্থায়ী দৃশ্যের দূরস্পর্শী প্রভাব অনুভব ক'রে ঔপন্যাসিক ঈর্ষা এড়াতে পারেন না।

উপন্যাস এবং সিনেমার পারস্পরিক প্রভাবের স্বরূপনির্ণয়ে গবেষণার একটি উর্বর ক্ষেত্র প'ড়ে আছে, এবং কোনো-এক দিন কোনো দেশে—সম্ভবত আমেরিকায়—এ-বিষয়ে যথাযোগ্য গ্রন্থটি নিশ্চয়ই কেউ প্রণয়ন করবেন। ইতিমধ্যে দু-একটি প্রাথমিক প্রস্তাবের উত্থাপন সম্ভব : অন্তত এ কথাটি বলতেই হয় যে মার্কিন চলচ্চিত্র যখন আঁতুড়ঘরে, অর্থাৎ বর্তমান শতকের প্রথম দশকে, দু-জন য়োরোপীয় ঔপন্যাসিক, জয়স ও জীদ, আধুনিক সিনেমার আখ্যানভঙ্গির মূলসূত্র উদ্ভাবন করেন ; এবং সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত উপন্যাসের এই নূতন প্রকরণের বিবিধ রূপান্তর এবং সম্প্রসারণ ঘটেছে ভার্জিনিয়া উলফ, অল্ডাস হাক্সলি, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, জঁ-পোল সার্ৎ ইত্যাদি পরস্পর-বিসদৃশ কথাশিল্পীর রচনাবলিতে। পরবর্তীরা পূর্বসূরির কাছে কতটা শিখেছেন, আর প্রত্যক্ষভাবে সিনেমার কাছেই বা কতটা, এবং দেনা-পাওনার হিশেবে শেষ পর্যন্ত আধুনিক কথাশিল্পই আধুনিক কথাচিত্রের মহত্তর উত্তমর্ণ কিনা, এ-সব প্রশ্নের মীমাংসা পণ্ডিতের হাতে ন্যস্ত থাকলেও আপাতত এ-দুয়ের সম্বন্ধ বিচার করার অন্য একটি উপায় আমাদের হাতে আছে। সে-উপায় চার্লস চ্যাপলিন ; কেননা চ্যাপলিনই একমাত্র, যিনি ঔপন্যাসিকের মন এবং অভিপ্রায় নিয়ে চলচ্চিত্র রচনা করেছেন।

২

যদিও হলিউডের নিন্দায় আমরা অনেকেই শতমুখ, এবং হলিউডের প্রভাবে মার্কিন সাহিত্যের প্রগতিশীল অধঃপাতের বর্ণনাও বহুবার শোনা গেছে, তবু এ-কথা সত্য যে চ্যাপলিন ঐ হলিউডেরই সন্তান। যদি অন্য কিছু নাও থাকতো, তবু এই জাত-ইংরেজ ছোট্ট মানুষটি একাই আছেন পৃথিবীর কাছে হলিউডের বিজয়ঘোষণা। হলিউড বলতে স্বভাবত আমাদের চ্যাপলিনকে মনে পড়ে না ; কিন্তু এ-কথা স্মর্তব্য যে সিনেমা— মার্কিন সিনেমাই— এই প্রতিভাশালীর ভাগ্যনিয়ন্তা। যে-দরিদ্র যুবক ভাগ্যের অন্বেষণে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলো, মার্কিন মাটিতে তার পা পড়লো ঠিক সেই সময়ে, যখন সিনেমা সে-দেশে

হাত-পা ছুঁড়ে আঁতুড়ে বাড়ছে। সমসাময়িক ইতিহাসে উল্লেখ্য এই সমাপতন উল্লেখ্য এই কারণে যে সিনেমা যেমন তাঁকে চেয়েছে, তাঁরও তেমনি প্রয়োজন ছিলো সিনেমার, অবিকল্প প্রয়োজন। কেননা, তাঁর স্বাভাবিক শক্তিসমূহ এমন অসাধারণভাবে মিশ্রিত ছিলো যে সিনেমা ছাড়া অন্য-কোনো উপায়ে তাদের যথোচিত অভিব্যক্তি সম্ভব হ'তো না। কেউ-কেউ যেমন জাত-লেখক, চ্যাপলিন তেমনি ফিল্মের জন্যই জন্মেছিলেন।

'তৎসহ দুই খণ্ড কমিক' ব'লে বিজ্ঞাপিত পূর্ব-চ্যাপলিনের হ্রস্ব চিত্রাবলি যাঁরা মনে করতে পারেন, তাঁরাই বুঝবেন যে তক্তা ছেড়ে পরদায় বদলি হবার সঙ্গে-সঙ্গেই নিজেকে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, অন্যদের তুলনায় তাঁর বৈশিষ্ট্য তখনই স্পষ্ট ছিলো, বালকের চোখেও স্পষ্ট ছিলো। এই বৈশিষ্ট্যের মূল তাঁর হাস্যোদ্দীপক বেশভূষা বা অঙ্গসজ্জায় পাওয়া যাবে না, অধমতম বাউণ্ডুলের রম্যতম প্রতিচিত্রণেও না; হাত, পা, চোখ, ঠোঁট ও পেশীর অসংখ্য অতুলনীয় সূক্ষ্ম যে-সব ভঙ্গিতে তিনি চতুর্বর্ণের চিত্তহরণ করেছিলেন; সে-সবেও এই বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা নেই। গূঢ় মৌলিকতা তার কারণ; ভঙ্গি, পোশাক, চরিত্ররূপ, যা-কিছু চ্যাপলিনের আর যা-কিছু চ্যাপলিন, সব-কিছুর মধ্যেই প্রথম থেকে তিনি স্রষ্টার স্বাক্ষর রেখেছেন; তাঁর রচনামাত্রই, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, বানিয়ে-তোলা জিনিশ নয়, হ'য়ে-ওঠা পদার্থ।

চ্যাপলিনের প্রতিভা এই অর্থে শেক্সপীরীয় যে তাঁর ব্যাবসায় চলতি প্রথা সব ক-টা মেনে নিয়েও তিনি বিশ্বাস্য, প্রামাণিক ও ব্যক্তিগত হ'তে পেরেছেন। তাঁর মৌলিকতা বিদ্রোহবর্জিত; কদাচ কোনো অদ্ভুত তাঁর কাছে প্রশ্রয় পায়নি। কর্মক্ষেত্রের সমসাময়িক অবস্থা এবং মাধ্যমিক মার্কিন বোধের সীমানা— এর কোনোটাকে অতিক্রম না-ক'রেও নির্জন নিজের একান্ত কথাটা তিনি ব'লে উঠতে পেরেছেন, সবচেয়ে বিস্ময়কর কথাটা হলো এই। হলিউডি সূত্র বারে-বারেই তাঁর রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে; 'দি গোল্ড রাশ'-এ ছেঁড়া কাঁথা থেকে লাখ টাকার গল্প, 'সিটি লাইটস'-এ প্রণয়ের ভাবালুতা, জ্যাকি কুগানের সহযোগে রচিত চিত্র দুটিতে কৈশোরলালিত্য। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি স্বকীয় এবং বিষয়-নির্বিশেষে সক্রিয় ব'লে গতানুগতিক সূত্রেই নূতন অর্থ বারে-বারে উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটেছে। অর্থাৎ, আবার শেক্সপীয়রের মতোই, চ্যাপলিন স্তরবহুল শিল্পী, ভোক্তার তারতম্যের অনুপাতে তাঁর আবেদনের স্তরও ভিন্ন-ভিন্ন, কিন্তু নিম্নতম স্তরেও বঞ্চিত হ'তে হয় না, কেননা নিছক উপভোগের সমান অংশিদার সকলেই।

সৃষ্টিশীলতার উদাহরণ ফিল্মের জগতে আরো আছে; কিন্তু চ্যাপলিনের সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না। পৃথিবীর চিত্রলোকে সর্বমুখিতায় তাঁর জুড়ি নেই। নটরাজ তিনি; সেই সঙ্গে কাহিনী, সংলাপ, সংগীত তাঁরই রচনা; সমগ্র প্রয়োজনাও তাঁর। তাঁরই সেই আশ্চর্য আকস্মিক সংকেত, কবিতার পঙক্তির মতো যা অবিস্মরণীয়; সার্বিক, সর্বশেষ প্রভাবটিও তাঁরই। চ্যাপলিনের সিনেমায় চ্যাপলিনই সর্বস্ব: একে তো এমন মুহূর্ত বিরল, যখন আমরা তাঁকে দেখছি না, তার উপর অন্যান্য নটনটী সুদ্ধু তাঁর সৃষ্টি, কেননা তারা অখ্যাত, অশ্রুতপূর্ব, এবং প্রতিবারেই নতুন। বস্তুত, চ্যাপলিন উপন্যাস লিখলে যতটা তার লেখক হতেন, প্রায় ততটাই তাঁর ফিল্মের তিনি প্রণেতা।

উপরন্তু, তিনিই মূক যুগের একমাত্র খ্যাতনামা, যিনি বাক্‌চিত্রের বিপ্লব উত্তীর্ণ হয়েছেন। শুধু যে উৎরেছেন তা নয়, জয়ী হয়েছেন, বিজয়ী। চ্যাপলিন, মূক মুদ্রার অধীশ্বর, প্রথমেই লুপ্ত হবার তাঁরই তো কথা ছিলো। কিন্তু শিল্পপদ্ধতির এই আকস্মিক বিরাট পরিবর্তন তিনি আত্মসাৎ করলেন— শুধু দক্ষতার দ্বারা নয়, নির্লোভ চারিত্রগুণে। সঙ্গে-সঙ্গেই বাক্‌যোজনায় রাজি হ'লে সর্বনাশ অবধারিত জেনে তিনি জিতবেন ব'লে ঠেকালেন, শিখবেন ব'লে হার মানলেন। সংকট বড়ো অদ্ভুত; প্রায়-প্রৌঢ় বিশ্ববিশ্রুত শিল্পীকে হয় নতুন ক'রে শুরু করতে হবে, নয়তো মেনে নিতে হবে তিরোধান। পরীক্ষা কঠিন, কিন্তু চ্যাপলিনও কম যান না। তলব করলেন তাঁর বুদ্ধির, অভিজ্ঞতার সম্বল; খুঁজে পেলেন তখন পর্যন্ত অব্যবহৃত ও অব্যবহার্য ক্ষমতার ভাণ্ডার। যা এসেছিলো লুপ্তির আশঙ্কা নিয়ে, তাতেই বিস্তৃত হ'লো তাঁর কর্মক্ষেত্র, নতুন রূপ নিলো উদ্ভাবন, সক্রিয় হ'লো তাঁর সাংগীতিক, বাচনিক, বাগ্মিক প্রতিভা; মূকাভিনয়ের সরল রূপকের জগৎ থেকে তাঁর মুক্তি হ'লো বাস্তব আলেখ্যের সমৃদ্ধ জটিলতায়। মহত্তর চ্যাপলিনের জন্ম হ'লো।

কিন্তু একবারেই এতটা হ'লো না। ধীরে-ধীরে, ধাপে-ধাপে তিনি এগোলেন; নিজেকে শেখালেন নববিধান, আর সেই সঙ্গে হলিউডকেও শেখালেন সিনেমায় শব্দযোজনার প্রকৃত সার্থকতা কোথায়। বাক্‌চিত্রের আবির্ভাবের পর তাঁর প্রথম রচনা 'সিটি লাইটস'-এ কারো মুখে কথা ফুটলো না, শুধু মাঝে-মাঝে আওয়াজের চমক আর সংগীতের আঘাত লাগলো। তৎকালীন গীতবাদ্যচীৎকারে সর্বতোমুখর কর্ণভেদী মর্মভেদী বাক্‌চিত্রের তুলনায় 'সিটি লাইটস'-এ এতটাই সুখশান্তি ছিলো যে অনেকেই তখন ভেবেছিলেন চলচ্চিত্রে স্তব্ধতাই স্বর্ণিল। কিন্তু চ্যাপলিন

তা ভাবেননি, কেননা তাঁর পরবর্তী 'মডার্ন টাইমস'-এ এক তিনি ছাড়া সকলেই কথা বললো, আর তাঁর গভীর, সুগোল কণ্ঠস্বরও সেখানেই আমার প্রথম শুনতে পেলাম। এই 'মধ্যবর্তী' রচনা দুটির কোনো-কোনো অংশ আপতিকরূপে বাক্‌চিত্রকে ব্যঙ্গ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাষাবর্জিত বিশুদ্ধ ধ্বনি নিয়ে পরীক্ষা। মূকাভিনয়ের অতিরঞ্জিত দৃশ্যভঙ্গির পরিবর্তে চ্যাপলিন প্রয়োগ করলেন শ্রাব্য ভঙ্গির আতিশয্য। ধ্বনি, শুধু ধ্বনি, কত যে কার্যকর হ'তে পারে তা আমরা বুঝলাম 'সিটি লাইটস'-এ গণবক্তৃতার ব্যঙ্গরূপ শুনে ('দি গ্রেট ডিক্টেটর'-এ হিটলারি বক্তৃতায় তারই পূর্ণ পরিণতি), উদরস্থ বেলুন থেকে নিঃসৃত অনৈচ্ছিক কণ্ঠবাদনে, আর 'মডার্ন টাইমস'-এ চ্যাপলিনের সেই মরীয়া-হওয়া, তখন-তখন-তৈরি-করা বিনা-কথার গীতনিস্বনে। সেই গান, এডগার অ্যালান পো-র নারীহন্তা বানরের কিচিমিচির মতো, প্রত্যেকেই তখন ভেবেছিলো নিজের অজানা কোনো ভাষায় বিন্যস্ত। কৌশলের দিক থেকে, রসের দিক থেকেও, সিনেমার সারা ইতিহাসেই স্মরণীয় এই অংশগুলি চ্যাপলিনের গান্ধর্ব-বিদ্যারই আবিষ্কার। মুখর হবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা নিয়েও চ্যাপলিনের মন্থর সতর্কতা শুধু ধৈর্য ও সুবুদ্ধিরই পরিচায়ক নয়, এ থেকে তাঁকে আত্মনিষ্ঠ ও বিবেকবান শিল্পী ব'লেও আমরা চিনতে পারি।

কিন্তু এত বড়ো গুণী হ'য়েও চ্যাপলিন আজ সাহিত্যিকের আলোচনার বিষয় হতেন না, যদি না তাঁর স্বকীয় কিছু বক্তব্য থাকতো, আমাদের সকলের পক্ষে জরুরি কোনো বক্তব্য। তাঁর অনন্যতার প্রকৃত উৎস এইখানে যে সর্বোপরি তিনি ভাবুক। শুধু যে ভাবতে পারেন তা নয়, খাঁটি সিনেমার ভাষায় ভাবতে পারেন। ('দি গোল্ড রাশ'-এ 'ছোট্ট মানুষটি' তার প্রকাণ্ড বুভুক্ষু সঙ্গীর চোখে মস্ত নধর মুরগি হ'য়ে নৃত্য শুরু করলে, নরভুক্‌বৃত্তির এমন ব্যঞ্জনা আর কোন শিল্পরূপে সম্ভব হ'তো?) যেহেতু চ্যাপলিন, একমাত্র চ্যাপলিন, সিনেমাকে সাহিত্যের মতোই চিন্তার বাহনরূপে ব্যবহার করতে পেরেছেন, সেইজন্যই, শুধু পূর্ব জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের নয়, পরবর্তী ক্ষণপ্রভদের অতিক্রম ক'রে বিশ্বব্যাপী দুঃসময় ভ'রে তাঁর প্রতিপত্তি আজ অব্যাহত। গত শীতের গার্বোরা আজ কোথায়? তারা আসে যায়; চ্যাপলিন থাকেন।

চ্যাপলিন হাস্যরসে তুলনাহীন, কিন্তু তাঁর হাসি, এলিয়টের বর্ণিত 'অর্থে'র

মতো, শুধু আমাদের মুখ বন্ধ ক'রে রাখে, আর সেই ফাঁকে তিনি নিজের কাজ হাসিল করেন, নিজের কথা বলে নেন। ফলত, তাঁর বক্তব্য প্রকট হ'য়ে ওঠে না; 'দি গ্রেট ডিক্টেটর' বাদ দিলে আর কোনোখানেই ওঠেনি। চিত্রটির প্রকাশ-কাল ১৯৩৮, যখন ফ্যাশিবাদের বিভীষিকার সামনে তাঁর শিল্পের দাবিকে তিনি গৌণ ক'রে দেখেছিলেন। সেটি যে চ্যাপলিনের প্রতিভার যোগ্য হয়নি, তা বলার জন্য দ্রষ্টা হ'তে হয় না, কিন্তু সেই একটি অপলাপ নিয়ে নালিশ তোলা, তার ঠিক দশ বছর পরে 'মঁসিয় ভের্দু' পেয়েও, শুধু অনর্থক নয়, কৃতঘ্নতাও; কেননা এই 'হাস্যময় হত্যালীলা'র কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় নেই।

'নতুন চ্যাপলিন': বিজ্ঞাপনের ঘোষণা। নিশ্চয়ই; কিন্তু নতুন শুধু এ-অর্থে নয় যে এতদিনে প্রায় বিশ্বপুরাণের অঙ্গীভূত সেই ঢিলে জুতো আর ঢোলা পাৎলুন-পরা বাউণ্ডুলে এখানে প্রৌঢ় প্যারিসীয় ফুলবাবুতে রূপান্তরিত: 'মঁসিয় ভের্দু' নিরন্তর উদ্বর্তনের একটি চরমক্ষণ। পৃথিবী বদলেছে, আমরা বদলেছি, চ্যাপলিনও বদলেছেন। আমরা বুড়ো হচ্ছি, চ্যাপলিনও বুড়ো হচ্ছেন। যে-সব প্রতিবন্ধক সহজাত কিংবা অপ্রতিকার্য, তার সঙ্গে ব্যবহারের তারতম্যে শিল্পীর কুলনির্ণয় সম্ভব। অনেকেই তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হন, কেউ-কেউ কোনোরকমে তাকে ঠেকিয়ে রাখেন, দু-একজন সেই দুর্বলতাকেই শক্তি ক'রে তোলেন। চ্যাপলিনের খর্ব আকৃতি আর কমনীয় প্রত্যঙ্গের ব্যবহারে পরম কর্তৃত্ব আমরা বরাবরই দেখেছি; এখানে উপরন্তু আর-একটি সম্পদ তিনি পেয়েছেন, ধূসরায়মান কেশগুচ্ছ, যা স্পষ্টতই কৃত্রিম বর্ণলেপনের অপেক্ষা রাখেনি। ভের্দু, পেশাদার পতি, পেশাদার পত্নীহন্তা, সে যে এমন শোকান্তিক, হসন্তিক, মর্মান্তিক, আর শেষ পর্যন্ত এমন গরীয়ান, তার কারণেই ঐ যৌবনাতিক্রমের বিজ্ঞপ্তি। মাদাম গ্রোনের কাছে তার প্রণয়নিবেদনের উৎক্ষেপ; আনাবেলার রতিমত্ত আলিঙ্গনে তার বিতৃষ্ণ মুখভঙ্গি; তার জীবে দয়া; তার প্রকৃত অথবা একমাত্র স্ত্রী এবং সন্তানের জননী, খঞ্জ মোনার প্রতি তার স্নেহের দ্রবতা;—এই সমস্তই তার কেশচ্ছুরিত রৌপ্য আভায় আলোকিত। ভের্দুর প্রৌঢ়তা এই কাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজন।

চ্যাপলিনের ভাবুকতা, মানুষের জন্য তাঁর গভীর ভাবনা-বেদনা 'মঁসিয় ভের্দু'তে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হ'লো। যৌবন-পেরোনো চাকরি-খোয়ানো এই ব্যাঙ্কের কেরানি আধুনিক দুর্গত মানুষের প্রতিভূ। এই রণদীর্ণ জগৎ, যেখানে মানুষ দারিদ্র্য ও দুষ্ক্রিয়ার মধ্যে আন্দোলিত, তারই বিরুদ্ধে ভের্দুর যুদ্ধঘোষণা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে গুণ্ডারাজ্যের আসন্ন বিস্তার উপলব্ধি ক'রে, সাধারণের আকাঙ্ক্ষিত শান্ত, সাধু জীবনের আশা সে ত্যাগ করেছে, এখন হিংস্রতার উত্তরে হিংস্রতা নিয়েই সে প্রস্তুত। এই সংগ্রামে তার পরাজয় অবধারিত; কেননা ও-বস্তু টিকে থাকতে পারে শুধু বৃহৎভাবে সংঘবদ্ধ হ'লে, আর ভের্দু একজন মানুষ মাত্র, একজন ব্যক্তি— সভ্যতার সেই অমূল্য সম্পদ, যার বিনাশে বর্তমান পৃথিবী বদ্ধপরিকর। বধ্য দুর্বলতরকে বধ ক'রে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এও সে জানে যে তার নিস্তার নেই। সেই কাফের দৃশ্য, যেখানে ভের্দুর কোনো-এক বিগত 'পত্নী'র কঠোরদর্শন আত্মীয়যুগল শেষ পর্যন্ত তাকে দেখে ফেললো, তাতে স্পষ্টই বলা আছে যে ভের্দু ধরা পড়লো না, ইচ্ছে ক'রে ধরা দিলো। কাফে থেকে বেরিয়ে এসেছিলো; ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিলো, সময় ছিলো প্রচুর। কিন্তু ভের্দু ফিরে গেলা। তা-ই ভালো; অমঙ্গল তার অনুগামীকে ধ'রে ফেলেছে, কেড়ে নিয়েছে হত্যালব্ধ অর্থ। শেয়ারবাজার বিচূর্ণ; য়োরোপ ভ'রে ব্রাউন-কামিজের হংসপাদিক কুচকাওয়াজ চলছে। আর সেই বেড়াল পোষা, শোপেন-হাওয়ার-পড়া, জেল-ফেরতা নিঃস্ব বিধবা তরুণী, অসীম অমঙ্গলের মধ্যে এক বিন্দু ভালো, যাকে বিষক্রিয়ার পরীক্ষা থেকে শুধু নয়, টাকা দিয়েও ভের্দু বাঁচিয়েছিলো, সে এখন এক ধনী অস্ত্রনির্মাতার হীরকচ্ছুরিত উপপত্নী। এদিকে পুলিশ হয়তো কখনোই তাকে ধরতে পারবে না;— আর তাহ'লে? ক্লান্ত সে; বুড়ো হচ্ছে। না, এ-ই ভালো; এখানেই খেলা ভাঙুক।

'মঁসিয় ভের্দু'র কাহিনী এখানেই সমাপ্ত: বিচারদৃশ্য চ্যাপলিনের ভাষ্য। কী উপন্যাসে, কী নাটকে, এই অংশই সবচেয়ে আশঙ্কাজনক, কিন্তু নরহত্যা, মনুষ্যজীবন এবং ভগবানের বিষয়ে ভের্দুর অতর্কিত মন্তব্য যদিও অব্যবহিত বোধগম্যতার প্রয়োজনে অতিসরল, তবু তা নাৎসিবিরোধী চ্যাপলিনের শেষ বক্তৃতার মতো ছন্দপতন ঘটায়নি, নাটকীয়তার দিক থেকেই সংগত হয়েছে। 'দি গ্রেট ডিক্টেটর'-এর চ্যাপলিন শেষ পর্যন্ত সব ছদ্মবেশ মোচন ক'রে আত্মরূপেই আত্মকথা বলেছিলেন; কিন্তু—যদিও নাম তার কখনো মঁসিয় ভের্দু, কখনো ক্যাপ্টেন বনূর, কখনো মঁসিয় ফ্লোরে, আবার কখনো বা মঁসিয় ভার্নে— ভের্দু সবসময়ই ভের্দু, তার সম্মোহনে বিরাম নেই, গিলোটিন-যাত্রার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সে অবশ্যমান্য। নাটকের গতিকে কোথাও ব্যাহত না-ক'রে চ্যাপলিন তাঁর সব কথা ব'লে নিয়েছেন; আমাদের বিশ্বাস করাতে পেরেছেন যে ভের্দুই বধ্য, আর ঘাতক তার পরিবেশ— আমাদের পরিবেশ: এই বর্তমান পৃথিবী।

চ্যাপলিনের বিশেষ কীর্তি এইখানে যে এমন প্রচুর আমোদের সঙ্গে-সঙ্গে এই কাহিনীর সমস্ত বিভীষিকা তিনি প্রকাশ করতে পেরেছেন। বিভীষিকা মুহূর্তের জন্যও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'য়ে ওঠেনি; সারা ফিল্মে আমরা চোখে দেখলাম শুধু একজনের হত্যা, কিন্তু বিষপ্রয়োগে গোয়েন্দার সেই অবলোপনে বরং যত্নসাধিত মৃদুতাই লক্ষণীয়। চিত্রিত কাহিনীর মধ্যে নারীহত্যাও একটিমাত্র ঘটলো; কিন্তু সেটি আমরা চোখে দেখলাম না, হত্যার উপায়টা পর্যন্ত অনুমানের বহির্ভূত থাকলো। খবরটা ভের্দু আমাদের জানিয়ে দিলো শুধু তার নিশীথরাত্রির চান্দ্রিক উচ্ছ্বাসে; আশ্চর্য সেই পরিহাস, আশ্চর্য ধূর্ত বক্রোক্তি। এ-দুটো বাদ দিলে ভের্দুর পৈশাচিক প্রচেষ্টার প্রতিঘাতে তার নিজেরই দুর্দশার সীমা থাকে না; আনাবেলার সলিলসমাধি ঘটাতে গিয়ে সে নিজেই প্রায় ডুবে মরে, বর সেজে বিয়ে করতে গিয়ে তাকে টেবিলের তলায় লুকোতে হয়। ফলত, তথ্যের হিশেবে যে-মানুষ ঘৃণ্য, তাকে দেখে আমরা হেসে গড়াই। চ্যাপলিনের কৌতুকপ্রতিভার প্রভাবে আমাদের অনুকম্পা নিরন্তর ভের্দুর দিকে ব'য়ে চলে। তাকে আমরা নারীহন্তা রাক্ষস ব'লে জেনেছি, কিন্তু চোখে দেখছি ক্ষুদ্র, অক্ষম, হাস্যকর, করুণাভাজন একজন মানুষকে।

তবু বিভীষিকার বিরাম নেই, বিরাট বেনামি কোনো নির্যাতনের আতঙ্ক কাফকার শিহরনের মতো আদ্যন্ত অন্তঃশীল। রেলগাড়ির চাকার প্রতীকী ঘূর্ণনে আতঙ্ক; ভের্দু যখন আলগোছে বলে, 'Business is a ruthless business', সেই কথার সুরে আতঙ্ক; আনাবেলার বিকট হাসির হায়েনা-তানে আতঙ্ক। আসলে, এই রূপসী রমণীর বিকৃত, কুৎসিত চিত্রণে চ্যাপলিন আমাদের জানালেন যে দাঁত-নখ-মাংসপেশীময় শক্তিরূপিণীর পরাভব অসম্ভব, কেননা পৃথিবী হিস্টিরিয়ার হাতে সমর্পিত, অতএব রাজত্বই আনাবেলার। পূর্ণাঙ্গ একটি মহৎ উপন্যাসের বিষয় এখানে দেখছি নব্বুই মিনিটের প্রমোদচিত্রে সংহত: এই দুঃসাহস চ্যাপলিনের পক্ষেই সম্ভব, কিন্তু চ্যাপলিনও এই অসাধ্যসাধন করতে পেরেছেন প্রায় সিনেমার স্বভাব লঙ্ঘন ক'রে। ম'সিয় ভের্দুতে সংক্ষেপীকরণ অত্যধিক, সিনেমার পক্ষে অত্যধিক, কেননা সিনেমায় অর্থবোধের অব্যবধান চাই। গার্হস্থ্য জঞ্জাল পোড়াবার চুল্লির ঘন কালো ধূমোদ্গিরণ পলকের জন্য আমাদের দেখানো হ'লো, তা-ই থেকে একটি বীভৎস ঘটনা বুঝে নিতে হবে। কাহিনীর বিভিন্ন অংশের সংযোজনার যান্ত্রিক সূত্রগুলি এতদূর পর্যন্ত বর্জিত হয়েছে যে এই চিত্র আমাদের ঋজুপৃষ্ঠ মনঃসংযোগ দাবি করে। প্রথমবার

দেখে মঁসিয় ভের্দু হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব; আবার দেখতেই হবে, সম্ভব হ'লে আরো অনেকবার। কিন্তু সিনেমাভবনে পুনরাগমন যখন অনিশ্চিত, তার সম্ভাবনাও নিজেদের আয়ত্তে নেই, এবং পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম ফিল্মটিরও অবলুপ্তি যখন অনিবার্য, তখন এমন চিন্তা অনেকের পক্ষেই স্বাভাবিক যে মঁসিয় ভের্দু ফিল্ম না-হয়ে—এমনকি চ্যাপলিনের ফিল্ম না-হ'য়ে—উপন্যাস হ'লেই ভালো হ'তো। জয়স সত্যই বলেছিলেন যে সাহিত্য সর্বাপেক্ষা মননশীল শিল্পরূপ, অর্থাৎ, কোনো মননশীল বক্তব্যের যথাযোগ্য স্থায়ী বাহন একমাত্র সাহিত্যই হ'তে পারে। পরিশেষে, তাই, সিনেমার এই অপূর্ব উন্নয়নের জন্য চ্যাপলিনকে আকাশস্পর্শী প্রশংসা ক'রেও এ-আক্ষেপ থেকে যায় যে এই বিরল প্রতিভা এমন এক উপায়ে আত্মপ্রকাশে বাধ্য হ'লো, যা স্বভাবতই অচিরস্থায়ী।

'স্বদেশ ও সংস্কৃতি'

এক গ্রীষ্মে দুই কবি

দিনের পর দিন, বিরাম নেই। ক্ষমা নেই, বিরাম নেই, নিষ্ঠুর। আরম্ভ হয় ঘুম ভাঙা মাত্র, রাত একটা পেরিয়ে গেলেও থামে না। সাতটা বেলা তিনটে বেলায় তফাৎ নেই, তফাৎ নেই মধ্যদিন ও মধ্যরাত্রে। কিংবা যদি বা থাকে, তা ধরা পড়ে শুধু নিশ্চেতন যন্ত্রে ও গণিতে, আমাদের ত্বকে বা ফুশফুশে তা অনুভূত হয় না। লোহিতসাগরের তাপের সঙ্গে মিলিত হয়েছে যবদ্বীপের আর্দ্রতা : এক ধূসর ও ধাতব আকাশের তলে কলকাতা মোহ্যমান। আরাম নেই স্নানে, তৃপ্তি নেই পানে, পরিধান দুঃসহ, নিজের দেহটা সুদ্ধ অশ্লীল হ'য়ে উঠেছে। পিঠের সঙ্গে মিনিটে-মিনিটে লেপটে যাচ্ছে গেঞ্জিটা ; নামছে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম, কাপড়ের তলায় গা বেয়ে সারি-সারি কৃমির মতো। রাস্তায় আগুন, বারান্দায় হলকা, চুল্লির মতো বাথরুম : আর ঘরের মধ্যে গ্রীষ্মাতুর মহিলার বিলাপধ্বনি। দিনের পর দিন, দিনে ও রাত্রে, একই রকম।

এ-রকম সময়ে ঈর্ষা করতে হয় গৃহপালিত কুকুরটিকে, যার বিকার নেই, নালিশ নেই, কোনো হেডলাইন অথবা প্রধান মন্ত্রীর মন্তব্য প'ড়ে মেজাজের মাত্রা বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা নেই ; দিনের পর দিন, দিনে ও রাত্রে, যে পাখার তলায় ঠাণ্ডা মেঝেতে প'ড়ে থাকে— সময়ের বাইরে, ইতিহাসের বাইরে, সাহিত্য, নারী ও রাজনীতির প্রলোভনের অতীত। ঈর্ষা করতে হয়, করতেও পারি— কিন্তু তার বেশি আর-কিছু পারি না, কেননা আমাদের মন এই গ্রীষ্মের চেয়েও ক্ষমাহীন। তাই, যে ক'রে হোক, অন্য কোনো উপায় খুঁজে নিতে হয় আমাদের, বানিয়ে নিতে হয়, যার ফলে এই দিনগুলো ভ'রে শুধু স্বর্গত পিতামাতাকে অনর্থকভাবে স্মরণ করতে না হয়, যাতে এই ক্লেদময় দাহন আমরা সহ্য করতে পারি— এমনকি, জয় করতে। আর সেই উপায়— যদি তাকে অব্যর্থ ও অবিরাম হ'তে হয়, হ'তে হয় আমাদের মর্জির অস্থৈর্য থেকে মুক্ত— তাহ'লে মানুষের অভিধানে একটিমাত্র নাম আছে তার : কাজ। আমিও একটি কাজ বেছে নিয়েছিলুম, দিনের পর দিন, অবিরাম।

এমন একটা কাজ, যা প্রেরণার উপর নির্ভর করে না, যা কোনো মুহূর্তেই দৈবাধীন নয়, বলতে গেলে যা গাধার খাটুনি, অর্থাৎ, নীরস ও নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের সুযোগ দিয়ে যা মানুষের আত্মমর্যাদাকে বলীয়ান ক'রে তোলে।

সৃষ্টির উন্মাদনা বা হতাশা নেই, আছে সংকলনকর্মের অমধুর সাধ্বিতা। দুটো পাখা চলে ঘরের মধ্যে, দরজা-জানলা বন্ধ, ইঞ্চি-খোলা জানলার ফাঁক দিয়ে নিস্তেজ আলো পড়ে শাদা কাগজে; আর আমি ব'সে-ব'সে শার্ল বোদলেয়ারের একটি জীবনীপঞ্জি রচনা করছি। সম্পাদকের উপরোধ ঠেলে, উপার্জন মুলতুবি রেখে, এমনকি নিজের অনেক সংকল্পকে দূরে সরিয়ে—আমি ছুটছি আমার পক্ষে অতীব অরুচিকর সাল-তারিখের পিছনে, পথ হারিয়ে ফেলেছি তথ্যের অরণ্যে, নাজেহাল হচ্ছি গ্রন্থসমূহের ওজনে এবং নিজের অসামান্য বিস্মরণ-ক্ষমতায়।—কেন? এর ফলে কি বোদলেয়ারের কবিতা বিষয়ে নতুন কোনো অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছি আমি? কি দেখতে পেয়েছি ইতিহাসের কোনো সূত্র? তা বলতে পারলে খুশি হতুম; কিন্তু আমাকে মানতেই হবে যে কবিতার নির্যাস সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক, এবং নিয়মহীনতাই ইতিহাসের নিয়ম। অথচ এই ধূসর শ্রম আমাকে কিছুই প্রতিদান দেয়নি তাও বলতে পারে না। শুধু যে গ্রীষ্মবোধ ভুলিয়ে রেখেছে তা নয়, মাঝে-মাঝে খিদে জাগিয়ে খাদ্যকে স্বাদু করেছে তাও নয়;—দিয়েছে উদ্দীপনার মুহূর্ত, আবিষ্কারের আনন্দ, গুপ্ত সংযোগ ও অনুল্লিখিত সাদৃশ্যকে তুলে ধরেছে আমার সামনে, যার ফলে ইতিহাসের মানচিত্র অকস্মাৎ একটি ছবি হ'য়ে উঠেছে কখনো-কখনো। সত্য, এই সংযোগগুলি দৈবাধীন মাত্র: তবু তার কোনো-কোনোটি, কবিতার দুই চরণের মিলের মতোই, এমনই পরাক্রান্ত ও প্রতিধ্বনিময় যে তার পিছনে কোনো-এক সাভিপ্রায় স্রষ্টাস্থাপনের প্রলোভন প্রায় অপ্রতিরোধ্য। এমনি একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করি: শার্ল বোদলেয়ার ফিয়ডর ডস্টয়েভস্কি একই বছরে জন্মগ্রহণ করেন।

একই বছরে। নিতান্তই কাকতালীয়, তবু ভাবতে কি অবাক লাগে না? ভাবতে অবাক লাগে না যে আমাদের এই দীন গ্রহে যুগপৎ প্রেরিত হয়েছিলেন এমন দুই পুরুষ, যাঁদের জীবনের কাজ প্রচারিত হবার পর থেকে সেই কাজটির বিষয়ে ধারণা সুদ্ধ বদলে গেলো? বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা নতুন ধারণা আনেন পৃথিবীতে— বিশ্ব, অথবা ভগবান, অথবা সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ে নতুন ধারণা; আর সে-সব ধারণা যে মূর্ত হবারও ক্ষমতা রাখে, তার প্রমাণ মানুষের প্রিয় অথবা ঘৃণ্য, কিন্তু ব্যবহারযোগ্য, প্রতিষ্ঠানসমূহ। কিন্তু একজন কবি— তিনি? কী তাঁর কাজ? কোথায় তাঁর ক্ষমতা? একজন বিজ্ঞানীর তুলনায়, এমনকি একজন দার্শনিকের তুলনায়, কী দরিদ্র তিনি, প্রায় শিশুর মতো রিক্ত ও দুর্বল;

পাণ্ডিত্য নেই, নেই যুক্তির যাথার্থ্য বা তথ্যের স্পর্শসহতা; একটা নতুন ধারণাও নেই বেচারার তল্পিতে, এমন কোনো চিন্তা নেই যা তাঁর আগে বহু কবি প্রকাশ ক'রে না-গেছেন। তাঁর বর্ণিল, অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট জগৎ থেকে মানবজাতিকে কোনো বাণী তিনি শোনাতে পারেন না, পারেন না উপদেশ দিতে, উপায় জোগাতে, কোনো সংকটে পথ ব'লে দিতে পারেন না। চরম যা পারেন তিনি, তা শুধু নিজেকে অবলম্বন করে: নতুন ক'রে তুলতে পারেন শুধু নিজেকে, আর কাব্যকলাকে। ব্যাপারটার ওখানেই শেষ: কবিতা থেকে কোনো প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠবে না, চাঁদে যাবার যান তৈরি হবে না, মানবজীবনে আর কোনো প্রতিফলন হবে না তার। কবিতা নিজেই মূর্ত, মূর্ত না-হ'লে সে কবিতাই হ'লো না; দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ধারণার সঙ্গে এখানেই তার দুস্তর ব্যবধান। ধারণার স্বভাব এই যে মূর্তিতে অনূদিত হবার প্রক্রিয়াটি তার মধ্যে অনিবার্যভাবে কিছু বিকৃতি ঘটায়, সঞ্চার করে কিছু কলুষ, কিছু অসংশোধনীয় ভ্রান্তি, যার ফলে বিবাহ, গণতন্ত্র বা শ্রেণীহীন সমাজের মতো মনোমুগ্ধকর ধারণাও প্রসব করে পঙ্গু অথবা জন্মান্ধ সন্ততি। এখানে বরং, স্বনির্ভর ব'লে, কবিতার একটু সুবিধে আছে: যেমন জগৎকে বদলাবার তার শক্তি নেই তেমনি অন্য কিছুও পারে না তার বিকার ঘটাতে; সাংবাদিকতা, শতবার্ষিকী ও অধ্যাপকের আক্রমণ সত্ত্বেও যুগে-যুগে তার মৌল মহিমা প্রতিভাত হয়; অন্তত কোনো-কোনো অপ্রস্তুত পাঠক, প্রতি যুগে, হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে তাকে, যেন এইমাত্র কবিতার জন্ম হ'লো, তার আগে কিছুই ছিলো না। বুকে তীর বিঁধলে যেমন হয় সে-অভিজ্ঞতাও তেমনি; তার সঙ্গে তর্ক চলে না, তা আমাদের উপযোগের অধীন নয়, আমাদের সেবা করে না সে, দখল ক'রে নেয়।

মনে হচ্ছে পাঠকরা উশখুশ করছেন, কোনো-একটা প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'তে চাচ্ছে। আমি কি দু-জন লেখকের নাম করিনি, আর তাঁদের মধ্যে একজন কি ঔপন্যাসিক নন? কবিতাই যদি আলোচ্য তাহ'লে ডস্টয়েভস্কির স্থান হয় কেমন ক'রে? না-দিলেও চলে, তবু বিশ শতকের প্রথা ও বাঙালি পাঠকের অভ্যাসের প্রতি সম্মানবশত এর জবাব দেবো। সংস্কৃতে, গদ্যপদ্যনির্বিশেষে, সৎসাহিত্যের অভিধা ছিলো 'কাব্য'; আর জর্মান ভাষায় শুনেছি, আজ পর্যন্ত, 'ঔপন্যাসিকে'র কোনো সঠিক প্রতিশব্দ নেই, ঐ ভাবুক ও গূঢ়ান্বেষী জাতি ভাবতেই পারে না যে কোনো স্রষ্টা-লেখককে 'কবি' বা 'ডিখ্‌টার' ছাড়া অন্য

কিছু বলা যায়। তাঁরা, যাঁরা মাঝে-মাঝে কবিতার স্পন্দন অনুভব ক'রে থাকেন, 'কবি' শব্দের এই ব্যবহারকে সমর্থন না-ক'রে পারবেন না, কেননা, যা বিধিবদ্ধভাবে কবিতা নয়, সেই গদ্যসাহিত্যেও অর্ফিয়ুসের বীণা তাঁরা শুনেছেন। বলা যেতে পারে, সাহিত্যের যা সারাৎসার তা-ই কবিতা; কবিতা বলে তাকেই যা বিবরণ নয়, বর্ণনা নয়, মন্তব্য নয়; যা জীবনের মুকুরমাত্র না হ'য়ে জীবনের সমান্তর এক সৃষ্টি হ'য়ে ওঠে; বুদ্ধির অতীত এক চঞ্চলতায় নিক্ষেপ করে আমাদের, যেখানে বহু ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি, দ্যুতি ও ছায়া পরস্পরে মিশ্রিত হ'য়ে অনির্বচনীয়ের আভাস এনে দেয়। আর এই অর্থে, এমন কোনো শিল্পকলা নেই যা কবিতার দ্বারা আক্রান্ত না হয়— সব সময় নয়, নিয়ম হিশেবে নয়, কিন্তু কখনো-কখনো। 'কবি লেওনার্দো', 'কবি চেখভ', 'কবি ভ্যান গ'— এ-সব কথা সহজেই আমাদের মুখে এসে পড়ে; কিন্তু 'কবি পুর্সাঁ।' বা 'কবি ভলতেয়ার' অর্ধোচ্চারিত না-হ'তেই আমরা থেমে যাবো। টোমাস মান্ বা ডস্টয়েভস্কির মতো লেখককে 'কবি' আখ্যা দিতে নারাজ হবেন শুধু তাঁরাই যাঁরা পদ্য ও গদ্যের তফাৎ বুঝলেও গদ্য-মন ও কবি-মনের প্রভেদ বোঝেন না।

আলোচনার অন্য একটি স্তর আছে যেখানে, নাটক ও উপন্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, আমরা বাধ্য হবো কবিতাকে একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিশেবে চিন্তা করতে;— কিন্তু সেটা রূপকল্পের আলোচনা, সারবস্তুর নয়। যদি কেউ জিগেস করেন, 'রামায়ণ' গ্রন্থটি উপন্যাস না কাব্য, শেক্সপীয়র কবি না নাট্যকার, 'দি ডিভাইন কমেডি' কবিতা না উপাখ্যান, আমরা তার উত্তরে নীরব থেকে শুধু বলতে পারি যে আধুনিক কালে কবিতা নামক রূপকল্পের বিশেষ যে-বিবর্তনটি ঘটেছে তা লিরিকধর্মী; পদ্য এপিক ও পদ্য নাটককে পুনর্জীবিত করার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, পারিভাষিক অর্থে, কবিতা আজকাল লিরিকের নামান্তর বললে ভুল হয় না।— কিন্তু এখানে আমার উদ্দেশ্য অন্য; আমি চাচ্ছি সাহিত্য বা 'নেহাৎ সাহিত্য' থেকে কবিতাকে বিশ্লিষ্ট ক'রে নিতে। পৃথিবীর সব ভাষাতেই 'সাহিত্য' শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক; ইতিহাস-, রাজনীতি- বা দর্শন-সংক্রান্ত গ্রন্থকে 'সাহিত্য' ব'লে স্বীকার করতে বাধ্য আমরা; চলতি কালের উপন্যাস, চলতি কালের সমস্যা নিয়ে বিতর্ক, রাষ্ট্রনেতার বক্তৃতাসমূহ— এগুলোকেও অমান্য করা যাবে না; এমনকি, যা-কিছু ভাষার দ্বারা রচিত হয়, বিজ্ঞাপন বা ব্যবহারিক নিবন্ধ, গো-পালন বা ব্যায়াম বিষয়ক পুস্তক, তাকেও 'সাহিত্য' হিশেবে গণ্য করায় অভিধানের ও লোকাচারের অনুমোদন আছে।

তেমনি, 'শিল্পকলা' বা 'আর্ট' শব্দটিও সার্বত্রিক ; দর্জি বা রাঁধুনিও শিল্পী, রবি বর্মা বা ঈশ্বর গুপ্ত তা-ই, রুয়ো অথবা রিলকেও তাই। কিন্তু একটা জায়গায় সীমা টানতেই হয়, এমন একটা সময় আসেই, যখন সাহিত্য ও অসাহিত্য, বা শিল্প ও অশিল্পে যে-ভেদরেখা আমরা অনুভব করি অথচ অঙ্কিত করতে পারি না, তা জনমানসে লুপ্তপ্রায় দেখে আমরা আতঙ্কে ও উৎসাহে চীৎকার ক'রে উঠি—'ফেলে দাও "আর্ট", "সাহিত্য" আর চাই না ; কবিতা হোক !' আর এই ভাবনাই প্রবল হ'য়ে ওঠে মনের মধ্যে, যখন বোদলেয়ারের সম্মুখীন হই আমরা, আর যখন ডস্টয়েভস্কির গদ্যকাব্যগুলিকে সহ্য করতে শিখি।

১৮২১ সাল, এই দু-জন যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। ফ্রান্সে রোমান্টিকতার জন্ম হয়নি ; পুশকিন, ফরাশি অনুবাদে বায়রন পাঠ করার পর, আধুনিক রুশ সাহিত্যের গোড়াপত্তন শুরু করেছেন। ইংলণ্ড, রোমান্টিক মানসের মাতৃভূমি ও আধুনিক উপন্যাসের জন্মভূমি, পশ্চিমী সাহিত্যের নায়কত্বে অধিষ্ঠিত। নিঃসৃত হচ্ছে, একটির পর আর-একটি, ওঅল্টর স্কটের উপন্যাস, বায়রন 'ডন জুয়ান' লিখছেন, শেলির 'মুক্ত প্রমিথিয়ুস' প্রকাশিত হয়েছে। আর দশ বছরের মধ্যে প্যারিসের 'ভ্যাণ্ডি'রা গ্রহণ করবেন ইংরেজ ভাবভঙ্গি, 'এর্নানি'র যুদ্ধে জয়ী হবে রোমান্টিকতার ফরাশি প্রকরণ, গ্যোটে মৃত, গোগোল প্রথম কাহিনীগুচ্ছ প্রকাশ করবেন। কিন্তু, হায় ততদিনে ইংলণ্ডের ময়ূর আর চিতাবাঘেরা গত হয়েছেন, গৃহপোষ্য 'লন টেনিসন'কে রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে। পরবর্তী অর্ধশতকে, ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য যে-অনুপাতে বিস্তার লাভ করলো, ঠিক সেই অনুপাতেই (এবং অংশত সেই কারণেই) নিষ্প্রভ হ'য়ে এলো তার কবিতা ও সাহিত্য : স্ফীত বাণিজ্য, ঘরে-ঘরে সমৃদ্ধি, জগৎ জুড়ে 'শ্বেতাঙ্গের বোঝা'—এই সব উপসর্গের ফলে ইংরেজ হ'য়ে উঠলো কূটনীতি ও অর্থনীতিতে বিশ্বনায়ক, এবং সাহিত্যে পাণ্ডুর। সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও তার নৈতিক সমর্থনের আকাঙ্ক্ষা থেকে কবিরাও মুক্ত হ'তে পারলেন না ব'লে, প্রায় সত্তর বছর ধ'রে ইংলণ্ডে একটা নতুন ভাবনা ভাবলে না কেউ, কোনো নতুন সুর যোজনা করলে না, ব্রাউনিঙের মতো বলিষ্ঠ মানুষও তাঁর বালিকা-নায়িকা পিপ্‌পার সঙ্গে ঘোটের উপর একমত হলেন যে 'স্বর্গে আছেন ঈশ্বর, আর জগতে কিছু ভুলচুক নেই !' এতেও হয়তো ক্ষতি ছিলো না ; কিন্তু মারাত্মক কথা এই যে কবিতার বিষয়ে নতুন কোনো দৃষ্টি ছিলো না এঁদের ; কবিতা বলতে শেলি বা ওঅর্ডস্বার্থ যা বুঝেছিলেন টেনিসন তা থেকে ভিন্ন কিছু বোঝেননি, ব্রাউনিংও না, এমনকি

সুইনবার্ন, নতুন উপকরণ বিস্তর সংগ্রহ ক'রে থাকলেও, কবিতার ভাষাকে নতুন করতে পারেননি। সে-কাজ বাকি থেকে গেলো একজন আইরিশ ও দু-জন আমেরিকান আগন্তুকের জন্য। আর ইতিমধ্যে, সবীজ কবিতা স'রে এলো ফ্রান্সে, আর উপন্যাস রাশিয়ায়।

সময় কম, সংক্ষেপে বলতে হবে; অবহিত পাঠক মার্জনা করবেন। আমি উনিশ শতকের ফরাশি উপন্যাসকে ভুলে যাচ্ছি না, ডিকেন্সকেও মনে রেখেছি। কিন্তু কেউ কি আমরা অস্বীকার করতে পারি যে উনিশ-শতকী কথাসাহিত্যের যে-অংশ আজকের দিনে আমাদের সবচেয়ে বেশি অন্তরঙ্গ, তার জন্মস্থল এমন এক দেশ যার কোনো 'ঐতিহ্য' ছিলো না, বলতে গেলে ইতিহাসও ছিলো না, য়োরোপের পূর্বদিগন্তে যে দেখা দিয়েছিলো মাত্র সেদিন? পরম একটি বিস্ময়: বিশ্বসাহিত্যে রাশিয়ার এই আকস্মিক ও প্রচণ্ড অভ্যুত্থান। কোনো ঐতিহ্য যে ছিলো না, সেটাই হয়তো শক্তি দিয়েছে তাকে; আঠারো শতকের শেষার্ধে 'বর্বর' জর্মানিও এমনি এক অমানুষিক প্রতিভার দ্বারা অধিকৃত হয়। রাশিয়া, গ্রীক চার্চের অন্তর্ভূক্ত বলে, অন্ততপক্ষে আরিস্টটলের 'কর্তার ভূত'কে এড়াতে পেরেছে; রেনেসাঁসের সঞ্জীবনী থেকে বঞ্চিত হ'য়ে রচনাকর্মের সনাতন কোনো সংহিতা পায়নি; এবং শাস্ত্রপাঠ, প্রার্থনা ও মন্ত্রোচ্চারণও মাতৃভাষাতেই সম্পন্ন করেছে। ক্লাসিক আদর্শের প্রভাবমুক্ত এক বিস্তীর্ণ শূন্যতা— তা-ই যেন সহায় হ'লো তার; যে মুহূর্তে ঘটলো বৈদেশিক সংস্রব, উনিশ-শতকী রোমান্টিক য়োরোপের অভিঘাত, সে-মুহূর্তেই তার বহু যুগসঞ্চিত কৌমার্য বিপুলভাবে সগর্ভ হ'য়ে উঠলো। অনুকরণেই আরম্ভ, কিন্তু প্রথম অনুকারক, পুশকিন, দৈবক্রমে নিজে ছিলেন প্রতিভাবান; মাত্র কয়েক বছরের লেখকজীবনে রুশ সাহিত্যের বরফ তিনি গলিয়ে দিলেন, মূর্ত করলেন গদ্যে পদ্যে তাঁর স্বদেশের জীবন, স্রোত শুরু হ'লো। যেমন তাঁর পিছনে বায়রন, তেমনি গোগোলের পিছনে ছিলেন হোফমান; কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্মানির কাছে রুশ লেখকদের প্রাথমিক ঋণ যেমন বিরাট, তেমনি উদার অব্যবহিত তার পরিশোধ। যা-কিছু তাঁরা নিয়েছিলেন ফিরিয়ে দিলেন তার অনেক বেশি; আর তা প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে, প্রায় হাতে-হাতে। জর্মানিতে শিলার ও গ্যেটের মতো, রাশিয়াতে একই সময়ে সক্রিয় হলেন ডস্টয়েভস্কি ও টলস্টয়; তার উপর, যেন রুশ মানসের ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, আগত হলেন মিতাচারী, 'য়োরোপীয়' টুর্গেনিভ, আর সর্বশেষে বিষণ্ণ ও ক্ষমাসুন্দর আন্তন চেখভ। যখন,

উনিশ শতকের শেষভাগে, এঁদের রচনাবলির অনুবাদ ফরাশি ও ইংরেজি ভাষায় দেখা দিতে লাগলো, তখনো থেকেই স্রোতের গতি গেলো উল্টে ; রুশীয় প্রভাব বিশ্বসাহিত্যে ব্যাপ্ত হ'লো।

ঠিক এই দৃশ্যই আমরা দেখতে পাই, উনিশ শতকের শেষার্ধের ফরাশি কবিতায়। য়োরোপের একটা পুরোনো প্রবাদ এই যে ইংলণ্ড কবিতার দেশ, ফ্রান্স গদ্যশিল্পের, আর জর্মানি দার্শনিকতার। আর বস্তুত, আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সে যে-সব কবি জন্মেছেন তারা ফরাশি ঐতিহ্যের মধ্যে সুমহৎ হ'লেও বিদেশীর কাছে ধরা দেননি। যে-দুই পরস্পরবিরোধী ফরাশি শক্তি জগৎকে বদলে দিলে, সেই রুসো ও ভলতেয়ার দু-জনেই গদ্যলেখক। উগো, বিদেশীর কাছে, প্রধানত তাঁর গদ্যকাহিনীর জন্যই স্মরণীয়, আর এই কথা অংশত গোতিয়ে-র পক্ষেও সত্য। ফ্রান্সের প্রথম বিশ্বকবি বোদলেয়ার ; তাঁরই সঙ্গে ফরাশি কবিতার দূরপ্রয়াণ ; উনিশ শতকের পরবর্তী কবিতার তিনিই উৎসস্থল। এবং বিশ শতকেও আজ পর্যন্ত কোনো প্রধান কবি হননি যিনি তাঁর কাছে, কোনো-না-কোনো ভাবে, ঋণী নন। ভাবতে অবাক লাগে, একটু কৌতুকও বোধ হয়, যে যে-কালে ইংরেজি কবিতা স্বদেশচেতন টেনিসন ও সমাজচেতন চার্টিস্ট কবিদের দোটানায় মৃতকল্প, সে-কালেই, খালের ওপারে, কবিতাকে তার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন বোদলেয়ার, ভেরলেন ও র‍্যাবো, আর মালার্মে। যেমন বোদলেয়ারের পটভূমিকায় পাওয়া যায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব, তেমনি এবার, অবশেষে, ফরাশি হাওয়া এলো ইংলণ্ডে ; কিন্তু সে-বসন্ত যেমন ক্ষণিক, তেমনি বিহঙ্গবিরল। অস্কার ওয়াইল্ডকে মনে হয়, ইংরেজের রুটিনে বাঁধা রাশভারি সপ্তাহের পরে, এক বাগানবাড়ির সপ্রমোদ ও ব্যয়বহুল শনিবার, আর পরবর্তী ক্লান্ত রবিবারটি যেন রমণীয় ও পাণ্ডুরোগী 'নব্বুই'য়ের যুগ। ইয়েটসের যৌবনের বন্ধুরা ভেরলেনের মতো নেশা করতে শিখেছিলেন, কিন্তু দু-একটির বেশি ভালো কবিতা লিখতে পারেননি ; এদিকে ওয়াটস-ডানটনের ঐকান্তিক ও সাধু প্রযত্নে স্বুইনবার্নের স্ফুলিঙ্গও নিবে গেছে। তত্রাচ, রাইমার্স ক্লাবের স্থাপনকালে ইয়েটস বুঝেছিলেন যে 'যা কিছু কবিতা নয় তা থেকে কবিতাকে মুক্তি দিতে হবে', অর্থাৎ, লিখতে হবে 'বোদলেয়ার ও ভেরলেনের মতো।' শুধু বুঝেছিলেন তা নয়, এই ধারণাটিকে প্রয়োগ করারও চেষ্টা করছিলেন—ইংলণ্ডের তৎকালীন কবিদের মধ্যে, শুধুই তিনি। তাই তাঁর পূর্ব-কবিতাতেও এতওঅর্তায় ম্লানিমা দেখা যায় না ; আর সেইজন্যেই

শতকান্তিক হলদে রবিবারের পর ইংরেজি কবিতা শুধুমাত্র ধোঁয়াটির ধূসর সোমবারে পর্যবসিত হ'লো না, তাতে নতুন প্রাণসঞ্চার করা ইয়েটসের সাধ্যে কুলোলো।

যাঁরা আধুনিক সাহিত্যের যাত্রাস্থল, এমন দু-জন লেখককে, গদ্য ও পদ্যের বিভাগ অনুসারে, যদি আমাদের বেছে নিতে হয়, তাহ'লে, নিঃসন্দেহে, এই দু-জনেরই নাম করবো আমরা একজন 'ল্য ফ্লর দ্যু মাল'-এর কবি, অন্যজন রাস্কলনিকভ, প্রিন্স মিশকিন ও কারামাজভদের স্রষ্টা। ডস্টয়েভস্কির সঙ্গে টলস্টয়ের তুলনায় প্রচণ্ড লোভ সামলে যেতে হচ্ছে আমাকে; শুধু এটুকু ব'লে স'রে যাবো যে টলস্টয় যেন বিরাট, প্রাচীন ও রহস্যময় এক বিগ্রহ, যার সামনে দাঁড়ালে ভক্তিতে ও ভয়ে আমাদের মাথা নুয়ে আসে, আর ডস্টয়েভস্কিকে দেখামাত্র আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব'লে উঠি— 'ছাখো, এই যে মানুষ!' এই প্রভেদের জন্যই, না-বললেও চলে, আধুনিক কালে ডস্টয়েভস্কির আবেদন বেশি ব্যাপক ও তীব্র। 'আত্মার ঋষি' ও 'রক্তমাংসের ঋষি', 'সন্ত' ও 'দেবতা'— এই দু-জনকে বোঝাবার জন্য যে-সব তুলনা ব্যবহৃত হয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই ইঙ্গিত আছে যে ডস্টয়েভস্কি আধুনিক মানুষের নিকটতর। বস্তুত, ডস্টয়েভস্কি ও বোদলেয়ার, পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত হ'য়েও পরস্পরের রচনা বিষয়ে অজ্ঞান থেকেও যেন সহযোগীর মতো একটি কাজকেই সম্পূর্ণ ক'রে গেছেন: বিশ-শতকী আধুনিক সাহিত্যের ধারণাকে সৃষ্টি করলেন তাঁরা, বিশ-শতকী আধুনিক মানুষের জন্ম দিলেন।

দু-জনেই আঠারো-শতকী যুক্তিবাদের শত্রু, উনিশ-শতকী উপযোগবাদের বিদ্বেষ্টা, কোনো-এক গোপন অপরাধবোধে পীড়িত; 'ভূতলবাসীর আত্মকথা'টিকে কোনো-কোনো স্থলে প্রায় 'ফ্লর দ্যু মাল'-এর গদ্য টীকা ব'লে মনে হয়। পিটার্সবার্গে স্থাপিত সেও এক বোদলেয়ারীয় জগৎ; সংস্কারক সেখানে মূঢ়তার উদাহরণ, উন্নতির অর্থ নৈতিক অধঃপাত, এবং সাধুমাত্রেই সম্পূর্ণ অকর্মণ্য। উভয়েরই নায়ক ('ভূতলবাসী'র ভাষায় অপনায়ক)—রুগ্ন, দুর্বল ও ইচ্ছাশক্তিহীন, মুমুক্ষু, শাস্তিলোভী, নিজের উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাদের বাস লোকচক্ষুর অন্তরালে; তাদের জীবন ভাবনায়; তাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ বিতৃষ্ণা— বিখ্যাত বোদলেয়ারীয় স্প্লীন; অথচ প্রেম ও সৌন্দর্যের স্বপ্ন থেকে নিজেদের তারা ছিনিয়ে নিতেও পারে না। এবং উভয় কাব্যেরই রচনা-রীতি স্বীকারোক্তির. বা স্বগতোক্তির; 'ভূতলবাসীর আত্মকথা'র 'নায়কের'

নাম পর্যন্ত উল্লিখিত হয়নি, কেননা, 'ল্য স্প্যর দ্যু মাল'-এর নিত্য-উপস্থিত 'আমি'র মতোই, এই ব্যক্তিও আধুনিক বিশ্বমানবের প্রতিভূ ; এবং আধুনিক জগতের একটি লক্ষণ এই যে সমাজ ও রাষ্ট্রকে সর্বক্ষম ক'রে সে ব্যক্তির নাম পর্যন্ত মুছে দিতে চায়। ডস্টয়েভস্কির উত্তরসাধক কাফকার 'নায়ক'রাও শুধুমাত্র নামের আদ্যক্ষর দ্বারা পরিচিত ; আর যেখানে ভূতলবাসী ব্যক্তিটি পতঙ্গ পর্যন্ত হ'তে পারেনি, সেখানে কাফকার চরিত্রের অবাধে সেই রূপান্তর ঘটে। বিশ শতকের 'প্রগতি'র স্বরূপ বুঝতে হ'লে কাফকার এই দ্যুতিময় কাহিনীটিকে মনে রাখা চাই।

আকারে ছোটো হ'লেও, 'ভূতলবাসীর আত্মকথা' তার লেখকের প্রায় সম্পূর্ণ একটি পরিচয়পত্র ; সেখানে আমরা দেখতে পাই এক পীড়িত ও উৎপীড়িত শক্তি, এক দানোয়-পাওয়া উদ্যম, এক নগ্ন, প্রায় ছাল-ছাড়ানো মানবাত্মা, যা নৈয়ায়িক সংকীর্ণতাকে ছাড়িয়ে গভীরতর খনি থেকে আতঙ্ক ও রত্ন ছেঁকে তুলছে। আর সেই সব লক্ষণই আমাদের মনে পড়ে, যখন ডস্টয়েভস্কিকে স্মরণ করি। পুস্তকটির আর-একটি বৈশিষ্ট্য তার আপতিক বিশৃঙ্খলা, যা, সন্দেহ নেই, লেখক সচেতন- ও চতুরভাবেই সাজিয়েছিলেন। 'শুধু নিজের জন্য' লেখা এই আত্মকথায় শ্রোতৃরূপী 'ভদ্রমহোদয়গণে'র উল্লেখ কিন্তু পৌনঃপুনিক ; কাল্পনিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রথম খণ্ডটি এক দীর্ঘায়িত ও প্রোজ্জ্বল বিতর্ক ; দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনীটুকু, যেন আকস্মিকভাবে উত্থাপিত হ'য়ে, স্বগতোক্তির খরস্রোতে অলক্ষ্যভাবে ডুবে গেলো। উপন্যাসরচনার যা-কিছু প্রতিষ্ঠিত নিয়ম, তার প্রত্যেকটিকে এই গ্রন্থে লঙ্ঘন করা হয়েছে। যা-কিছু কবিতা নয় তা থেকে বোদলেয়ার যেমন মুক্তি দিয়েছিলেন কবিতাকে, ক্রমশ বর্জন করেছিলেন বর্ণনা ও অভিমত, শুভেচ্ছা ও ভবিষ্যদ্বাণী, তেমনি এই গ্রন্থেও গতানুগতিক উপন্যাসের উপাদান বিরল ; কোনো বৃত্তাকার কাহিনী নেই এতে ; আছে, নিরন্তর চিন্তাবয়নের ফাঁকে-ফাঁকে, কয়েকটিমাত্র বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণ। বইটির আকর্ষণ মনস্তত্ত্বের : একটি মানুষ, যার নাম পর্যন্ত আমরা জানলাম না, তার মনের গূঢ়তম দ্বন্দ্ব ও রহস্য জেনেও আমাদের মনে হয় আরো অনেক বাকি থেকে গেলো। আমরা আবার পড়তে লুব্ধ হই, কিন্তু হয়তো একটি অংশ প'ড়েই তুলে রাখি— যেমন কিনা একজন কবির একটি রচনাই যথেষ্ট মনে হয় এক-এক সময়, আরো প'ড়ে, সেই একটির প্রভাব হারাতে ইচ্ছে করে না। অর্থাৎ কথাসাহিত্য কবিতার দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে কী-রকম ভাবে

বদলে যেতে পারে, 'ভূতলবাসীর আত্মকথা' তারই একটি প্রাথমিক ও স্থায়ী উদাহরণ।

অবশ্য এ-কথা ভাবলে ভুল হবে যে ডস্টয়েভস্কি প্লট জমাতে জানেন না। 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট'-এর মতো অমন ঘন, বেগবান, ও বিরতিহীন উত্তেজনাময় ঘটনাক্রম জগতের আর কোন উপন্যাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে? বস্তুত তাঁর প্রধান উপন্যাসসমূহের বৈশিষ্ট্যই এই যে তাদের দুঃস্বপ্নপীড়ন সহ্য করা যত কঠিনই হোক, একবার পড়া শুরু করলে ছেড়ে ওঠা আরো বেশি দুঃসাধ্য। অথচ প্লটের যান্ত্রিক সৌষ্ঠবে তাঁর আগ্রহ বা দক্ষতা নেই; মূল কাহিনী মুলতুবি রেখে হঠাৎ এক যক্ষ্মাপীড়িত অকালপক্ব কিশোরের আত্মকথা তিনি শোনান আমাদের, বা গ্রন্থের উপসংহারের অংশে নতুন চরিত্র আমদানি ক'রে তাকে নিয়েই মেতে ওঠেন—তাঁর যেন এত অফুরন্ত কথা বলবার আছে যে উপন্যাসের পাত্র ছাপিয়ে বারে-বারেই তিনি উপচে পড়েন। অর্থাৎ, পাঠকের মনে যে-দুর্বার আবেশের তিনি সঞ্চার করেন তার কারণ ঘটনাচক্র নয়, তাঁর ভাবনাবেদনার তীব্রতা; তাঁর দৃষ্টি আমাদের অন্তস্তল পর্যন্ত উন্মোচিত ক'রে দেয়, তাঁর পাপপ্রবণ ঈশ্বরতৃষিত চরিত্রগুলিতে নিজেদের গূঢ়তম সত্তাকে আমরা দেখতে পাই; সেই আত্মোপলব্ধির যাতনাময় আনন্দই তাঁর উপন্যাসপাঠের অমৃতফল। তাদের স্বভাবের নির্বন্ধে, তাঁর কুশীলবেরা নিরন্তর সংকটের আবর্তে ঘূর্ণিত হ'তে থাকে, তাদের আমরা আহার করতে দেখি না কখনো, কোনো কাজ করতেও অল্পই দেখি, তারা অবিরাম শুধু বলে, কথা বলে, যেন প্রত্যেকেই 'ভূতলবাসী' ব্যক্তিটির মতো, স্বীকারোক্তির দায়িত্বে ভারাতুর।

মহৎ সাহিত্য, প্লেটো-বর্ণিত প্রেমের মতোই, অনেক সময় হীনজন্মা হ'য়ে থাকে। যে সব উৎস থেকে বোদলেয়ার আহরণ করেছিলেন, তার মধ্যে একটি প্রধান হ'লো 'শ্মশানসাহিত্য', তাঁর বাল্যে প্রখ্যাত ও অচিরে বিস্মৃত এক লেখকগোষ্ঠীর রচনাবলি— যা হত্যা, আত্মহত্যা, শব ও কবরের উল্লেখ না-ক'রে তিন পঙক্তি অগ্রসর হ'তো না। মানতেই হবে, যে ডস্টয়েভস্কিরও অন্যতম উত্তমর্ণ ইংরেজি ভাষার বিভীষিকাময় 'গথিক' উপন্যাস। কিন্তু তিনি যখন চাইতেন একটি লোমহর্ষক রচনা লিখতে, তা হ'য়ে উঠতো 'দি ডাব্‌ল্‌'-এর (বাংলায় বলা যাক 'দুই আমি') মতো কোনো কাহিনী, মানুষের দ্বিত্ববোধের এক সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ। সব উপাদান গ'লে যায় তাঁর ভাবনার তাপে, বস্তুর স্পৃশ্যগুণ নষ্ট হ'য়ে যায়, চরিত্রগুলি হ'য়ে ওঠে অতিকায় ও দ্বিবায়তনিক, ঘটনায় ইন্ধনকে

ভস্মীভূত ক'রে জ্ব'লে ওঠে এক চিন্ময় ও দুঃসহ অনল। তেমনি, হত্যা ও মৃত্যু নিয়ে বোদলেয়ার যে-সব কবিতা লিখেছেন তাতে এই কথাটি ধ্বনিত হয়েছে যে অমৃতে ভিন্ন তৃপ্তি নেই মানুষের, আর যেহেতু অমৃতের অভিজ্ঞতা— প্রেম, কবিতা বা মদিরার সাহায্যে প্রাপ্য হ'লেও— মরজীবনে ক্ষণিক ও খণ্ডিত হ'তে বাধ্য— তাই মানুষের দুঃখেরও অবসান হ'তে পারে না। মিসেস র‍্যাডক্লিফ বা পেক্র্যাস বরেল প'ড়ে আজও আমাদের গায়ে কাঁটা দিতে পারে, কিন্তু পড়ার শেষে আমরা যা ছিলাম তা-ই থেকে যাই; আর বোদলেয়ার বা ডস্টয়েভস্কি প'ড়ে আমরা নতুন একটি আত্মা লাভ করি— অর্থাৎ, নিছক ইন্দ্রিয়গত সংবেদনকে তাঁরা রূপান্তরিত করেন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায়।

আমি ভুলিনি, এই দুই লেখকের মধ্যে কোনো-কোনো বিষয়ে প্রভেদও দুস্তর। ডস্টয়েভস্কির গঠনশক্তি দুর্বল, রেখা ও ঘনতার বিতরণ তিনি বুঝতেন না;— চিত্রকর হ'লে বলা যেতো তিনি অঙ্কনবিদ্যায় অপটু আর বর্ণলেপনে প্রতিভাবান। এইজন্যেই তাঁর রচনাকে টুর্গেনিভ একবার বলেন 'ব্যাধির দুর্গন্ধময় প্রলাপ', আর টুর্গেনিভ-ভক্ত হেনরি জেমস তাকে 'গ'লে-যাওয়া পুডিং' ব'লে উড়িয়ে দেন। সমকালীন পাঠকদের মধ্যে অনেকে ছিলেন যাঁরা 'ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এও 'ব্যাধির দুর্গন্ধ' ছাড়া আর-কিছু পাননি; কিন্তু এই কবি যে নিখুঁত রূপকল্পের পূজারি, মানসতায় রোমান্টিক হ'য়েও কারুশিল্পে ক্লাসিকধর্মী, তা সহজীবী সাহিত্যিকরাও বুঝতে পারেননি তা নয়। 'ভাষার প্রতিটি শব্দের প্রতিটি সম্ভবপর মিল যে না জানে সে-ব্যক্তি কোনোপ্রকার ভাবপ্রকাশে অক্ষম,' এই একটি মন্তব্যেই বোদলেয়ারের কাব্যধর্ম আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু দুই খণ্ড 'লেখকের ডায়েরি' প'ড়ে আমরা জানতে পারি না যে উপন্যাসের শিল্পরূপ বিষয়ে ডস্টয়েভস্কি কখনো কিছু ভেবেছিলেন কিনা। ঐ গ্রন্থ তাঁর উত্তরজীবনের রচনা; সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্মীয় আলোচনায় ভারাক্রান্ত; তখন তিনি 'পাশ্চাত্ত্য' ও 'স্লাভপন্থী' লেখকদের সমন্বয়সাধনে সচেষ্ট; স্বদেশের সনাতনী মন্দির ও উগ্র জাতীয়তাবাদ— তাঁর অভিপ্রায়কে ভুল বুঝে— তাঁকে তাদের প্রবক্তারূপে বরণ করেছে; তাই, উনিশ শতকের বাঙালি লেখকদের মতোই, গণকল্যাণের ভাবনাও তিনি আর এড়াতে পারছেন না। এর উল্টো দিকে বোদলেয়ারের বিবর্তন। ১৮৪৮-এর ক্ষণিক উন্মাদনার পরে যে-কোনো প্রকার জনসংঘ বিষয়ে তাঁর আস্থা ভেঙে যায়; ফ্রান্সে তিনি বিরক্তিবোধ করেন সে-দেশে 'সকলেই ভলতেয়ারের মতো' ব'লে; এই বিশ্বাসে

উপনীত হন যে 'একমাত্র সার্থক প্রগতি' হ'লো তা-ই যা মানুষ তার নিজের মধ্য থেকে আত্মিকভাবে ঘটাতে পারে। দু-জনের মানসতার তফাৎ একটি উদাহরণেই স্পষ্ট হবে। জর্জ সাঁ, যাঁকে বোদলেয়ার 'নিষ্ঠাগারে'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, তাঁর নায়িকাদের মধ্যে ডস্টয়েভস্কি দেখেছিলেন সব রকম নৈতিক গুণের সন্নিপাত।

অথচ, বাংলা প্রবচনের ভাষায়, দু-জনকে যে এক দেবতা গড়েছিলেন সে-বিষয়েও সন্দেহ রাখা অসম্ভব। একটি মহৎ যোগসূত্র বেঁধে রেখেছে এঁদের; দুঃখসাধনায় যমজ ভাই যেন এঁরা; কবিদের মধ্যে এঁরাই প্রথম, যাঁরা দুঃখকে একটি মূল্যরূপে উপলব্ধি করেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে দুঃখ ছিলো বিধিলিপি, বা কর্মফল, বা ঈর্ষাপরায়ণ দেবতার প্রতিহিংসা; অন্ততপক্ষে তার প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব ছিলো— হয় নরকে, নয় জন্মান্তরে, নয় তো বা সজ্জনের উত্তরাধিকারে। দান্তে তাঁর নরকের পাপীদের জন্য নিজেকে মুহূর্তের জন্যও দায়ী ব'লে মনে করেন না; শেক্সপীয়রের ট্র্যাজিক নায়কেরা, কতিপয় গৌণ ও সৎব্যক্তির হাতে জগতের ভার তুলে দিয়ে, নিজেরা অপগত হন। পূর্ব-রোমান্টিকেরা দুঃখ বিষয়ে লিখেছিলেন অনেক, কিন্তু তাঁদের কাছে তা ছিলো একটি প্রতিকার্য অপলাপ, বা একটি 'স্খলন', যা ভালো আইন ও সামাজিক সংস্কার দ্বারা চিকিৎস্য। শেলির প্রমিথিয়ুসের কষ্ট অনেক, কিন্তু বিলাপ আরো বেশি ব'লে আমরা তার জন্য দুঃখবোধের অবকাশ পাই না; তার সান্ত্বনাদাত্রী বহু; সারা বিশ্ব তার মুক্তির জন্য সচেষ্ট। এরই সহযোগী ছিলো বায়রনি বিষাদ, 'শতাব্দীর ব্যাধি', নিঃসঙ্গতাবোধ, সমাজের প্রতি বিবমিষা; আর বোদলেয়ারের যাত্রাস্থল এখান থেকেই। কিন্তু দুষ্ট সমাজ থেকে পলায়ন সম্ভব, সম্ভব ডন জুয়ানের মতো বিদ্রোহ, কিংবা বর্তমান ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে নতুন পৃথিবী রচনা করার প্রলোভনও নিত্য উপস্থিত। বোদলেয়ারের বৈশিষ্ট্য এই যে এই সম্ভাবনাগুলির একটিকেও তিনি স্বীকার করেননি। তাঁর নিজের 'ঝটিকাদীর্ণ যৌবন' তাঁকে যে-অভিজ্ঞতা এনে দেয়, ডস্টয়েভস্কি তা লাভ করেছিলেন উনিশ-শতকী রাশিয়াতে জন্মেছিলেন ব'লেই। আলেকজাণ্ডার রাডিশেভ, এক রুসো-ভক্ত রুশ লেখক, ১৭৯০ সালে 'পিটার্সবার্গ থেকে মস্কো' নামে এক ভ্রমণকাহিনীতে লেখেন: 'চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম আমি, আর মানবজাতির দুঃখে আমার আত্মা বিদীর্ণ হ'লো।' একজন সমালোচক বলেছেন যে এই বাক্যটি রচিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে জন্ম নিয়েছিলো রুশীয় বুদ্ধিজীবী

সম্প্রদায়। প্রথম থেকেই, রুশীয় সাহিত্যে দুঃখ একটি বিরাট স্থান অধিকার করেছে ; তার ধারা আরম্ভ হয় গোগোলেই, যিনি রুশ গদ্যসাহিত্যের আদিপিতা, ও ডস্টয়েভস্কির প্রত্যক্ষ গুরু। কিন্তু এখানে যে-কথাটা উল্লেখ্য তা এই যে, বোদলেয়ার যেমন বায়রনি বিষাদে এক গভীরতর অর্থ সঞ্চার করেন, তেমনি ডস্টয়েভস্কির হাতে রুশীয় দুঃখের এক রূপান্তর ঘটেছিলো।

দু-জনে প্রায় একই সময়ে একই আবিষ্কার করেছিলেন। বুঝেছিলেন, দুঃখ এমন জিনিশ নয় যা শুধু, বাইরে থেকে আঘাত দেয়, তা মানুষের একটি সহজাত বৃত্তি। বুঝেছিলেন, দুঃখ দূর করার চেষ্টার দ্বারা কিঞ্চিৎ আশু উপশম হ'লেও শেষ পর্যন্ত দুঃখকে আরো বাড়িয়ে দেয়া হয় ; যে দুষ্ট সমাজ থেকে শারীরিক অর্থে পলায়ন সম্ভব হ'লেও আত্মার কলুষ থেকে মুক্তি দুরূহ ; যে বিদ্রোহও এক প্রকার নতিস্বীকার ; যে মানবসমাজে অবিরাম ভাঙা-গড়া চললেও পৃথিবীতে কখনো স্বর্গরাজ্য আসবে না, শুধু এক অবিচার থেকে অন্য অবিচারে পৌঁছনো যাবে। কিন্তু তাহ'লে ? মানুষের কি কিছুই করবার নেই ?

আশ্চর্য এই যে এই প্রশ্নেরও ঠিক একই উত্তর রেখে গেছেন দু-জনে। এবং সে-উত্তর রাজনৈতিক বা সমাজতত্ত্বজ্ঞের নয়, কবির, এবং আধুনিক কবির। 'এডগার পো,' বোদলেয়ার একবার লিখেছিলেন, 'সেই আধুনিক কবিদের একজন, যাঁরা আমাদের সকলের হ'য়ে দুঃখভোগ করেছেন।' পো-র বিষয়ে অল্পই তিনি জানতেন তখন, কথাটা তাঁর নিজের বিষয়েই বলা— অর্থাৎ, 'কবি' বলতে তিনি যা বোঝেন সেই ধারণাই প্রকাশ পেয়েছে এখানে। অন্যেরা প্রতিকার করুন দুঃখের, ত্রাণ করুন জগৎকে ; কবির কাজ সকলের হ'য়ে দুঃখ-ভোগ করা, তাঁর পরিচয় সকলের সব দুঃখের জন্য একটি বিশুদ্ধ ও নির্মল দায়িত্ববোধে। এই দায়িত্ববোধের একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ প্রিন্স মিশকিন ; তাঁর চরিত্র স্পষ্টত যীশুকে মনে করিয়ে দেয় ; কিন্তু মস্ত তফাৎ এই যে প্রিন্স মিশকিন, তাঁর দারুণ সাধুতা নিয়ে, তাঁর অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকেও এক তিল বদল ঘটাতে পারেন না। তিনি যে সকলের হ'য়ে দুঃখ পান সেটাই তাঁর পুণ্য ; রিলকের 'মাল্‌টে লাউরিড্‌জ ব্রিগ্‌গে'-র মতো, বা 'ফ্ল্যর দ্য মাল' ও 'প্যারিস স্প্লীন'-এর প্রণেতার মতো, তিনি ভিখারি, বেশ্যা, মাতাল, উন্মাদ ও সব রকম পীড়িত ও পতিতজনের অন্তরতম স্থলে প্রবেশ করতে পারেন, কিন্তু কাউকেই শোধন করতে পারেন না। অর্থাৎ, তিনি ত্রাতা নন, তিনি কবি।

উপরন্তু, যেন জগতের সামনে উদাহরণ স্থাপন করার জন্য, এই দু-জন

তাঁদের জীবনকেও দুঃখময় ক'রে তুলেছিলেন। বোদলেয়ার, টোমাস মান-এর ফাউস্টের মতো, অল্প বয়সেই অর্জন করলেন উপদংশ রোগ, যা খুব বেশি দেরি না-ক'রে তাঁকে বিনষ্ট করবে। 'শিশু-প্রেমের সবুজ স্বর্গ' ভেঙে দিয়ে তাঁর বিধবা মাতা আবার বিবাহ করলেন ; সাবালক পুত্রকে অভিভাবকত্বের অধীন ক'রে জুগিয়ে দিলেন জীবনব্যাপী দারিদ্র্য ও অসম্মান। আর ডস্টয়েভস্কিকে হ'তে হ'লো মৃগীরোগী, সহ্য করতে হ'লো প্রজাদের হাতে পিতার নিধন, বধ্যভূমিতে আনীত হ'য়ে মুক্তি পেলেন শেষ মুহূর্তে, ভোগ করলেন সাইবেরিয়ায় নির্বাসন, তারপর দারিদ্র্য ও পত্নীর রুগ্নতা। কৃতী পুরুষ বিপিতাকে বোদলেয়ার যেমন শ্রদ্ধাও করেছেন আবার সহ্য করতেও পারেননি, তেমনি ডস্টয়েভস্কিরও চিরন্তন গলগ্রহ ছিলো তাঁর প্রথম পত্নীর প্রথম পক্ষের এক নিষ্কর্মা যুবকপুত্র। এই সবই মনে হ'তে পারে আপতিক, বহিরাগত দুর্ঘটনা মাত্র, আর এ-কথা কখনোই সত্য নয় যে ঘটনাবহুল জীবন হ'লেই রচনার সমৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু, পরীক্ষা করলেই ধরা পড়ে, এঁরা দু-জনেই নিজ-নিজ দুঃখকে সৃষ্টি ক'রে নিয়েছিলেন— যেমন কোনো-কোনো প্রাণী কোনো বিশেষ বিষকে ক্ষরণ করে তার দেহের মধ্যে— দুঃখভোগের কোনো সুযোগ তাঁরা হারাননি, তা পাবার জন্য যত্ন নিয়েছেন রীতিমতো, অবস্থা ভিন্ন হ'লেও স্বীয় জীবনকে এমনিভাবেই রচনা ক'রে নিতেন তাঁরা। অভিভাবকত্বের শরশয্যায় শুয়ে, বোদলেয়ার শুধু ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়েছেন, চিঠিপত্রে উদ্বেল ক'রে তুলেছেন আক্রোশ, কিন্তু ঐ বন্ধন থেকে মুক্ত হবার কোনো সত্যিকার চেষ্টা কখনো করেননি। 'ল্য ফ্ল্যর দ্যু মাল'-এর মামলার সময়েও সরকারি উকিলের বাগ্মিতা তিনি বাণবিদ্ধভাবে শুনে গেলেন শুধু, একবার আত্মসমর্থনের চেষ্টা করলেন না। তাঁর 'বিচারক'দের সঙ্গে গোপন মনে তিনি যেন একমত, যে-সব প্রথাসিদ্ধ মূল্যবোধ তাঁর পরম ঘৃণ্য তাকে কার্যত যেন শ্রদ্ধা না-ক'রেও পারেন না। পাছে সুখী হন, যেন সেই ভয়েই মাদাম সাবাতিয়ে-র প্রণয়াঞ্জলি প্রত্যাখ্যান করলেন ; সুখশান্তির আশা নেই জেনেও— বা সেইজন্যেই— জান দ্যুভালকে ত্যাগ করতে পারলেন না। প্রথম যৌবনে, আর্থিক অবস্থা যখন ভালো ছিলো, তখনই এক নির্বিবেক চিত্রবণিকের চক্রান্তে ঋণজালে আবদ্ধ হন ; নিজেকে প্রতারিত জেনেও জীবনের শেষ পর্যন্ত সেই ঋণ অস্বীকার করেননি ; আর যখন নিজের আহার জোটে না তখনও মিথ্যাচারিণী জান দ্যুভালকে অর্থ জুগিয়েছেন। মনে হয়, তাঁর জীবনে সবচেয়ে জরুরিভাবে যার প্রয়োজন ছিলো; তারই নাম দুঃখ। আর এই কথা কি

ডস্টয়েভস্কির বিষয়েও সত্য নয়? বার-বার তিনি কি জুয়োতে সর্বস্বান্ত করেননি নিজেকে, কেননা পিঠের উপর দারিদ্র্যের চাবুক না-পড়া পর্যন্ত কিছুতেই তাঁর কলম চলবে না? মৃতা পত্নীর পুত্রকে, তার পরাশ্রয়ী স্বভাব বুঝেও, প্রায় গায়ে প'ড়েই কি পোষণ করেননি আজীবন? গ্রহণ করেননি, নিজে ঋণের যাতনা সত্ত্বেও, মৃত ভ্রাতার ঋণভার ও তার পরিবারপোষণের দায়িত্ব? শুধু তা-ই নয়, সাইবেরিয়ায় নির্বাসনকালে একবার নালিশ করেননি, পরেও কখনো বলেননি যে সম্রাট তাঁকে লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিয়েছিলেন। বরং, যে-অপরাধ করেননি তাও তিনি মাথা পেতে নিয়েছেন, পিতার হত্যা যেন তাঁরই স্বকৃত, এই বোধ তাঁর অবচেতনকে ক্লিষ্ট করেছে; এমনকি, একবার এক বন্ধুকে বলেছিলেন যে যৌবনে এক বালিকাকে তিনি ধর্ষণ করেন। এই কাহিনীটি রচিত; নিজের বহু কুকীর্তি বানিয়ে-বানিয়ে রটনা করা বোদলেয়ারেরও অভ্যাস ছিলো। স্বনির্যাতন, সন্দেহ নেই, দু-জনেরই ছিলো স্বভাবসিদ্ধ: দু-জনেই ছিলেন একাধারে 'বধ্য ও ঘাতক, বিক্ষত মাংস ও ছুরিকা।'

আর এইভাবে, কবির বিষয়েও একটি নতুন ও আধুনিক ধারণা এঁরা উপহার দিয়ে গেছেন পৃথিবীকে। আর ত্রাতা নন, প্রবক্তা নন, 'নন 'মানবজাতির অস্বীকৃত বিধানকর্তা', এঁদের মধ্য দিয়ে কবি হ'য়ে উঠলেন শিল্পের শহীদ, সবচেয়ে সচেতন মানুষ, নিজের চৈতন্যের অনলে যে অবিরল নিজেকে দগ্ধ করে, এবং নিজের সৃষ্টি ছাড়া আর-কিছুই রেখে যায় না। যে-সব বহুমান্য প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়ে আমরা দৈনিক জীবন যাপন ক'রে থাকি, তা থেকে বহু দূরে তাঁর অবস্থান; তাঁর সাধ্য নেই, আমাদের কোনো সুখ অথবা প্রমোদ জোগাতে পারেন; তাঁর অবদান একান্তভাবে আধ্যাত্মিক। এ-কথা সহজেই বোঝানো যায় যে আমাদের এই বহুনিন্দিত বিশ শতকে সাহিত্য ও শিল্পকলা অনেক বেশি আধ্যাত্মিক হ'য়ে উঠেছে; ত্যাগ করেছে বস্তুর মোহ, প্রতিচিত্রণের সরল আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষাদান, সংবাদসেবন বা কৌতূহল নিরসনের দায়িত্ব। এবং এই আধুনিক আধ্যাত্মিকতার যাঁরা জনক, সেই দুই পুরুষকে, শতাব্দীর ব্যবধান পেরিয়ে, আমাদের এই গ্রীষ্ম এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য থেকে, আমরা দ্রষ্টা, দিশারি ও আত্মীয়রূপে বরণ করি।

'স্বদেশ ও সংস্কৃতি'

দ্বিতীয় খণ্ড

রম্যরচনা ও ভ্রমণ

পুরানা পল্টন

দেশ দেখা আমার কপালে খুব কমই ঘটেছে। খানিকটা আর্থিক কারণে, কিন্তু তারও বেশি দেশভ্রমণে স্বাভাবিক রুচির অভাবে। ঘুরে বেড়াতে আমি ভালোবাসি না; জীবনের সবচেয়ে কল্পনাপ্রবণ এবং উদ্দাম সময়েও পারিপার্শ্বিকের বৈচিত্র্য ও নতুনত্বের লোভ আমার বেশি ছিলো না। বরং—দু-একবার যা চেষ্টা ক'রে দেখেছি—এই অত্যন্ত সভ্য যুগের দ্রুত ও অপেক্ষাকৃত শারীরিক ক্লেশহীন যানেও ভ্রমণের অনারামই আমার বেশি মনে হয়েছে; এবং নতুন জায়গায় গিয়ে অতি সুন্দর প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যেও আমি স্বাচ্ছন্দ্য পাইনি। তাই ব'লে প্রকৃতির প্রতি যে আমি উদাসীন, তা নয়। বাইরের বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি আমার আকর্ষণ ও আসক্তি যে কত গভীর তা আবিষ্কার ক'রে এক-এক সময় নিজেই অবাক হ'য়ে গিয়েছি। কিন্তু সে-প্রকৃতি—আমি যেখানেই থাকি না কেন, সব সময় আমার জানলার বাইরে উপস্থিত: সন্ধ্যার মেঘের রং, সন্ধ্যার তারা, দ্বিতীয়ার নতুন বাঁকা চাঁদ। তার জন্যে রেল-কোম্পানির টিকিট কাটবার দরকার করে না। প্রকৃতির এই আটপৌরে, অসাবধান রূপই আমাকে মুগ্ধ করে; যেখানে প্রকৃতি টুরিস্টের মনোহরণ করার জন্য পাহাড়ে আর জলপ্রপাতে, বিদেশী ফুলের বর্ণচ্ছটায় আর নীল হ্রদে নীলতর আকাশের ছায়ায় সেজে-গুজে ব'সে আছে; যেখানে তার রূপ ভাঙিয়ে রেল-কোম্পানির বিজ্ঞাপন তৈরি হয়; যেখানে সে নিতান্তই সরকারিভাবে সুন্দর—আমার মন তার প্রতি স্বভাবতই বিমুখ। স্বীকার করছি, তেমন কোনো বিখ্যাত বিউটি-স্পট আমি এ-পর্যন্ত দেখিনি; এবং দেখলে হয়তো আমার মত বদলাতে পারে। তবু এও ঠিক যে কোনো বাধা না-থাকলেও, নানারকম সুবিধে পেলেও, প্রকৃতির সে-সব সরকারি সৌন্দর্য দেখার জন্য আমার পরিচিত, অভ্যস্ত গৃহকোণ ছাড়তে আমার মন চায় না।

আসল কথা, আমি ঘরকুনো; আমি গুছিয়ে বসতে ভালোবাসি, শিকড় গজাতে ভালোবাসি; অনেকদিন বাস করবার ফলে যে-ঘরটি আমার ব্যক্তিত্বে একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে, তার বাইরে বেশিক্ষণ মন টেঁকে না আমার। বাঁধা-ধরা কতগুলো অভ্যাসের দৈনন্দিন দাসত্বে আমার সুখ; কখনো কোনো কারণে তার একটু বিচ্যুতি হ'লেও আমার অস্বস্তি লাগে। নতুনত্বের প্রতি

মোহ তো আমার নেই-ই, বরং গভীর সন্দেহ আছে। এমনকি, আমার ঘরে যেখানে যে-জিনিশ আছে, তার ব্যবস্থার একটু পরিবর্তন হ'লেও আমি বিরক্ত হই। আমার নিতান্ত অপরিসর, আসবাব-বাহুল্যহীন ঘরে বই নিয়ে, লেখা নিয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব নিয়ে, নিজের মনের চিন্তা নিয়ে— নিজের ঘরের পরিচিত, অতি পরিচিত আবহাওয়ায় আমি বেশ থাকি, সবচেয়ে ভালো থাকি। বৈচিত্র্য আমার পক্ষে বৈষম্য। এমন সময় গেছে, যখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বলা যায়— ঘর থেকে একেবারে না-বেরিয়ে আমি কাটিয়েছি। আমি যা চাই, যা-কিছু আমার ভালো লাগে, সব আমি ঘরে ব'সেই পেয়েছি; বাইরে যাবার কথা মনে হয়নি। এবং সে-সময়টা আমার পরিপূর্ণ আনন্দে কেটেছে; একটা মুহূর্ত ম্লান মনে হয়নি; মুহূর্তের জন্য ক্লান্ত বোধ করিনি। এমন অনেক আনন্দের দিনই আমার কেটেছে পুরানা পল্টনের বাড়িতে।

পুরানা পল্টন— অনেক দিন আগে যে-মেয়েকে ভালোবাসতাম, হঠাৎ কেউ যেন আমার সামনে তার নাম উচ্চারণ করলো। এককালে যে নিতান্ত আপন ছিলো, তার নাম আজ কানে ঠেকছে নতুন। অবাক হ'তে হয়— তার সঙ্গে অতদিনের ঘনিষ্ঠতা— তা কি সত্যি? সেদিন হয়তো তাকে ইচ্ছে ক'রেই ছেড়ে এসেছিলাম, কিন্তু আজ তার নামের শব্দে মধুরতা, বিষাদ। পুরানা পল্টন যেদিন শেষবারের মতো ছেড়ে এলুম সেই স্থানবিশেষের জন্য সেদিন আমার মনে একটুও দুঃখ হয়নি। বরং ঢাকা ছাড়তে পেরে আমি মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছিলাম। ঢাকা শহরের প্রতি আমার বিশেষ কোনো প্রীতি নেই; বরং তার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আছে। তার উপর, আমার যা পেশা, তাতে ব্যবসার ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে না-থাকলে চলে না। আমার বহুকাল ধ'রে অভিপ্রায় ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা হ'য়ে গেলেই কলকাতায় এসে বসবাস করবো; তা যেদিন ঘটলো, খুবই খুশি হয়েছিলুম; ঢাকার কথা ভেবে মন-খারাপ করার সময় ছিলো না। তবু এখন মাঝে-মাঝে পিছন ফিরে তাকাতে ভালো লাগে। মানুষের মনে অতীতের মোহ আশ্চর্য— বর্তমানে যা অপ্রিয় তা স্মৃতিতে পরিণত হ'লেই তারও কোনো কাঁটা আর থাকে না, মনের মধ্যে তা কোমল ও সুগন্ধি হ'য়ে হাল্কা হয়। পুরানা পল্টন আজ স্মৃতিতে প[illegible] হয়েছে; তাই তার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা ক'রে শুধু তার সৌন্দর্য উজ্জ্বল হ[illegible] সমুজ্জ্বল ফুটে উঠছে; বর্তমানে যাকে নিয়ে সম্পূর্ণ সুখী হ'তে পারিনি, আজ অতীতের প্রেক্ষিতে তাকে একান্তরূপে ভালোবাসছি।

বাস্তবে যার মধ্যে অনেক অভাব ছিলো, স্মৃতিপটে তার যে-ছবি উঠলো, দেখলুম তাতে কোনো খুঁত নেই। আজ যদি কেউ আমাকে জিগেস করে, পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর কোন জায়গা, আমি অনায়াসে উত্তর দিই: পুরানা পল্টন।

পুরানা পল্টনের টিনের বাড়িতে আমি ছ-বছর কাটিয়েছি— সমস্ত কলেজ-জীবন, সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্যায়, যৌবনের উন্মেষ থেকে বিকাশ। এ-সময়টা আত্মপ্রকাশের না-হ'লেও আত্মপ্রস্তুতির দিক থেকে জীবনের সবচেয়ে প্রধান অংশ। এ-সময়ের পরিণতিতেই মানুষের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ নির্দিষ্ট হয়। বন্ধুতা স্থাপন করার, অন্তর্জীবনের বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করার, রুচি ও অভ্যাস গঠন করার এই সময়। এ-সময়ে মন আশ্চর্য দ্রুত গতিতে গ'ড়ে ওঠে; এক বছরে মানুষ পাঁচ বছর বাড়ে। মনের তখন সবে পাখা গজিয়েছে; সে দূর থেকে আরো দূরে উড়ে-উড়ে নিজের শক্তি পরীক্ষা করে; জীবন সম্বন্ধে প্রথম সচেতনতায় প্রতি মুহূর্তে আবিষ্কার করে নতুন আস্বাদ, নতুন অনুভূতি। সেই ক-বছরে মানুষের মন নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে গিয়ে শেষটায় নিজস্ব রূপ নেয়; বাকি জীবনের কাজ সেই নির্দিষ্ট রূপের উপর গাঢ়তর রং ফলানো। এতদিনে আমি আমার নিজস্ব ছাঁচে গড়া হ'য়ে গেছি; মনের চেহারা আর বদলাবে না—যতদিন না রক্তের তেজ ক'মে আসে, জরার বাষ্পোদয়ে মনের স্বচ্ছতা আসে ঘোলাটে হ'য়ে।

সতেরো বছর বয়সে আমি পুরানা পল্টনের বাড়িতে আসি। পাড়াটা তখন সবে গ'ড়ে উঠছে; শহরের এক প্রান্তে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দু-একখানা বাড়ি; পাকা রাস্তা নেই, ইলেকট্রিসিটি নেই; সে—ই বড়ো রাস্তার মোড়ে একমাত্র জলের কল। ডাকবাংলোর পর থেকে রাস্তাতেও আলো ছিলো না। অসুবিধে যতদূর হ'তে হয়। প্রথম কয়েক দিন খুব বিশ্রী লাগলো; মনে হ'লো সভ্যতার এলাকার বাইরে নির্বাসিত হয়েছি। আমাদের বাড়ি ছাড়া আর বোধহয় খান দুই বাড়ি উঠেছে তখন— তারই এক বাড়ির ছেলের সঙ্গে প্রতিবেশিতার সূত্রে আমার পরিচয়, একই কলেজে পড়ার উপলক্ষে তা পরিণত হ'লো বন্ধুতায়। শেষ পর্যন্ত আমরা যে-ক'টি বন্ধু একত্র হ'য়ে 'প্রগতি দল' ব'লে পরিচিত হলাম, তাদের প্রায় সকলের সঙ্গেই সেইরকম সময়ে আমার আলাপের সূত্রপাত।

দেখতে-দেখতে আমার চোখের উপর মস্ত-মস্ত বাড়ি উঠে পাড়া ভ'রে গেলো। কত গ্রীষ্মের দুপুর ছাদ-পেটানো গানের একঘেয়ে সুরে উদাস হ'য়ে

উঠলো; পাকা রাস্তা তৈরি হ'লো, ইলেকট্রিসিটিতে আলো হ'য়ে গেলো চারদিক, দশ গজ পর-পর বসলো জলের কল। শেষ পর্যন্ত পুরানা পল্টন-ভদ্র হ'য়ে উঠলো, ভদ্রলোকের বসবাসের যোগ্য হ'য়ে উঠলো। সবাই আমরা আরামের নিশ্বাস ছাড়লুম। তবু, এখন ভেবে দেখছি, হয়তো আগেকার সে-সব দিনই ভালো ছিলো, যখন বড়ো রাস্তার মোড়ে ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে তারপর জল-কাদা পার হ'য়ে বাড়ি আসতে হ'তো; যখন বন্ধুরা মাঝে-মাঝে সাইকেল ঘাড়ে ক'রে এক হাঁটু কাদা ভেঙে আমার বাড়ি এসে পৌঁছতো; যখন কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে তারার আলোয় পথ দেখে মাঠ পেরিয়ে আমি বাড়ি ফিরতুম, আর শুক্লপক্ষে আকাশ ভ'রে আলোর বান ডাকতো— তেমন জ্যোৎস্না কতকাল দেখি না। সে-সময়টায় আমি প্রায় রোজই বেশি রাত ক'রে বাড়ি ফিরতুম; নির্জন মাঠের উপর দিয়ে একা হেঁটে আসতে কী ভালোই লাগতো। অন্ধকারে খানিক দূর এসে হঠাৎ অদূরে ইলেকট্রিক পাওয়ার-হাউসের তীব্র আলো চমক লাগাতো; এক বন্ধু প্রায়ই বলতো যে তার মনে হয় ওখানে খুব সুখী এক পরিবার বাস করে। কত রাত্রে আসতে-আসতে ডান দিকের সবুজ বনরেখার উপরে লাল হ'য়ে চাঁদ উঠতে দেখেছি; আর আমার মন কবিতার রসে আপ্লুত হ'য়ে গেছে। একবার এক ফুটফুটে জোছনা রাত্রে আমি যেন ঠিক দেখতে পেয়েছিলাম, এক ঝাঁক শাদা মূর্তি মাঠের মধ্যে ছুটোছুটি করছে। তখন আমার ভাবতে খুব ভালো লেগেছিলো যে আমি পরির নাচ দেখতে পেলুম।

হ্যাঁ, সেই পুরোনো পুরানা পল্টনই ভালো ছিলো। আমার ঘরের জানলা দিয়ে তাকালে চোখ একেবারে সোজা রেল-লাইন অবধি চ'লে যেতো; তারও পিছনে বড়ো ব্যারাক-বাড়িটাকে চেষ্টা করলে ধরা যেতো চোখে। গ্রীষ্মকালে সারাক্ষণ প্রকাণ্ড মাঠ পেরিয়ে হু-হু হাওয়া; শেষ সময় অবধি ঠিক আমার ঘরের সামনেটা খোলাই ছিলো; কিন্তু শেষের বছরগুলোতে সে-রকম হাওয়া আর পেয়েছি ব'লে মনে পড়ে না। পাড়াটা সভ্য হ'য়ে ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতির উদ্দামতা ক'মে এসেছিলো যেন।

পুরানা পল্টনের যে-জিনিশটি আমি কখনো ভুলবো না, তা হচ্ছে তার বর্ষার রূপ। অমন ধ্বনিবর্ণবহুল, উচ্ছৃঙ্খল, অজস্র বর্ষা আর দেখতে পাবো না। কী ঘন সমারোহেই না বর্ষা নামতো সেই নির্জন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে! সারা আকাশ মেঘে-মেঘে নিবিড়— স্তরের পর স্তর, ঢেউয়ের পরে ঢেউ, গাঢ়-নীল; কখনো দিগন্ত

থেকে যেন মেঘের স্তম্ভ উঠে আকাশ বিদীর্ণ ক'রে দিতো ; কখনো তরঙ্গক্ষুব্ধ মেঘের সমুদ্র আকাশকে ঝাপটে ধ'রে থাকতো, শুধু দিক্‌রেখার কাছে খানিকটা দেখা যেতো বর্ণহীন শূন্য। মেঘের মিছিল গড়িয়ে চলেছে, প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে আকাশের চেহারা, জানলার কাছে ব'সে-ব'সে আমি দেখতুম। ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটতো ; তার ছোঁওয়ায় এক আশ্চর্য সুখের স্রোত নামতো আমার মেরুদণ্ডে। তারপর রেল-লাইন আর দেখা যায় না, মাঠ অস্পষ্ট হ'য়ে এলো—শোঁ-শোঁ শব্দ উঠলো বাতাসে। বট গাছ দুটো ঢেকে গেলো আবছায়ায়, আমাদের টিনের চাল ঝমঝম শব্দে বেজে উঠলো। মুহূর্তে মেঘের রং মুছে গেছে, সারা আকাশ বিবর্ণ এখন। বৃষ্টি! বৃষ্টি! জানলা বন্ধ ক'রে দিতে হ'তো, তবু বেড়ার ফাঁক দিয়ে জল এসে ঘরের মেঝেতে রীতিমতো স্রোত ব'য়ে গেছে। চালের উপর বৃষ্টির অবিরাম গান—সে-গান শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি কত রাত্রে।

পুরানা পল্টনের বর্ষার রূপ কিছুতেই ভোলবার নয় ; সকালবেলাকার ছেঁড়া মেঘের আকাশ, ভিজে হাওয়া, মাঠে জ'মে-থাকা জল, মাঠ-ভরা নতুন সবুজ ঘাস, আমাদের উঠোনের তুলসী-মঞ্চে ঘন লতার আড়ালে ঘন-নীল অপরাজিতা, মাটির গন্ধ, বুনো ফুলের গন্ধ। আকাশ-ভরা সেই নরম-নীল মেঘ, সেই অশ্রান্ত, অজস্র বর্ষণ ; বাইরে তাকালে মনে হ'তো সমস্ত সৃষ্টি যেন ধোঁয়া হ'য়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ; মনে হ'তো, পৃথিবীর শেষ সীমা এইখানে।

আগে দুটো বট গাছের উল্লেখ করছি ; স্মৃতি যে-সব দৃশ্য জমা ক'রে রেখেছে, তাদের সঙ্গে, দেখছি, গাছ দুটো অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আমাদের ছোট্ট পাড়ার ঠিক বাইরে দু-দিকে দুই প্রকাণ্ড গাছ একাধারে সিংহদ্বার ও দ্বারপ্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে ; জানলার কাছে দাঁড়ালেই তাদের দেখতে পেতুম। আমার মনের সব ছবির সঙ্গে অজান্তে জড়িয়ে গেছে তারা। চৈত্র মাসে তাদের তলায় কত যে শুকনো পাতা ঝ'রে পড়ে ; হাওয়ায় সেগুলো ঘুরে-ঘুরে ছড়িয়ে যায় পাড়াময়। বর্ষায় তাদের নতুন রূপ ; জট-বাঁধা প্রকাণ্ড ঝুনো শরীরে ছোটো, কচি পাতা ঠিক যেন মানাতো না। হাওয়ার দিনে অশান্ত, অশ্রান্ত মর্মর ; রোদের দুপুরে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হ'তো প্রতিটি পাতা প্রাণ-শক্তিতে থরথর ক'রে কাঁপছে ; আর সন্ধ্যার শেষ সোনালি রশ্মিকে গাছ দুটোর মাথায় কতদিন আটকে যেতে দেখেছি। ঘন অন্ধকারে সমস্ত মাঠ যখন হারিয়ে গেছে, তাকিয়ে থাকতে-থাকতে গাছ দুটোর পরিচিত বিশাল আকার ফুটে উঠেছে আমার চোখের সামনে—মনে ভারি আরাম পেয়েছি। শেষের

দিকে একটা গাছে এক পাল শকুন বাসা বেঁধেছিলো; বেশি রাত্তিরে বাড়ি ফিরতে-ফিরতে তাদের পাখা-ঝাপটানি আর শকুন-ছানার মানুষের মতো ডাক শুনে ভয় পেতে ভালোবাসতুম। চ'লে আসবার কয়েকদিন আগে শুনেছিলুম পাড়ার সব প্রবীণরা একত্র হ'য়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছেন গাছ দুটো কেটে ফেলার জন্য; তাঁদের ধারণা হয়েছে, ঐ শকুনদের জন্য পাড়ায় নানা রকম ব্যাধি ছড়াচ্ছে। আমার কপাল ভালো; পুরানা পল্টনের উপর সভ্যতার এই শেষ আঘাত অনুষ্ঠিত হবার আগেই আমি ও-পাড়া ছাড়তে পেরেছিলুম।

২

পুরানা পল্টনে প্রথম যখন গেলুম, তখন আমি বয়ঃসন্ধির প্রভাবে নিজেকে ঘোর দুঃখী ব'লে কল্পনা করছি, এবং রোজ দুটো তিনটে ক'রে ব্যর্থ প্রেমের কবিতা লিখছি। সংসার-সমাজের প্রতি সমস্ত মন তখন বিমুখ; বোহেমিয়ানিজমকে সার করেছি জীবনের। তার ফলে তিন মাসে একবার চুল ছাঁটি; স্নানাহার সম্বন্ধে অনিয়মকেই ক'রে তুলেছি নিয়ম; দিন কি রাত্রির যে-কোনো সময়ে চায়ের দোকানে সদলে আড্ডাই ছিলো আমার স্বর্গ। সে-সব দোকানের কথা মনে করলে এখন ন্যক্কারের উদ্রেক হয়। কিন্তু নিয়ম-করা উচ্ছৃঙ্খলতায় কিছুদিন পরেই ক্লান্তি আসে; সে-ঢেউ কেটে যেতে দেরি হ'লো না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভর্তি হলাম, তখন থেকে আমার মধ্যে যেন নতুন জীবন এলো। আমাদের প্রায় সম্পূর্ণ দলটি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—এবং দু-জন ছাড়া সকলেই জগন্নাথ হল-এ সংলগ্ন। নিতান্তই বরাত-জোরে আমি আই. এ. পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে গিয়েছিলুম; তার খবর যেদিন পেলাম প্রায় সেদিনই সবাই মিলে ঠিক করা গেলো যে 'প্রগতি' (যা এতদিন হাতে লিখে বের করতুম) এইবার ছেপে বের করতে হবে। হিশেব ক'রে দেখা গেলো, মাসে একশো টাকা হ'লে টায়ে-টুয়ে একটি পত্রিকা চলে। একরকম নিজেদের ভিতর থেকে সহজেই দশজন লোক পাওয়া গেলো, যারা প্রতি মাসে দশ টাকা ক'রে চাঁদা দেবে। আমি দিতে পারবো কিনা, সেটাই ছিলো সন্দেহ; আমার বৃত্তি পাবার খবরে সে-দুর্ভাবনা ঘুচলো। এই আশাতীত পুরস্কার-লাভে আমি ঈশ্বরের অঙ্গুলি-নির্দেশ দেখতে পেলুম; এবার আর 'প্রগতি' না-বেরিয়ে যায় না। দারুণ উত্তেজনা, জল্পনা, আলোচনা, কিছুদিনের পরমসুখকর পরিশ্রমের পর— শেষটায় একদিন,

আষাঢ়ের এক শুভদিনে পীত মলাটে ঊর্ধ্বমুখী নারীমুণ্ডের প্রতিকৃতিযুক্ত হ'য়ে—সত্যি-সত্যি একদিন ছাপার অক্ষরে 'প্রগতি' বেরোলো।

শেষে কী হ'লো একটু ব'লে রাখি। প্রথম সংখ্যা পত্রিকা বেরোবার অনতি-পরে আমাদের দশজনের মধ্যে অনেকেই ঘটনাচক্রান্তে কে কোথায় ছিটকে পড়লো—পরে আর তাদের সাড়া পাওয়া গেলো না। কেবল দু-জনের কাছ থেকে আমরা অনেকদিন পর্যন্ত সাহায্য পেয়েছিলুম। কিন্তু মোটা খরচের ভারটা যে-দুজনের উপরে পড়লো, তাদের যৎসামান্য বিত্ত মাসিকপত্রের অগ্নিসংযোগে আশ্চর্য দ্রুতবেগে পুড়ে যেতে লাগলো। ('প্রগতি'র যা বার্ষিক আয়, তাতে ঠিক এক সংখ্যা কাগজ ছাপা হ'তে পারতো।) এমন অবস্থায় মাসিকপত্রের মতো প্রচণ্ড শখ মিটতেও বেশি দেরি হয় না, অকস্মাৎ মধ্যপথে 'প্রগতি'র গতি গেলো থেমে।

সে যা-ই হোক, 'প্রগতি' বের করা আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া একই সময়ে—একই মাসে ঘটলো। জীবন উঠলো আশ্চর্যরকম পরিপূর্ণ হ'য়ে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৃহত্তর পরিধি এবং নানা বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতায় প্রথমটায় একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। লেখা, পড়া, হাসি, গল্প, আড্ডা—প্রাণশক্তি খরস্রোতে ব'য়ে চললো নানাদিকে। প্রতি মুহূর্ত সজাগ, প্রতি মুহূর্ত মধুর। বাড়িতে আড্ডা, বিশ্বালয়ও আর-একটা আড্ডার জায়গা ছাড়া কিছু নয়। ওখানে গেলেই সব বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। অনেক দিন ক্লাশ থেকে বেরিয়ে এসে আমি খুঁজে-খুঁজে অন্য সবাইকে বের ক'রে এনেছি—ক্লাশ থেকে, লাইব্রেরি থেকে, কমন-রুম থেকে, যাকে যেখানে পাওয়া গেছে। যাদের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই, এমন কোনো-কোনো ছেলেকেও দলে জুটিয়ে নিয়েছি। প্রকাণ্ড দল বেঁধে আদিত্যের দোকানের সামনে ঘাসের উপর গোল হ'য়ে ব'সে চা খাওয়া—শুনেছি, আমাদের হাসির শব্দে ঐ দিককার ক্লাশগুলোতে পড়াশুনোর ব্যাঘাত হ'তো। বাড়ি ফিরেও বিকেল থেকে অনেক রাত অবধি হৈ-চৈ; আমার নিকটতম প্রতিবেশী এক শান্তিপ্রিয় মুনসেফ ভদ্রলোককে না-জেনে অনেক কষ্ট দিয়েছি আমরা। তারপর রাত জেগে-জেগে সব কাজ করতে হ'তো; 'প্রগতি'র প্রুফ দেখা, 'প্রগতি'র পাতা ভরবার জন্য 'কপি' তৈরি করা, আরো নানা রকম লেখা। এক মুহূর্তের জন্য ক্লান্তি অনুভব করতাম না; একটা দিন কেটে যেতো এক মুহূর্তের মতো। দিনগুলো যেন গানের সুর, কোথাও একটু অসংগতি বা বৈষম্য নেই, আনন্দে একেবারে ভরপুর। বন্ধুদের ভালোবাসা,

সাহিত্যে দুরন্ত উৎসাহ, অবিরাম রচনা ও পরিকল্পনা, বিচিত্র বাসনার জাগরণ, জীবনের উপভোগে ক্লান্তিহীন আগ্রহ—যদি কখনো একটু অবসর পেতাম, বিস্মিত মন প্রশ্ন করতো: এ কি সত্যি? বছর দুই সময়ের মধ্যে আমার মন আশায় সাহসে আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করলো। তারপর—তার পরের কথা ব'লে লাভ নেই; কী যেন হ'লো, 'প্রগতি' উঠে গেলো, বন্ধুতার নিবিড় বন্ধনও যেন শিথিল হ'য়ে এলো। বাইরে থেকে দেখতে গেলে সবই সে-রকম আছে—আমার ঘরে তেমনি হাস্যমুখর সান্ধ্য আড্ডা—তবু কী যেন নেই। শুধু যেন অভ্যাস-মতো ঠাট বজায় রেখে চলেছি; প্রাণ চ'লে গেছে। জীবনের চাকা ইতিমধ্যেই আমাদের মনে দাগ কাটতে শুরু করেছে—আমরা শক্ত হ'য়ে উঠছি, স্বার্থপর হ'য়ে উঠছি, হৃদয়াবেগ সম্বন্ধে সন্দিহান, নিজেকে গোপন রাখতে প্রয়াসী। যত সুন্দর মন নিয়েই আমরা আসি না কেন, সংসারের চিহ্ন তাতে পড়বেই।

অবশ্য এ নিয়ে আক্ষেপ করা বৃথা—এরই নাম পরিণতি। জীবনকে এড়ানো অসম্ভব; সব অবস্থায় তাকে স্বীকার ক'রে নেয়াই ভালো। তবু আজ এ-কথা মনে না-ক'রে পারছি না যে সে-ই গেছে আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সময়—তা আর ফিরে আসবে না। প্রথম যৌবনের সে-উচ্ছ্বাস, সূর্যোদয়ের কমনীয় রক্তিম আভা, ভোরবেলার স্নিগ্ধতা, স্বচ্ছ আলো—তা আর ফিরে আসবে না। জানি, আমার জীবনের দীর্ঘ পথ এখনো সামনে প'ড়ে আছে; সিদ্ধির, কীর্তির দিক থেকে সে-অংশই প্রধান। জানি, লোকে যাকে সুখ বলে, তার আরো অনেক আমার জন্য অপেক্ষা করছে—হয়তো। কিন্তু এও জানি, সে-আনন্দ আর কখনো পাবো না, পুরানা পল্টনের টিনের বাড়িতে যা পেয়েছিলাম। তখনকার জীবনকে আমি যেমন ক'রে ভালোবেসেছিলাম, কৃতী ও সম্মানিত পরবর্তী জীবনকে ঠিক সে-রকম ক'রে ভালোবাসতে পারবো কি? কে জানে।

'হঠাৎ-আলোর ঝলকানি' (পরিমার্জিত)

ক্লাইভ স্ট্রিটে চাঁদ

বাস্‌টা মোড় ঘুরতেই আমি নেমে পড়লুম। কী সহজে লেখা হ'য়ে গেলো কথাটা, যেন সন্ধে সাড়ে-ছ'টার সময় ক্লাইভ স্ট্রিটের মোড়ে বাস্‌ থেকে নামতে কোনো হাঙ্গামাই নেই; যেন অনেক কষ্টে কোঁচা সামলে, অন্যের পা মাড়ানো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে, ওঠবার জন্য ব্যাকুল ও নামবার জন্য ব্যস্ত ভিড়ের ঠেলা-ঠেলির মধ্যে কোনোরকমে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অক্ষত রেখে···অনেক চেষ্টায়, দস্তুরমতো জিমনাস্টিক্স ক'রে রাস্তায় পদক্ষেপ করতে হয় না। যা-ই হোক, নেমে তো পড়লুম, এবং অনুমানে বুঝতে পারলুম, শরীরটা আস্তই আছে। ঈশ্বরের দয়া! উঃ, ভদ্রলোকেরা প্রেস খোলার আর জায়গা পাননি। ভিড়ের সময় ড্যালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলে আসতে হ'লে আকাশ ভেঙে পড়ে আমার মাথায়; যতদূর সম্ভব, আমি সেটা এড়িয়ে চলি।

প্রেস থেকে খবর পাঠিয়েছিলো, আমি যদি সন্ধের সময় গিয়ে কয়েকটা গ্যালি প্রুফ দেখে দিতে পারি, রাত্রের মধ্যে দুটো ফর্মা ছাপা হ'য়ে যায়। বই ছাপা হবার গরজ ছাপাওলার চাইতে আমারই বেশি; খুব উৎসাহ নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম। কিন্তু ক্লাইভ স্ট্রিটের ফুটপাতে. ভিড়ের ধাক্কা থেকে নানারকম কসরৎ করতে-করতে নিজেকে বাঁচিয়ে. ফুটপাত থেকে একটু নেমেছি কি একটুর জন্যে গাড়ি-চাপা-পড়া থেকে বেঁচে যেতে-যেতে, উদ্বেল ট্রাফিক-তরঙ্গের গর্জনের মাঝখানে— না-এলেই ভালো হ'তো, আমি ভাবতে লাগলুম, কেন এলুম, না-হয় ফর্মা দুটো একদিন পরেই ছাপা হ'তো। দিনের আলো নিবে যাবার আর গ্যাস জ্ব'লে ওঠার মাঝখানকার ধূসর সময়; প্রেতের মতো আলো যেন সব ঐশ্বর্য ভেদ ক'রে শহরের কঙ্কালের উপর পড়েছে; আর তার উপর, সবার উপর— এই লোক, এত লোক!

সম্মিলিত মানবতার দৃশ্য যখনই দেখি, আমার মন-খারাপ হ'য়ে যায়। অনেক লোক যেখানে একত্র হয়, সেখানে আমি সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারি না। ব্যক্তিগতভাবে; প্রত্যেককে আলাদা ক'রে দেখলে, মানুষের মধ্যে— অন্তত কোনো-কোনো মানুষের মধ্যে— আমরা দেখতে পাই বুদ্ধির দীপ্তি, শরীরের রেখায় সামঞ্জস্যের আভাস, তার সংস্পর্শে পাই প্রাণের উজ্জীবন। কিন্তু যেখানে ভিড়, যেখানে একই উদ্দেশ্যে— কি একই উদ্দেশ্যহীনতায়— অনেকে জড়ো

হয়েছে, সেখানে ব্যক্তির সেই স্বাতন্ত্র্য যায় হারিয়ে; সব মিলে শুধু একটা বিশাল মানবতার পিণ্ড যেন কোনো যান্ত্রিক কৌশলে নড়াচড়া করছে। সেই দৃশ্য দেখে শুধু ভয় হয়, শুধু ক্লান্তি আসে। গায়ে-গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি মানবমাংসের স্তূপ, তা থেকে যেন উঠছে জীবনের তিক্ত গন্ধ, উন্মাদক এবং ঝাঁজালো—তার মধ্যে সহজে যেন নিশ্বাস পড়ে না।

ক্লাইভ স্ট্রিটের ভিড়ের মধ্যে, তাই; আমার হঠাৎ মন-খারাপ হ'য়ে গেলো, আমি যেন একটা আবছায়ায় প্রবেশ করেছি, যেখানে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে ধোঁয়া উঠছে চারদিক থেকে। ধোঁয়াটে, ধূসর সব মুখ— ভেসে চলেছে অবিরাম আমার পাশ দিয়ে— একটানা আট ঘণ্টার কাজের চাপে মুছে-যাওয়া, যেন ম'রে-যাওয়া সব মুখ। সে-সব মুখে ক্লান্তির ছাপ নেই— দিনের পর দিন একই বাঁধা-ধরা মাপাজোকা কাজ করতে হ'লে যে-ক্লান্তি আসে, কাজের মতো সেটাও একটা অভ্যেস হ'য়ে পড়ে— অভ্যেসের কাজ, অভ্যেসের ক্লান্তি!— দুটোই নিশ্চেতন, অনুভবহীন। না, ক্লান্ত নয়; সে-সব ধূসর ধোঁয়াটে মুখ একটা শূন্যতার মতো— যেন তারা অস্তিত্বের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে; তারা যে চলেছে, তাদের সামনে যেন কোনো লক্ষ্য নেই। চোখ, সারাদিন ভ'রে দলিল আর হিশেবের উপর ন্যস্ত, আলো-নিবে-যাওয়া, দৃষ্টিহীন— এখন আর কী তারা দেখতে পাবে সামনে? গলায় মলিন চাদর জড়ানো ঐ বাঙালি বাবুটি— সে কি কিছু দেখতে পাবে বাইরে, তার মনের মৃত ধূসরতা ছাড়া? তার চোখ তাকিয়ে আছে স্থির, সে কিছু দেখছে না। একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে খটখট জুতোর আওয়াজ করতে-করতে বাবুটিকে পার হ'য়ে গেলো, তার রং-উঠে-আসা ঠোঁট যেন হতাশায় পরস্পরের উপর বুজে আছে, শক্ত অবশ তার আঙুলগুলো আঁকড়ে ধ'রে আছে চামড়ার ব্যাগ, ফেঁপে-ওঠা চুলের নিচে তার মাথার মধ্যে টাইপরাইটারের ধাতব শব্দ। স্যুট-পরা একজন মাদ্রাজি আস্তে-আস্তে চলেছে— তার মুখে চুরোট, ঝুলে-পড়া গোঁফে-ঘেরা তার ঠোঁটে বাঁকা একটু হাসি— হয়তো সে আজকের দিনের মধ্যে তার ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউণ্ট অনেকটা ফাঁপিয়ে তুলেছে, তার অন্তরে টাকাময় শূন্যতা। দ্রুতগতি কোনো জন্তুর পালের মতো মোটরগুলো প্রায় নিঃশব্দে একটা আর-একটার পশ্চাদ্ধাবন করছে— তাদের মধ্যে উপবিষ্ট বড়ো সাহেবদের প্রবল মত্ততৃষ্ণা ছাপিয়ে উঠেছে অন্য সব চিন্তাকে— কিন্তু আর কী চিন্তাই বা থাকতে পারে, যা তারা আপিশের দেরাজে দিনের কাগজপত্রের সঙ্গে সঙ্গে রেখে আসেনি?

আর-কোন জিনিশে তাদের মন এখন সাড়া দিতে পারবে, হুইস্কির তীব্রতায় ছাড়া ?

একটা মিছিল ! বরং, দীর্ঘ একটা শবযাত্রা, মৃত্যুর পদচারণা। এই সব মৃত হৃদয়—অসাড় আঙুল, আর অন্ধ চোখ ; ধূসর, আলোকহীন মুখের পর মুখ—কোনো আগুন কি তাদের স্পর্শ করবে না, জেগে উঠবে না প্রাণ—চোখের আলো হ'য়ে অঙ্গুলিবৃন্তে চেতনা হ'য়ে ? এই কি আমাদের পৃথিবী, আমাদের জীবনের শেষ কথা—এই কোলাহল আর ব্যস্ততা, দিনের পর দিন জীবিকার পাকে ঘুরে বেড়ানো, বাণিজ্যের স্বর্ণষণ্ডের পায়ে এই হীন, এই লোলুপ আত্ম-সমর্পণ ?

আর হঠাৎ, রাস্তার পশ্চিম দিকের আকাশে মাথা-উঁচোনো বিরাট দুই বাড়ির মাঝখানে, আমার চোখের উপর ঝলসে উঠলো চাঁদ, রুপোলি চাঁদের বাঁকা টুকরো সন্ধ্যার স্তব্ধ-নীল আকাশে, যেন কোনো দূর, শান্ত হাসির মতো, যেন এক অনির্বচনীয় শান্তির দৃশ্যমান ইঙ্গিত। আমি চমকে উঠলুম, থমকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলুম খানিকক্ষণ। এমন একটা বিস্ময়, আঘাতের মতো! এখানে চাঁদের দেখা পেতে আশা করা যায় না, সারাদিন ধ'রে ফেনিয়ে-ওঠা এই নগর-কেন্দ্রে, যেখানে মানুষ বেঁচে থাকার চেষ্টায় ম'রে যাচ্ছে, এই সব বিশাল দেয়ালের পরিধির মধ্যে, এই উন্মাদ—মনে হয় যেন অকারণ—কোলাহলের আবহাওয়ায়। চাঁদকে যেন এখানে মানায় না, সে যেন এখানে ভুল ক'রে চ'লে এসেছে। আমি আবার চোখ তুলে তাকালুম চাঁদের দিকে—ঐ তো ছোটো একটু আলোর রেখা, তাকে ঘিরে পূর্ণিমার আভাস—কোনো কিশোরীর বুকের নতুন রেখায় তার পূর্ণ যৌবনের সম্ভাবনার মতো। ঐ তো ছোটো চাঁদ—তার মধ্যে কী শান্তি, কী স্তব্ধতা। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম, সে হাসছে আমাদের এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে—আমাদের জীবন-নাট্যের দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখে, আমাদের চেষ্টা আর সংগ্রাম, ইচ্ছা আর জল্পনা, ভালোবাসা আর হতাশা দেখে। সে তো সব জানে—সে তো দেখে এসেছে সব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে, সেইজন্যেই তার মুখে ঈষৎ ক্লান্তির আভাস। তবু তার মুখে সেই শান্ত হাসি—যেন এই সমস্ত ব্যাপারটা এত দুঃখের না-হ'লে ঠাট্টার হ'তো—সব কলরব ছাড়িয়ে অনেক উপরে সেই আশ্চর্য শান্তি, এই প্রেত-জনতা থেকে অনেক, অনেক দূরে। হঠাৎ আমার স্নায়ুতে-স্নায়ুতে রোমাঞ্চ খেলে গেলো ; কে যেন আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'ভয় নেই।'

না, ভয় নেই; চাঁদ আছে। এখানেও, এই ক্লাইভ স্ট্রিটেও আছে। আমরা যারা শহরে থাকি, তারা চাঁদকে বিশেষ লক্ষ করি না; আমাদের ধারণা, চাঁদের শোভা সেখানেই, প্রকৃতির যেখানে নিজস্ব রাজত্ব—পল্লীর উন্মুক্ত প্রান্তরে, বা সমুদ্রের দৈগন্তিক লীলায়। এটা আমাদের একটা গতানুগতিক ধারণা, যা আমরা বংশপরম্পরায় অবাধে বিশ্বাস ক'রে এসেছি, বিশ্বাস করাই সহজ ব'লে। কিন্তু চাঁদকে যে এখানেই দেখতে হয়, এই বাণিজ্যধানীতে, কুবেরকে উৎসর্গিত মন্দির থেকে মন্দিরে প্রতিফলিত দীর্ঘ ছায়ার পরিপ্রেক্ষিতে—এখানেই তো সবচেয়ে বাণীময় হ'য়ে ওঠে চাঁদের শান্তি আর স্তব্ধতা। পল্লীর নির্জনতায় আর প্রসারে চাঁদ যায় হারিয়ে; যেখানে প্রকৃতি তার উদাস আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে আকাশে-আকাশে, সেখানে চাঁদ বাহুল্য মাত্র। আমরা, যারা শহরের লোক,—কাড়াকাড়ি ক'রে, মারামারি ক'রে, প্রতি মুহূর্তে ঠেলাঠেলি ক'রে, কঠিন চেষ্টায় তাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করতে হয়; আমরা, যাদের রক্তের বিবর্ণ পাণ্ডুরতা ধূসর হ'য়ে ফুটে ওঠে আমাদের মুখে; হৃদয় যাদের শুকিয়ে গেছে, ঝ'রে গেছে ধুলো হ'য়ে—আমাদেরই তো সবচেয়ে বেশি দরকার অন্তরে চাঁদের স্পর্শ, আমাদেরই জন্য তো চাঁদের শান্তি। নেশার ঘোরে কেটে যায় দিনের পর দিন—ক্ষুধা শাণিত হ'য়ে ওঠে; লোভ নিজেকে বিস্তার করার জন্য ছটফট করে; অবান্তরতায়, তুচ্ছতায় সংকীর্ণ জীবন যখন নিজের বিনাশে নিজেই উদ্যত—এমন সময় একদিন চাঁদ ওঠে আকাশে, মনে করিয়ে দেয় আরো-কিছু আছে।

* * *

প্রেসে ঘণ্টাখানেক কাটাতে হ'লো। আবার রাস্তায় বেরিয়েই আমি চাঁদের জন্য তাকালুম আকাশে, কিন্তু পশ্চিমের আকাশ বিলিতি ব্যাঙ্কের জাঁদরেল বাড়িতে চাপা পড়েছে। একটু এগিয়ে আসতেই ফাঁক দেখা গেলো। আর—ঐ তো চাঁদ হেলে পড়েছে আকাশের নিচে, লাল হ'য়ে; তার মুখে লেগে রয়েছে এখনো সেই হাসি, আর ক্লান্তির ক্ষীণ আভাস। আমার চোখ থেকে সে যখন অদৃশ্য হ'য়ে যাবে, নতুন অভাবনীয় কোনো আকাশে—সেই আকাশের কোনো সঙ্গী যদি তাকে জিগেস করে, 'নতুন কিছু দেখলে?' এই হাসি দিয়েই সে উত্তর দেবে সে-প্রশ্নের—তারপর আবার পাড়ি দিতে আরম্ভ করবে আকাশের শূন্যতা যতক্ষণ না যে ফিরে আসবে এই ক্লাইভ স্ট্রিটের পিছনে, বিলিতি ব্যাঙ্ক আর স্কটিশ বীমা কোম্পানির মাঝখানকার ফাঁকায়—সেই একই দৃশ্য দেখতে, আমাদের ধোঁয়াটে, ঘোলাটে জীবনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি।

হঠাৎ এক টুকরো পাৎলা মেঘ এসে চাঁদের খানিকটা ঢেকে ফেললো—যেটুকু বেরিয়ে রইলো, রক্তিম দীপশিখার মতো জ্বলছে। চাঁদ, আমি মনে-মনে বললুম, তোমার ঐ শিখা থেকে আমি জ্বেলে নিলুম আমার মন, সে-আগুন নিববে না। যদিও মনের কোনো গোপন অংশে আমি জানতুম যে ও-কথা সত্য নয়, হ'তে পারে না—কাল সকালেই হয়তো উঠবে কোনো কোলাহলের হাওয়া, এক ফুঁয়ে নিবে যাবে এই স্পর্শ। কিন্তু তখনকার মতো আমি যেন নিজের মধ্যে অনুভব করলুম চাঁদের সত্তা, এক হ'য়ে গেলুম আমি চাঁদের সঙ্গে।

ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে এসে লাগলো যেন কার আদরের মতো। নির্জন ফাঁকা ক্লাইভ স্ট্রিট দিয়ে আমি একমাত্র চলেছি, ফুটপাতের পাথরের উপর আমার জুতোর অস্বাভাবিক শব্দ হচ্ছে। কী মুক্তি! এই ঠাণ্ডা হাওয়া, এই রাত্রি! অন্ধকারকে আমি আমার শরীর দিয়ে অনুভব করতে পারছিলুম নরম কোনো স্পর্শের মতো; ক্ষীণ গ্যাসের আলো প্রশস্ত রাস্তাকে জড়িয়ে ধরতে পারছে না—এক ফোঁটা আলো নেই দু-পাশের এতগুলো বাড়ির কোনো-একটিতে। যেন রাত্রির সব গোপন কথা লুকিয়ে আছে এই লঘু অন্ধকারের পরতে-পরতে—গ্যাসের আলো যেখানে ফুটপাতে পড়েছে, দূর থেকে মনে হয় যেন লেফাফা-আঁটা কোনো খবর। কী সে-খবর, তা আমি জানি না, জানতে চাই না। আমি খুশি যে অন্ধকারের গায়ে সংগোপন রাত্রির লিপি আমি পড়তে পারি না। অবাক হ'তেই আমার বেশি ভালো লাগে; এই রহস্যের চেতনাতেই আমার আনন্দ। আর, কী আশ্চর্য, এই স্তব্ধতা আর অন্ধকার, যেন এক জাদুমন্ত্রে রূপান্তরিত ক্লাইভ স্ট্রিট। একটু আগেও এখানে ভিড় আর ধরছিলো না, এখন তা দুঃস্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে, এখন কাছাকাছি আমি ছাড়া আর একটি লোক নেই। আমার বিশ্বাস করার ইচ্ছে হ'লো যে ঘণ্টাখানেক আগে, এখান দিয়ে যাবার সময়, আমি যা দেখেছিলাম তা প্রেতের মিছিল, সেই সব লোকের কখনো সত্যিকার অস্তিত্ব ছিলো না। তারা লাফিয়ে উঠেছিলো মাটি-ফুঁড়ে কোনো মায়াবী দানবের ইঙ্গিতে, মুহূর্তের জন্য প্রচণ্ড জাঁকজমকে কুচকাওয়াজ ক'রে মিলিয়ে গেলো। আধো-অন্ধকারে যেন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে এই রাস্তা, রাত্রির হাওয়া যেতে-যেতে তাকে চুমো দিয়ে যাচ্ছে—কী ক'রে এখন বিশ্বাস করা যায় তার দিনের বেলাকার রূপ, এ-কথা মনে না-করা কী ক'রে সম্ভব যে সেটা আমাদেরই মনের বিকৃত কল্পনা মাত্র, কোনো উন্মাদের প্রলাপ, যা আমরা মূঢ়তার বশে মেনে নিয়েছি সত্য ব'লে। সারাদিন এই রাস্তা ধ্বনি-

তরঙ্গে আলোড়িত— এখন আর সে কি তার কিছু মনে রেখেছে? সব কি মিলিয়ে যায়নি, শূন্য হ'য়ে যায়নি— যেন কখনো তা ছিলো না? ট্র্যাফিকের গর্জনে আর লোকের মুখের কথায় হানাহানি— মুখ থেকে মুখে, টেলিফোনের তারে-তারে সঞ্চরমাণ লক্ষ-লক্ষ কথা— স্বার্থে-স্বার্থে সংঘর্ষ, ছদ্মবেশী লোভের দীনতা, নিজের ফন্দি গোপন রাখার জন্য সওদাগরি চাতুরী— পার্সেন্টেজ, ডিভিডেণ্ড, অন্তরালবর্তী অসংখ্য লোকের অদৃষ্ট নিয়ে খেলা— আর এখন সব চুপ, একেবারে চুপ, শুধু আমার পায়ের শব্দ নিজের পুনরাবৃত্তি ক'রে চলেছে। আমার চারদিকে যতগুলো বাড়ি দেখছি, তার প্রত্যেকটি যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ, সারাদিন ধ'রে মৌচাকের ব্যস্ততা সেখানে, হাজার লোক অন্নের গ্রাস কুড়িয়ে নিচ্ছে, সুখেদুঃখে জড়ানো হাজার জীবন পিণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে কয়েকজন অদৃশ্য ধনীর আত্মস্ফীতির প্রয়াসের চাপে; এই মাত্র এক বর্গ মাইল জায়গার মধ্যে প্রত্যহ লেনদেন হচ্ছে কোটি-কোটি টাকার। কিন্তু এখন সে-সবের কিছুই নেই; এখন শুধু রাত্রির রহস্য আর স্তব্ধতা। বাড়িগুলো তাদের অন্ধকার শূন্য জঠর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন কিসের প্রত্যাশায়। মনে হয়, যেন তাদের পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে; রাত যখন গভীর হবে, তারাদের নিচে চলবে এদের কানাকানি, দিনের স্মৃতি মন্থন ক'রে তারাও হয়তো হাসাহাসি করবে নিজেদের মধ্যে— মানুষের সব চেষ্টার অন্তিম নিষ্ফলতা নিয়ে। এই বাড়িগুলোর মধ্যেও যেন গোপন রয়েছে চাঁদের ক্লান্তি।

যদি কেউ মনে করেন যে নিজের লাভের জন্য পৃথিবীময় টাকা খাটিয়ে তিনি মানুষের সভ্যতাকে সাহায্য করেছেন, বণিকবৃত্তিকে একমাত্র ধর্ম ক'রে তোলা যাঁর তপস্যা, তিনি যেন একবার সন্ধের পর তাঁর ক্লাইভ স্ট্রিটকে দেখে আসেন, যখন ও-রাস্তা একেবারে শূন্য ও নীরব হ'য়ে যায়। তাহ'লে তিনি জানবেন। তিনি জানবেন, ক্লাইভ স্ট্রিটই তার নিজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখেছে বিদ্রূপ—বিদ্রূপের চেয়েও বেশি—গভীর শাস্তি। চাঁদের আশ্চর্য শান্তি, তার মধ্যেও তা রয়েছে। ক্লাইভ স্ট্রিটকে আমরা জানি কলকাতার— শুধু তা-ই বা কেন?— বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ড ব'লে, যেখান থেকে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত দেশে, যে-রক্তে লালিত হয় জীবন। হ্যাঁ, ক্লাইভ স্ট্রিটই তো আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে— বরং, বর্তমান সময়ের এমনিই ব্যবস্থা যে ক্লাইভ স্ট্রিট বাদ দিয়ে আমাদের বাঁচার উপায় নেই। যদি রক্ত আসে অতি ক্ষীণস্রোতে, জীবন চলে মৃদু তালে— এক কথায়, জীবন যদি শুধু হয় জীবনের দেখানোপনা, তাহ'লে

শুধু ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে পারি, তা ছাড়া আর কী। এটুকু যে হচ্ছে, তারই জন্য ধন্যবাদ ক্লাইভ স্ট্রিটকে। আজকালকার দিনে আমাদের প্রত্যেককেই দাসখৎ লিখে দিতে হয়েছে বণিকরাজকে, তা থেকে কারো মুক্তি নেই—যতই পরোক্ষে, যতই সূক্ষ্মভাবে হোক–সবারই উপর চরম প্রভুত্ব করছে ক্লাইভ স্ট্রিট। আমি, লেখা যার পেশা, ক্লাইভ স্ট্রিটের সঙ্গে আপাতত যার কোনোই সম্বন্ধ নেই— আমার পক্ষেও ক্লাইভ স্ট্রিটকে এড়ানো অসম্ভব। পূর্বযুগে আমাকে অলংকৃত করতে হ'তো কোনো রাজসভা— কোনো-একজনের কাছে সে-বশ্যতা আমার ভালো লাগতো না; আজকের দিনে এই দুর্বোধ জটিল বণিক তন্ত্রের সঙ্গে আমারও জীবিকার সমস্যা জড়িত। বিশেষ একজন রাজার অধীন হওয়া ভালো না; কিন্তু এই বণিককুলের যারা ক্রেতা, সেই বিজ্ঞাপন-বিশ্বাসী চিন্তা-শক্তিহীন জনসাধারণের অধীনে থাকাই কি তার চেয়ে ভালো?

যা-ই হোক, ক্লাইভ স্ট্রিট সম্বন্ধে এটাই শেষ কথা নয়; আমরা যেন তার চাঁদ-সত্তাকে মনে রাখি, তার রাত্রিময় রহস্যকে। রুটিন-বাঁধা একঘেয়ে কাজ দিনের পর দিন করতে হ'লে আমাদের প্রাণ শুকিয়ে যেতে বাধ্য; কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর যা ব্যবস্থা, তা ছাড়া আমাদের উপায়ই বা কী—বেঁচে তো থাকতে হবে সবার আগে। স্বর্ণষণ্ডের পূজায়, তাহ'লে, নিজের একটি অংশকে বলি দিতেই হবে—কিন্তু যেটুকু ঠিক দরকার, যেটুকু না-দিলেই নয়, তার বেশি যেন আমরা না দিই। জোড়াতালি দিয়ে দু-দিকই বজায় রাখার চেষ্টা—সেটাই আজকালকার মানুষের বাঁচার উপায়। কাজ যতক্ষণ, ততক্ষণ একটা অস্তিত্ব-হীনতা; যে-মুহূর্তে তা শেষ হ'লো, সে-মুহূর্তে নিজের জীবন। আমার নিজের জীবন! অবসরের সময়টা আমার, সেটুকু সময় আমি বাঁচবো। তখন রাত্রির ক্লাইভ স্ট্রিটের ছায়ালোক, হৃদয়ে এই চাঁদের স্পর্শ।

'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' (পরিমার্জিত)

মৃত্যু-জল্পনা

কয়েকদিন ধ'রে আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না। কী হয়েছে বলা শক্ত। নির্দিষ্ট কোনো ব্যাধি আমাকে আক্রমণ করেনি, আমার শরীরে কোনো যন্ত্রণা, এমনকি কোনো অস্বস্তিও নেই; স্নানাহারাদি স্বাস্থ্যসম্মত ক্রিয়া নিয়মিতরূপে চলছে। নিয়মিতরূপে— এবং নিছক নিয়ম হিশেবে, শুধুই নিয়মরক্ষার খাতিরে। অনেকদিনকার অলঙ্ঘ্য অভ্যাস অনুসারে— তা-ই মনে হচ্ছে আমার— ডান হাতের আঙুলগুলো খাদ্য তুলে দিচ্ছে মুখে, নেহাৎই কর্তব্যপরায়ণভাবে দাঁত চিবোচ্ছে, মুখ অনিবার্যরূপে রসে ভ'রে উঠছে। আর উদরস্থ খাদ্যের উপর শরীরযন্ত্রের সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াগুলিও যে অক্ষুণ্ণভাবে চলছে, তার পরিচয় পাচ্ছি পরবর্তী আহারের সময়। এ থেকে অনুমান করতে হয় যে শরীরের কলকবজা মোটামুটি ঠিকভাবেই চলছে। তবু এও ঠিক যে আমি অসুস্থ হ'য়ে পড়েছি; এত অসুস্থ শিগগির হইনি।

সম্প্রতি আমি নিজের মধ্যে একটা ক্লান্তি অনুভব করছিলাম। কয়েকটা দিন আমি ছুটি নেবো, মনে-মনে আমি বলেছিলাম, সম্পূর্ণ বিশ্রাম করবো। খাওয়া, ঘুম আর বই পড়ায় সীমাবদ্ধ যে-জীবনযাত্রা, তার মতো লোভনীয়, তার চেয়ে সুখকর আর কী আছে? তখন, অনিচ্ছায় লেখার দায়ে পীড়িত, অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় বিব্রত, তখন আমার তা-ই মনে হয়েছিলো। আর তা-ই আমি করলাম। গেলো কয়েক দিনে আমি কাগজের উপর কলম ছোঁয়াইনি; বহুকাল ধ'রে যে-সব বই পড়বো ব'লে নিজের কাছে প্রতিশ্রুত হ'য়ে আছি, তা-ই নিয়ে কাটছে আমার সময়। সাধারণত রাত্রিশেষ অবধি জাগরণে বাধ্য, বারোটা না-বাজতেই ঘুমিয়ে পড়েছি। কী সুখের জীবন!— কল্পনা করতেও, কল্পনা করতেই সুখের! কেননা, আসলে, এই বিশ্রাম-চিকিৎসার একমাত্র ফল হয়েছে আমার ক্লান্তিকে আরো গভীর ক'রে তোলা। সাত ঘণ্টার গাঢ় নিদ্রার পর ক্লান্ত হ'য়ে আমি বিছানা থেকে উঠি, ক্লান্তভাবে কোনো সমসাময়িক উপন্যাসের পাতা উল্টে যাই। ক্লান্তভাবে খেতে বসি; দুপুরবেলা বই নিয়ে ব'সে বার-বার ঝিমিয়ে পড়ি। শ্রেষ্ঠ সমালোচকেরা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বিচারে যে-বইকে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ব'লে নির্দিষ্ট করেছেন, তাতেও মন বসে না। আর শেষ পর্যন্ত ক্লান্তি আর সহ্য করতে না-পেরে অযথা দেরি না-ক'রে শুতে যাই। সমস্ত

শরীর যেন দীর্ঘ দিন ভ'রে এরই প্রতীক্ষা করতে থাকে ; বালিশে মাথা রাখার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ; সাময়িক মৃত্যু। এটুকু শুধু বাঁচি, কারণ ঐটুকু সময় ক্লান্তির নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাই। জাগ্রত অবস্থাতেও মন থাকে ঘুমিয়ে, শরীরের যান্ত্রিক নড়াচড়া, তাই, অস্বাভাবিক, এমনকি উৎকট ব'লে মনে হয়। শুধু ঘুমের মধ্যেই ঘটে শরীর ও মনের সুরসংগতি। এক বিশাল ক্লান্তি গ্রাস করেছে আমাকে।

বোদলেয়ার এক রকম ক্লান্তির কথা বলেছেন, যা কিনা 'assumes the proportions of immortality'। সেই ভীষণ ক্লান্তির আনুষঙ্গিক হচ্ছে ক্ষয়কারী তিক্ততা, নিঃসীম হতাশা। জীবনের দিক থেকে তা যতই অবাঞ্ছিত, যত বড়ো অমঙ্গলই হোক, তা কাব্যে ফলপ্রসূ হ'তে পারে ; অতএব তা সক্রিয়, তা সজীব। যা থেকে কবিতায় প্রাণ সঞ্চারিত হয়, তা মৃত্যুর অনুকূল হ'তে পারে না। তা কবিতার প্রেরণা হবার ক্ষমতা রাখে, সেখানেই তার মহৎ সার্থকতা। আর-এক রকম ক্লান্তি আছে, টেনিসন-বর্ণিত মধুভুকদের ক্লান্তি, সুইনবার্নের অলস ছন্দ যা আমাদের চেতনাগোচর করে। এই ক্লান্তি কাল্পনিক, উপাখ্যানধর্মী ; কিন্তু এর মূলে জীবনের সত্য আছে। কারণ এই অবস্থা কথনো-না-কথনো আমরা কামনা করি (কীটস-উল্লিখিত 'fever and fret'-এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া এটা) ; কামনা করি— এবং অনুভবও করি। এমন সময় আসে, যখন আমরা ছায়ার মধ্যে, স্বপ্নের মধ্যে মিলিয়ে যাই। সে-ক্লান্তি মধুর, উপভোগ্য ; এক রকমের ঐশী উন্মাদনা। উপরন্তু, সেটাও কবিতার একটা সম্ভাব্য উৎস।

কিন্তু এই ক্লান্তি, যার ভিতর দিয়ে আমি সময় কাটাচ্ছি (কঠিন ধৈর্যসহকারে, এই কঠিন আশ্বাসে যে এটা সাময়িক, এখনকার মতো যতই মর্মঘাতী হোক, এটা কেটে যাবে)—এ-দুয়ের কোনো শ্রেণীতেই তা পড়ে না। এ-ক্লান্তিতে বোদলেয়ারের তিক্ততা কি প্রসার্পিনার আফিম-ফোটা প্রান্তরের তন্দ্রাময় মাধুর্য নেই ; বস্তুত, কিছুই নেই এতে। সমস্ত অনুভূতির অভাব, সমস্ত আবেগের, চিন্তার অনস্তি— এই ক্লান্তি একটা বিরাট শূন্যতা যেন। চারদিকে কিছু নেই, আমি নেই। আমি নেই— কেননা, আমি আর অনুভব করতে পারছি না, চিন্তা করতে পারছি না, অবিশ্রাম-বহমান বিশ্বস্রোত থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারছি না আর। যে-বিশ্ব থেকে সহস্র অদৃশ্য যোগসূত্র দিয়ে প্রতি মুহূর্তে আমি প্রাণরস আহরণ করেছি, যেন এক হিংসাপরায়ণ অপদেবতার অভিশাপে তা

থেকে আমি এখন বিচ্ছিন্ন। যে-সব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রকৃতির সমগ্রতার সঙ্গে, বিশ্বের জীবনের সঙ্গে আমার সংযোগ, তাদের উৎসমুখ গেছে রুদ্ধ হ'য়ে: এক কথায়, আমি জীবিত আছি, কিন্তু আমার জীবন নেই। সারাক্ষণ আমার চারদিকে যা-কিছু আছে, যা-কিছু ঘটছে— জানলা দিয়ে দেখা রোদে-ঝলসে-যাওয়া আকাশ, রাস্তায় ট্যাক্সির হর্ন, পানের দোকানের হল্লা, আমার জীবন দিয়ে পরিপূর্ণ এই ঘর, অতি-পরিচিত বই, আসবাব,— সব আমার পক্ষে অসার, অবাস্তব, যেন সত্যি-সত্যি এদের অস্তিত্ব নেই: কিংবা, এরা আছে অস্তিত্বের অন্য এক স্তরে, যেখানে আর আমি পৌঁছতে পারছি না। আমাকে যেন আবৃত করেছে এক কুয়াশা, আমার ও বাস্তবের মধ্যে একটা পর্দা নেমে এলো; যতই ছটফট করি, সেই পর্দা আমি সরাতে পারবো না। নিজেকে আমি প্রশ্ন করি: কী হ'লে তোমার ভালো লাগে? যে-কোনো সময়ে যা-কিছু আমি কামনা করেছি, একে-একে সব আউড়ে যাই: বৃথা, মন একটাতেও সাড়া দেয় না। কিছু না, কিছুই আমার ভালো লাগে না: ভালো লাগার ক্ষমতাই আর নেই আমার। খারাপ লাগারও ক্ষমতা নেই। ভাবতে চেষ্টা করি, আমি খুব অসুখী, কেননা দুঃখেও শক্তি পাওয়া যায়, এমনকি, তাতে এক ধরনের আনন্দ আছে। কিন্তু অসুখী আমি নই, তাহ'লে তো বাঁচতাম। যাতে আছে বিতৃষ্ণা বা আনন্দ উপভোগ, বা যন্ত্রণা—এমন-কিছু, যে-কোনো কিছু, যা মনকে জাগিয়ে তুলতে পারে, তা অনুভব করতে পারলে আমি এখন প্রাণ পেতাম। যা আমি সবচেয়ে ভয় পাই, সেই নিঃসাড়তা আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। এক অন্তহীন অনতিক্রম্য শূন্যের মধ্যে আমি এক শূন্যের মতো অবস্থিত— এ যেন আত্মার অ্যাট্রফি, চৈতন্যের অবলোপ। এর চেয়ে ঢের ভালো শরীরের কোনো দুঃখ: তার তবু একটা সত্তা আছে, মনের বৃত্তিগুলোকে তা জড় ক'রে দেয় না: বরং সূক্ষ্মতররূপে অনুভূতিশীল ক'রে তোলে। ঢের ভালো হ'তো এর চেয়ে, যদি সত্যি কোনো কষ্টকর রোগ আমাকে আক্রমণ করতো, কোনো শোক আঘাত করতো আমাকে। কিন্তু এই নিষ্প্রাণ জড়ত্ব, এই বন্ধ্যা শূন্যতা—এ তো মৃত্যুরই নামান্তর। আমার নিশ্বাস পড়ছে, অবিরাম নির্ভুল নিয়মে ধ্বনিত হচ্ছে হৃৎপিণ্ড, শরীরের প্রতি মুহূর্তের ক্ষয় খাদ্য-পানীয়-গ্রহণে পূরিত হচ্ছে: কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আমি মৃত; গূঢ়তম, প্রকৃততম অর্থে মৃত; কেননা এখন আমি যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, এই নিশ্চেতন জড়িমা, তা একটা বিলুপ্তি, আলোর নির্বাপণ, সক্রিয়তার সমাপ্তি, শূন্যতা। কেননা, সচেতনতাই জীবন।

*   *   *

আফ্রিকায়, প্রকৃতি যেখানে তার বন্যতমরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেখানে সি-সি (tse-tse) নামক একরকম মাছি আছে, যার দংশন অনিবার্যরূপে কালান্তক। জীবের দেহযন্ত্রের উপর এই মাছির বিষের যা প্রতিক্রিয়া, তাকে বলা হ'য়ে থাকে তন্দ্রারোগ— sleeping sickness। সি-সি মাছি একবার যাকে কামড়েছে, সে ঝিমিয়ে পড়তে-পড়তে ধীরে-ধীরে একটু-একটু ক'রে শেষ নিদ্রায় মিলিয়ে যায়। রোগের প্রথম সূচনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বেশ দীর্ঘ কালের ব্যবধান থাকে, এবং এই দীর্ঘ কাল ধ'রে প্রতি মুহূর্তে, প্রতি নিশ্বাস-পতনের, প্রতি হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে তার জীবনীশক্তি নির্গত হ'তে থাকে— তার নিজেরই অজ্ঞাতে, কারণ, তার কী হচ্ছে, তা উপলব্ধি করার ক্ষমতাও তার থাকে না। এক দারুণ অবসাদ আক্রমণ করে তাকে ; মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে, দিন থেকে দিনে তা গাঢ়তর হয় : ফাটা পাত্র থেকে বিন্দুর পর বিন্দু নিঃসরণকারী জলের মতো চুঁইয়ে-চুঁইয়ে বেরিয়ে যেতে থাকে জীবন— বিরামহীন, শ্রান্তি-হীন, যতক্ষণ না প্রাণবর্জিত শরীর শুধু মাটিকে উর্বর করবার উপযুক্ত কত-গুলো রাসায়নিকের সমষ্টিতে পরিণত হয়। আক্রান্ত ব্যক্তি বুঝতেও পারে না যে সে মরছে ; আর যদি বা পারে, তবু মৃত্যুকে রোধ করার মতো ইচ্ছাশক্তি, রোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো সজীবতা— যা কিনা মানুষের অন্ধ প্রবৃত্তির অংশ, জাতির প্রবহমানতার প্রধানতম শর্ত— তাও আর থাকে না তার ; সে হ'তে দেয়, গা ছেড়ে দেয় ; প্রকৃত মৃত্যু ঘটবার অনেক আগেই মৃত্যু হয় তার। নিঃশব্দ, নিঃসাড়, সে শুধু প'ড়ে-প'ড়ে ঝিমোয়। কোনো শ্বেত পরিব্রাজক আফ্রিকার আভ্যন্তরিক কোনো পল্লীতে প্রবেশ ক'রে হয়তো দেখতে পায় সারা গ্রাম তন্দ্রারোগে আক্রান্ত ; প্রত্যেক বাড়ির দাওয়ায় অধিবাসীরা ব'সে-ব'সে ঝিমোচ্ছে— কেউ-কেউ হয়তো ম'রেও গেছে। সারা গ্রামে মৃত্যুর এক অখণ্ড মূর্তি বিরাজমান। যত বিভিন্ন ভাবে জীবের মৃত্যু ঘটে, তার মধ্যে এর মতো ভয়াবহ কিছু আছে ব'লে আমি ধারণা করতে পারি না। মৃত্যুর ভীষণতম রূপ— এই তন্দ্রারোগ : কারণ আর-কিছুই মানুষের চৈতন্যকে, মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে এমন সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে না। যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যক্ত যে-আহত চলৎশক্তিরহিত সৈনিক সন্নিকট ট্যাঙ্কের শব্দ শুনে উন্মত্তের মতো চীৎকার করতে থাকে, সেও তার সেই চীৎকার দ্বারা মৃত্যুর বিরুদ্ধে তার শেষ প্রতিবাদ ঘোষণা ক'রে যায়, যে-প্রবৃত্তির প্রতীক সেই চীৎকার, সেটাই

জীবনের ধারাবাহিকতার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও যেখানে লুপ্ত হ'য়ে যায়, বাঁচবার অদম্য ইচ্ছাই অপসারিত হয়, ভয়াল মৃত্যুর চেতনাও আর থাকে না— সেখানেই মৃত্যু হয় জয়ী, জীবনের গভীরতম মূল সেখানেই উৎপাটিত হয়। মরতেই যদি হয়, জেনে-শুনেই মরবো— এই গর্ব মানুষের। সচেতনতাই জীবন; এবং মৃত্যুর মুখেও সে-জীবন আমরা অক্ষুন্ন রাখতে চাই। এইজন্যে পৌরাণিক বীরের এক লক্ষণ ইচ্ছামৃত্যু; জীবের মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু অসহায় কীটের মতো এক অন্ধ খেয়ালি শক্তির বশ্যতার বিরুদ্ধে সেই পুরুষেরা প্রতিবাদ করেছিলেন; সময় যখন হবে, স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে মৃত্যুর কাছে তাঁরা আত্মসমর্পণ করবেন; মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রিত করবেন, নিজের ইচ্ছা দ্বারা সৃষ্টি করবেন নিজের মৃত্যু, খামখেয়ালি দৈবের বশবর্তী হবেন না। এখন পর্যন্ত, সজ্ঞানে মৃত্যুলাভ পুণ্যাত্মার লক্ষণ ব'লে বিবেচিত হ'য়ে থাকে। সচেতনতা, জ্ঞান— তা-ই হ'লো মানুষের মনুষ্যত্ব— নিছক জীবত্ব থেকে তাকে যা আলাদা করে। সচেতন হওয়া, জানা— প্রকৃতির বিরুদ্ধে, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে মানুষের বহুযুগব্যাপী সভ্যতার বিরামহীন সংগ্রামের এই তো সারবস্তু।

মৃত্যুকে আমরা সবাই ভয় করি— ভয় করি আর ঘৃণা করি, জীবনের কোনো-না-কোনো সময়ে রাত্রির অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে মৃত্যুভয়ে বুকের রক্ত হিম হ'য়ে যায়নি, এ-কথা যে বলে সে হয় মূঢ় না হয় মিথ্যাবাদী। ইতিহাসে অবশ্য দেখা যায় যে সব দেশে এবং সব সময়ে, নিজের কি অন্যের হাতে, কোনো-না-কোনো উন্মত্ততার ঝোঁকে মানুষ ইচ্ছে ক'রে মরেছে: কিন্তু এতে শুধু এই প্রমাণ হয় যে ও-সব ক্ষেত্রে তখনকার মতো ভয় পরাভূত হয়েছিলো। ভয় ছিলো না, তা নয়; ভয় ছিলো, চিরকাল ছিলো— এবং থাকবে। যে-কোনো দেশের পুরাসাহিত্যে কোনো-না-কোনো রকম মৃতসঞ্জীবনীর উল্লেখ পাওয়া যাবে। কিন্তু মৃতদেহে কখনো প্রাণ ফিরে আসেনি; মৃত্যুর ধারণার সঙ্গে মানুষ নিজেকে কোনোরকমে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, কেননা প্রতিবাদ করা নিষ্ফল। সব মানুষই বিচ্ছিন্নভাবে, নিছক একটা তথ্য হিশেবে, এ-কথা মানে যে একদিন তার মৃত্যু হবে। কিন্তু মানুষ যা কখনো মেনে নিতে পারেনি, তা হচ্ছে তার চৈতন্যের বিলুপ্তি। মৃত্যুকে সে যে এত ভয় করে তা তার শরীর নষ্ট হ'য়ে যাবে ব'লে নয়, তার চৈতন্যের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে, সেই আশঙ্কায়। 'ঘুমকে তুমি রোজই আহ্বান করো, অথচ মৃত্যুকে ভয় পাও, ঘুমের বেশি যা কিছু নয়।…ঘুম, স্বপ্ন। কিন্তু সেই মৃত্যুর ঘুমে, কী স্বপ্ন?' পাছে মৃত্যুরূপী

ঘুমের স্বপ্ন জীবনের চেয়েও বেশি ভয়াবহ হয়, সেই ভয়ে হ্যামলেট আত্মহত্যা করলো না। কিন্তু আমরা যে মরতে ভয় পাই, তা দুঃস্বপ্নের জন্য নয়; পাছে মৃত্যুর ঘুমে কোনো স্বপ্নই না থাকে, সেই আশঙ্কায়। পাছে সেটা একেবারে পূর্ণচ্ছেদ হয়, চরম বিরতি, পাছে আমাদের চৈতন্যের কোনো প্রবহমানতা না থাকে সেখানে। পাছে এক মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে আমরা সর্বকালের মতো শেষ হ'য়ে যাই। নির্বাণ আমরা কামনা করি না, কল্পনা করতে পারি না। হ্যামলেট ভয় পেয়েছিলো, যদি কিছু থাকে: আমরা ভয় পাই, যদি কিছু না থাকে। যদি কেউ আমাদের এমন আশ্বাস দিতে পারে যে মৃত্যুর পরে আছে ভীষণ দুঃস্বপ্ন, নিশ্চিতরূপে আছে, তাহ'লেও আমরা কিছুটা যেন সান্ত্বনা পাই। কিন্তু যে-সন্দেহ আমাদের সব সময় হানা দেয়, এবং যা কিছুতেই সহ্য করা যায় না, তা হচ্ছে এই যে বোধহয় তাও নেই, কিছুই নেই, শুধু শূন্যতা। অথচ সেই শূন্যতা, সৃষ্টির আগে যা ছিলো, আত্মজ্ঞ ব্রহ্মা যা থেকে বিশ্বকে নিষ্কাশিত করেছিলেন, মানুষের তা ধারণার অতীত। মৃত্যুর পরেও কি তা-ই? আমরা কল্পনা করতে পারি না। আমাদের চেতনা মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই একেবারে নির্বাপিত হ'য়ে যাবে, মৃত্যুর পরে রূপান্তরিত হ'য়ে, অস্তিত্বের কোনো সূক্ষ্মতর স্তরে পরিবর্তিত হ'য়ে আমাদের সত্তাস্রোত অক্ষুণ্ণ রাখবে না, তা বিশ্বাস করা অসম্ভব না হোক দুঃসাধ্য। এর চেয়ে কষ্টকর চিন্তা মানুষের পক্ষে আর-কিছু নেই। দেহহীনতা হয়তো ধারণা করা যায় (যদিও রূপে অভ্যস্ত মানুষের পক্ষে তা সহজসাধ্য নয়—ঈশ্বরকে সে কল্পনা করেছে নিজের মূর্তিতে, এমনকি, প্রেতকেও দিয়েছে অতিরিক্তরকম মানবিক আকৃতি); কিন্তু মানুষের সত্তার যা সার, সেই চেতনা কখনো থাকবে না, এই চিন্তা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর। এবং সেই ভয়কে খণ্ডন করার জন্য তাকে কল্পনা করতে হয়েছে আত্মার অমরত্ব, পুনর্জন্ম, শেষ বিচারের দিনে মৃতের পুনরুত্থান। একটা আশ্বাস, যে-কোনো একটা আশ্বাস চাই। অমরত্ব··· ? হ্যাঁ, অমরত্ব আছে বইকি। টি. এইচ. হাক্সলি তাঁর 'শরীরতত্ত্বে' লিখেছিলেন: 'উদ্ভিদজগতের ভিতর দিয়ে ক্রিয়াশীল সূর্যের আলো (মৃতদেহস্থ) কার্বনিক অ্যাসিড, জল, অ্যামোনিয়া ও বিভিন্ন লবণের বিচ্ছিন্ন অণুগুলিকে শস্যদেহে নির্মিত ক'রে তোলে। সেই শস্য প্রাণীরা খায়, প্রাণীরা পরস্পরকে খায়, এবং মানুষ শস্য ও অন্যান্য প্রাণী দু-ই খায়। এইভাবে দেখতে গেলে এটা খুবই সম্ভব মনে হয় যে যে-সব অণু একদা জুলিয়স সীজারের ব্যস্ত মস্তিষ্কের অখণ্ড অংশ ছিলো, তা এখন আলাবামায় নিগ্রো সীজারের এবং

কোনো ইংরেজ গৃহের পোষা কুকুর সীজারের দেহসংগঠনে প্রবিষ্ট হয়েছে।' জড়বাদীর মতে এই হচ্ছে একমাত্র অমরত্ব, যে-কোনো মর জীব যার গর্ব করতে পারে; কিন্তু চৈতন্যবিলাসী মানুষের এতে সান্ত্বনা নেই, এদিকে ধর্মীয় প্রতিশ্রুতিতেও আধুনিক মানুষ আস্থা হারিয়েছে। তাই, পুরাকাল বা মধ্যযুগের তুলনায়, মৃত্যু-কল্পনা এখন অনেক বেশি ভয়াবহ। কোনো পূর্বযুগে—যতদিন পর্যন্ত বিশ্লেষণধর্মী বিজ্ঞান মানুষের চিন্তাকে অধিকার করেনি—লেখা হ'তে পারতো না টলস্টয়ের 'ইভান ইলীচের মৃত্যু'র মতো নিষ্ঠুর সত্যবাদী কাহিনী, যেখানে মানুষের মৃত্যুভয়কে যেন ছাল ছাড়িয়ে দেখানো হয়েছে—কাঁচা, নগ্ন, কম্পমান অবস্থায়। কিন্তু অন্তিম মুহূর্তে ইভান ইলীচ যে-'আলো' দেখতে পেয়েছিলো—যখন সে বলতে পেরেছিলো, 'মৃত্যু আর নেই'—সেটা কবিকল্পনা, না ইচ্ছাপূরণ, না কোনো সম্ভাব্য অভিজ্ঞতা, তা আমরা জানি না, এবং জানার কোনো উপায়ও নেই।

'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' (পরিমার্জিত)

উত্তরতিরিশ

আমি এখন আছি তিরিশ আর চল্লিশের মাঝামাঝি জায়গায়। সেখান থেকে তিরিশ যত দূরে, চল্লিশও প্রায় তা-ই। অবস্থাটাকে বলা যেতে পারে প্রৌঢ়ত্বের শৈশব। আমার জীবনে যৌবন যখন সদ্যোজাত, সেই রঙিন বছর-গুলিতে তিরিশের ধূসর দিগন্ত একটা অস্পষ্ট বিভীষিকার মতো বোধ হ'তো। ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের উদাহরণে উৎসাহিত হ'য়ে মনে-মনে এও প্রার্থনা করেছি যে ঐ শোচনীয় পরিণাম আসন্ন হবার পূর্বেই আমার জীবনের যেন অবসান হয়। খেয়ালি নিয়তি আমার সে-প্রার্থনা মঞ্জুর করেনি। ভাগ্যিশ করেনি!

আমাদের যে বয়স বাড়ছে তার অনুভূতি নিজের মধ্যে অনেক সময়ই স্পষ্ট হয় না। এই দেহটাকে অনেকদিন ধ'রে ভোগ করার মাশুলস্বরূপ মৃত্যুর নানা অগ্রদূত যতদিন না জানানি দিতে শুরু করে, ততদিন বয়োবৃদ্ধির অনস্বীকার্য ঘটনাকে প্রায় ভুলেই থাকি। বিশেষ ক'রে জীবনের মধ্যবয়সে চারদিকে কর্মের তরঙ্গ যখন উদ্বেল, তখন সে-দিকে মনোযোগ দেবার অবকাশ থাকে না। পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমণের একটি অনভিপ্রেত কিন্তু নিশ্চিত ফল এই যে আমার জন্মের তারিখটি প্রতি বছরেই ঘুরে-ঘুরে একবার এসে হাজির হবে; কিন্তু তার সম্বন্ধে বালকের আগ্রহ কিংবা চিরযৌবনলুব্ধা বিগতযৌবনার উৎকণ্ঠা কোনোটাই অনুভব করি না। জড়িয়ে ধরার মতো ক্ষণিকের প্রণয়ী অতিথিও নয়, এড়িয়ে যাবার মতো ভয়ংকরও নয় সে; সে যেন কোনো বাল্যবন্ধু, পঁচিশ বছর আগে যার সঙ্গে খুবই ভাব ছিলো, কিন্তু অধুনা যার সঙ্গে যোগসূত্র গেছে ছিন্ন হ'য়ে, এখন কদাচ রাস্তায় দেখা হ'লে একটু মাথা নেড়ে আপন কাজের তাড়নায় নির্দিষ্ট পথে ধাবিত হই। ওর বাৎসরিক আবির্ভাব যে যৌবনের চোর এবং জরা ও মৃত্যুর দেহদেশব্যাপ্ত পঞ্চমবাহিনী, সে-কথা তথ্য হিশেবে নির্ভুল ব'লে জানি, কিন্তু সত্য ব'লে অনুভব করি না।

তাই ব'লে এমনও নয় যে বয়স বাড়বার খবরটা আমরা একেবারেই ভুলে থাকতে পারি। মনে করিয়ে দেবার জন্য আছে বাইরের জগৎ। যেমন রেলগাড়ির ভিতরে ব'সে তার গতিটা উপলব্ধি করতে হ'লে তাকাতে হয় বাইরের বিপরীত-ধাবমান গাছপালার দিকে, তেমনি বহির্জগতের পরিবর্তনের

ছবি দেখেই আমরা অনুভব করতে পারি যে আমাদের বয়স বাড়ছে। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের যে-আন্তরিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে, প্রকৃতির যে-কোনো প্রক্রিয়ার মতোই তা এমন একটি ছন্দে বাঁধা যে তা সহজে অনুভূত হয় না; আমাদের পুত্রকন্যারা যে বড়ো হচ্ছে তা যেমন আমরা বুঝেও বুঝি না, তেমনি আমরা নিজেরাও যে বদলাচ্ছি তাও নিজের কাছে স্পষ্ট হ'তে-হ'তে অনেক-গুলো বছর কেটে যায়। মনে-মনে কেমন একটা ধারণা থাকে, এখনো সেই কলেজের ছাত্রই আছি বুঝি— এই তো সেদিন কম্পিত বক্ষে ম্যাট্রিকুলেশনের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছিলুম। স্মৃতির ভেলকিতে মাঝখানকার অনেকগুলো বছর ঝাপসা হ'য়ে আসে, জীবনের অতীতাংশ যতই বহরে বেড়ে চলে, ততই যেন কাছে চ'লে আসে দূরতর অতীত। বার্ধক্যে বাল্যস্মৃতিই হয় প্রিয়তম আলোচ্য। পূর্বজন্মের সংস্কার নিয়ে জীবন যখন অনায়াসে ব'য়ে চলছে, এমনি সময় একদিন দেখি সদ্য এম. এ. পাশ-করা ছেলেরা আমার কাছে এসে খুব সমীহ ক'রে কথা বলছে। সাহিত্যে যারা নবাগত তাদের নতচক্ষু বিনয় দেখে মুগ্ধ হ'য়ে যাই। আরো বেশি মুগ্ধ হই, যখন দেখি আমার বিরুদ্ধে তরুণতর লেখকদের রসনা ও লেখনীর উদ্যম। তখনই বুঝতে পারি, আমার বয়স হয়েছে। নবযুবকের দল যদি আমার বিরুদ্ধতা না-করতো, সেটা হ'তো প্রকৃতির বিরুদ্ধতা। পূর্ববর্তীকে এই আক্রমণ ওদের যৌবনের স্বাক্ষর, আর আমার আসন্ন প্রৌঢ়ত্বের অভিজ্ঞান।

এদিকে হয়তো একদিন দেখা হয় কোনো-একটি তরুণীর সঙ্গে— রীতিমতো ভদ্রমহিলা, বিবাহিতা, মাতা, সংসারের বিচিত্র বন্ধনে স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত। অবাক হ'য়ে খবর শুনি যে ইনি সেই বালিকা, যাকে কোনো-এককালে পাখির মতো গলায় 'হাসিখুশি' আওড়াতে শুনেছিলাম। সেই সঙ্গে দেখি কলেজের সহপাঠিনীকে, সংস্কৃতের অধ্যাপক যাকে ভুল ক'রে ডাকতেন বনশ্রী ব'লে, তার মুখে প্রৌঢ়তার রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারপর হঠাৎ একদিন বন্ধুকন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র আসে। সব মিলিয়ে আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে আমি বয়স্ক। আমাকে বয়স্ক না বানিয়ে ছাড়ে না। নিজের ভিতরের পরিবর্তন সহজে ধরা পড়ে না, কিন্তু বহির্জগতের এই পরিবর্তনের স্রোত বার-বার আমার মনের উপরে আঘাত ক'রে ব'লে যায়— বয়স বাড়ছে, বুড়ো হ'তে চলেছো। তার পৌনঃপুনিক পরামর্শকে শেষ পর্যন্ত আর অবজ্ঞা করতে পারি না, বয়স্কোচিত ধৈর্য ও গাম্ভীর্যের ভাব ধরি; আমি যে আর যুবক নই সে-কথা অনায়াসে মেনে নিই, এবং তার জন্য মনে কোনো দুঃখও হয় না।

অন্তত, আমার তো হয়নি। বরং যৌবনের ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে মধ্য বয়সের একাগ্রতায় যে পৌঁছতে পেরেছি, এতে আমি আনন্দিত।

আমার মনে হয় যৌবনকে নিয়ে কবিরা চিরকালই কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছেন। এত স্তব, এত স্তুতি, এত ছন্দ— সে কার উদ্দেশে? কত মুগ্ধ ভক্তের অর্ঘ্যনিবেদন শতাব্দীর স্রোত পার হ'য়ে এসে পড়ছে কায়িক যৌবনের একটি মনোহারিণী প্রতিমার পায়ে, যার রূপের অনেকখানি কবিকল্পনা থেকেই আহৃত। আর যেহেতু কবিরা বেশির ভাগই পুরুষ, সেই প্রতিমা নারীদেহেরই অবয়ব দিয়ে গড়া। তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে নারীদেহে যৌবনসমাগমের যে-ব্যঞ্জনাটি প্রাকৃতিক কারণেই সুনির্দিষ্ট, তারই বন্দনায় বিশ্বের কবিকুল মুখর। কবিদের পক্ষে খুব প্রশংসার কথা নয় এটা, কিন্তু কথাটা কি সত্য নয়?

তবে কবিদের সপক্ষেও বলার কথা আছে। যৌবনের যে-সংকীর্ণ সংজ্ঞা আমি দিয়েছি তা হয়তো তাঁরা সম্পূর্ণ মেনে নিতে রাজি হবেন না। তাঁরা হয়তো বলবেন: বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণশক্তি যেখানেই প্রকাশিত, সেখানেই আমাদের অভিনন্দন ধ্বনিত হয়; সূর্যোদয় আমাদের মুগ্ধ করে, সমুদ্র আমাদের রক্তে ঢেউ তোলে, বসন্তে সবুজ গাছটির দিকে তাকিয়ে চোখে আমাদের পলক পড়ে না। মানুষের দেহে যৌবনবিকাশও সেই প্রাণশক্তিরই একটি উচ্ছ্বাস, তাই সে এত সুন্দর; সে-উচ্ছ্বাসের আধার যখন হয় নারী তখন আমাদের সর্বদেহ-মনের ব্যাকুলতা দিয়ে যে তার ভজনা করি তার কারণ প্রাকৃত হ'লেও নিতান্তই জৈব নয়। কোনো বিশেষ-একটি মেয়ের দেহে যৌবনের আবির্ভাব একটা জীবতত্ত্বঘটিত তথ্য মাত্র, তা নিয়ে বিস্মিত বা উল্লসিত হবার কিছু নেই; কিন্তু বাসনার যে-বিপুল আলোড়ন সে নিজের অজান্তেই তার চারদিকে বিকীর্ণ করে, যে-মোহ সে ছড়ায়, যে-স্বপ্নে সে জড়ায়, তারই বন্দনা যুগে-যুগে যদি আমরা না করি, তবে আমরা কবি কিসের। যৌবনের ক্ষয় আছে, কিন্তু সেই মোহ তো চিরন্তন, সেই মোহই আমাদের অনন্তযৌবনা উর্বশী।

কবিদের এ-কথা মেনে নিয়েও বলা যায়-যে পৃথিবীর কাব্যে নিতান্ত শারীরিক যৌবনের বন্দনার পরিমাণও বড়ো কম নয়। বিশেষত, কবিরা নিজেরা যখন সন্তযৌবনাপন্ন, সেই সময়টায় যৌবনের তথ্যকেই সত্যরূপে চিত্রিত করার ঝোঁক প্রবল হ'য়ে ওঠে। শেক্সপীয়র কাঁচা বয়সে 'ভিনাস অ্যাণ্ড অ্যাডনিস' লিখে-ছিলেন। যৌবনই প্রাণীজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতার সময়, এই ধারণাটি নানা ভাষার কাব্যে বার-বার ফিরে-ফিরে এসেছে। প্রৌঢ়ত্বের কাছাকাছি এসে

হারানো যৌবনের জন্য বিলাপ করেছেন অনেক কবি— 'When we *were* young! Ah, woeful when!' রবীন্দ্রনাথও করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপের সঙ্গে একটি সূক্ষ্ম হাস্যের চকিত আভা ধরা পড়ে; যৌবন চ'লে যাচ্ছে তা ঠিক, কিন্তু আমি জানি ও যাবার নয়— তাঁর ভাবখানা যেন এই রকম। তাঁর যৌবন-বিদায় যেন তাঁরই বর্ণিত প্রেমিকের বিদায়ের মতো—

ভাবচ তুমি মনে মনে
এ লোকটি নয় যাবার,
দ্বারের কাছে ঘুরে ঘুরে
ফিরে আসবে আবার—

ওতে অনেকখানি ছল আছে। এ যেন সদর দরজায় বন্ধুকে বিদায় দিয়ে খিড়কির দোর দিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনা— তাই করুণ বিদায়-বাণী বলতে গিয়েও মুখের হাসি চাপা থাকছে না। এইজন্য 'ক্ষণিকা'তে হাসি-কান্নার এই বিচিত্র বিজড়িত লীলা, এইজন্য পঞ্চাশোর্ধ্বে 'বলাকা'র যৌবন-বন্দনা। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই যৌবনের তথ্যকে বড়ো ক'রে দেখেননি, তার সত্যকেই দেখেছিলেন— সে-কথা স্পষ্ট বলা আছে 'চিত্রাঙ্গদা'য়; তাঁর সাধনা যৌবনের আয়ুর উদ্দেশে নয়, তার আত্মার উদ্দেশে, এবং সে-সাধনায়, আমরা সকলেই জানি, কী অসামান্য তাঁর সিদ্ধি।

তবে যৌবনের যেটা নিতান্ত দৈহিক দিক, তার নুন আমরা সকলেই কোনো-না-কোনো সময়ে খেয়ে থাকি, অতএব তার গুণ গাইবার লোক কোনোকালেই বিরল হয় না। তার আবির্ভাব দেহে-মনে এমন একটি জন্মান্তরকারী বিপ্লব আনে, যার অভিঘাতে কবিতার জন্ম অনিবার্য। আমি শুধু বলতে চাই যে ঐ অবস্থাটাকে কবিতায় যতটা সুখের ব'লে বর্ণনা করা হয় আসলে তা তত সুখের হয় না— অনেকের পক্ষেই হয় না। নবযৌবনের অকারণ পুলকের সঙ্গে অনেকখানি অনর্থক দুঃখও জড়িত থাকে, যাদের স্বভাব কল্পনা-প্রবণ তাদের পক্ষে সে-দুঃখ দুঃসহ হ'য়ে উঠতে পারে। একদিকে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, অন্যদিকে চারদিকের পাথরের দেয়ালে নির্ঝরের কপাল ঠুকে মরা। একদিকে আশ্চর্য জাগরণ, বিশ্বজগতের সঙ্গে সচেতন মনের প্রথম রোমাঞ্চকর পরিচয়, অন্য দিকে নিরন্তর আত্ম-নিপীড়ন, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংগতিস্থাপনের অক্ষমতাজনিত যন্ত্রণাভোগ। এক হিশেবে ষোলো বছরের ছেলের মতো দুঃখী আর নেই; তার নবজাগ্রত, বিনিদ্র আত্মচেতনা তাকে এক মুহূর্তের শান্তি

দেয় না; সে আর ছোটো নেই, পুরোপুরি বড়োও সে হয়নি এখনো; তার চালচলন, হাবভাব, কথাবার্তা সবই কেমন খাপছাড়া: সামাজিক পরিবেশে সে অত্যন্ত অসংগত, এবং সে নিজেও তা জানে। তাতে তার দুঃখ বাড়ে বই কমে না। মনে-মনে তার ধারণা যে পৃথিবীটাকে বদলে দেবার জন্যই সে এসেছে, কিন্তু তার ইচ্ছেমতো পৃথিবীর একচুল বদল হচ্ছে না, সব দিকেই বয়স্কদের পাষাণ-রাজত্ব অটুট থেকে যাচ্ছে; এমনকি বাস্তব জীবনে সে নিজেও তার আদর্শকে সব সময় অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছে না, প্রায়ই ঘটছে স্খলন-পতন, এবং এ নিয়ে তার মনে একটি বিক্ষোভের তোলপাড় অবিশ্রান্ত চলেছে। শুধু তা-ই নয়, তার এই দুঃখে সে নিতান্ত নিঃসঙ্গ, কারণ দুঃখটা যে তার ঠিক কী নিয়ে, তা ধারণা করার মতো পরিণত চিন্তাশক্তি তার নেই, তার উপর মুখের কথায় মনের ভাব প্রকাশ করার কৌশলও সে শেখেনি। তাই ঠিক তার মনের কথাটি কাউকেই সে বলতে পারে না— খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও না— বোবা দুঃখের বোঝা অসহায়ভাবে তাকে ব'য়ে বেড়াতে হয়। যে-সব উপলক্ষে তার দুঃখের অনুভূতি প্রবল হ'য়ে ওঠে সেগুলি প্রায়ই তুচ্ছ— পরবর্তী জীবনে যে-সব স্মরণ ক'রে হয়তো তার হাসি পায়— কিংবা পায় না। যাঁরা একেবারেই পাকা ছিশেবিয়ানার উচ্চচূড়ায় অধিরূঢ় না হন তাঁদের পক্ষে হাসি না-পাওয়াই স্বাভাবিক, কারণ উপলক্ষটা যা-ই হোক, দুঃখটা তো বাস্তব, সেটাকে অস্বীকার করা যায় না। শিশু তার পুতুলের পা ভাঙলে কাঁদে, আমাদের চোখে কারণটা অতি তুচ্ছ; কিন্তু তাই ব'লে তার দুঃখটা অবাস্তব নয়। সে-দুঃখের স্থায়িত্ব হয়তো অল্প, কিন্তু তীব্রতা অসাধারণ। শেলির বিষয়ে লিখতে গিয়ে ফ্রান্সিস টমসন ঠিকই বলেছিলেন যে শিশুর দুঃখ যেমন ছোটো, শিশুও তো তেমনি। ছোটো মানুষের পক্ষে ছোটো দুঃখই দুঃসহ। কথাটা এত সত্য যে বলবার যোগ্যই হ'তো না, যদি-না দেখা যেতো যে ব্যবহারিক জীবনে আমরা প্রায়ই এটা ভুলে থাকি।

নবযৌবনের এই যে ছবি আমি আঁকলুম তা সকল বয়স্কজনের স্মৃতির সঙ্গে মিলবে কিনা জানি না। আমি অবশ্য আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। হয়তো আমি অত্যন্ত বেশি ভাবপ্রবণ ছিলুম ব'লে অত্যন্ত বেশি কষ্ট পেয়েছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমার বয়স যখন আঠারোর পাড়ায়, আমি মনে-মনে এ-প্রার্থনাও জানিয়েছি— ঈশ্বর, আমাকে খুব শিগগির বুড়ো ক'রে দাও, তাহ'লে বাঁচি। এই প্রার্থনায় আন্তরিকতার অভাব ছিলো না, কেননা চারদিকে তাকিয়ে

দেখেছি বয়স্কদের প্রশান্ত নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা; তারা খায় দায়, আপিশ করে, ঘুমোয়, কিছু নিয়ে ছটফট করে না— এদিকে আমি কত কিছু নিয়েই দিনরাত জ্ব'লে-পুড়ে মরছি। সে-বয়সেও এটা বুঝেছিলাম যে আমার অতি-তারুণ্যই এই যন্ত্রণাভোগের হেতু, বুড়োদের যতই না মুখে ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছি, মনে-মনে তাদের ঈর্ষা না-ক'রেও পারিনি। আমার সেই কাঁচা বয়সের মন ছিলো এত বেশি অনুভূতিশীল যে সেটা প্রায় একটা ব্যাধির মতো, যে-কোনো দিক থেকে একটুখানি হাওয়া দিলেই আমি উদ্দাম হ'য়ে উঠতাম, নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতে নিজেকে এক-এক সময় মনে হ'তো ঝড়ের ঝাপট-খাওয়া ক্ষত-বিক্ষত নৌকোর মতো।

এতদিনে যৌবনের উত্তালতা পার হ'য়ে এসেছি, শান্ত দিগন্ত দেখা যাচ্ছে চোখের সামনে। যদি দেবতা এসে বর দিতে চান— তোমাকে আবার আঠারো বছরের যুবা ক'রে দিচ্ছি, আমি হাত জোড় ক'রে বলবো, দোহাই, প্রভু, তোমার বর ফিরিয়ে নাও। আঠারো বছর বয়স হবার দুঃখ একবার যে পেয়েছে, সে কি আবার সেখানে ফিরে যেতে চাইবে! অনেকে বলেন, আহা, শিশুরা কী সুখী! যদি আবার শিশু হ'তে পারতুম! কথাটা চিন্তা ক'রে বলেন না। শিশুর মন সচেতন নয়; তার কল্পনা আছে, চিন্তা নেই; তাই তার সুখদুঃখ কুয়াশার মতো ব্যাপ্ত কিন্তু অনবয়ব; আর বয়স্কদের শাসনে শিশুর জীবন এমন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িত যে আমার তো মনে হয় তার জীবনে দুঃখের ভাগই বেশি। কোনোরকমে যে একবার সাবালক হ'য়ে উঠতে পেরেছে, সে যে কী ক'রে আবার শৈশবে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে, আমার তা কল্পনার অতীত। ঠিক তেমনি অবিশ্বাস্য মনে হয় যখন কোনো বয়স্ক লোক তারুণ্যের উন্মত্ততায় আরো একবার ঝাঁপ দিতে চায়।

এটা ভালোই যে আমার জীবনে তারুণ্যের উন্মাদনা শেষ হ'লো, বছরগুলোর উপহারস্বরূপ পেলাম কিছুটা স্থৈর্য ও ভারসাম্য। যে-কোনো ক্ষণিক আকস্মিক হাওয়ায় আর আন্দোলিত হ'তে হয় না আমাকে। একটি মুহূর্তের একটি অনুভূতি আর মনকে কানে ধ'রে নাচিয়ে বেড়াতে পারে না। যখন-তখন যে-কোনো কারণে বা অকারণে চিত্তবিক্ষেপ ঘটে না, হাতের কাজে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হ'তে পারি, এদিকে অবকাশসম্ভোগের আনন্দকেও খামকা মন-খারাপের হাওয়া এসে মলিন করতে পারে না। রাগ চাপতে শিখেছি, শিখেছি উদ্ধত অভিমানকে এক চড়ে দাবিয়ে দিতে, ফুটো কলসি থেকে জলের মতো ভালোবাসা আর যেখানে-

সেখানে ঝরঝর ক'রে ঝ'রে পড়ে না। তুচ্ছকে তুচ্ছ ব'লে অবজ্ঞা করার শক্তি পেয়েছি। জীবনে দুঃখের ভাগ আশ্চর্যরকম ক'মে গিয়েছে। সেই সঙ্গে সুখও কমেছে কি? না তো।

আমার বিশ্বাস জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবন নয়, জীবনের মাঝামাঝি অবস্থাটাই সবচেয়ে ভালো। আমি নিজে আপাতত ঐ অবস্থায় এসে পড়েছি ব'লেই যে তার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করছি, তা নয়; শুনতে পাই বর্তমানকে অবজ্ঞা ক'রে অতীতের অতিরঞ্জিত স্তাবকতা করাই মনুষ্য-স্বভাব। তার উপর জীবন যখন মধ্যদিনে, তখন ভোরবেলার সোনালি আলোর জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলাই সাহিত্যের ঐতিহ্যসংগত। কিন্তু আসলে হয়তো এই সময়টাতেই জীবন হয় সবচেয়ে উপভোগ্য, অন্তত আমার তো তা-ই বোধ হচ্ছে। দেহের ও মনের, ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির পরিপূর্ণ শক্তির আমি এখন অধিকারী, জরার আভাসমাত্র পাওয়া যাচ্ছে না; অথচ সে-শক্তি যেখানে-সেখানে ডন কিহোটীয় চালে অন্ধ বেগে ধাবিত হচ্ছে না, তাকে সংহত রেখে তার যথাসম্ভব সুমিত প্রয়োগের বিদ্যা আমার শেখা হয়েছে। কাঁচা বয়সে জীবন ছিলো গুরুজনের শৃঙ্খলে বাঁধা; এখন আমি স্বাধীন, নিজের জীবিকা একান্তরূপে নিজেই উপার্জন করি, আমার উপর কথা বলার কেউ নেই। স্বোপার্জিত অন্নের প্রথম স্বাদ আমার মনে এনেছিলো এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, সে-রোমাঞ্চ এতদিনের অভ্যাসের চাপেও একেবারে নষ্ট হয়নি। জীবিকা-অর্জনের যে-পরিশ্রম ও বিরক্তি সেটা কখনোই যে নিপীড়ক ব'লে বোধ হয় না তা বলবো না, কিন্তু মোটের উপর ওটা নিয়ে আমি আপত্তি করি না, তার বিনিময়ে যে-স্বাধীনতা পেয়েছি তাতে ক্ষতিপূরণ হ'য়েও অনেকখানি উদ্বৃত্ত থাকে। তার উপর, আমি বিশেষভাবে ভাগ্যবান, কারণ আমার জীবিকার কিছু অংশ আমার আনন্দের সঙ্গে মিলিত; আমাকে যে সব সময়ই নিরানন্দ ও অপ্রিয় কাজ করতে হয় না এ-জন্য নামহীন অদৃষ্টের কাছে আমি কৃতজ্ঞ আছি।

তরুণ বয়সে মনে-মনে ভয় ছিলো যে প্রৌঢ়ত্বের প্রভাবে আমারও হৃদয়বৃত্তি হয়তো নিঃসাড় হ'য়ে আসবে। কিন্তু এখন দেখছি যে তা হ'লো না। বিশ্ব-জগতের সঙ্গে এখন আমার কী সম্বন্ধ, সেটা স্পষ্ট ক'রে বোঝার যখন চেষ্টা করি, তখন দেখতে পাই যে নবযৌবনের শক্তি তার অনুভূতিশীলতায়, আর দুর্বলতা তার ভারসাম্যের, মাত্রাজ্ঞানের অভাবে। আর পরিণত বয়সের শক্তি তার সংযমে ও বিচারবুদ্ধিতে, দুর্বলতা তার হৃদয়বৃত্তি ও উৎসাহের ক্ষীণতায়। কিন্তু

এমন একটা অবস্থা নিশ্চয়ই আছে যখন উভয় শক্তির মিলন ঘটে, নয়তো পৃথিবীতে এত বড়ো-বড়ো কর্ম সম্পন্ন হ'তে পারতো না। সেটাই মধ্যবয়স।

দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবী সম্বন্ধে আমার কৌতূহল ও আনন্দবোধে এখনো মরচে পড়ার লক্ষণ নেই। অশিথিল উৎসাহ নানা কর্মস্রোতে ব'য়ে চলছে। কাঁচা বয়সের অনুভূতির প্রবলতা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তার প্রয়োগবিদ্যা তখনও অনায়ত্ত, তাই ও-বয়সে ভালো কবিতা লেখা সম্ভব হ'লেও অন্য কোনো দিকে কাজের মতো কাজ প্রায় কিছুই হ'য়ে ওঠে না। নবযৌবনের ব্যর্থতা প্রকৃতিরই নির্দেশ, অনেকখানি অপব্যয় না-ক'রে প্রকৃতি কিছুই গড়তে পারে না; মানুষের দেহ যেমন বহু শতাব্দীব্যাপী বিবর্তনের ফল, তেমনি শৈশব-যৌবনের বিস্তর বাজে খরচের ফলেই মানুষের পরিণত মন গ'ড়ে ওঠে। এখন আমার অনুভূতির সঙ্গে মিলেছে পর্যবেক্ষণ; উৎসাহের উচ্ছলতা বুদ্ধির শাসনকে অঙ্গীকার ক'রে নিয়েছে; প্রতিদিনের হাতে এই শিক্ষাই আমি পাচ্ছি কেমন ক'রে মনের সচেতনতা ও হৃদয়ের সংবেদনাকে যৌথভাবে প্রয়োগ করতে হয়— আর এখানেই নবযুবকের উপর আমার জিৎ। বিশ্বপ্রকৃতিকে যেন এইমাত্র প্রথম দেখলুম, নবযৌবনে এই আনন্দ অস্পষ্ট ভাব-নীহারিকার আকারে মনের আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে রাখে; সে-আনন্দ অনেকটা নিপীড়নের মতো, তার বিদ্যুৎময় স্পর্শ প্রায় নিশ্বাস কেড়ে নেয়। কিন্তু এখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার যে-সংযোগ, সেটা শুধুমাত্র একটা ভাব আর নয়, সেটা একটা রূপও বটে; তাকে শুধু অনুভবই করি না, চোখেও দেখি। এই দেখার পটভূমিকায় আছে অতীত জীবনের সঞ্চিত অচেতন অভিজ্ঞতা; তারই আলোয় বস্তু স্পষ্ট আকার নেয়, যা ছিলো হাওয়া তা হ'য়ে উঠে ছবি। অল্প বয়সের বাষ্পাকুল মন কিছুই ছাখে না, শুধু অনুভব করে— তাই তার আনন্দের মধ্যে দুঃখের পরিমাপ এত বৃহৎ।

সেই ভাববিহ্বল তারুণ্যের লীলা আজ আমার আশে-পাশে চোখ মেলে দেখছি, আর মনে-মনে হাসছি। সে-হাসি ঈর্ষার নয়, করুণার নয়, ব্যঙ্গেরও নয়, সে-হাসি সস্নেহ। ওর মধ্যে আমারই অতীতের ছবি দেখতে পাচ্ছি, ওখানে চলেছে আমারই পুনর্জন্ম, এদিকে আমি নির্লিপ্ত হ'য়ে কোণের আসনটিতে ব'সে দেখছি। এর চেয়ে উপভোগ্য অবস্থা আর কী হ'তে পারে? এই অবস্থায় আরো কুড়ি বছর হয়তো কাটাতে পারবো, এমন আশা করা হয়তো অন্যায় হয় না। আরো কুড়ি বছর! ভাবতে পারি না এই কুড়ি বছরে আরো কী ঘটবে, আরো কী

অভিজ্ঞতা আমার জন্য অপেক্ষা করছে জানি না, কিন্তু আপাতত আমি আমার এই সদ্য-আগত মধ্যজীবনকে সম্ভাষণ জানাই, সানন্দে তাকে বরণ করি; সে আমাকে পূর্ণ করেছে, আশা করি আমিও তাকে কিছু ফিরিয়ে দিতে পারবো। আপাতত আমার নতুন-পাওয়া শিশু-বয়স্কতার গৌরবে শীতের এই সকালবেলার রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে আমি বসলুম—জীবনের স্রোত চোখের উপর দিয়ে ব'য়ে যাক, আমি চুপ ক'রে দেখি।

'উত্তরতিরিশ' (পরিমার্জিত)

আড্ডা

পণ্ডিত নই, কথাটার উৎপত্তি জানি না। আওয়াজটা অ-সংস্কৃত, মুসলমানি। যদি ওকে হিন্দু ক'রে বলি সভা, তাহ'লে ওর কিছুই থাকে না। যদি ইংরেজি ক'রে বলি পার্টি, তাহ'লে ও প্রাণে মরে। মীটিঙের কাপড় খাকি কিংবা খাদি; পার্টির কাপড় ফ্যাশন-দুরস্ত কিন্তু ইস্ত্রি বড়ো কড়া; সভা শুভ্র, শোভন ও আরামহীন। ফরাশি সালঁর অস্তিত্ব এখনো আছে কিনা জানি না, বর্ণনা প'ড়ে বড্ড বেশি জমকালো মনে হয়। আড্ডার ঠিক প্রতিশব্দটি পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষাতেই আছে কি? ভাষাবিদ না-হ'য়েও বলতে পারি, নেই; কারণ আড্ডার মেজাজ নেই অন্য কোনো দেশে, কিংবা মেজাজ থাকলেও যথোচিত পরিবেশ নেই। অন্যান্য দেশের লোক বক্তৃতা দেয়, রসিকতা করে, তর্ক চালায়, ফূর্তি ক'রে রাত কাটিয়ে দেয়, কিন্তু আড্ডা দেয় না। অত্যন্ত হাসি পায় যখন শুভানুধ্যায়ী ইংরেজ আমাদের করুণা ক'রে বলে—আহা বেচারা, ক্লাব কাকে বলে ওরা জানে না! আড্ডা যাদের আছে, ক্লাব দিয়ে তারা করবে কী? আমাদের ক্লাবের প্রচেষ্টা কলের পুতুলের হাত-পা নাড়ার মতো, ওতে আবয়বিক সম্পূর্ণতা আছে, প্রাণের স্পন্দন নেই। যারা আড্ডাদেনেওলা জাত, তারা যে ঘর ভাড়া নিয়ে, চিঠির কাগজ ছাপিয়ে, চাকরদের চাপরাশ পরিয়ে ক্লাবের পত্তন করে, এর চেয়ে হাস্যকর এবং শোচনীয় আর-কিছু আছে কিনা জানি না।

আড্ডা জিনিশটা সর্বভারতীয়, কিন্তু বাংলাদেশের সজল বাতাসেই তার পূর্ণবিকাশ। আমাদের ঋতুগুলি যেমন কবিতা জাগায়, তেমনি আড্ডাও জমায়। আমাদের চৈত্রসন্ধ্যা, বর্ষার সন্ধ্যা, শরতের জ্যোৎস্না-ঢালা রাত্রি, শীতের মধুর উজ্জ্বল সকাল—সবই আড্ডার নীরব ঘণ্টা বাজিয়ে যায়, কেউ শুনতে পায়, কেউ পায় না। যে-সব দেশে শীত-গ্রীষ্ম দু-ই অতি তীব্র, বা বছরের ছ-মাস জুড়েই শীতকাল রাজত্ব করে, সেগুলো আড্ডার পক্ষে ঠিক অনুকূল নয়। বাংলার কমনীয় আবহাওয়ায় যেমন গাছপালার ঘনতা, তেমনি আড্ডার উচ্ছ্বাসও স্বাভাবিক। ছেলেবেলা থেকে এই আড্ডার প্রেমে আমি ম'জে আছি। সভায় যেতে আমার বুক কাঁপে, পার্টির নামে দৌড়ে পালাই, কিন্তু আড্ডা! ও না-হ'লে আমি বাঁচি না। বলতে গেলে ওরই হাতে আমি মানুষ। বই প'ড়ে

যা শিখেছি তার চেয়ে বেশি শিখেছি আড্ডা দিয়ে। বিশ্ববিদ্যাবৃক্ষের উচ্চশাখা থেকে আপাতরমণীয় ফলগুলি একটু সহজেই পেড়েছিলুম— সেটা আড্ডারই উপহার। আমার সাহিত্যরচনায় প্রধান নির্ভররূপেও আড্ডাকে বরণ করি। ছেলেবেলায় গুরুজনেরা আশঙ্কা করেছিলেন যে আড্ডায় আমার সর্বনাশ হবে, এখন দেখছি ওতে আমার সর্বলাভ হ'লো। তাই শুধু উপাসক হ'য়ে আমার তৃপ্তি নেই, পুরোহিত হ'য়ে তার মহিমা প্রচার করতে বসেছি।

যে কাপড় আমি ভালোবাসি আড্ডার ঠিক সেই কাপড়। ফর্শা, কিন্তু অত্যন্ত বেশি ফর্শা নয়, অনেকটা ঢোলা, প্রয়োজন পার হ'য়েও খানিকটা বাহুল্য আছে, স্পর্শকোমল, নমনীয়। গায়ে কোথাও কড়কড় করে না, হাত-পা ছড়াতে হ'লে বাধা দেয় না, লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়তে চাইলে তাতেও মানা নেই। অথচ তা মলিন নয়, তাতে মাছের ঝোল কিংবা পানের পিক লাগেনি; কিংবা দাওয়ায় ব'সে গা-খোলা জটলার বেআব্রু শৈথিল্য তাকে কুঁচকে দেয়নি। তাতে আরাম আছে, অযত্ন নেই; তার স্বাচ্ছন্দ্য ছন্দোহীনতার নামান্তর নয়।

শুনতে মনে হয় যে ইচ্ছে করলেই আড্ডা দেয়া যায়। কিন্তু তার আত্মা বড়ো কোমল, বড়ো খামখেয়ালি তার মেজাজ, অতি সূক্ষ্ম কারণেই উপকরণের অবয়ব ত্যাগ ক'রে সে এমন অলক্ষ্যে উরে যায় যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু বোঝাই যায় না। আড্ডা দিতে গিয়ে প্রায়ই আমরা পরাবিদ্যার— মানে পড়া-বিদ্যার আসর জমাই, আর নয়তো পরচর্চার চণ্ডীমণ্ডপ গ'ড়ে তুলি। হয়তো স্থির করলুম যে সপ্তাহে একদিন কি মাসে দু-দিন সাহিত্যসভা ডাকবো, তাতে জ্ঞানী-গুণীরা আসবেন, এবং নানা রকম সদালাপ হবে। পরিকল্পনাটি মনোরম তাতে সন্দেহ নেই; প্রথম কয়েকটি অধিবেশন এমন জমলো যে নিজেরাই অবাক হ'য়ে গেলাম, কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেলো যে সেটি আড্ডার স্বর্গ থেকে চ্যুত হ'য়ে কর্তব্যপালনের বন্ধ্যা জমিতে পতিত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থলে যাওয়ার মতো নির্দিষ্ট দিনে যেখানে যেতে হয়, তাকে, আর যা-ই হোক, আড্ডা বলা যায় না। কেননা আড্ডার প্রথম নিয়ম এই যে তার কোনো নিয়মই নেই; সেটা যে অনিয়মিত, অসাময়িক, অনায়োজিত, সে-বিষয়ে সচেতন হ'লেও চলবে না। ও যেন বেড়াতে যাবার জায়গা নয়, ও যেন বাড়ি; কাজের শেষে সেখানেই ফিরবো, এবং কাজ পালিয়ে যখন-তখন এসে পড়লেও কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না।

তাই ব'লে এমন নয় যে এলোমেলোভাবেই আড্ডা গ'ড়ে ওঠে। নিজে

অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে তার পিছনে কোনো-একজনের প্রচ্ছন্ন কিন্তু প্রখর রচনাশক্তি চাই। অনেকগুলি শর্ত পূরণ হ'লে তবে কতিপয় ব্যক্তির সমাবেশ হ'য়ে ওঠে সত্যিকার আড্ডা— ক্লাব নয়, পার্টি নয়, সভা কিংবা সমিতি নয়। একে-একে সেগুলি পেশ করছি।

আড্ডায় সকলেরই মর্যাদা সমান হওয়া চাই। ব্যবহারিক জীবনে মানুষে-মানুষে নানা রকম প্রভেদ অনিবার্য, কিন্তু সেই ভেদবুদ্ধি আপিশের কাপড়ে সঙ্গে-সঙ্গেই যারা ঝেড়ে ফেলতে না জানে, আড্ডার স্বাদ তারা কোনোদিন পাবে না। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি এতই বড়ো যে তাঁর মহিমা কখনো ভুলে থাকা যায় না, তাঁর পায়ের কাছে আমরা ভক্তের মতো বসবো, কিন্তু আমাদের আনন্দে তাঁর নিমন্ত্রণ নেই, কেননা তাঁর দৃষ্টিপাতেই আড্ডার ঝর্নাধারা তুষার হ'য়ে জ'মে যাবে। আবার অন্যদের তুলনায় অনেকখানি নিচুতে যার মনের সুর, তাকেও বাইরে না-রাখলে কোনো পক্ষেই সুবিচার হবে না। আড্ডায় লোক-সংখ্যার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে; ঊর্ধ্বসংখ্যা দশ কি বারো, নিম্নতম তিন। দশ-বারোজনের বেশি হ'লে অ্যালবার্ট হল হ'য়ে ওঠে, কিংবা বিয়ে-বাড়িও হ'তে পারে; আর যদি হয় ঠিক দু-জন তাহ'লে তার সঙ্গে কূজনই মিলবে— পদ্যেও, জীবনেও। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে স্বভাবের উপর-তলায় বৈচিত্র্য থাকা চাই, কিন্তু নিচের তলায় মিল না-থাকলে পদে-পদে ছন্দপতন ঘটবে। অনুরাগ এবং পারস্পরিক জ্ঞাতিত্ববোধ স্বতই যাদের কাছে টানে, আড্ডা তাদেরই জন্য, এবং তাদেরই মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত; চেষ্টা ক'রে সংখ্যা বাড়াতে গেলে আড্ডার প্রাণপাখি কখন উড়ে পালাবে কেউ জানতেও পাবে না।

কিন্তু এমনও নয় যে ঐ ক-জন এক-সুরে-বাঁধা মানুষ একত্র হ'লেই আড্ডা জ'মে উঠবে। জায়গাটিও অনুকূল হওয়া চাই। আড্ডার জন্য ঘর ভাড়া করা আর শোক করার জন্য কাঁদুনে ভাড়া করা একই কথা। অধিগম্য বাড়িগুলির মধ্যে যেটির আবহাওয়া সবচেয়ে অনুকূল, সেই বাড়িই হবে আড্ডার প্রধান পীঠস্থান। সেই সঙ্গে একটি-দুটি পারিপার্শ্বিক তীর্থ থাকাও ভালো, মাঝে-মাঝে জায়গা-বদল করাটা মনের ফলকে শান দেয়ার শামিল; ঋতুর বৈচিত্র্য এবং চাঁদের ভাঙা-গড়া অনুসারে ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে ছাতে, এবং ছাত থেকে খোলা মাঠে বদলি হ'লে সেই সম্পূর্ণতা লাভ করা যায়, যা প্রকৃতিরই আপন হাতের সৃষ্টি। কিন্তু কোনো কারণেই, কোনো প্রলোভনেই ভুল-জায়গায় যেন

যাওয়া না হয়। ভুল জায়গায় মানুষগুলোকেও ভুল মনে হয়, ঠিক সুরটি কিছুতেই লাগে না।

আড্ডার জায়গাটিতে আরাম থাকবে পুরোপুরি, আড়ম্বর থাকবে না। আসবাব হবে নিচু, নরম, অত্যন্ত বেশি ঝকঝকে নয়; মরজি-মতো অযথাস্থানে সরিয়ে নেবার আন্দাজ হালকা হ'লে তো কথাই নেই। চেয়ার-টেবিলের কাছাকাছি একটা ফরাশ গোছেরও কিছু থাকা ভালো— যদি রাত বেড়ে যায়, কিংবা কেউ ক্লান্ত বোধ করে, তাহ'লে শুয়ে পড়ার জন্য কারো অনুমতি নিতে হবে না। পানীয় থাকবে কাচের গেলাশে ঠাণ্ডা জল, আর পাৎলা শাদা পেয়ালায় সোনালি সুগন্ধি চা; আর খাদ্য যদি কিছু থাকে তা হবে স্বাদু, স্বল্প এবং শুকনো, যেন ইচ্ছেমতো মাঝে-মাঝে তুলে নিয়ে খাওয়া যায়, আর খাবার পরে হাত-মুখ ধোবার জন্য উঠতেও হয় না। বাসনগুলো হবে পরিচ্ছন্ন— জমকালো নয়; এবং ভৃত্যদের ছুটি দিয়ে গৃহকর্ত্রী নিজেই যদি খাদ্যপানীয় নিয়ে আসেন এবং বিতরণ করেন তাহ'লেই আড্ডার যথার্থ মানরক্ষা হয়।

কথাবার্তা চলবে মসৃণ, স্বচ্ছন্দ স্রোতে, তার জন্য কোনো চেষ্টা কি চিন্তা থাকবে না; যে-সব ভাবনা ও খেয়াল, সংশয় ও প্রশ্ন মনের মধ্যে সব সময় উঠছে পড়ছে— কেজো দিনের শাসনের তলায় যা চাপা প'ড়ে থাকে, এবং যার অনেকটা অংশই হয়তো আকস্মিক কিন্তু তাই ব'লে অর্থহীন নয়, তারই মুক্তি-পাওয়া ছলছলানি যেন কথাগুলো। এখানে সংকোচ নেই, বিষয়-বুদ্ধি নেই, দায়িত্ববোধ নেই। ভালো কথা বলার দায় নেই এখানে। ভালো কথা না আসে, এমনি কথাই বলবো; এমনি কথারও যদি খেই হারিয়ে যায়, মাঝে-মাঝে চুপ ক'রে থাকতে ভয় কিসের। মুহূর্তের জন্যও চুপ ক'রে থাকাকে যাঁরা বুদ্ধির পরাভব কিংবা সৌজন্যের ক্রটি ব'লে মনে করেন, আড্ডা জিনিশটা তাঁরা বোঝেন না। তার্কিক এবং পেশাদার হাস্যরসিক, আড্ডায় এই দুই শ্রেণীর মানুষের প্রবেশ নিষেধ। যাঁরা প্রাজ্ঞজন, কিংবা যাঁরা লোকহিতে বদ্ধপরিকর, তাঁদেরও সসম্মানে বাইরে রাখতে হবে। কেননা আড্ডার ইডেন থেকে যে-সূক্ষ্ম সর্প বার-বার আমাদের ভ্রষ্ট করে, তারই নাম উদ্দেশ্য। যত মহৎই হোক, কিংবা যত তুচ্ছই হোক, কোনো উদ্দেশ্যকে ভ্রমক্রমেও কখনো ঢুকতে দিতে নেই। আড্ডার মধ্যে তাসপাশার আমদানি যেমন মারাত্মক, তেমনি ক্ষতিকর তার বারা কোনো জ্ঞানলাভের সচেতন চেষ্টা। ধ'রে নিতে হবে যে আড্ডা কোনো উদ্দেশ্যসাধনের উপায় নয়, তা থেকে কোনো কাজ হবে না, নিজের কিংবা

অন্যের কিছুমাত্র উপকার হবে না। আড্ডা বিশুদ্ধ ও নিষ্কাম, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। তা যদি নিজেরই জন্য আনন্দদায়ক না-হ'তে পারে তাহ'লে তার অস্তিত্বেরই অর্থ নেই।

শুধু পুরুষদের নিয়ে, কিংবা শুধু মেয়েদের নিয়ে, আড্ডা জমে না। শুধু পুরুষরা একত্র হ'লে কথার গাড়ি শেষ পর্যন্ত কাজের লাইন ধ'রেই চলবে; আবার কখনো লাইন থেকে চ্যুত হ'লে গড়াতে-গড়াতে সুরুচির সীমাও পেরিয়ে যাবে হয়তো। শুধু মেয়েরা একত্র হ'লে ঘরকন্না, ছেলেপুলে, শাড়ি-গয়নার কথা কেউ ঠেকাতে পারবে না। আড্ডার উন্মীলন স্ত্রী-পুরুষের মিশ্রণে। মেয়েরা কাছে থাকলে পুরুষের, এবং পুরুষ কাছে থাকলে মেয়েদের রসনা মার্জিত হয়, কণ্ঠস্বর নিচু পর্দায় থাকে, অঙ্গভঙ্গি শ্রীহীন হ'তে পারে না। মেয়েরা দেন তাঁদের স্নেহ ও লাবণ্য, ন্যূনতম অনুষ্ঠানের সূক্ষ্মতম বন্ধন; পুরুষ আনে তার ঘরছাড়া মনের দূরকল্পনা। বিচ্ছিন্নভাবে মেয়েদের দ্বারা এবং পুরুষের দ্বারা পৃথিবীতে অনেক ছোটো-বড়ো কাজ হ'য়ে থাকে; ছন্দ হয় দুয়ের মিলনে।

আড্ডা স্থিতিশীল নয়, নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তার রূপের বদল হয়। মন যখন যা চায়, তা-ই পাওয়া যায় তাতে। কখনো কৌতুকে সরস, কখনো আলোচনায় উৎসুক, কখনো প্রীতির দ্বারা সুস্নিগ্ধ। বন্ধুতা ও অন্তর্বীক্ষণ, হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধির চর্চা, উদ্দীপনা ও বিশ্রাম— সব একসঙ্গে শুধু আড্ডাই আমাদের দিতে পারে, যদি সত্যি তা ঐ নামের যোগ্য হয়। বিশ্ব-সভায় অখ্যাতির কোণে আমরা নির্বাসিত; যারা ব্যস্ত এবং মস্ত জাত, যাদের কৃপাকটাক্ষ প্রতি মুহূর্তে আমাদের বুকে এসে বিঁধছে, তারা এখনো জানে না যে পৃথিবীর সভ্যতায় আড্ডা আমাদের অতুলনীয় দান। হয়তো একদিন নব-যুগের দুয়ার খুলে আমরা বেরিয়ে পড়বো, অস্ত্র নিয়ে নয়, মানদণ্ড নিয়ে নয়, ধর্মগ্রন্থ নিয়েও নয়, বেরিয়ে পড়বো বিশুদ্ধ বেঁচে থাকার মন্ত্র নিয়ে, আনন্দের উদ্দেশ্যহীন ব্রত নিয়ে, আড্ডার দ্বারা পৃথিবী জয় করবো আমরা, জয় করবো কিন্তু ধ'রে রাখবো না;— কেননা আমরা জানি যে ধ'রে রাখতে গেলেই হারাতে হয়, ছেড়ে দিলেই পাওয়া যায়। পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতি বলে, কাড়ো; আমাদের আড্ডা-নীতি বলে, ছাড়ো।

'উত্তরতিরিশ' (পরিমার্জিত)

নোয়াখালি

প্রথম চোখ ফুটলো নোয়াখালিতে। তার আগে অন্ধকার, আর সেই অন্ধকারে আলোর ফুটকি কয়েকটি মাত্র। সন্ধ্যাবেলা চাঁদ ওঠার আগে উঠোন ভ'রে আলপনা দিচ্ছেন বাড়ির বৃদ্ধা, মুগ্ধ হ'য়ে দেখছি। রাতের বিছানা দিনের বেলায় পাহাড়ের ঢালুর মতো ক'রে গুটানো, তাইতে ঠেশান দিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছি মস্ত বড়ো লাল মলাটের 'বালক' পত্রিকার। রোদ্দুর-মাখা বিকেলে টেনিস খেলা হচ্ছে; একটি সুগোল মসৃণ ধবধবে বল এসে লাগলো আমার পেরাম্বুলেটরের চাকায়, বলটি আমি উপহার পেয়ে গেলুম। কিন্তু সে কোন মাঠ, কোন দেশ, সে কবেকার কথা, আজ পর্যন্ত তা আমি জানি না। আমার জীবনের ধারাবাহিকতার সঙ্গে তাদের যোগ নেই: তারা যেন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ছবি, অনেক আগে দেখা স্বপ্নের মতো, বছরের পর বছরের আবর্তনেও যে-স্বপ্ন ভুলতে পারিনি। সচেতন জীবন অনবচ্ছিন্নভাবে আরম্ভ হ'লো নোয়াখালিতে: প্রথম যে-জনপদের নাম আমি জানলুম তা নোয়াখালি; নোয়াখালির পথে এবং অপথে আমার প্রথম ভূগোলশিক্ষা, আর সেখানেই এই প্রাথমিক ইতিহাসবোধের বিকাশ যে বছর-বছর আমাদের বয়স বাড়ে। আমার কাছে নোয়াখালি মানেই ছেলেবেলা, ছেলেবেলা মানেই নোয়াখালি।

সব-আগের বাড়িটি একটি বৃহৎ ফল-বাগানের মধ্যে: লোকে বলতো ফেরুল সাহেবের বাগিচা। জানি না ফেরুল কোন পর্তুগিজ নামের অপভ্রংশ। ফলের এত প্রাচুর্য যে মহিলারা ডাবের জলে পা ধুতেন। খুব সবুজ, মনে পড়ে। একটু অন্ধকার। কাছেই গির্জে। শাদা প্যান্ট-কোট পরা কালো কালো লোকেদের অনাত্মীয় লাগতো। গির্জের ভিতরে গিয়েছি; ভিতরটা থমথমে, বাইরে সবুজ ঘাস, লম্বা ঝাউগাছ, রোদ্দুর। বনবহুল ঘনসবুজ দেশ, সমুদ্র কাছে, মেঘনায় রাক্ষসী মোহানায় ভীষণ আলিঙ্গনে বাঁধা। সবচেয়ে সুন্দর রাস্তাটির দু-দিকে ঝাউয়ের সারি, সেখানে সারা দিন গোল-গোল আলো-ছায়ার ঝিকিমিকি, আর ঝাউয়ের ডালে-ডালে দীর্ঘশ্বাস, সারা দিন, সারা রাত। দলে-দলে নারকেল গাছ আকাশের দিকে উঠেছে, ছিপছিপে শুপুরি-সখীদের পাশে-পাশে; যেখানে-সেখানে পুকুর, ডোবা, নালা, গাবের আঠা, মাদারের কাঁটা, সাপের ভয়। শাদা ছোটো-ছোটো দ্রোণফুলে প্রজাপতির আশাতীত ভিড়— আর কোথাও আর কখনো

দেখিনি সে-ফুল— আর কী-একটা গাছে ছোটো গোল-গোল কাঁটাওলা গুটি ধরতো, মজার খেলা ছিলো সেগুলি পরস্পরের কাপড়ে-জামায় ছুঁড়ে মারা— কী তার নাম ভুলে গিয়েছি। হলদে লাল ম্যাজেন্টা গাঁদায় সারাটা শীত রঙিন, এমন বাড়ি প্রায় ছিলো না যার আঙিনায় গুচ্ছ-গুচ্ছ গাঁদা ধ'রে না থাকতো— শ্যামল সুঠাম এক-একটি বাড়ি, বেড়া-দেয়া বাগান, নিকোনো উঠোন, চোখ-জুড়োনো খড়ের চাল, মাচার উপর সবুজ উদ্‌গ্রীব লাউ-কুমড়োর লতায় ফোঁটা-ফোঁটা শিশির। শহরের শ্রেষ্ঠ বাড়িটিতেও থেকেছি আমরা, কিন্তু ও-রকম বাড়িতে কখনো থাকিনি, কেননা সরকারি চাকুরেরূপী অধিপতিদের বাসা নয় ওগুলো, অধিবাসীদের বাস্তুভিটা। কতগুলি বাড়ি ছিলো— এমন নিষ্কলঙ্ক-নিকোনো তাদের উঠোন, এমন অস্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন, যে যতবার চোখে পড়েছে ততবার অবাক লেগেছে। ও-বাড়িগুলিতে কারা থাকে জিগেস ক'রে গুরুজনের কাছে জবাব পাইনি। পরে জানতে পেরেছিলুম ওগুলি শহরের গণিকালয়, যদিও গণিকা বলতে ঠিক কী বোঝায় তা তখনও আমার ধারণার বাইরে ছিলো।

এমন কোনো পথ ছিলো না নোয়াখালির, যাতে হাঁটিনি, এমন মাঠ ছিলো না যা মাড়াইনি, দূরতম প্রান্ত থেকে প্রান্তে, শহর ছাড়িয়ে, বনের কিনারে, নদীর এবড়োখেবড়ো পাড়িতে, কালো-কালো কাদায়, খোঁচা-খোঁচা কাঁটায়, চোরা-বালির বিপদে। শীতের ভোরবেলা নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি; যদিও আলস্টর আর কান-ঢাকা টুপিতে মোড়া, তবু বিশ্ববিধান আমার অসম্মান করেনি, শান্তাসীতার নীলাভ রেখাটি যেখানে শেষ হয়েছে, দিগন্তের সেই কুহক থেকে দেখা দিয়েছে আগুন-রঙের সূর্য, প্রথমে কেঁপে-কেঁপে, তারপর লম্বা লাফে উঠে গেছে আকাশে, বিস্তীর্ণ জলকে ঝলকে-ঝলকে লাল ক'রে দিয়ে। আবার সন্ধ্যা-বেলা লাল-সোনার খেলা পশ্চিমে। কখনো গিয়েছি সুদূর রেল-স্টেশনে রেল-লাইনের নুড়ি কুড়োতে, কখনো জেলখানার পিছনে ভুতুড়ে মাঠে, কি নৌকো-চলা খালের ধারে বাঁশ-পচা গন্ধে। একবার কী-কারণে পুলিশ লাইনে তাঁবু পড়েছিলো, দুপুরবেলা তাঁবুর মধ্যে শুয়ে-শুয়ে ঘাসের গন্ধে নেশার মতো লেগেছিলো আমার, প্রায় ঘুমিয়ে পড়তে-পড়তে মনে হয়েছিলো সংসারটা জঞ্জাল, সব চেষ্টা অর্থহীন, সবচেয়ে ভালো রাখাল হ'য়ে মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ানো, গাছের ছায়ায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়া। হয়তো এখানে বলা দরকার যে তখনু পর্যন্ত আমি রবীন্দ্রনাথ পড়িনি—রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতাই না।

অন্ত সব যখন শেষ হ'লো, তখন ফিরতে হয় নদীর কাছেই। নোয়াখালির সর্বস্ব ঐ নদী, নোয়াখালির সর্বনাশ। সবচেয়ে জমকালো সম্পত্তি, সবচেয়ে নিদারুণ বিপদ। সে-নদী মনোহরণ নয়; বাংলা দেশের অন্য কোনো নদীর মতোই নয় সে, না গঙ্গা, না পদ্মা, না কোপাই। বিশাল, শ্রীহীন, দুর্দান্ত, অমিত্র, অসেতুসম্ভব। কেউ স্নান করতে নামে না; উপায় নেই। নানা রঙের শাড়ি-পরা ছিপছিপে তরুণীদের মতো নানা রঙের পাল-তোলা নৌকো নেই এখানে—বছরে দু-এক মাস, ভরা গ্রীষ্মের সময়, অর্ধেকটা নদী জুড়ে প'ড়ে থাকে বালি আর কাদা, তখন একটি খেয়া অতি কষ্টে পারাপার করে, আর বর্ষাকালে যে-একটি নড়বড়ে স্টিমার কুমির-রঙের ঢেউয়ের উপর দিয়ে কেঁপে-কেঁপে সন্দ্বীপে যায়, কিংবা হাতিয়ায়, তার দিকে তাকালেই ভয় হয় এই ডুবলো বুঝি। মানুষের লাভের বা লোভের দিন-মজুরি এ-নদী করলো না; মানুষের ভালোবাসাকেও ভাসিয়ে দিলো কুটিল গোগ্রাসী আবর্তে। ধারে-ধারে না উঠলো কারখানা, না বাগানবাড়ি; ধার দিয়ে বেড়াবার একটি পাকা সড়ক—তা পর্যন্ত হ'তে দিলো না। মেয়েদের সঙ্গে গলাগলি ভাব ক'রে গ'লে যাওয়া তার কোষ্ঠীতে লেখেনি, বাবুদের নৌকো চড়িয়ে হাওয়া খাওয়াবার মতো মেজাজ নয় তার। আর-কিছু না, শুধু ভাঙবে। খাড়া পাড়, পাহাড়ের গায়ের মতো এবড়োখেবড়ো; তার ঠিক নিচেই ঘুরপাক-খাওয়া তীব্র জল; আর ঝুপঝুপ ক'রে ধ্ব'সে পড়ছে মাটি, যারা দাঁড়িয়ে আছে বা হেঁটে-চ'লে বেড়াচ্ছে, একেবারে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি যাচ্ছে স'রে, ফাটল ধরছে আবার একটু দূরে, কখনো প্রকাণ্ড চাকে গাছপালা সুদ্ধু ভেঙে পড়লো কান-ফাটানো শব্দে, কাছের বাড়িগুলি বলির পাঁঠার মতো দাঁড়িয়ে। আদি শহরটি অত্যন্তই ছোটো হয়তো ছিলো না, নদী নাকি ছিলো তিন-চার মাইল দূরে, কিন্তু ঘোড়ার মতো লাফিয়ে-লাফিয়ে নদী এমন দ্রুতবেগে এগিয়ে এলো যে দেখতে-দেখতে কুঁকড়ে ছোট্ট হ'য়ে গেলো নোয়াখালি। আমি শেষ দেখেছিলাম শহরের ঠিক মাঝখানটিতে টাউন হলের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে অমিতক্ষুধা জল, তার পর শুনেছি আরো কয়েছে; যে-নোয়াখালি আমি দেখেছি, যাকে আমি বহন করছি আমার স্মৃতিতে ও জীবনে, আজ তার নামমাত্রই হয়তো আছে—কিংবা কিছুই নেই।

আর সেই সব মানুষ? সেই আধ-বুড়ো পর্তুগিজ, যে-দুর্দম জলদস্যুরা বঙ্গোপসাগরের উপকূলে একদিন তাণ্ডব বাধিয়েছিলো, তাদেরই প্রক্ষিপ্ত, উচ্ছিন্ন ধ্বংসাবশেষ? গায়ের রং-তার আমাদের মতোই কালো, চুলের রং পুরোনো

পয়সার মতো, ময়লা প্যান্ট-কোট পরনে, পায়ে জুতো নেই। খাশ নোয়াখালির বাংলা বলতো সে, প্রায় সারা দিনই পথে-পথে ঘুরে বেড়াতো, পথের কোনো ভদ্রলোককে ধ'রে জুড়ে দিতো আলাপ, চেয়ে নিতো চুরুট কিংবা দু-চার আনা পয়সা। আর সেই অদ্ভুত রহস্যময় প্রায়-অলৌকিক মূর্তি—লম্বা, পাথরের মতো মুখে জ্বলজ্বলে চোখ বসানো, গোড়ালি থেকে গলা পর্যন্ত মস্ত ঝোলা আলখাল্লায় ঢাকা, পিঠে ঝুলি, হাতে—বোধহয় একটা শানাই কিংবা ঐ-রকম কোনো যন্ত্র। মনে পড়ে না সে-যন্ত্রে সে কখনো ফুঁ দিয়েছে, মনে পড়ে না কখনো তাকে কথা বলতে শুনেছি। বেশির ভাগ তাকে দেখা যেতো হাটে-বাজারে, আর যত দূর থেকেই হোক, তাকে দেখামাত্র একটা কিলবিলে অস্বাভাবিক ভয়ে আমি প্রায় ম'রে যেতুম; হাতের আঙুল যদি গুরুজনের মুঠোয় ধরা থাকতো, তবু সে-ভয় পোষ মানতো না। খজু, নিঃশব্দ, ঘনগম্ভীর ঐ মূর্তিকে কিছুতেই আমি ভাবতে পারতুম না মানুষ ব'লে। ঐ ঝুলিতে কী আছে? ভাবতে শিউরে উঠতুম। ও কোথায় যায়, কী খায়, কী করে? ভাবতে কাঁটা দিতো গায়ে। এমন সব কথা আমার মনে হ'তো যার কোনো ভাষা নেই; সে যেন বালকের কল্পনামাত্র নয়, পূর্বপুরুষের সমস্ত ভীতিকর অভিজ্ঞতার অচেতন সঞ্চয়। যাতে অকল্যাণ, যাতে অন্ধকার, যাতে অবরোধ, আর যা-কিছু বিকৃত, বীভৎস, পিচ্ছিল, পৈশাচিক, সেই সমস্ত-কিছুর অবতার ছিলো আমার কাছে ঐ—খুব সম্ভব নিরীহ পাগল। পাগল হোক আর না-ই হোক, সে যে নিরীহ ছিলো এখন তা বোঝা সহজ, তবু তার কথা ভাবলে আজ পর্যন্ত একটা ছমছমানির ঢেউ ওঠে আমার শরীরে।

যারা প্রধানত আমার সঙ্গী ছিলো, তাদের বাবারা কেউ এস. ডি. ও., কেউ পি. ডব্লিউ. ডি.র কর্তা, কেউ বা পুলিশের ইন্সপেক্টর। অনেকেই তারা নোয়াখালিতে এসেছে আমার পরে, অনেকেই বিদায় নিয়েছে বদলির ধাক্কায় আমার আগেই। কিন্তু আরো অনেকে ছিলো যারা বদলির ঘুরপাকের বাইরে, যারা স্থানীয় এবং স্থায়ী—অন্তত তখন তা-ই ভাবতেন তাঁরা—গুহ, গুহরায়, রায়চৌধুরী, কয়েকটি ঈষৎ উচকপালে পরিবার। তাদের ছেলেরা পড়ে কলকাতায় কলেজে, ছুটিতে এসে হৈ-হৈ করে শহর ভ'রে, নাটক জমায় টাউন হলে, ডাকের জন্য দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আড্ডা দেয় পোস্টাপিশের বাইরে সকাল-বেলায়। অসহযোগের ঝড় যখন উঠলো, তাদের কেউ-কেউ উড়ে গিয়ে জেলে পড়লো, ঈর্ষায় বুক ফেটে গেলো আমার, নিজেকে শতবার ধিক্কার দিলুম আর

কয়েকটা বছর আগে জন্মাইনি ব'লে। আর সেই সঙ্গে তারা ছিলো, যারা অনেক এবং অনুল্লেখ্য, যারা কোনোদিন জেলে যায়নি বা দ্রষ্টব্য কিছু করেনি ; যারা বেঁচেছে তেমনি নিঃশব্দে, যেমন নিঃশব্দ আমাদের নিশ্বাস। যামিনী মাষ্টার অঙ্ক কষাতেন আমাকে, তাঁর রাত্রের আহারের বরাদ্দ ছিলো আমাদের সঙ্গে, ঠিক আটটায় বারান্দায় শোনা যেতো তাঁর কাশি, হ্রস্ব, কুণ্ঠিত, সশ্রদ্ধ—ক্ষুধার সঙ্গে যার পরিচয় আছে, খাদ্যের প্রতি সেই মানুষের শ্রদ্ধা স্বল্পতম শব্দে-তিনি প্রকাশ করতেন। তালতলার অশ্বিনী কবিরাজের নাম-ডাক ছিলো শহরে—সময়ে-অসময়ে এবং কারণে-অকারণে তাঁর লাল-কালো বড়ি আমাদের খেতে হ'তো ; তাঁর নিজের চেহারা তাঁর ওষুধের বিজ্ঞাপনের কাজ করতো না, কিন্তু বৈঠকখানাটি ভালো লাগতো আমার—রোদালো ঘর, পরিষ্কার ফরাশ, ঝকঝকে দেয়াল-ঘড়ি, আর একটা ঘন কবরেজি গন্ধ। এই সব পারিবারিক চেনাশোনার বাইরেও দু-একজন বন্ধু হয়েছিলো আমার, মুসলমান তারা, অত্যন্ত বিনীত, আমার বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ। একজন পোস্টাপিশে চিঠির টিকিটে ছাপ দিতো, সুশ্রী ছিলো সে, নম্র ছিলো কণ্ঠস্বর। আর-একজনের সঙ্গে গিয়েছিলুম বনপথ দিয়ে অনেকদূর হেঁটে তাদের গ্রামের বাড়িতে, খেতে দিয়েছিলো ডাবের জল আর ডাবের শাঁস, ঘন গাছপালার ভিতর দিয়ে বিকেলের লাল রোদ্দুর এসে পড়েছিলো।

ভোর আসতো নোয়াখালিতে মোরগ-ডাকের সোনালি রথে চ'ড়ে—কোক্-কোরোক্-কো, কোক্-কোরোক্-কো—দিনের অভ্যর্থনা ধ্বনির ফোয়ারায় লাফিয়ে উঠতো আকাশে, আর সেই সঙ্গে শোনা যেতো পথে-পথে খোলা গলার উল্লাস, গ্রাম থেকে যারা শহরে আসছে সব্জি দুধ গুড়ের হাঁড়ি বেচতে, তারা শীতের কুয়াশায় পরস্পরকে হারিয়ে ফেলে, কিংবা মিছিমিছি, নিছক ফুর্তিতে চীৎকার ক'রে ডাকছে : এড়িও—আড়িড়ু—ৎ! এড়িও—আড়িড়ু—ৎ! একজন ডাকলো তো চার জন জবাব দিলো চার দিক থেকে, সমস্ত সকালটা ভ'রে উঠলো সেই তীক্ষ্ণ লম্বা গিটকিরিতে, শেষের দিকটা ছুঁচোলো হ'য়ে প্রতিধ্বনির পিন ফুটিয়ে দিয়ে গেলো। আর কোথাও শুনিনি ঐ ডাক, ঐ ভাষা, ঐ উচ্চারণের ভঙ্গি। বাংলার দক্ষিণপূর্ব সীমান্তের ভাষাবৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর। চট্টগ্রামের যেটা খাঁটি ভাষা, সেটা আমাদের অনেকের পক্ষেই দুর্বোধ্য, আর নোয়াখালির ভাষা, আমার মতো জাত-বাঙালকেও, কথায়-কথায় চমকে দিতো। শুধু যে ক্রিয়াপদের প্রত্যয় অন্য রকম তা নয়, শুধু যে উচ্চারণে

অর্ধস্ফুট 'হ'-এর ছড়াছড়ি তাও নয়, নানা জিনিশের নামই শুনতুম আলাদা। সে-সমস্ত কথাই মুসলমানি ব'লে মনে করতে পারি না, সম্ভবত অনেকগুলো মগ ভাষা থেকে গৃহীত, কিছু হয়তো বর্মি, আর ছিটেফোঁটা পর্তুগিজও ধ'রে নেয়া যায়। একে তো সমস্ত বাংলাই পাণ্ডববর্জিত, তার উপর বাংলার মধ্যেও অনার্যতর হ'লো বাঙালদেশ, আবার সেই বাঙালদেশেও সবচেয়ে দূর, বিচ্ছিন্ন, মিশ্রিত, অশ্রুত এই নোয়াখালি।

নোয়াখালির নগণ্যতা নিয়ে আক্ষেপ ছিলো আমার মনে। ভেবে পেতুম না, বিধাতা বেছে-বেছে আমাকে এমন জায়গায় ছুঁড়ে ফেললেন কেন, যার নাম কখনো ছাপার অক্ষরে ওঠে না। কলকাতা দিল্লি বম্বাইয়ের কথা ছেড়েই দিচ্ছি—ও সব তো স্বপ্ন—খবরকাগজে দেখতুম ঢাকা বরিশাল বাঁকুড়া শিলচরের কথা, এমনকি তমলুক নেত্রকোনা সিরাজগঞ্জের খবরও মাঝে মাঝে ছাপা হ'তো, কিন্তু নোয়াখালি—ও আবার একটা জায়গা, আর তার আবার একটা খবর! যদি বা দু-চার মাসে একবার মফস্বল নোটস-এর মধ্যে একটু জায়গা হ'তো নোয়াখালির, সে এতই ছোটো আর এতই ছোটো অক্ষরে যে রীতিমতো অপমান বোধ হ'তো আমার। কেন, এমনই কী তুচ্ছ জায়গাটা? এখানে এমন কয়েকটি যুবক তো আছেন যাঁরা 'নূতন'কে লেখেন 'নতুন', আর নতুন লেখেন ন-এ ওকার দিয়ে; এখানে 'সবুজ পত্রে'র একজন অন্তত গ্রাহক আছেন—শুধু তা-ই নয়, এমন একজন ভদ্রলোকও আছেন যাঁর প্রবন্ধ 'সবুজ পত্রে' ছাপা হ'য়ে 'প্রবাসী'র 'কষ্টিপাথরে' উদ্ধৃত হয়েছে! আর অসহযোগের উন্মাদনার দিনে নোয়াখালি কি পেছিয়ে ছিলো কারো তুলনায়? স্কুল ছাড়া বলো, জেলে যাওয়া বলো, মীটিং, বক্তৃতা, গান—কোনটাতে কম! বন্দে মাতরম্ আর আল্লা-হো-আকবর, এই যুগ্ম-নিনাদ কি উচ্ছুসিত হয়নি গানের দুই চরণের মতো; মোটা খদ্দর প'রে এঁটেল গ্রীষ্মে কি ঘামিনি আমরা, কুলির রক্ত জ্ঞান ক'রে ত্যাগ করিনি চা? তবু কাগজওলাদের চোখে পড়লো না নোয়াখালি, এমনি অন্ধ তারা! এই মলিন অখ্যাতির মধ্যে বসবাস করতে আমার আর ভালোই লাগছিলো না; কিন্তু চোখের উপর অমুক-অমুক বাবু বদলি হ'য়ে গেলেন, কেউ চট্টগ্রামে, কেউ রংপুরে, কেউ মৈমনসিংহে; আমাদের ভাগ্যে শুধু বাসা-বদল এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায়, আমরা প'ড়ে আছি যে-তিমিরে সে-তিমিরে। শেষ পর্যন্ত যখন নোয়াখালি ছাড়বার দিন এলো আমাদের, এবং বোঝা গেলো আর আমরা ফিরবো না সেখানে, সেদিন আমি

সুখী হয়েছিলাম, আমার কিশোর প্রাণ একবারও কাঁদেনি বাল্যকালের লীলাভূমিকে পিছনে ফেলে যেতে।

এতদিনে প্রতিশোধ নিয়েছে নোয়াখালি, ভীষণ প্রতিশোধ; ছড়িয়ে দিয়েছে তার নাম বড়ো-বড়ো অক্ষরে, শুধু বাংলার বা ভারতের নয়, লণ্ডন, ন্যুয়র্কের খবর-কাগজে, এঁকে দিয়েছে তার নাম আরক্ত অক্ষরে মেয়েদের হৃৎকম্পনে, মায়েদের হৃৎপিণ্ডে। এমনকি সেই রামগঞ্জ থানা, যেখানে খালের উপর বাঁকা সাঁকো, আর খালের জলে কচুরি পানার বেগনি ফুলের আলো, যেখানে একবার নৌকো ক'রে বেড়াতে গিয়ে নারকোল দিয়ে রাঁধা কইমাছ অমৃতের মতো খেয়েছিলুম, যার অস্তিত্ব সমস্ত পৃথিবীতে কেউ জানতো না, সেই রামগঞ্জের নাম আজ সারা বাংলায় মুখে-মুখে। রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, শ্রীরামপুর···তুচ্ছ ভেবেছি এই সব নাম, অতি তুচ্ছ, আর আজ তারা কত বড়ো, কী মারাত্মকরকম বড়ো। ঈর্ষাযোগ্য নয় এই ভাগ্য, কিন্তু···কে জানে। গান্ধী আজ সেখানে, আর গান্ধীর চেয়ে বাঞ্ছনীয় আজকের দিনের পৃথিবীতে আর কী?

ইতিমধ্যেই খবর-কাগজে নোয়াখালির খবরের অক্ষর হয়েছে ছোটো, স্থান সংকুচিত। পয়লা পাতায় আবার জাঁকিয়ে বসেছে দিল্লি লণ্ডন মস্কো ওয়াশিংটন; কিন্তু বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা আস্তে-আস্তে উন্মীলিত হচ্ছে বাংলার অখ্যাততম অনার্যভূমিতে; বর্তমান সময়ের শুধু নয়, চিরকালের চরম একটি প্রশ্নের উত্তর সেখানে রচিত হ'লো, যার প্রভাব আজ মনে হ'তে পারে অকিঞ্চিৎকর; — কিন্তু হয়তো একদিন ছড়িয়ে পড়বে দূরান্তরে ও যুগান্তরে। মানুষের মধ্যে যে-অংশ জীব, তার ইতিহাস আজ যুদ্ধের পরে গ'ড়ে উঠছে পৃথিবীর শক্তিশালী রাজধানীগুলিতে; কিন্তু মানুষের মধ্যে যে-অংশ দেবতা, বা অন্তত দেবাভিমুখী, তার ইতিহাসের ক্ষেত্র আজ সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র নোয়াখালি।

নিষ্ঠুর শোনাবে কথাটা, তবু বলবো, ভাগ্যিশ নোয়াখালি ঘটেছিলো। তাই তো গান্ধী মুক্তি পেলেন দিল্লি-লণ্ডনের কূটচক্র থেকে; বম্বাই-আহমেদাবাদের ঘনজটিল জাল থেকে; সভা, সমিতি, দল, দলপতি, বিতর্ক, মন্ত্রণার অশেষ-বিষাক্ত পরিমণ্ডল থেকে; সংখ্যা, তথ্য ও আইনের পিচ্ছিলতা থেকে; লোভীর সঙ্গে লোভীর বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার প্রচ্ছন্ন-প্রখর আবর্ত থেকে; স্বর্গরাজ্যের সর্বনাশী পরিকল্পনা থেকে; মিথ্যা থেকে, মত্ততা থেকে; গণ-নেতার অনিবার্য ধর্মচ্যুতি থেকে। গণ-নেতার নেতাই তো জনগণ, আর জনতার প্রমত্ততা

যেহেতু সমাজের একটা মৌল সত্য, তাই নেতৃপদে একবার অভিষিক্ত হ'লে বার-বার চরিত্রচ্যুত না-হ'য়ে উপায় থাকে না কোনো মানুষের। মানুষের পক্ষে ভালো হওয়া সম্ভব শুধু একলা হ'লে, সংঘবদ্ধ হ'লেই সে মন্দ; অথচ আমরা এমনি নির্বোধ যে মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে দু-দু'বার সংঘবদ্ধ মানুষের নারকীয়তা প্রত্যক্ষ ক'রেও, এবং তার অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রীতিমতো মুখস্থ থাকা সত্ত্বেও, এখনো আমরা জনগণের উদ্ধারকারীদের বিশ্বাস করি।

এই মোহ থেকে বেরিয়ে এলেন পৃথিবীতে অন্তত একজন মানুষ। সমস্ত জীবন তিনি স্বদেশের জন্য ক্ষয় করেছেন রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায়—দীর্ঘ কঠিন ঝঞ্ঝাহত বছরের পর বছর ধ'রে;— তারপর সেই রাষ্ট্রগঠনের সময় যখন এলো, তখন দেখলেন, যে-স্বাধীনতার জন্য সমস্ত দেশকে মাতিয়ে তুলেছিলেন, তার প্রথমতম সম্ভাবনাতেই হিংসা উঠলো উদ্বেল হ'য়ে। স্তম্ভিত হ'য়ে রইলেন কয়েক দিন, তারপর তাঁর যাত্রা শুরু হ'লো। দিল্লি তাঁকে দলে পেলো না, ওয়ার্ধা তাঁকে বেঁধে রাখলো না, মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেলো লণ্ডন জেনিভা ন্যুয়র্ক। পথের মানুষ আবার পথে নামলেন। ভেঙে দিলেন আশ্রম, ছেড়ে দিলেন সঙ্গীদের, দেহের ন্যূনতম প্রয়োজনের অভ্যাসকেও বর্জন করলেন, একলা হলেন, মুক্ত হলেন। এ-মুক্তিতে তাঁর প্রয়োজন ছিলো। এ না-হ'লে ব্যর্থ হ'তো তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা। এই তাঁর পূর্ণতা, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত, যুধিষ্ঠিরের মতো কঠিন শোকাচ্ছন্ন নিঃসঙ্গ স্বর্গারোহণ।

কোন স্বর্গে? যেখানে সব আলো, সব খোলা, সব সহজ। যেখানে ভয় নেই, বীরত্বও নেই। লোভ নেই, ত্যাগও নেই। ক্রোধ নেই, সংযমও নেই। যেখানে আশ্রয় নেই, তবু নিশ্চয়তা আছে। যেখানে বিফলতা নিশ্চিত, তবু আশা অন্তহীন। তিনি বেরিয়ে পড়লেন নোয়াখালির পথে, পায়ে হেঁটে, একা। গেলেন গ্রাম থেকে গ্রামে, বাড়ি থেকে বাড়িতে, কথা বললেন প্রত্যেকের সঙ্গে, অংশ নিলেন প্রত্যেকের জীবনের। বয়স তাঁর আটাত্তর। স্বজন বহুদূরে। বজ্রকঠিন শরীর, তবু মানুষের রক্তমাংস। অমিতশান্ত স্বভাব, তবু মানুষের মন। কোথায় প'ড়ে রইলো তাঁর দেশ, যেখানে বছরের পর বছর তিনি কাটিয়েছেন ভক্ত বন্ধুদের সাহচর্যে, আর কোথায় এই সিক্ত, কর্দমাক্ত, অসংস্কৃত, অবান্ধব নোয়াখালি! কোথায় তাঁর পথের শেষ জানেন না, কখনো ফিরবেন কিনা তাও জানেন না।...কিন্তু কেন? অহিংসার অগ্নিপরীক্ষা হবে ব'লে? চিরস্থায়ী শান্তি আনবেন ব'লে? ও-সব কথা কিছু বলতে হয় ব'লেই বলা; আসলে

অর্থহীন। আসল কথা, স্বর্গকে তিনি পেয়েছেন এতদিনে; সেই স্বর্গ নয়, যা দিয়ে রাজনৈতিক রচনা করেন জনগণের সমস্ত বঞ্চিত কামনার, ঈর্ষার, কুসংস্কারের তৃপ্তিস্থল, আর পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে-না করতে যা প্রতিপন্ন হয় আরো একটি যুদ্ধের মাতৃজঠর; সেই স্বর্গ, যা মানুষ সৃষ্টি করে একলা তার আপন মনে, সব মানুষ নয়, অনেক মানুষও নয়, কেউ-কেউ যার একটুমাত্র আভাস হয়তো মাঝে-মাঝে পায়, কিন্তু যাকে জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করতে যিনি পারেন তেমন মানুষ কমই আসেন পৃথিবীতে, ;— আর তেমনি একজনকে আজ আমরা চোখের উপর দেখছি বিদীর্ণ বিহ্বল নোয়াখালির জলে, জঙ্গলে, ধুলোয়। নম্র হও, নোয়াখালি; পৃথিবী, প্রণাম করো।

'উত্তরতিরিশ'

কোনারকের পথে

কালপুরুষকে কতদিন দেখেছি। কত আশ্বিনের সবুজ সন্ধ্যায় পূর্বদিগন্তে প্রশ্নচিহ্নের মতো, কত চৈত্র-সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে তির্যক ছাঁদে ঝুলন্ত, কত কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নায় ম্লান, কত অন্ধকারে আশ্চর্য উজ্জ্বল। দেখেছি তাকে জানলা থেকে, গলির উপরে, শহরের পথে যেতে-যেতে সেই বিরাট মূর্তি চমক লাগিয়ে দিয়েছে কতবার। আমাদের আকাশে এই জ্যোতির্ময় পুরুষের মতো আর কিছু নেই—কোটি কল্পের এই সৌরপুঞ্জ, অন্ধকারের দুরন্ত হৃৎপিণ্ড যেন। আর আছে শান্ত গম্ভীর সপ্তর্ষি, উত্তর আকাশে নিস্পন্দ। কালপুরুষ আনে আমাদের রক্তে চাঞ্চল্য, সপ্তর্ষি আনে শান্তি। এই শেষ-শরতের আকাশে আমি কতদিন সপ্তর্ষিকে খুঁজেছি, দেখা পাইনি। আজকাল বড়ো দেরি ক'রে ওঠে সে—তখন আমাদের ঘুমের সময়। আজকাল সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আকাশে রাজত্ব করে কালপুরুষ—খড়্গ ঝুলিয়ে, উদ্ধত ও বিজয়ী ভঙ্গিতে। আছে আরো অনেক তারা, তারা ম্লান ও বিচ্ছিন্ন, তাদের কোনো মিলিত মূর্তি আমার চোখে ধরা পড়ে না। আরো কত নক্ষত্রপুঞ্জ বিকীর্ণ এই আকাশে, কিন্তু আমার আনাড়ি চোখ চেনে না তাদের; কালপুরুষের অসহ্য সৌন্দর্যে ক্লান্ত, আমি খুঁজি সপ্তর্ষির শান্তি। কোন গভীর রাত্রে সে উঠে আসে এই ঋতুতে, চুপে-চুপে, ভীরু ভাঙা চাঁদের মতো, খানিক পরেই ভোরের আভাসে মিলিয়ে যায়। কেটে যাবে শীত, প্রথম বসন্তে যখন দক্ষিণে হাওয়া দোলা দেবে, তখন এক সন্ধ্যায় হঠাৎ দেখবো দিগন্তের উপরে প্রত্যাগত সপ্তর্ষি, আর কালপুরুষ পশ্চিমে আনত।

—কিন্তু আজকের এই দেখাও আমার অদৃষ্টে ছিলো! হঠাৎ ভেঙে গেলো ঘুম, কিন্তু ঘুমের জড়তা কাটিয়ে এটা উপলব্ধি করতে কিছু সময় লাগলো যে আমাদের গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কানে এলো গাড়োয়ানের শীতে-কর্কশ কণ্ঠস্বর—চীৎকার ক'রে ডাকছে আমাদের। সেই অতি সংকীর্ণ শকটের লেপে-চাপা অবলুপ্তি থেকে উঠে আসাও বড়ো সহজ হ'লো না। দেখলুম, ঘড়ির জল-জলে রেডিয়ম-কাঁটায় ঠিক তিনটে বেজেছে। বেরিয়ে এলুম গোযানের জমাট অন্ধকার থেকে; সঙ্গে-সঙ্গে স্বপ্নের মতো কানে বাজলো জলের ছলছলানি।

গাড়োয়ান বললে, নদীতে জোয়ার এসেছে। নদী? ঐ তো নদী নিরাকিয়া,

তারার আলোয় ম্লান জলের ঝিলিমিলি। পার হওয়া যাবে না? গাড়োয়ান মাথা নাড়লো। নৌকো? নৌকোয় গাড়ি-সুদ্ধ পার হওয়া যায় বটে, কিন্তু নৌকো কোথায়? গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালুম, পায়ের তলায় শিশিরে ভেজা বালুর স্পর্শ জুতো ফুঁড়ে বিঁধলো আমাকে। হাতটাকে চোঙের মতো গোল ক'রে নিয়ে গাড়োয়ান শীতে-ভাঙা গলায় চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগলো মাঝিকে—বিশাল বালুময় শূন্য প্রান্তরে মিলিয়ে গেলো সেই শব্দ, নদীর ওপার থেকে প্রতিধ্বনি ফিরে এলো। আজ এই লক্ষ তারা-ভরা আকাশের তলায়, এই নিঃসীম নিস্পন্দ অন্ধকারে আমরা ছাড়া আর-কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। শুধু মাঝে মাঝে কানে আসছে সমুদ্রের গর্জন। কোথায় সমুদ্র? জানি না। কিন্তু সারা রাত ধ'রে সমুদ্রের শব্দ এসেছে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে, হঠাৎ ঢেউয়ে-ঢেউয়ে সংঘাতের শব্দ, যেন গাছপালা পোকা-পাখি আর পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘর নিয়ে ভূখণ্ড ধ্ব'সে পড়লো জলে, যেন হঠাৎ-গুলি-খাওয়া বাঘের গর্জনে অরণ্য হ'লো উত্তরোল। আমাদের পথে-পথে কখন থেকে এই শব্দ চলেছে, ঘুমের মধ্যে চমক-লাগানো, কখনো দূরের রেলগাড়ির মতো ঘুম-পাড়ানো। তারপর রাত্রিশেষে ঘুম-ভাঙা কানে এই তোলপাড় চুরমার, লক্ষ তারার আকাশের নিচে, নিয়াকিয়া নদীর ধারে, নিদ্রাহীন।

এ-কথা বলতেই হবে যে এমন আকাশের নিচে আর কখনো আমি দাঁড়াইনি, এমন নিস্পন্দ রাত্রিময় জনহীন প্রান্তরের মধ্যে। সব দিকে ছড়িয়ে আছে স্তব্ধ, অস্পষ্ট বালুবিস্তার; আর-কিছু চোখে পড়ে না, দূরে যদি থাকে গাছের সারি, মনে হয় রাত্রিই নেমেছে নিবিড়তর হ'য়ে। উপরে তাকালুম: তাকানোমাত্র আকাশে যা চোখে পড়লো তা ঠিক ঐ রকম ক'রে দ্বিতীয়বার দেখার আমি আশা রাখি না। প্রথম কথা, আকাশ বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝি, এ সে-জিনিশই নয়। আকাশের ভাঙাচোরা রঙিন টুকরো নিয়ে আমরা আমাদের মনের খেলাঘর সাজাই, সারাটা আকাশ একসঙ্গে আমাদের কল্পনাতেও আসে না। এ কি আমরা কখনো ভাবতে পারি—এই যে আকাশ উঠে গেছে দশ দিক থেকে তীক্ষ্ণ তারাস্রোতে, বাধা নেই, দ্বিধা নেই, সমস্ত পৃথিবীর উপরে চিরকালের ছায়ার মতো ছড়ানো! ক্ষুদ্র সীমায় অভ্যস্ত আমাদের চোখ একসঙ্গে এতটা নিতে পারে না, ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। টুকরো চাঁদ প্রথম প্রহরেই অস্ত গেছে, এখন আকাশের প্রান্ত থেকে প্রান্ত তারায়-তারায় জ্বলন্ত ও জীবন্ত। ঠিক মাথার উপরে দেখলুম কালপুরুষ, আর উত্তর দিগন্তে এইমাত্র-উঠে-আসা সপ্তর্ষি। স্পষ্ট

দেখলুম সাতটা তারা, আর তাদের শান্ত ভঙ্গি, আর মাথার উপরে তীব্র কালপুরুষ যেন আকাশের মধ্যিখানে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। এত তারা—এত উজ্জলতা—তাদের নিষ্পেষণে আকাশ যেন ভেঙে যাবে, এমনি মনে হ'লো। কিন্তু ভিড় থেকে বিচ্ছিন্ন, নির্লিপ্ত, আকাশের দূর প্রান্তে ঐ তো সপ্তর্ষির শান্তি—সপ্তর্ষিকে কতদিন পরে দেখলুম!

গাড়োয়ানের হাঁকডাকের কোনো উত্তর এলো না, নিয়াকিয়া নদী ছলছল শব্দে ব'য়ে চলেছে। ছোটো নদী, কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে যোগ আছে ব'লে জোয়ারের সময় স্ফীত হ'তে জানে; যতক্ষণ না ভোরবেলায় ভাটা লাগে, ততক্ষণ এখানেই কাটাতে হবে আমাদের। বিকেলবেলা পুরীর হোটেল থেকে যখন বেরিয়েছিলুম, মনে আশা ছিলো যে প্রতিষ্ঠিত প্রথা-অনুযায়ী সূর্যোদয়ের আগেই কোনারকে পৌঁছতে পারবো। সে-আশা এই বালুভূমিতে লুণ্ঠিত হ'লো। হোটেলের দরজা থেকে পুরী শহরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমাদের গাড়োয়ানটি রাস্তায় যাকে-তাকে ডেকে ঘোষণা করেছে—'কোনারক্-অ যাউচি।' তাতে বুঝেছিলুম, গোযানচালকদের মধ্যে কোনারক-যাত্রা কৌলীন্যের চিহ্ন। কিন্তু এত ঘটা ক'রে আরম্ভ ক'রেও সূর্যোদয় দেখা আমাদের ভাগ্যে জুটলো না।

অগত্যা গুঁড়িশুঁড়ি মেরে বিছানাতেই ফিরে যেতে হ'লো। ঐটুকু তো গাড়ি—তার মধ্যে আমরা, আমাদের জলের কুঁজো, শীতবস্ত্র, একটি বাক্সে চায়ের পেয়ালা স্টোভ ইত্যাদি— শরীরটাকে সহনীয় আরামে রাখা এই অবস্থায় সহজ নয়। টর্চের আলোয় জায়গা দেখে নিয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে শুয়ে পড়লুম। কোনো জন্তুর সবুজ স্ফুরিত চোখের মতো ইলেকট্রিক টর্চ জ্ব'লে উঠেই নিবে গেলো। অন্ধকারে মনে হ'লো আদিম কোনো গুহার মধ্যে শুয়ে আছি। বাইরের বাতাসে থমকে-থমকে সমুদ্রের স্বর আছাড় দিচ্ছে; শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

ঘুম যখন ভাঙলো, তখন বেশ বেলা। রোদ উঠেছে। পথে চলেছে দু-চার-জন দেহাতি লোক। ভাটার নদী এখন এত শীর্ণ যে নৌকোর প্রয়োজন হ'লো না, গাড়িসুদ্ধ পার হ'য়ে গেলুম। নদী যেখানে সবচেয়ে গভীর সেখানে গোরুর গলা অবধি জল; গোরু দুটো শীতে কাঁপতে-কাঁপতে উল্টো পাড়ে এসে উঠলো। সেখানে কয়েক ঘর বসতি, বোধহয় কোনো পাড়াগেঁয়ে হাট বসে, কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে অন্তহীন প্রান্তর ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। বাইরে বাতাসের বেগ বিপুল। বহু চেষ্টায় স্টোভ ধরিয়ে চা তৈরি ক'রে খেয়ে নিলুম আমরা, তারপর আবার যাত্রা শুরু হ'লো।

ধু-ধু করছে, ব্রাউন রঙের মাটির সমুদ্র। ঘাস নেই, গাছ অল্প। কোথাও একটা কুঁড়ে ঘরও চোখে পড়ে না। কদাচ দু-একটি লোক পায়ে-চলা পথে যাওয়া-আসা করে। সমুদ্রের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না এখন, সকালের আলোয় অদ্ভুত শুব্ধ মনে হচ্ছে পৃথিবীটাকে। বইছে বালু-ওড়ানো হাওয়া মাইলের পর মাইল; অকারণ অর্থহীন ঈষৎ-বন্ধুর বন্ধ্যা মাটি অফুরন্ত গড়িয়ে চলেছে— নেহাৎই যেন আমাদের আর কোনারকের মধ্যে ব্যবধান বাড়াবার জন্য। মন্থর গোযানে ঝাঁকুনি খেতে-খেতে মনে হচ্ছিলো পথ আর ফুরোবে না, কিন্তু বেলা দশটা নাগাদ হঠাৎ একটা বৃক্ষবেষ্টিত উঁচু জায়গা কাছে এলো আমাদের। শুনলুম, এসে গেছি। ধারণা করেছিলুম, দূর থেকেই মন্দিরের দর্শন মিলবে, কিন্তু গাড়ি ঢুকলো মস্ত এক ঝাউবনে, চললো তার আন্দোলিত আলো-ছায়ার উপর দিয়ে, ডালে-ডালে বেজে উঠলো বিশাল দীর্ঘশ্বাসের মতো বাতাস। অবশেষে একটা পুকুরের ধারে গাড়ি থামলে; এখানেই নামতে হবে আমাদের। 'গোরুর গাড়িতে ষোলো ঘণ্টা': একটা ছোটো গল্পের চমৎকার নাম।

বিশাল মর্মরিত ঝাউবনের মধ্যে লুকিয়ে আছে এই অতুলনীয় মন্দির, আর তারই সংলগ্ন ডাকবাংলোটি। একেবারে কাছে না-এলে কোনোটাই চোখে পড়ে না। বাংলোটি একটু ফাঁকা জায়গায়, তাতে প্রবেশে প্রধান পথটির দু-দিকে আছে ঝাউয়ের সারি, অন্য দিকে মস্ত সবুজ প্রাঙ্গণের মধ্যে ইঁদারা। ঝাউবনের বুকের মধ্য থেকে যে-একটি সূক্ষ্ম নিশ্বাসের ঢেউ অনবরত ওঠা-পড়া করছে, তা যেন কোনো স্তব্ধতারই শ্রুতিগম্য রূপ। কাছাকাছি কোনো শহর নেই, রেল-লাইন নেই যে এই স্তব্ধতা মুহূর্তের জন্যও ভাঙবে। মোটরের রাস্তা আছে, কিন্তু তা বছরের মধ্যে ছ-মাসই অব্যবহার্য; ঝাউয়ে লুকোনো, হাওয়ায় ধোয়ানো, আলোয় নাওয়ানো এই স্বর্গে পৌঁছতে হ'লে গোযানই গতি।

ক্লান্তি নেই এখানে। আসতে-আসতে শেষের দিকে অবসন্ন লাগছিলো আমাদের, কিন্তু যে-মুহূর্তে বাংলোয় এসে উঠেছি, যে-মুহূর্তে গায়ে লেগেছে এই ঝাউবনের বাতাস, সে-মুহূর্তেই আমাদের দেহমন প্রফুল্ল ও উৎসুক হ'য়ে উঠেছে। আকাশে উড়তে-উড়তে পাখি হঠাৎ দিক-বদল করে, সেই তীক্ষ্ণ বাঁকা রেখা যেন আমি। এ কোথায় এলাম? এত আলো, এত আকাশ, এত শান্তি, আর এমন স্বচ্ছ উজ্জ্বল নীরবতা— বিশ্বাস হয় না যেন। এখানে যেন পৃথিবী এখনো তরুণ আছে; মাত্র ষোলো ঘণ্টা গোরুর গাড়িতে চ'ড়ে আমরা পালিয়ে এসেছি সময় থেকে, মুক্তি পেয়েছি এক স্তব্ধ নিভৃত অতীতে, এক আদিম নগ্নতায়।

না কি এই নগ্ন সরল স্তব্ধতার মধ্যে আমরাই নিয়ে এলাম তালি-মারা কাটাছেঁড়া বর্তমানকে? আমাদের আত্মবিস্মৃতি কখনোই যেন সম্পূর্ণ হয় না; যত গভীরেই ডুবে যাই, কোথায় যেন ভেসে থাকে শক্ত একরোখা আত্মচেতনা। এখানেও আমরা নিয়ে এসেছি আমাদের বছর আর তারিখ আর কাগজ-কলম ডাকের টিকিট— খাবার আগে যেটুকু সময় হাতে আছে, তাতে আমরা বাড়ির লোকেদের চিঠি লিখতে চাই। কিন্তু খবর পেলাম, নিকটতম ডাকঘর পাঁচ মাইল দূরবর্তী, রাজার ডাক ধরতে হ'লে মাঝামাঝি আর কোনো উপায় নেই। নিশ্চিত ছিলুম যে এই বিখ্যাত স্থানটিতে একটা ডাকবাক্স অন্তত থাকবে, আর যদিও মফস্বলের ডাকবাক্স বিষয়ে আমার মনে অবিশ্বাস বদ্ধমূল, তবু তারই ভরসায় কলম শানিয়ে নিচ্ছিলুম। কিন্তু নিরাশ হ'তে হ'লো; 'কোনারক ডাকবাংলো' চিহ্নিত কোনো পত্র আত্মীয়দের পাঠানো গেলো না।

ভ্রমণে বেরোলে আমরা কেউ-কেউ মস্ত চিঠি-লিখিয়ে হ'য়ে উঠি, তার কারণ কি সূক্ষ্ম ও নির্দোষ একটু গর্বের ভাব, না কি অন্যের সঙ্গে আনন্দটাকে ভাগ ক'রে নেবার সাধু আকাঙ্ক্ষা? হয়তো দুটোই কাজ করে আমাদের মনে; আমরা অন্যদের জানাতে চাই যে আমরা আনন্দ পাচ্ছি, আর তা জানাতে গিয়েই অনুভূতিটা উপলব্ধি হ'য়ে ওঠে। এমন নয় যে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় আমরা আত্মীয়বিরহে কাতর হ'য়ে থাকি, বরং নতুন দৃশ্যের উত্তেজনায় নববিবাহিতার পক্ষেও মাতৃবিচ্ছেদের বেদনা ভুলে থাকা সম্ভব হয়। তবু প্রকাশের ইচ্ছেটাকে সামলানো যায় না; উৎসাহিত মন পরিবারবর্গের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে; হঠাৎ মনে পড়ে যায় বাল্যবন্ধু সুকুমারকে, ভুবনেশ্বরে ধর্মশালায় তক্তাপোশে উপুড় হ'য়ে শুয়ে তাকেও একখানা চিঠি লিখে ফেলি। কিংবা হয়তো সহপাঠিনী মালতী— বিয়ের পরে যে দিনাজপুরে চ'লে গেছে, যার দু-খানা চিঠির জবাব দেয়া হ'য়ে ওঠেনি, তাকে এখনই না-লিখলে চলছে না, এই চিন্তায় ডাকবাংলোয় ব'সে, এই মুহূর্তের সব খবর দিয়ে। যে-দুর্ভাগারা প'ড়ে আছে ঢাকাতে কি দিনাজপুরে, বা আটকে আছে সেই চিরকালের কলকাতায়, তাদের এই নতুন দেশের টাটকা মুহূর্তের স্পর্শ পাঠাতে কি ইচ্ছে করে না? অন্তত পক্ষে, আমাদের মনটা অনেক বেশি সচল হ'য়ে উঠেছে তখন, অনেক দ্রুত কলম চলছে, লেখার উপাদানেরও অভাব হচ্ছে না; আর সে-সব চিঠি পেয়ে তাদেরও যে একটু বিশেষ ভালো লাগবে না, তা কি জোর ক'রে বলা যায়? কোনারকে ডাকবাক্স

না-থাকাতে আমাদের ভ্রমণের একটু অঙ্গহানি হ'লো, আমার পক্ষে তা স্বীকার না-ক'রে উপায় নেই।

চিঠিপত্রের দ্বারা বিজ্ঞপ্তিতে যদি বা কোনো ত্রুটি ঘটেছিলো, এই লেখাটায় তা পুষিয়ে নেয়া গেছে, এই রকম একটা ব্যঙ্গোক্তি এখানে প্রাসঙ্গিক হ'তে পারে। কিন্তু লেখাটাতে রটনার অংশ অকিঞ্চিৎকর, একটা অভিজ্ঞতাকে মূর্ত করার চেষ্টা আছে শুধু। যাকে অভিজ্ঞতা বলছি সেটা ঘটনানির্ভর না-ও হ'তে পারে; অনেক সময় বাইরের দিক থেকে সেটাকে উল্লেখযোগ্য বলা যায় না, কিন্তু গ্রহীতার মনই তাকে মূল্যবান ক'রে তোলে। আছে কোনো-কোনো নিবিড় সংবেদনের মুহূর্ত, কোনো আকস্মিক আবিষ্কার যেন— যেমন নিয়াকিয়ার তীরবর্তী শেষরাত্রির অন্ধকার ও আকাশ, বা ঝাউবনের মধ্যে সহসা-দৃষ্ট কোনারক মন্দির, বা মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে অপ্রত্যাশিত, স্বপ্নের মতো সমুদ্রের নীলিমা। হঠাৎ মনে হয়— এই তো দেখলুম, যেন বিশ্বের রহস্য উন্মোচিত হ'লো। এই রকম মুহূর্তগুলোই আমাদের জীবনের চিহ্ন, এদের দিকে না-তাকালে বুঝতে পারি না যে আমরা বেঁচে আছি বা বেঁচে ছিলাম। ভাবনার হাওয়ায় এরা চঞ্চল, স্মৃতির কুয়াশায় এরা রঙিন। এরা হারাবে না, ফুরোবে না, নতুন হ'য়ে ফিরে-ফিরে আসবে। এই তো কয়েকটি মুহূর্ত কবে ছাড়িয়ে এসেছি, তবু এখনো তাদের দেখতে পাচ্ছি সমুদ্রের উপরে শাদা পাখির ঝাঁকের মতো। একদিন হয়তো দিগন্ত ছাড়িয়ে উড়ে যাবে তারা; এখানে রইলো তাদের পাখার শব্দ, রইলো তাদের উড়ে চলার বাতাস।

'আমি চঞ্চল হে' (পরিমার্জিত)

একটি শোবার ঘর, একটি বাথরুম, তার পাশেই কাপড় ছাড়ার ঘর, প্রকাণ্ড খাবার ঘর একটি, আর তার পাশে পার্টিশন-দেয়া একটা ঘর বোধহয় চাকরদের জন্য, আর তার পরে রান্নাঘর মস্ত চুল্লি-বসানো···দৈনিক দু-টাকায় এতখানি জায়গা আমাদের অধিকারে। বর্গ ফুট ধ'রে মাপলে ভবানীপুরে মাসিক পঞ্চাশ টাকায় যতটা জায়গা পাই, তার চেয়ে কম হবে না। তবে কিনা এখানে এত আমাদের লাগবে কিসে! ছোট্ট শোবার ঘরেই কুলিয়ে যায়। আর ড্রেসিংরুম ব'লে যেটার পরিচয় সেটা লাগে নানাবিধ সাংসারিক কাজে; বাড়তি জায়গাগুলোয় শুধু যে আমাদের দরকার নেই তা নয়, তাতে রীতিমতো অসুবিধে। এই সমুদ্রের ধারে কয়েকটা দিন কাটাবার পক্ষে নিবিড়তাই সবচেয়ে ভালো।

সেই ছোট্ট স্পিরিটল্যাম্পেই রান্না। সাত প্রস্থ ভোজন ঠিক হয় না; তবে ভাতের সঙ্গে ডালসেদ্ধ, গোটা দুই কাঁচালঙ্কা আর কাঁকরের মতো বড়ো-বড়ো নুনের দানার সঙ্গে অতি উপাদেয় সুখাদ্য ব'লেই মনে হয়, আর তার উপর ডিম কি মাছমাংস যেটা জোটে সেটার সৌরভ ও স্বাদ রসনা থেকে আত্মা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হ'তে থাকে। আহারের পরে পান পর্যন্ত বাদ যায় না।

একদিন বিশ্রাম করবো ভেবেই গোপালপুর নেমেছিলুম, কিন্তু ভালো লেগে গেলো। আশ্রয় সম্বন্ধে উৎকণ্ঠার যেই অবসান হ'লো, মনের মধ্যে এমন একটা স্নিগ্ধতা নামলো যে ভাবলুম এখানে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে যাই। বেশ লাগছে এখানে। ছোট্ট জায়গা এই গোপালপুর, সমুদ্র একে যেন তিন দিক দিয়ে ঘিরে রয়েছে আধো-চাঁদের আকারে, সমুদ্রকে ফেলে খুব বেশিদূর যাওয়া সম্ভবই নয় এখানে। পুবদিকে ধূ-ধূ সমুদ্রের স্বপ্ন-সীমার মতো পাহাড়ের নীল রেখা অস্পষ্ট দেখা যায়। জায়গাটি বেশ উঁচুনিচু, অল্প কয়েকখানা বিলিতি ছাঁদের বাড়ি, নুলিয়াদের বস্তি, একদিন বিকেলের পড়ন্ত আলোয় বড়ো সুন্দর লেগেছিলো চোখে, ঢেউ-খেলানো একমুঠো জমি গাছপালার আড়ালে। হয়তো বেড়াতে বেরিয়েছি, বাজারের দিক থেকে ফিরতে-ফিরতে হঠাৎ কতগুলো ঝাউগাছের ফাঁকে সমুদ্র ঝিলিক দিয়ে উঠলো, কিংবা উল্টো দিক থেকে ট্যারচা হ'য়ে এসে ধাক্কা লাগালো চোখে। সমুদ্র বেশি দূরে নয়, সমুদ্র কখনোই বেশি দূরে নয়। একটা জায়গায় সমুদ্রের জল ডাঙার ভিতরে খানিক ঢুকে গিয়ে থমকে

দাঁড়িয়েছে, সেই লোনা জলের পল্বলের উপর দিয়ে খেয়ানৌকোর যাওয়া-আসা; এদিকে সমুদ্র থেকে তা বিচ্ছিন্ন অতিশয় সরু একটু বালুর রেখায়, তার উপর দিয়ে হেঁটে পার হ'য়ে চ'লে যায় লোকেরা। সেই ক্ষীণ বালুরেখাটুকু সমুদ্র কেন যে এক ফুঁয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না সেটা আশ্চর্য বটে।

বাজারে এসে পৌঁছতে একটি সোজা রাস্তা ধ'রে মিনিট পাঁচেক হাঁটতে হয়। চৌরাস্তার মোড়ে ডাকঘর, পাশাপাশি কয়েকটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর দোকান, বেশির ভাগই খাদ্যজাতীয়; তা ছাড়া দেয়ালে ঘেরা একটা জায়গায় হাট বসে। শাকসব্জি প্রচুর ও শস্তা; কিছু সমুদ্রের মাছ, ভেড়ার মাংস। ডিম মুর্গির অভাব নেই। 'কেলা' আর 'কম্‌লালেম্বু' ঘরে-ঘরে ফেরি করছে। খুব মিষ্টি লেবু; কলাও চমৎকার; কলকাতার বাজারে এই দুই ফলেরই ও-রকম উৎকর্ষ দুর্লভ। দেখে-শুনে মনে হ'লো এখানে যতদিনই থাকি না কেন অনশনে ক্লিষ্ট হ'তে হবে না। কিন্তু অনটন যে জিনিশের হ'লো সেটা অপ্রত্যাশিত।

কলকাতা থেকে একটা স্পিরিটের বোতল এনেছিলাম, সেটা পরের দিনই তলায় এসে ঠেকলো। বেরোলাম স্পিরিট কিনতে। যেখানে গিয়ে ঠেকলাম, সেটা নিশ্চয়ই গোপালপুরের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত মনোহারি দোকান। দোকানি ইংরিজি বলে, চকোলেট বিস্কুট মাখন যা চান তা-ই পাবেন, কিন্তু স্পিরিট? দোকানি মাথা নাড়ে। এখানে কোনো ডাক্তারি দোকান কি নেই যেখানে?··· না, এখানে ডাক্তারি দোকান নেই। তবে? আমি দিতে পারি আনিয়ে বহরমপুর থেকে, আট আনা দাম পড়বে। আট আনা? বেশ, তা-ই সই। বিকেলে এলো খবরের কাগজে মোড়া বোতল, লেবেল নেই; মক্ষিরানী তার স্পিরিটল্যাম্প টাপুটুপু ভ'রে নিয়ে ফুর্তিসে রান্না চড়ালো। রান্না নামলো, খাওয়া হ'লো, কিন্তু তার পরে মানবিকার দুধ গরম করবার সময় হ'লে দেখা গেলো আগুন ধরছে না। কী ব্যাপার? স্পিরিট নেই। আমাদের এই ক্ষুদ্র স্পিরিট-ল্যাম্পটির এত অল্প সময়ে এত প্রচুর ইন্ধন গ্রাস করবার ক্ষমতা ছিলো ব'লে কোনোদিনই সন্দেহ করিনি। আট আনার স্পিরিট এক-একদিনে এক বোতল উড়ে যেতে থাকলে অচিরেই সেই স্পিরিটে রান্না করবার মতো ভোজ্যবস্তুর অভাব ঘটবে যে! পরের দিন সেই দোকানিকে গিয়ে বলি—কেমন স্পিরিট তোমার? জল মেশানো নাকি? দোকানি কী জানে, সে তো অন্য জায়গা থেকে আনিয়ে দেয়। তা লেবেল নেই কেন? দোকানি মৃদুস্বরে বলে, 'You

see…।' বুঝলুম ওর লাইসেন্স নেই; কিন্তু এক বোতল স্পিরিটে আধ বোতল জল মেশাবার লাইসেন্স সে নিজেই নিজেকে দিয়েছে। এই অসাধু আচরণের সঙ্গে অসহযোগ ঘোষণা করলে মক্ষিরানী, সে-রাত্রে এক আঁটি কাঠ আনিয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলো সেই অতিকায় উনুনে রান্না করতে। সে এক কাণ্ড! প্রথম কথা, উনুনের উচ্চতা এত যে পায়ের আঙুলে ভর না-দিয়ে মক্ষিরানী ভাবী খাদ্যের চেহারা দেখতে পায় না; আর যেটুকুও বা দেখা সম্ভব কেরোসিনের লণ্ঠন তা আরো ঘুলিয়ে দেয়। আমি মাঝে-মাঝে গিয়ে লণ্ঠন তুলে ধরি, কড়াইয়ের উপর টর্চ ফেলি; কিন্তু মানবিকা ঘুমোচ্ছে ও-ঘরে, দগুাইসি চ'লে গেছে, আমাকে থাকতে হয় ওরই পাহারায়। তাছাড়া, কাঠের ধোঁয়া! নাকের জলে চোখের জলে এক হওয়া কাকে বলে, আক্ষরিক ও রূপক উভয় অর্থেই সেটা উপলব্ধি ক'রে সে-বেলার মতো রান্না নামালো মক্ষিরানী। হায়রে, বড়ো স্টোভটা যদি আনতুম! যদি আনতুম! মক্ষিরানীরই দোষ, তারই উচিত ছিলো আমার নিষেধ উপেক্ষা ক'রে লুকিয়ে ওটা নিয়ে আসা।

ভাগ্যক্রমে আমাদের সু—বাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি এসেছেন আমাদের একদিন আগে এক বন্ধুকে নিয়ে; আছেন এই বীচ হাউসেরই এক ঘরে। এঁরা এক মাদ্রাজি মেয়ে রেখেছেন বাবুর্চি হিশেবে, আর নানা রকমের সুস্বাদু সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহ করছেন প্রচুর পরিমাণে। ভোজ্যবস্তু সংগ্রহে সু—বাবুর অধ্যবসায় ও নৈপুণ্য দেখে অবাক লাগলো। আমরা তো বাজার ঘুরে আর-কিছু না পেয়ে গোটা দুই সাধারণ ভেটকি নিয়ে এলুম, তাও নিশ্চয়ই অত্যধিক মূল্যে: বাড়ি এসে হয়তো দেখি সু—বাবু বিখ্যাত ম্যাঙ্গো মৎস্যের এক প্রকাণ্ড খণ্ড কিনে ফেলেছেন জলের দরে, কি হয়তে একঝুড়ি ব্যাক্ওয়াটার ফিশ্, তার খ্যাতিও কম নয়। অ-ভোজ্য বস্তু সংগ্রহেও সু—বাবুর উৎসাহের অভাব নেই। কোনো ফেরিওলাকে ফিরতে হয় না তাঁর দরজা থেকে। এক দেরাজ বোম্বাই শঙ্খই কিনেছেন, কয়েকটা তার ভারি সুন্দর। শঙ্করমাছের লেজের চাবুক আর তলোয়ার-মাছের মাথার 'তলোয়ার' যা কিনেছেন তা দিয়ে ছোটোখাটো একটি জাদুঘর সাজানো যায়। দুটো অপেক্ষাকৃত ছোটো সাইজের 'তলোয়ার' আমরাও কিনে ফেলেছিলুম শেষ পর্যন্ত। রোজ ঘণ্টায়-ঘণ্টায় এত নিয়ে আসে সে শেষ পর্যন্ত না-কেনা প্রায় অসম্ভব।

হেলাফেলা ক'রে দিন কাটছে। সকালে উঠে চা-পান ও প্রাতঃকৃত্য শেষ

না-হ'তেই দরজায় খড়ের টুপি-পরা মুলিয়ামূর্তির আবির্ভাব। এটা-ওটাতে—বিশেষত মানবিকার জন্যে— আমাদের দেরি হ'তে থাকে। পাশের বাড়িতে কয়েকটি ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষের আড্ডা, সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই সমুদ্রে নামে তারা। সঙ্গে তাদের গোটা দুই শিশু, একটি অতি সুন্দর কুকুর আর দুটো হাওয়ায়-ফাঁপানো জলতোশক। এই জলতোশক নিয়ে এরা যে মাতামাতি হুড়োহুড়িটা করে, তা দেখতে বেশ লাগে আমাদের। সকাল-বিকেলে এরা ছ-ঘণ্টা অন্তত সমুদ্রের জলে কাটায়। এদের আঁটোসাটো লালচে শরীরের উপর জলের ফোঁটা রোদে চিক চিক করে; কখনো এরা ডাঙায় উঠে জিরোয়, কখনো হৈ-হৈ দাপাদাপি ক'রে গড়ায় ঢেউয়ের সঙ্গে-সঙ্গে। এরা দ্বীপবাসী, সমুদ্রের সঙ্গে এদের রক্তের অনেক-দিনের মিতালি। এদিকে আমরা বাঙালিরা মালকোঁচা এঁটে অতি সন্তর্পণে এক পা দু-পা ক'রে নামি, শাড়ি-পরা মেয়েরা আঁচল সামলাবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় বিব্রত হ'তে-হ'তে ডাঙায় উঠে বাঁচে। আমাদের হৃদয়ের যোগ নদীর সঙ্গে; সমুদ্রকে আমরা যেন জীবনের মধ্যে কখনোই স্থান দিইনি। ভারতবর্ষের ভূগোলে তো সমুদ্রের অভাব নেই; কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রকাররা সেই যে সমুদ্রকে হিন্দুর জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন এখনো তার ঐতিহাসিক স্মৃতি আমাদের মন থেকে হয়তো লোপ পায়নি। বর্তমানে আমাদের কারো-কারো মধ্যে সমুদ্রের প্রতি যে-আসক্তি দেখা যাচ্ছে তাতে কতটা আছে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব সেটা বিবেচ্য।

মানবিকাকে দণ্ডাইসির হাতে গছিয়ে আমরা নামি গিয়ে সমুদ্রে। এতক্ষণে বেলা বেড়েছে, শাদা রোদে ঝলসাচ্ছে সমুদ্র, ভোরের সবুজ-সোনালি চেহারা নেই আর। আরো স্নানার্থী আসছে একটি-দুটি ক'রে; তবে এখানে পুরীর মতো গঙ্গাঘাটের ভিড় কখনোই হয় না। জায়গাটি নিরিবিলি, লোক আসে খুব কম। তাহ'লেও, ফিরিঙ্গিরা দেখলুম জায়গাটিকে বেশ দখল ক'রে নিয়েছে। সেটা আশ্চর্য নয়, কেননা গোপালপুর-অন্‌-সী নামে এই যে জনপদ, এক হিশেবে এটা বি. এন. রেলোয়েরই সৃষ্টি। তা ছাড়া, পুরীতে অহিন্দুরা সম্ভবত বিশেষ আরাম পায় না; সত্যি কথা বলতে, তাদের থাকবারই কোনো জায়গা সেখানে নেই, যদি না রোজ দ্বাদশ মুদ্রা ঢালবার মতো অবস্থা হয়। ফিরিঙ্গিরা তাই এখানে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। হোটেল এবং ভালো-ভালো বাড়ি যে-ক'টা দেখলুম, প্রায় সবখানেই আধা-ইংরেজের ভিড়। আমরাই এখানে কোণ-ঠাসা।

পুরীর তুলনায় গোপালপুরের সমুদ্র নেহাৎই শান্ত। তেমন উত্তরোল উচ্ছ্বাস

একদিনও দেখলুম না। এ-সমুদ্রে স্নান করার ক্লান্তি কম, কিন্তু উত্তেজনাও কম, ফুর্তিও কম। ছোটো-ছোটো ঢেউ, তাও এক-একটার জন্য অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পুরীতে ক্রমাগত প্রকাণ্ড ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে-খেয়ে অল্প পরেই হাঁপ ধ'রে যায়। এখানে একটানা ঘণ্টাখানেক স্নান ক'রেও আমি ক্লান্ত হইনি, না হয়েছে একটু গা ব্যথা— সমুদ্রের এতটা ভদ্রতা, সত্যি বলতে, ভালো লাগে না। সমুদ্রস্নানের সত্যিকারের আনন্দ যারা চায়, তাদের একটু নিরাশ হ'তে হবে এখানে।

স্নানের শেষে ফিরে প্রথম কাজ হচ্ছে স্পিরিট ল্যাম্পটি ধরানো। এ কাজে এরই মধ্যে বিশেষ পারদর্শী হয়েছি আমি। হাওয়ার জন্যে জানলা বন্ধ করতে হয়, তারপর সলতেটি গোপালপুরি স্পিরিটে চুপচুপে ভিজিয়ে দেশলাই ধরানো, আস্তে-আস্তে সুন্দর একটি নীল ফুলের মত ঠাণ্ডা নিঃশব্দ আগুন জ্ব'লে ওঠে। দ্বিতীয়বার চা-পান: তারপর মক্ষিরানীর রান্না চড়ে। আমার ইচ্ছে ছোটো-খাটো সাহায্য করি, কিন্তু পাছে তার ফলে অনর্থ ই বেড়ে ওঠে সেই ভয়ে রং-চটা জীর্ণ ইজিচেয়ারে শুয়ে খানিক সমুদ্র দেখি, খানিক বই পড়ি। খাওয়া হয় খোলা দরজার ধারে সমুদ্র দেখতে-দেখতে; পুরোনো আমলের অসম্ভব ভারি টেবিল-চেয়ার দু-জনে মিলে অতি কষ্টে টানাটানি করি। যে-বাসনে খাই তা ভদ্রসমাজে দেখানো যায় না, জল খাওয়া হয় চায়ের পেয়ালায়। খোঁজ পেয়েছিলুম, ভদ্রতামাফিক বাসনকোশনের জন্য পাপ্পার কাছে আরজি পেশ করলে অগ্রাহ্য হয় না; কিন্তু আমাদের বেশ চ'লে যাচ্ছিলো।

দুপুরবেলার দিকে মানবিকার দয়া হয়; তিনি ঘুমোন। সেই সুযোগে মক্ষিরানীও ঘুমিয়ে নেয়। আমি শুয়ে-শুয়ে বই পড়ি; ক্ষণে-ক্ষণে জানলা দিয়ে চোখে পড়ে বিশাল উজ্জ্বল সমুদ্র, হঠাৎ চমকে উঠি, মনে হয় এই প্রথম সমুদ্র দেখলুম। আমি যতদূর জানি, এই পৃথিবীতে সমুদ্রই একমাত্র জিনিশ যা দশ মিনিট পরে দেখলেও একেবারে নতুন লাগে। আকাশ রোদে ঝকঝক করে, পশ্চিমের জানলায় মোটা শিকের ফাঁক দিয়ে রোদ আসে ঘরে, বিকেল হ'লো। একটু হয়তো তন্দ্রা লাগে, চোখ মেলে বইয়ের পাতা উল্টে সিগারেট ধরাই, দরজায় এক বুড়ি ঝিনুক বেচতে এসেছে, হাত নেড়ে ওকে বারণ করি। এরই মধ্যে দ্বিতীয়বার হুলিয়ার আবির্ভাব। স্নান, বিকেলের চা, তারপর ঠাণ্ডা বালুর উপর এসে বসা। ক্রমে সন্ধ্যা নামে, আকাশের অগাধ আলো যায় মিলিয়ে, সবুজ সন্ধ্যাতারা বিশ্বের জলন্ত হৃৎপিণ্ডের মতো দপদপ করে— কী মস্ত বড়ো, বিশ্বাস

হয় না। বালুর উপর আমাদের ফ্যাকাশে ছায়া পড়েছে, আকাশে আধখানা চাঁদ। এখানে ব'সে আধখানা রাত্রি কাটিয়ে দিতে পারলে তো ভালোই ছিলো; কিন্তু মানবিকার ঘুমের সময় হ'লো, তাছাড়া রান্না আছে। আমাদের দণ্ডাইসি তো সন্ধে হ'তেই বিদেয় নেয়। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে ঘরে ঢুকি।

আরো একবার চা; তারপর বাইরে জোছনা আর ঘরে হারিকেন লণ্ঠনের ঘোলা আলো নিয়ে কিছুই যেন করার থাকে না। রোজ সন্ধ্যায় একটি মহাযুদ্ধের পালা; তারপর মানবিকা ঘুমোন। একটি ছোটো মানুষ ঘুমিয়ে পড়লো; এই অতি ছোটো ঘটনার মধ্যে যে কী বিশাল শান্তি ও আরাম তা ভাবতে অবাক লাগে। দেখতে-দেখতে বালুবেলা নির্জন হ'য়ে আসে, জোছনা উজ্জ্বল হয়, সমুদ্রের অবিরাম স্বর গম্ভীর হ'য়ে কানে এসে লাগে, চাঁদের আলোয় যেন ঢেউয়ে-ঢেউয়ে খেলা করে রূপকথার বিশাল সমুদ্র-সর্প। ভাত ঠাণ্ডা ক'রে লাভ নেই, খেয়ে নেয়া যাক। তারপর শুতে যখন যাই রাত ন-টাও বোধ করি বাজেনি। দরজা বন্ধ করলেই বেজায় গরম লাগে, জানলা দুটো নিজেরা যত ছোটো, শিকগুলো ঠিক সেই অনুপাতেই মোটা-মোটা। পাশের বাড়ির পেট্রোম্যাক্স-জ্বালানো বারান্দায় ইংরেজ পরিবারের কথাবার্তা আনাগোনা শোনা যায়, সেটা নিবে যাওয়া মাত্র থাকে শুধু অন্ধকার আর সমুদ্রের স্বর। খাটের অর্ধেক তো জুড়েছেন মানবিকা, বাকি অর্ধেকে আমরা দু-জন শরীরটাকে নানা কায়দায় বেঁকিয়ে চুরিয়ে কোনোরকমে শুয়ে থাকি। যে-মানুষ সবচেয়ে ছোটো তারই সব চেয়ে বেশি জায়গা লাগে।

মানবিকার কথা একটু না-বললে এই কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাঁর নিশ্চয়ই ধারণা যে আমরা দু-জন তাঁর বাহন হবার জন্যেই এই পৃথিবীতে এসেছিলুম। যত ধৈর্য, যত সংযম, যত বুদ্ধিবিবেচনা সব এই দাসেদের জন্য; তিনি তাঁর অফুরন্ত ও উচ্ছৃঙ্খল খেয়ালে যখন যা খুশি করবেন। সম্রাজ্ঞীর মতো তাঁর মেজাজ, যখন যেটা চাই সেটা চাই-ই। তাঁর সুখের ব্যবস্থায় আমরা অহর্নিশ ঘেমে উঠছি: আর লেশমাত্র ত্রুটি হ'লে তীব্র চীৎকারে তিনি আত্মঘোষণা করছেন। যেই একটু ঘুমে আমাদের চোখ লেগে এলো, অমনি কান্নার সুর তোলা তাঁর ব্যসন। রাত্রে আমাদের বিছানার পাশে টেবিলের উপর থাকে স্পিরিটল্যাম্প আর দেশলাই, থাকে দুধের বাটি, ঘড়ি আর টর্চ— ঠিক সময়মতো তাঁকে খাওয়াতে হবে। খিদে পেলে লোকে সাগ্রহে খায় এটাই আমাদের সাধারণ বুদ্ধির কথা; কিন্তু যে-খাওয়ার জন্যে তাঁর কান্না, সেই

খাওয়ানো নিয়েই কি কাণ্ডখানা কম! তাছাড়া, কোথায় তাঁর অসুবিধে হচ্ছে সেটা আমাদের মতো নেহাৎ সাবালকের পক্ষে বোঝাও সম্ভব নয় সব সময়। একদা শেষরাত্রে তাঁর তারস্বরে স্বয়ং পাপ্পা এলো ছুটে। কী ব্যাপার? খোকী রোদ্‌তো কেন? কেন, তা যদি জানতুম! মক্ষিরানী রেগে গিয়ে বললে: 'নিয়ে যাও, নিয়ে যাও তুমি ওকে।' বলবামাত্র পাপ্পা লুফে নিলো তাঁকে; তার বিশাল বুকের মধ্যে টুকটুকে খুদে মানুষ লেপটে মিশে গিয়েই চুপ। মক্ষিরানীকে ক'ষে খানিকটা ধমকে পাপ্পা গেলো চ'লে মানবিকাকে নিয়ে। দরজা বন্ধ ক'রে ফের শুয়ে পড়লুম, কিন্তু খানিক পরেই আমাকে আবার উঠতে হ'লো। একবার দেখে আসি কোথায় নিয়ে গেলো। অন্ধকার ঘর আর অন্ধকার উঠোন পার হ'য়ে একটা ঘরে গিয়ে দেখি লণ্ঠন জ্বেলে মেঝেতে পা ছড়িয়ে ব'সে বিশালকায় পাপ্পা তকলিতে সুতো কাটছে, আর পাশেই একটা খাটে কম্বলে মোড়া মানবিকা পরম সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন। এরই নাম কৃতজ্ঞতা! আমাদের প্রাণান্ত চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে কিনা এই পাপ্পার কোলে গিয়েই ঘুম। তবে এটা আমি বরাবরই লক্ষ করেছি যে মানবিকা ভৃত্যজাতীয় মানুষদের খুব বেশি পছন্দ করেন; তাদের কারো কাছে থাকতে পারলে আর-কিছু তিনি চান না। অভ্যাগত অতিথির প্রসারিত বাহু বর্বরের মতো উপেক্ষা করতে ওঁর একটুও বাধে না, কিন্তু ভৃত্য হ'লেই কোলে যাবেন ঝাঁপ দিয়ে। এ থেকে হয়তো এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় যে তাঁর রুচি তেমন পরিশীলিত নয়; কিন্তু তাঁর এই প্রলেটারিয়েট-প্রীতি দুঃসময়ে আমাদের খুব কাজে লেগে যায় সে-কথা মানতেই হবে।

পাপ্পা মানুষটা কিন্তু বেশ। প্রথম দর্শনে ভীতি উৎপাদন করে, কিন্তু ক্রমে ভালো লাগতে থাকে। প্রকাণ্ড কালো শরীর নিয়ে সারাদিন ম্যানেজারি করছে, তার উচ্চ কাংস্যস্বর দু-মাইল দূর থেকে শোনা যায়, স্বামী-পুত্র কেউ নেই, মাইনে পায় আট টাকা মাত্র, এদিকে সাতটা জোয়ানের কাজ একলাই করে, ইত্যাদি নালিশের কথা ওর মুখে বেশ উপভোগ্য হয়। বলে হয়তো কপাল চাপড়ে, কিন্তু কণ্ঠস্বরে এমন বেপরোয়া ফুর্তির ভাব যে বোঝাই যায়, মোটের উপর ও আছে ভালো। মুখে ওর সরু মাদ্রাজি চুরুট প্রায়ই দেখা যায়, আমার কাছ থেকে মাঝে-মাঝে সিগারেট চেয়ে নেয়, কিন্তু সিগারেটের উপর ওর অশ্রদ্ধা ঘোর। আমাকে বলে—অত সিগ্রেট খেয়ো না বাবু, কলিজা ঝাঁজরা হ'য়ে যাবে। এক-এক সময় ঘরে এসে অনর্গল কত যে কথা ব'লে যায় সব তার

বুঝি না বোঝবার চেষ্টাও করি না। আমাদের চাইতে মানবিকা সম্বন্ধে ওর উৎসাহ বেশি, কেননা পাপ্পার সব কথায় তিনি মাথা নেড়ে সায় দেন, এবং সেই প্রবল শব্দস্রোতে নিজেও নানা রকম ধ্বনিসংযোগ ক'রে চলেন—সেটা বোধ করি পাপ্পার পছন্দ হয়।

মানবিকার কথাটা তাহ'লে শেষ করি। এমন লোক কেউ-কেউ আছে জানি যারা তাঁর মধ্যে অসাধারণ বুদ্ধি দেখতে পায়; আমার মতটা কিছু অন্য রকম। সত্যি কথা বলবো, তাঁর বোধশক্তি সম্বন্ধে আমি কিছু হতাশই হয়েছি এবারে। ভেবেছিলুম, সমুদ্র দেখে ইনি আনন্দে উথলে উঠবেন, কিন্তু সমুদ্রের দিকে এঁর চোখই ফেরানো যায় না; যদি বাইরে নিয়ে গিয়ে বলি গ্যাখো সমুদ্র, ইনি সোজা পিঠ ফিরিয়ে ঘাড়ের উপর মুখ গুঁজবেন। একদিন নিয়ে গেলুম সমুদ্রের জল গায়ে লাগাতে—বাস্‌রে, কী কান্না, ভয়ে শক্ত হ'য়ে গেলো। অত বড়ো একটা জলজ্বলে সমুদ্র যাঁর মধ্যে কোনোরকম সাড়া তোলে না, বলুন তো তাঁর মানসিক বৃত্তি সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা হয় কি? এদিকে ভয় আছে টনটনে, বালুর উপরেও বসবেন না, দু-হাতে আঁকড়ে লেপটে থাকবেন কোলে। আমার মনে হয় যে-সব জিনিশ খুব বড়ো সেগুলো একেবারেই তাঁর ধারণার অতীত; নিকট পারিপার্শ্বিকের বাইরে একমাত্র চাঁদের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ দেখেছি, কেননা চাঁদ দেখতে ছোটো, বোধহয় একটা উঁচু দরের খেলনা মনে হয় তাঁর। তাছাড়া, যত জিনিশকে আমরা সুন্দর বলি, আশ্চর্য বলি, সে-সমস্তর প্রতি এঁর অপার উদাসীনতা। সমুদ্র উনি দেখবেন না, কিন্তু খাবার জন্যে একটা মুর্গি এনে রেখেছিলুম, সেটাকে পেয়ে এঁর কী ফুর্তি! বন্দী কুক্কুটকে ঘিরে নেচে-নেচে যত অদ্ভুত আওয়াজ ইনি মুখ দিয়ে বের করতে লাগলেন তার অনুলিখন এই বর্ণমালার সাহায্যে অসম্ভব। পশু-পাখির প্রতি মানবিকার প্রবল অনুরাগ: গোরু কি কুকুর দেখলে তো আত্মহারা। আমি নিজে কোনো মন্তব্য করতে চাই না; কিন্তু নিরপেক্ষ ব্যক্তি এ থেকে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে এমন অনুমান করতে পারেন যা তাঁর ভক্তদের পক্ষে সুখের হবে না ব'লেই মনে হয়।

সু—বাবুরা চ'লে যাচ্ছেন। ভোরবেলায় কলকাতার গাড়ি ধরবেন, শেষরাত্রে বাড়ি থেকে বেরোবেন ঝটকা গাড়িতে। আগের রাত্রে তাঁরা আমাদের ভোজে ডাকলেন। খাওয়া হ'লো আমাদেরই ঘরে; আমাদের পরিত্যক্ত ডাইনিংরুমে থালা গেলাশ আর দুই লণ্ঠন সাজিয়ে রীতিমতো ভদ্র ভোজ। আমরাও

যাই-যাই ভাবে অবস্থান করছিলুম ; হঠাৎ ঠিক ক'রে ফেললুম পরশু সকালের ডাক-গাড়িতেই যাবো ওয়াল্টেয়ার। সু—বাবুর সঙ্গী পরামর্শ দিলেন—রাত্রের প্যাসেঞ্জার গাড়িতে চ'লে যান, সকালে বেরোলেও ওরা সম্পূর্ণ একদিনের ভাড়া নেবে। মনে লাগলো কথাটা। টাইমটেবিল খোলা হ'লো—ঠিক ভোরবেলায় ওয়াল্টেয়ার পৌঁছনো যাবে। ভালো। সু—বাবু অনেক দেশ বেড়িয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে খবর মিললো ওয়াল্টেয়ারে ফিরোজ ম্যানশন্স নামে এক বাড়ি আছে সমুদ্রের ধারে, সেখানে আহারাদিও মেলে। নিশ্চিন্ত বোধ করলুম। স্পিরিটল্যাম্প নিয়ে রান্না-বান্না খেলার ফুর্তি এ-ক'দিনে ক'মে এসেছিলো, সত্যি বলতে ; একটু বিরক্তই লেগে উঠেছিলো। চাওয়ামাত্র খাওয়া জুটবে এমন জায়গায় যেতে পারলেই এখন খুশি হই।

শেষরাত্রে সু—বাবুরা আমাদের জাগিয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন। আমি গেলুম তাঁদের সঙ্গে বাইরে রাস্তায় ; ঝটকা দাঁড়িয়ে। চেহারাটা গোরুর গা ড়র, টানে একটা ঘোড়া, তারই নাম ঝটকা। এই যানের খুব প্রচলন এ-অঞ্চলে। এই ঝটকাই ওঁরা ঠিক ক'রে দিলেন, কাল বিকেলে এসে আমাদের বহরমপুর স্টেশনে নিয়ে যাবে, 'কিরায়া' পাঁচ সিকে। এক ঘণ্টায় পৌঁছে দেবে, তবে ওঁরা ব'লে গেলেন আমরা যেন বেলাবেলি বেরুই, স্টেশনে ব'সে থাকতে হ'লে দোষ কী? গাড়ি ঠিক আসবে।

তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার এসে ঘুমোলাম। একটা জাহাজের ডেকে ব'সে আছি, জাহাজ যাচ্ছে রেঙ্গুন। অথচ সঙ্গে আমাদের ওয়াল্টেয়ারের রেলের টিকিট। তাই তো, কী হবে? স্বপ্নের মধ্যে এই দুশ্চিন্তা অসহ্য হ'য়ে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেলো। সঙ্গে-সঙ্গে জানলা দিয়ে চোখ গেলো বাইরে—আরে, সত্যি-সত্যি একটা জাহাজ এসে দাঁড়িয়েছে। দু-দিন আগে একটা জাহাজ এসেছিলো, কোকনদ থেকে রেঙ্গুন যাচ্ছে। আজকের জাহাজ উল্টো পথের, আসছে রেঙ্গুন থেকে। গোপালপুরে অনেকক্ষণ দাঁড়ায়, নৌকো ক'রে যাত্রীরা নামে ওঠে। আসলে এরা মালের জাহাজ, মজুরশ্রেণীর যাত্রীও যায় কিছু-কিছু, ভাড়া খুব শস্তা।

বিছানা থেকে নেমে দরজাটা খুলে দিলুম। দেখি, আকাশ মেঘে ঢাকা, গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ছী-ছি, এ-সময়ে আবার বৃষ্টি কেন? এ-ব্যাপারটা অলীক এবং ক্ষণিক, আমার জাহাজের দুঃস্বপ্নেরই মতো ; শিগগিরই কেটে গিয়ে সূর্য দেখা দেবে, মনে-মনে নিজেকে এই ব'লে আশ্বাস দিয়ে স্পিরিটল্যাম্প

ধরালাম। মক্ষিরানীকে অবাক ক'রে দেবো আজ। জল ফুটিয়ে চা করলাম, ডিম সেদ্ধ করলাম; একেবারে ছোটো হাজরি সাজিয়ে বেশ গর্বভরেই ডেকে তুললাম মক্ষিরানীকে। সত্যের খাতিরে বলতেই হবে, অমন চমৎকার চা খাওয়া সচরাচর মানুষের ভাগ্যে ঘটে না।

বেলা বাড়লো, আকাশের মুখ বদলালো না। ক-টা দিন এমন চমৎকার কাটিয়ে যাবার দিনে এ কী অনাসৃষ্টি। সমুদ্রটা ছাই রঙে আর বাদামি রঙে মিশে ঘোলাটে; আকাশ যেন পাৎলা সীসের পাতে মোড়া; মাঝে-মাঝে একটু ফ্যাকাশে রোদের আভা যদি বা দেখা দেয়, পরক্ষণেই আমাদের হৃদয়ের আশার মতোই নিবে যায়।

রোদ ওঠার আশায় ব'সে-ব'সে যখন বুঝতে পারলুম রোদ আর উঠবে না, তখন গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যেই সমুদ্রে দুটো ডুব দিয়ে এলুম। মক্ষিরানী আজ স্নানের ঘরেরই শরণ নিলেন; তাছাড়া তিনি আজ বড়ো ব্যস্ত, জিনিশ গুছোবার পালা।

বেলা দুপুর। জাহাজটা এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজেছে, আর ধোঁয়া উগরেছে চোঙ দিয়ে। সাধারণ মালের জাহাজ, এমন-কিছু সুন্দর নয় দেখতে, খানিক বাদে তার উপস্থিতিই ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একসময়ে তাকিয়ে দেখি, সে তো চলেছে। চলেছে কোনাকুনি দক্ষিণ দিকে, এই মেঘে বৃষ্টিতে বিশাল সমুদ্রের বুক চিরে কী নির্ভীক, কী বলশালী তার গতি। ঘরে ব'সে দেখতে-দেখতে আমার যেন একটু-একটু ভয়ই করছিলো। উড়ছে ধোঁয়ার নিশেন, জাহাজটি আড় হ'য়ে এগিয়ে চলেছে— অন্তহীন সমুদ্রের মধ্যে কী প্রচণ্ড ওর ভরসা। স্বয়ং রাজা সলোমন সমুদ্রের উপর জাহাজের গতি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, আমি তো কোন ছার। এত বড়ো ভয়ংকর সমুদ্র কিনা একা চ'ষে বেড়াচ্ছে ঐ ছোট্ট জাহাজ। দেখতে-দেখতে সে দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্তে একটা কালো ফুটকি হ'য়ে গেলো আমাদের চোখে, তারপর শুধু একটু ধোঁয়া, তারপর ধোঁয়াও গেলো মিলিয়ে।

তিনটের পরেই আমাদের ঝটকা এসে উপস্থিত। বাঁধাছাঁদা প্রায় শেষ, তাড়াতাড়িতে একটু চা খেয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ করা গেলো। আমরা প্রস্তুত। কিন্তু এত আগেই বেরুবো কী! সেই রাত ন-টায় গাড়ি। এদিকে আকাশের অবস্থা ভালো না, বৃষ্টির জোর বাড়তে পারে, দিনের আলো থাকতে-থাকতেই বেরুনো

ভালো। তা-ই হোক তবে। বকশিশ বিতরণের পালা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সাঙ্গ করলুম— এতগুলো মানুষের সেবা এই পাঁচ দিন ধ'রে ভোগ করেছি, এর আগে তা কিন্তু জানতুম না। ঝটকা ব্যাপারটা ছোটো একটুখানি, মালপত্রেই ভ'রে গেছে, বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে অতি কষ্টে তারই মধ্যে উঠে বসলাম। ওরা সব আছে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে; পাপ্পা বললে— 'হেঁই মা, খোঁকি কেমন থাকে চিঠি লিখো। খোঁকির কথা লিখো।'

'সমুদ্রতীর' (সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবন

কঠিন রোগসংকটের ছায়ায়, দেশব্যাপী জয়ধ্বনির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আশি বছর পুরলো। শুনেছিলুম তাঁর রোগযন্ত্রণার, তাঁর ইন্দ্রিয়বিকলতার কথা; মনে ভয় ছিলো, কেমন না জানি তাঁকে দেখবো। হয়তো দু-একটির বেশি কথা বলবেন না, হয়তো আগেকার মতো নিঃসংশয় নিঃসংকোচে তাঁর পাশে গিয়ে বসা চলবে না। দেখে ভুল ভাঙলো। প্রথম দিন সন্ধ্যায় তাঁকে দেখলুম বাইরের বারান্দায়, মনে হ'লো ক্লান্ত, রাত্রির আসন্ন ছায়ার ভালো ক'রে যেন দেখতে পেলুম না। পরের দিন সকালে যখন তাঁর কাছে গেলুম, তিনি ব'সে ছিলেন দক্ষিণের ঢাকা বারান্দায়। পরনে হলদে কাপড়, গায়ে শাদা জামা। পাশে একটি থালায় বেলফুলের স্তূপ। মুখ তাঁর শীর্ণ, আগুনের মতো গায়ের রং ফিকে হয়েছে, কিন্তু হাতের মুঠি কি কব্জির দিকে তাকালে বিরাট বলিষ্ঠ দেহের আভাস এখনো পাওয়া যায়। কেশরের মতো যে-কেশগুচ্ছ তাঁর ঘাড় বেয়ে নামতো তা ছেঁটে ফেলা হয়েছে, কিন্তু মাথার মাঝখান দিয়ে দ্বিধা-বিভক্ত কুঞ্চিত শুভ্র দীর্ঘ কেশের সৌন্দর্য এখনো অম্লান। মনে হ'লো তাঁর চোখের সেই মর্মভেদী তীক্ষ্ণ ভাবটা আর নেই, তিনি যখন কারো দিকে তাকান সে-চাহনি স্নিগ্ধকোমল। এইজন্যে তাঁকে মোগল বাদশাহের মতো আর লাগে না, বরং অশীতিপর টলস্টয়ের ছবির সঙ্গে কোথায় যেন সাদৃশ্য ধরা পড়ে। এই অপরূপ রূপবান পুরুষের দিকে এখন স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেমন ক'রে আমরা শিল্পীর গড়া কোনো মূর্তি দেখি। এত সুন্দর বুঝি রবীন্দ্রনাথও আগে কখনো ছিলেন না, এর জন্যে এই বয়সের ভার আর রোগদুঃখভোগের প্রয়োজন ছিলো। বর্নার্ড শ একবার এলেন টেরির জন্মদিনে একটি পদ্য লেখেন, তাঁর বলবার কথাটা ছিলো এইরকম যে এ কী আশ্চর্য কাণ্ড যে বছর-বছর আমাদের বয়স বাড়ে আর এলেনের বয়স ক'মে যায়! বয়স যত বেড়েছে রবীন্দ্রনাথ ততই সুন্দর হয়েছেন এ-কথা তাঁর বিভিন্ন বয়সের ছবি ধারাবাহিকভাবে দেখলেই বোঝা যাবে। কিছুদিন আগেও তাঁর মুখে তীব্র একটি উজ্জ্বলতা ছিলো, চোখ যেন ধাঁধিয়ে যেতো, বিরাট সভার মধ্যেও অন্য প্রত্যেকটি মুখ তুলনায় মনে হ'তো ম্লান। সে-ও সুন্দর, কিন্তু আজ তাঁর শীর্ণ মুখে যে-সন্ধ্যারাগের কমনীয়তা দেখা দিয়েছে, দৃষ্টিতে ফুটেছে যে-সকরুণ আভা, সৌন্দর্যের এ-ই বোধহয় চরম পরিণতি।...

তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনে যখন বেরিয়ে আসতুম, রোজই নতুন ক'রে মনে হ'তো যে সমস্ত জীবন ধন্য হ'য়ে গেলো। তাঁর কথা যেন বর্ণাঢ্য গীতিনিস্বন, যেন সুরস্রাবী ইন্দ্রধনু। তা যেমন শ্রুতিসুখকর তেমনি মনোবিমোহন। বাংলা ভাষার উপর তাঁর প্রভুত্ব যে কী বিরাট তা তাঁর মুখের কথা না-শুনলে ঠিক ধারণা করা যায় না। তিনি কথা বলেন হুবহু তাঁর শেষের দিককার গল্প বইগুলোর মতো, অতি সাধারণ কথাকেও অসাধারণ ক'রে বলবার ক্ষমতায় তাঁর গল্পের সকল পাত্রপাত্রীকে তিনি হার মানান, উপমা রূপক থেকে-থেকে ফুটে উঠছে, হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে ঝিলিক দিচ্ছে কৌতুক! তাঁর নিটোল, সুন্দর, স্বর্ণঝংকৃত কণ্ঠস্বর, আর তাঁর উচ্চারণের স্পষ্ট, দৃঢ় অথচ ললিত ভঙ্গির সঙ্গে সকলেই তো পরিচিত, তাঁর মুখে শুনলে বাংলাকে অনেক বেশি জোরালো ও মধুর ভাষা ব'লে মনে হয়। তাঁর অভ্যর্থনার মধুরতা ও আলাপের আন্তরিকতা ভোলবার নয়। অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে থাকতুম পাছে বেশিক্ষণ থাকা হ'য়ে যায়, পাছে তাঁর কাজের কি বিশ্রামের ক্ষতি করি। তিনি একটু থামলেই মনে হ'তো এখন বোধহয় ওঠা উচিত। কিন্তু তিনি একটার পর একটা নতুন প্রসঙ্গ পাড়তেন— এখানে অনেকেই বললেন যে এত কথা আর এত ভালো কথা কবি অনেকদিন বলেননি। তাঁর একটি মহৎ গুণ এই যে যখন যাকে কাছে ডাকেন তার প্রতি সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেন, করো উপস্থিতিতে উন্মনা কি উদাসীন ভাব তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। হয়তো অনেক সময় দু-চার মিনিটেই কথা শেষ করেন, কিন্তু সেই অল্প সময়েই একটি সরস পরিপূর্ণতার স্বাদ আসে— তিনি যে মস্ত একজন কাজের লোক, তাঁর সময় যে মহামূল্য এ-ভাবটা তাঁর মধ্যে কখনোই ফোটে না। অন্নদাশঙ্কর একবার লিখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের কাছে যখনই যাওয়া যায় তখনই মনে হয় তাঁর অফুরন্ত সময়, কোনো কাজই তাঁর নাই। খুব সত্য এ-কথা। ব্যস্ততার ভাব তাঁর স্বভাবে একেবারেই নেই, তাড়াহুড়োর খ্যাপামি কখনো তাঁকে ছোঁয় না; অন্তহীন কাজ নিয়ে অন্তহীন ছুটির মধ্যে তিনি ব'সে আছেন। যখনই যার সঙ্গে কথা বলেন মনে হয় ঠিক ঐ লোকটির সঙ্গে কথা বলা ছাড়া আর-কোনো কাজই নেই তাঁর। তাঁর তুলনায় অতি সামান্য অতি তুচ্ছ কাজ যাঁরা করেন তাঁরাও ব্যস্ততার ঠেলায় নিজেরাও হাঁপিয়ে ওঠেন, অন্যদেরও হাঁপ ধরান; যে-রকম শুনি তাতে বোঝা যায় যে য়োরোপের ক্ষুদ্র লেখকদেরও সাক্ষাৎ পেতে হ'লে বিস্তর বেগ পেতে হয়— এদিকে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে রয়েছে একটি অকুণ্ঠিত মুক্তি

তাঁর দুয়ার সব সময়েই খোলা। নানা দেশ থেকে নানা লোক আসে তাঁকে দেখতে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, পারতপক্ষে কাউকেই প্রত্যাখ্যান করেন না; তাঁর উপর ছোটোবড়ো কত যে দাবি তার অন্ত নেই, সাধ্যমতো সবই পূরণ করেন। সেদিন পর্যন্তও নিজের হাতে সব চিঠির জবাব দিয়েছেন, এমনকি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা পাঠিয়েছেন তাও নিজের হাতে নকল ক'রে। এত কাজের সঙ্গে এত অবকাশকে তিনি কেমন ক'রে মেলাতে পারলেন এ একটা রহস্য হ'য়ে রইলো।

আমরা যখন গিয়েছিলুম রবীন্দ্রনাথ থাকতেন 'উদয়ন'-এর একতলার দক্ষিণ দিকের ঘরগুলিতে। অসুখের পরে তিনি একটু গ্রীষ্মকাতর হ'য়ে পড়েছেন. তাই তাঁর শোবার ঘরে ঠাণ্ডাই যন্ত্র বসানো হয়েছে। ঘরটি বৃহৎ নয়। এক দিকে দেয়াল-লগ্ন লম্বা টেবিলে সারে-সারে ওষুধ পথ্য শিশি বোতল গেলাশ। আর আছে একটি খাট, একটি ইজিচেয়ার, ছোটো বুক-কেসে কিছু বই, আর অভ্যাগতদের বসবার জন্য কয়েকটি চামড়া আঁটা মোড়া। দেয়ালে তাঁর নিজের আঁকা খান দুই, আর চীনে চিত্রী জুপিয়ঁর একটি ঘোড়ার ছবি, তা ছাড়া একখানা জাপানি মেঘের দৃশ্য। পাশে আর-একটি ঘর, সেটি আরো ছোটো। সমস্ত পৃথিবী, পৃথিবীর সব পর্বত প্রান্তর সমুদ্র নদী নগর, সমস্ত সঙ্গ ও নির্জনতা আজ কবিজীবনে এসে মিলেছে ঐ দুটি ছোটো ঘরে আর দু-দিকের বারান্দায়।

রবীন্দ্র জীবনের এই অধ্যায়টি মহাকাব্যের উপাদান। মনে করা যাক দিগ্বিজয়ী একজন রাজা, ঐশ্বর্যের সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতায় যাঁর জীবন কেটেছে, একদিন ভাগ্যের কুটিলতায় তাঁকে রিক্ত হ'তে হ'লো। রাজত্ব রইলো, রইলো অন্তরের রাজকীয়তা, কিন্তু যে-সব পথ দিয়ে রাজার সঙ্গে রাজত্বের যোগাযোগ, সেগুলো বন্ধ হ'য়ে গেলো। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিপ্রেরণা অক্ষুণ্ণ, অক্লান্ত তাঁর প্রতিভার উদ্যম, কিন্তু দেহের যে-সামান্য কয়েকটা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া শিল্পরূপ প্রকাশিত হ'তে পারে না, তারা ঘোষণা করেছে অসহযোগ। যে-কবি বলেছিলেন, 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার', তাঁর ইন্দ্রিয়ের দরজাগুলো একে-একে বন্ধ হ'য়ে আসছে। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, চোখের সঙ্গে বই লাগিয়ে অতি কষ্টে পড়তে হয়, তবু পড়েন। শ্রবণশক্তি নিস্তেজ, আঙুল দুর্বল, তুলি ধরবার মতো জোর নেই, কলমও কেঁপে যায়। তিনি নাকি বলেন, 'বিধাতা মুক্তহস্তেই দিয়েছিলেন, এবার একে-একে ফিরিয়ে নিচ্ছেন। ভেবেছিলুম শেষ জীবন ছবি এঁকে কাটাবো,

তাও হ'লো না।' তাঁর মানস-লোকে ছবিরা ভিড় ক'রে আসে, ওদের রঙে, রেখায় ফোটানো হয় না, ফিরে যায় তারা প্রেতলোকে। মন জ্বলন্ত, হাত চলে না। ক্ষণে-ক্ষণে প্রাণে লাগে সুর, কণ্ঠে জাগে না—ছবির মতোই শূন্যে হারিয়ে যাচ্ছে গীতস্রোত। নানা শিল্পকর্মের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় যে-গান, তার পালাও ফুরোলো। যেদিন বৃষ্টি নামলো, সন্ধেবেলা গিয়েছিলুম কবির কাছে। উদয়নের বড়ো বসবার ঘরটিতে দেখলুম রবীন্দ্রনাথের গানের অনেকগুলি রেকর্ড বাইরে প'ড়ে আছে—কবি খানিক আগে শুনছিলেন। তিনি ছিলেন ভিতরের দিকের ছোটো ঘরটিতে, খুব ক্লান্ত ছিলেন সেদিন। আমরা যেতে বললেন, 'একটা বর্ষার গান evoke করবার চেষ্টা করছিলুম—এখন আর হয় না।' শান্তিনিকেতনে বর্ষা এসে কবির অভিনন্দন পেলো না এমন ঘটনা বোধহয় এই প্রথম।

আর তাঁর জীবনের চিরসঙ্গী—তাঁর লেখা? ষোলো বছর বয়স থেকে গদ্যে পদ্যে নানা রূপে নানা বিষয়ে কোটি-কোটি শব্দ যিনি লিখে এসেছেন, তিনি এখন কলম ধরতে পারেন না, নামটা সই করতে কষ্ট হয়। তবু রচনার বিরাম নেই; 'জন্মদিনে' পর্যন্ত নিজের হাতেই লিখেছেন, আজকাল মুখে-মুখে ব'লে যান, যে-কথা পছন্দ হয় না বার-বার তার অদল-বদল করেন, তবু সংশয় থেকে যায় ঠিক কথাটি ঠিকমতো বুঝি বলা হ'লো না। আজকাল তাই নিজের রচনা সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত বিনয়। শরীর যত বড়োই শত্রুতা করুক, রচনায় কোনোরকম অপরিচ্ছন্নতা তিনি সইতে পারেন না; ছোটোদের নাম ক'রে গদ্যে-পদ্যে 'গল্পসল্প' লিখেছেন, তাও হয়েছে উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম। রবীন্দ্রনাথের বইয়ের সমালোচনায় একটা সুর আজকাল প্রায়ই ধরা পড়ে—'বুড়ো হয়েছেন, শরীর ভালো নেই, কী আর লিখবেন—যা লিখছেন এই ঢের!' এই পিঠ-চাপড়ানো ভাবটায় তাঁর রচনার প্রতি শুধু নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিও ঘোর অবিচার করা হয়। আজকাল কোনো লেখাই বোধহয় তাঁকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেয় না, সমালোচকদের কথা তাই অগ্রাহ্য করেন না, বরং শুনতে চান। শুনতে চান, কিন্তু খাতির চান না, অর্ধমনস্ক আন্দাজি প্রশংসা চান না, তিনি জানতে চান রচনাটি হয়েছে কিনা। এখানেই তাঁর বিনয়। আজকের দিনে নিজের প্রতিষ্ঠাকে তিনি গৃহীত ও অনশ্বর সত্য ব'লে ধ'রে নেন না, প্রতিটি নতুন রচনার পিছনে থাকে নতুন লেখকের উৎসাহ; প্রতি বারেই তাঁর নতুন জন্ম ব'লে প্রতি বারেই তাঁর নতুন প্রতিষ্ঠার দাবি। 'হে নূতন, দেখা দিক আর বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ'—তাঁর এই

নবতম বাণী শুধু কথার কথা নয়, ওতে আছে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের মূল সত্য।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে এই যে 'আমার যা হবার হ'য়ে গেছে' এ-ভাবটি কখনো তাঁর মনে এলো না। এ-জন্যেই এত লিখেও তিনি পুরোনো হলেন না, এত দিনেও তিনি ফুরিয়ে গেলেন না। তাঁর লেখা— রবীন্দ্রনাথের লেখা ব'লে নয়— যে-কোনো লেখকের রচনা হিশেবেই দেশের লোকের মনে লেগেছে কিনা সে-বিষয়ে এখন তিনি অনুসন্ধানী। পাঠকদের তিনি বলেন -- আর-কিছু দেখো না, কে লিখেছে, তার বয়স কত, উপজীবিকা কী, সে কোন সমাজের লোক, ও-সব ভুলে যাও, লেখাটা গ্যাখো। অন্য সব বাদ দিয়ে লেখাটাই যদি ভালো লাগে, সেই ভালো লাগাটাই খাঁটি। তাঁর কোনো লেখা কারো ভালো লেগেছে শুনলে তিনি খুশিও হন, যদি সেই ভালো-বলা নেহাৎই খুশি করার জন্য না হয়। কথার মারপ্যাচে তাঁকে ফাঁকি দেয়া অসম্ভব, আন্তরিক অনুভূতির যেখানে অভাব তিনি সহজেই ধ'রে ফেলেন। সে-অভাব সমালোচকেরা প্রায়ই পূরণ করার চেষ্টা করেন যুক্তিতর্ক দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ জানেন কতটুকু তার মূল্য। ভালো লেগেছে, এই কথাটি ঠিকমতো বলতে পারাই তাঁর মতে যথার্থ সমালোচনা, এর বেশি আর-কোনো কথা নেই। কিন্তু ঠিকমতো বলা শক্ত। তার জন্য শিক্ষা চাই, চাই অভিজ্ঞতা, শিল্পবোধ। সেটা পাণ্ডিত্য নয়, সেটা অনুভূতিরই শিক্ষা, আলোচ্য শিল্পে প্রত্যক্ষ গভীর অভিজ্ঞতা। তারই জোরে ভালো লেগেছে কথাটা বলবার মতো হয়, শোনবার মতো হয়। এ-কথাটা যেখানে ভালো ক'রে বলা হয় সেখানেই তাঁর মন মেনে নিতে পারে, সমালোচনার অন্যান্য পদ্ধতিতে তাঁর আস্থা নেই। তাঁর সাহিত্য কি ছবির আলোচনায় চুলচেরা বিশ্লেষণ তিনি চান না, ঐতিহাসিক সামাজিক পটভূমিকার বর্ণনাও না, নিছক স্তুতির শূন্যতা তাঁকে পীড়িত করে, তিনি শুধু খোঁজেন বিশুদ্ধ উপভোগের প্রাণবন্ত পরিচয়। তিনি জানেন ভালো-লাগানোটা কত কঠিন কাজ, তার চেয়ে বড়ো কীর্তি শিল্পীর কিছু নেই, আর শিল্পের শেষ যাচাই সেখানেই। আমাদের বলেছিলেন বিদেশীরা তাঁর ছবি কী-ভাবে নিয়েছে। বার্মিংহামে গিয়েছিলেন, সেখানে ওরা বললে, 'এ-ছবি আমাদের নয়; তুমি প্যারিসে যাও, ওরা ঠিক ধরতে পারবে।' প্যারিসে সবাই বললে, 'আমরা এতদিন ধ'রে যা করবার চেষ্টা করছি তুমি যে তা-ই করেছো!' ভালেরির সঙ্গে ছবি দেখতে এসেছিলেন ফরাশি দেশের সবচেয়ে বড়ো আর্ট-ক্রিটিক। 'তিনি আমাকে

জড়িয়ে ধ'রে, চুমু খেয়ে, বললেন, "তুমি যে কত বড়ো আমরা তা জানতুম, কিন্তু তুমি যে সত্যি এতই বড়ো তা জানতুম না।" তারপর গেলুম মস্কোতে, সেখানে সবাই বললে— "এ কী! এ-ছবি তুমি কোথায় পেলে? এ যে সব সোভিয়েট ছবি।"' বিদেশে সর্বত্রই তাঁর ছবির আশ্চর্য সমাদর হয়েছে, সবচেয়ে বেশি জর্মানিতে। বার্লিনে ওরা ওদের ন্যাশনাল গ্যালারির জন্য সমস্ত দেশের তরফ থেকে তাঁর কয়েকটি ছবি কিনে রেখেছিলো, এ-সম্মান আর-কোনো জীবিত চিত্রকরকে ওরা দেয়নি। তথ্যের দিক থেকে উল্লেখ করতে হয় যে সেবারে য়োরোপে রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনী প্রথমেই প্যারিসে হয়েছিলো; আসলে তিনি প্যারিসে গিয়েছিলেন বার্মিংহাম যাবার পরে নয়, আগে, আর বার্মিংহামের আর্ট-ক্রিটিকরা তাঁকে বার্লিনে যেতে বলেন, প্যারিসে নয়। আমাদের কাছে বলবার সময় তিনি বিস্মৃতিবশে দুটো ঘটনা মিশিয়ে ফেলেছিলেন। বার্লিনের কথা তিনি উল্লেখ করেননি, অথচ আমরা তো জানি যে সমস্ত জর্মানি যে-ভাবে তাঁকে বরণ করেছিলো ইতিহাসে তার তুলনা নেই। সেই জর্মানিরও এ-অবস্থা তাঁকে দেখে যেতে হ'লো।

বিশ্বের বৃত তিনি, কিন্তু তাঁর বিশ্বব্যাপী যশ তাঁর মনে মোহ আনেনি। তিনি জানেন কবির প্রকৃত আসন তাঁর স্বদেশ, যদি সে-দেশ মূঢ়ের দেশ হয়, তবুও।

> ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
> ধরা পড়ুক তার রহস্য, মূঢ়ের দেশে নয়,
> যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদী,
> আছে ইংরেজ জর্মান ফরাসী।

এ-কথা পরোক্ষে তাঁর নিজেরই কথা। স্বদেশের কথা, স্বজাতির কথা উঠলে তাঁর কথার সুর বদলে যায়, এই ঈর্ষাকাতর ক্ষুদ্রস্বার্থমগ্ন আত্মবিভক্ত বাঙালি জাতি নিয়ে তীব্র বেদনাবোধ তাঁর মনে চাপা আগুনের মতো জ্বলছে। অথচ সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালির কৃতিত্বের কথা বলতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। ইংরেজ এ-দেশে এলো যে-নবীন সংস্কৃতির বাহন হ'য়ে তার সংঘাতে এত বড়ো ভারতবর্ষের মধ্যে এক বাংলাদেশেই এলো সাহিত্যবন্যা, তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ বলেন, বাংলাদেশে ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিলো। 'ইংরেজের বদলে ফরাশি হ'লে আমরা সবাই মোপাসাঁ হ'চ্ছে উঠতুম।' অর্থাৎ, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায় বলতে গেলে, এটা ইংরেজের জন্য হয়েছে, কিন্তু ইংরেজের জন্যই হয়নি। এ-নবজীবন আমাদের

মধ্যে আসতোই, ইংরেজ উপলক্ষ মাত্র। পাশ্চাত্ত্য প্রেরণা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অন্যান্য বিষয় জাগিয়েছে—কোথাও আইন, কোথাও গণিত, কোথাও বাণিজ্য, কিন্তু সাহিত্যের বিকাশ হ'লো বাংলাদেশে। তারই প্রভাবে বাঙালি তার মাতৃভাষাকে ভালোবাসতে শিখেছে, তার দেশপ্রেমেরও একটি প্রধান অঙ্গ মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ।…

কবি প্রকাশিত হন তাঁর মাতৃভাষায়, তাঁর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রও তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বদেশ, তাঁর ভাষায় যারা কথা বলে তাদের মধ্যে। জগৎ-জোড়া খ্যাতি নিয়েও রবীন্দ্রনাথ আজ জানতে চান তাঁর নিজের দেশকে সত্যি তিনি কিছু দিতে পেরেছেন কিনা। বাংলাদেশ যিনি সৃষ্টি করলেন, তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে বাংলাদেশ তাঁকে গ্রহণ করেছে তো? তিনি যে ব্যর্থ হননি এই কথাটি শুনে যেতে চান। তাঁর এবারের জন্মদিনে যত অভিনন্দন তাঁর উপর বর্ষিত হ'লো তাতে তিনি এইটুকু দেখতে পেলেন যে দেশ তাঁকে গ্রহণ করেছে। 'তোমরা ছুয়ো দাওনি আমাকে—আমাদের দেশে তা-ই দেয়।'

আমরা যখন গেলুম তখন একটি নতুন ছোটোগল্প তিনি সদ্য শেষ করেছেন। আরো অনেক নতুন ও নতুন ধরনের ছোটোগল্প তাঁর কাছ থেকে আমরা পেতে পারতুম—যদি কোনো উপায়ে ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গেই রচনা হ'য়ে যেতো। 'যোগাযোগ'-এর দ্বিতীয় পর্ব সম্পূর্ণ ভাবা আছে, আমাদের বললেন সেই গল্প, রোমাঞ্চিত হ'য়ে শুনলাম। এই গল্প মানসলোকের সীমানা পেরোবে না, অসম্পূর্ণ রইলো 'যোগাযোগ'-এর মতো মহৎ উপন্যাস। বড়ো লেখায় হাত দেবার উপায় নেই, ছোটোদের জন্য ছড়া বাঁধেন, গল্প গাঁথেন, কখনো কবিতা, কখনো সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন—হঠাৎ হয়তো একটি ছোটোগল্প বেরিয়ে যায়, কি রুদ্র তেজে জ্ব'লে ওঠে রণদীর্ণ সভ্যতার প্রতি অভিশাপ—এইভাবে যেটুকু পারেন তৃপ্ত রাখেন মহান আকাঙ্ক্ষাকে। রোগদুঃখের চাইতে ঢের বেশি নিষ্ঠুর এই যন্ত্রণা, শরীর-মনের এই দ্বন্দ্ব। এদিক থেকে তাঁর জীবন এখন উৎপীড়িত, কল্পনার সঙ্গে কর্মের, চিন্তার সঙ্গে প্রকাশের বিরোধে অসহনীয়। অন্তত তা-ই হওয়া উচিত। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না। বরং তাঁর মধ্যে দেখা যায় প্রশান্তির পূর্ণতার ছবি। বধির বেঠোফেনের প্রলয়বিক্ষোভ তাঁর নেই। তিনি আত্মসমাহিত, কিন্তু উদাসীন নন। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চের দিকে তাঁর চোখ খোলা, বাইরের জগতে অন্যায়ের স্পর্ধা সইতে পারেন না, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে

সবই যেন মেনে নিয়েছেন। আক্ষেপ নেই। নালিশ করেন না। নিজের অক্ষমতার কথা যখন বলেন তাতে হয় ঈষৎ কৌতুকের, নয় একটি করুণ কোমলতার সুর লাগে। বিক্ষোভ মনে যদি থাকে তো মনেই আছে। আর-কেউ তার খবর জানে না।

অথচ বেঠোফেনের বধিরতায় চাইতে রবীন্দ্রনাথের এই বন্দী-জীবন ট্র্যাজেডি হিশেবে কম নয়। দেখতে তিনি ভালোবাসেন। সেবারে আমাদের বলেছিলেন, 'এখন আমি আর-কিছুই করি না, শুধু দেখি।' শান্তিনিকেতনের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরের দুপুরে ঘরে-ঘরে যখন দরজা বন্ধ, তিনি কতদিন বারান্দায় ব'সে কাটিয়েছেন দিগন্ত-ছোঁয়া মাঠের মধ্যে দৃষ্টি মেলে। রাত কেটে গিয়ে যখন ভোর হয়, সেই সংগম-সময়টিকে প্রতিদিন দেখেছেন, নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছেন আকাশে, অন্ধকারে, জ্যোছনায়। আর আজ একটি অন্ধকার ঠাণ্ডা-করা ঘরে তিনি বন্দী, হঠাৎ ঘুম থেকে চমকে উঠে তাঁকে জিগেস করতে হয়— 'এখন দিন না রাত ?' জ্যোৎস্না আজ ছায়ার মতো, মেঘ অদৃশ্য। তাঁর জগতে দিনরাত্রির বৈচিত্র্য আর নেই, ঋতুর লীলা ফুরিয়েছে। আশ্রমের পাখিরা ভোরবেলা ডাকাডাকি করে, তিনি শোনেন না; বৃষ্টি পড়ে, তাঁর জগতের নীরবতা ভাঙে না। বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর কাছে পৌঁছয় ক্ষীণ আভাসে, অস্ফুট ইঙ্গিতে, আর কল্পনায়। অসাধারণ তাঁর বৈচিত্র্যপ্রিয়তা; এক জায়গায় বেশিদিন মন টেকে না, কিছুদিন পর-পরই বাড়ি-বদলের ঝোঁক চাপে, তাছাড়া ছিলো অবিরাম দেশভ্রমণ। আর এখন একই বাড়ির মধ্যে ঘর বদল করাও দুঃসাধ্য, ভ্রমণের কথা তো ওঠেই না। ব'সে-ব'সে হয়তো ভাবেন দেশ-বিদেশের নদী নগর পর্বত প্রান্তরের কথা; বিশেষ ক'রে পদ্মার কথা মনে পড়ে, হয়তো ইচ্ছে করে ফিরে যেতে। 'তোমরা পদ্মা-পারের মানুষ— আর দেখলে তো এখানকার কোপাই! কী রুক্ষ দেশ— একেবারে রাজপুতনা। পদ্মা থেকে কোন সুদূরে চ'লে এসেছি।' হঠাৎ হয়তো মনে হয় সমুদ্রের ধারে গেলে সেরে উঠবেন। কিন্তু কত দূরে পদ্মা, আরো কত দূরে সমুদ্র। বেশ, এই ঘরের মধ্যেই তাঁর বৈচিত্র্যসাধন। চেয়ারটি এক-একদিন এক-এক দিকে ঘুরিয়ে বসেন, ঘরের অন্যান্য জিনিশ সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছে, পর-পর দু-দিন দেখলুম না ঘরের একরকম ব্যবস্থা।...

রাত্রে ভালো ঘুম হয় না, নানারকম অদ্ভুত স্বপ্ন ছাখেন, স্বপ্নের মধ্যে কথাও বলেন। রাত দুটোয় জেগে উঠে আর ঘুম নেই। তখন শুরু হয় গল্প, কি কোনো রচনা মুখে-মুখে ব'লে যান। একদিন ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে

কয়েকটি প্রশ্ন লিখে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। এ-বিষয়ে তাঁর মুখে কিছু শুনবো, এর বেশি আশা ছিলো না। পরদিন সকালে যেতেই বললেন, 'কী কতগুলো বর-ঠকানো প্রশ্ন করেছো! এই নাও।' হাতে দিলেন শ্রীমতী রানী চন্দর হস্ত-লিখিত প্রবন্ধ; তাঁর ঘুম ভাঙার পর শুরু করেছিলেন, আমাদের ঘুম ভাঙার আগে শেষ হ'য়ে গেছে। দু-দিন পরে মনে হ'লো ওটা যথেষ্ট হয়নি, সঙ্গে জুড়ে দিলেন আর-একটি ছোটো প্রবন্ধ। রচনা বিষয়ে কোনো অসম্ভব অনুরোধ জানালেও 'না' শুনতে হয় না, একটু হেসে বলেন, 'আচ্ছা, ভেবে দেখবো।' কোনো প্রশ্নেই তিনি নিরুত্তর নন, কোনো প্রসঙ্গেই অনিচ্ছুক নন। তিনি সর্বদাই প্রস্তুত; একদিকে যেমন তাঁকে ঘিরে আছে অফুরন্ত ছুটি, তেমনি আবার তাঁর মনের কারখানা-ঘরে ছুটির লাল তারিখ কখনো ছিলো না, এখনো নেই।...

চ'লে আসার দিন রবীন্দ্রনাথকে দেখলুম রোগশয্যায়। ভাবিনি এমন দৃশ্য দেখতে হবে। বাইরে বিকেলের উজ্জ্বলতা থেকে হঠাৎ তাঁর ঘরে ঢুকে চমকে গেলুম। অন্ধকার; এক কোণে টেবল-ল্যাম্প জ্বলছে। মস্ত ইজিচেয়ারে অনেক-গুলো বালিশে হেলান দিয়ে কবি চোখ বুজে চুপ। ঘরে আছেন ডাক্তার, আছেন সুধাকান্তবাবু। আমরা যেতে একটু চোখ মেললেন, অতি ক্ষীণস্বরে দু-একটি কথা বললেন, তাঁর দক্ষিণ কর আমাদের মাথার উপর ঈষৎ উত্তোলিত হ'য়েই নেমে গেলো। বলতে পারবো না তখন আমার কী মনে হ'লো, কেমন লাগলো। হঠাৎ আঘাত লাগলো হৃদ্‌যন্ত্রে, গলা আটকে এলো, কেমন একটা বিহ্বলতায় তাঁর দিকে ভালো ক'রে তাকাতেও যেন পারলুম না। বাইরে এসে নিশ্বাস পড়লো সহজে। অমর কবি এই উজ্জ্বল আলোর চিরসঙ্গী, রুদ্ধ ঘরে বন্দী হ'য়ে আছে ভঙ্গুর মৃৎমাত্র।

'সব-পেয়েছির দেশে' (সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)

বীটবংশ ও গ্রীনিচ গ্রাম

সপ্তাহে অন্তত তিন দিন, কখনো বা একই দিনে দু-বার, আমাকে আসতে হয় এখানে। এই যেখানে ফিফথ অ্যাভিনিউ আরম্ভ হয়েছে, পার্কের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে পাঁচ নম্বর বাস্‌গুলো, গারিবাল্ডির মূর্তির তলায় খেলা করছে কুকুরের সঙ্গে বালক, আর রাস্তায় চলেছে ছাত্রছাত্রী— মুখর দলে, ঘনিষ্ঠ যুগলে, বা হয়তো কোর্তার তলায় কবি হবার উচ্চাশা নিয়ে, একা। এ-ই ওয়াশিংটন স্কোয়ার, যাকে হেনরি জেমস বিখ্যাত ক'রে গেছেন, যার তিন দিক জুড়ে ন্যুয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সারি-সারি অট্টালিকা দাঁড়িয়ে, আর যার দক্ষিণ প্রান্তে গ্রীনিচ গ্রাম এঁকে-বেঁকে ছড়িয়ে আছে। এর এক বর্গ মাইলের মধ্যে ন্যুয়র্কের অধিকাংশ পুস্তক-প্রকাশকের দপ্তর, যে-সব পত্রিকা অগ্রণী বা 'আভঁ-গার্দ', তাদেরও আস্তানা এখানে ; শিল্পী, সাহিত্যিক, বিদ্রোহীদের পাড়া এটা ; দরিদ্র ও তরুণ বুদ্ধিজীবীর ; যাদের সব পারিবারিক সম্বন্ধ ছিন্ন হয়েছে সেই সব নিঃসঙ্গ মানুষের ; কিংবা যারা বিবাহিত ও আয়ের দিক থেকে সুস্থির হ'য়েও কম খরচে মনঃপূত আবহাওয়া পেতে চায়, তাদের পাড়া। অন্তত এই 'গ্রাম' সম্বন্ধে এটাই কিংবদন্তি।

আমার কর্মস্থল এটা, যারা বেড়াতে আসে তাদের নর্মস্থল। বছর যখন বসন্তে পা দিলো তখন থেকে দেখছি বাস্‌-বোঝাই ট্যুরিস্ট চলেছে এ-সব পথ দিয়ে ; ক্যানসাস, টেক্সাস, কলোরাডো বা আইডাহো থেকে এসেছে তারা, কেউ-কেউ হয়তো এই প্রথম 'বড়ো শহর' দেখলো। ন্যুয়র্কের তারকাচিহ্নিত দ্রষ্টব্যের মধ্যে এও একটি— এই 'গ্রাম' ; কেননা 'দ ভিলেজ' মানেই বোহেমিয়া, প্যারিসের 'বাম তীরে'র ইয়াঙ্কি প্রকরণ, কেননা জীবন এখানে প্রথামুক্ত, আচরণ স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন, বেশবাস আলুথালু, শ্বেত-কৃষ্ণে বা ধনী-দরিদ্রে ভেদ নেই, শিল্পকলার মর্যাদা স্বপ্রকাশ ; এখানে ছত্রিশ জাত একই টেবিলে কালো কফি বা নির্ছক ভডকা পান ক'রে থাকে, আর ঘড়িতে রাত এলিয়ে পড়লেও কাফের দরজা বন্ধ হ'য়ে যায় না। তাছাড়া, এটাই সেই বিচরণভূমি, যেখানে বীটবংশের মুমুক্ষুরা ধ্যানে বসেন, কবিতা লেখেন ও জ্যাজ-বাদ্য সহযোগে তা প'ড়ে শোনান, অবস্থা বুঝে জেন অথবা মারিয়ুয়ানার শরণ নেন— এবং কদাচিৎ হয়তো আহার ক'রে নিদ্রাও যান। অন্তত, এই সবই এর বিষয়ে কিংবদন্তি।

যা-কিছু শোনা যায় তা সত্য নাও হ'তে পারে, কিন্তু মানতেই হবে এই

পাড়ার চরিত্র আলাদা। তিনটে অ্যাভিনিউ আর অনেকগুলো স্ট্রীট জড়িয়ে এর ব্যাপ্তি, কিন্তু মানহাটানের অন্যান্য অংশের মতো এর ভূগোল জ্যামিতিক নয় : আট স্ট্রীট, সাত স্ট্রীট···পাঁচ···তিন—তারপরেই নম্বরের বদলে রাস্তার নাম শুরু হ'য়ে গেলো, দেখা দিলো ঋজুতার বদলে বঙ্কিমা ; অ্যাভিনিউ ছেড়ে ভিতরে এলে অলিগলি বেশ জটিল, আর নামকরণ এমন খেয়ালি যে অনেক সময় ট্যাক্সিওলাও ঠিকানা খুঁজে পায় না।···বিস্তর বেগ পেতে হয়েছিলো আমাকে, আট বছর আগে এক সন্ধ্যায়, এই 'গ্রামে' ই. ই. কামিংস-এর বাসা আবিষ্কার করতে। কেউ জানে না প্যাচিন প্লেস কোথায়, কেউ তার নাম পর্যন্ত শোনেনি, কানামাছির মতো একই পথে ঘুরছি ; অবশেষে ট্যাক্সিওলা যখন অসহিষ্ণু আর আমি প্রায় হতাশ, তখন বলতে গেলে দৈবাৎ তার খোঁজ পাওয়া গেলো। প্রায় ডিনারের সময়ে, প্রাচ্য জাতির সময়জ্ঞানহীনতার আবহমান অপবাদ মাথায় নিয়ে চায়ের নিমন্ত্রণে পৌঁছলুম। ন্যুয়র্ক শহরে, যেখানে শুধু গুনতে জানলে আর দিক চিনলে যে-কোনো ঠিকানা বের করা যায়—সেখানে এই !

আর সত্যিও, খাশ ভিলেজে ঢুকলে হঠাৎ প্রায় মনে হয় না ন্যুয়র্কে আছি। সরু-সরু পথ, বাড়িগুলো দোতলা বা তেতলা মাত্র উঁচু, কোনো-কোনোটা দেড়শো বা দু-শো বছরের পুরোনো, কোনোটায় হয়তো অ্যালেন পো একবার এসে উঠেছিলেন। স্টুডিও, বইয়ের দোকান, কফির আড্ডা, ঘরোয়া চেহারার রেস্তোরাঁ, কিছুটা উন্নাসিক ও সাহিত্যিক ধরনের নাইট-ক্লাব, আর ছোটো-ছোটো শৌখিন দ্রব্যের দোকান, যেখানে হয়তো সাজানো আছে জাপানি মাদুর, তিব্বতি ঘণ্টা, আফ্রিকার মুখোশ, দিনেমারদেশের কাঠের কাজ, আর সবচেয়ে হালফ্যাশনের ভারতীয় তাঁতে-বোনা রেশন—এমন মোটা আর আকাঁড়া তার চেহারা যে দেখলে চট ব'লে মনে হয়। আর রাস্তায়—শিথিল, অলস, উদ্দেশ্যহীন, যথেচ্ছচারী ভিড়।

ভিড়ের মধ্যে বীটবংশকে শনাক্ত করা সহজ। মেয়েরা পরে কালো মোজা লম্বা চুল রাখে, লিপস্টিক মাখে না ; আর পুরুষেরা রাখে দাড়ি আর ঘাড়-বেয়ে-নামা লম্বা চুল, তীব্রতম শীতে ছাড়া টুপি কিংবা ওভারকোট পরে না ; জামা, জুতো বা দেহের পরিচ্ছন্নতাসাধন তাদের হিশেবে অনাচার। কুলপিবরফের খাপের মতো সরু আর আঁটো তাদের পাৎলুন, উর্ধ্ববাস একটা মোটা চেনটানা কোর্তায় সীমিত : চুল চিরুনির সম্পর্করহিত। এ-ই হ'লো শাস্ত্রীয় বা ঠিকুজি-মেলানো বীট, গ্রীনিচ গ্রামে যে-কোনো সময়ে এদের দেখা যায়, কিন্তু শুধু

এদেরই দেখা যায় না। আছেন তাঁরাও, যাঁদের বয়ঃপ্রভাবে মাথা ঠাণ্ডা হ'য়ে থাকলেও স্বভাবদোষে কৌতূহল মেটেনি, কিংবা যাঁরা আপেক্ষিক তারুণ্য সত্ত্বেও এখনো 'ভদ্রলোক' হ'তে লজ্জিত নন। আর আছে, এই দুই প্রান্তের মধ্যে অনেকগুলো সূক্ষ্ম স্তরভেদ: আধা-বীট, হবু-বীট, ছিলুম-বীট, ছদ্ম-বীট, হ'তে-পারতুম-বীট, ইত্যাদি; আর সংখ্যায় এই মাঝারিরাই বৃহত্তম। এদের মধ্যে সকলেই চুল-দাড়ি রাখে না, কারো বা মস্তক নিষ্কেশ, কেউ এমনকি নেকটাই পর্যন্ত বাঁধে; কিন্তু এদের চলাফেরা ও দৃষ্টিপাতের উদাসীন ভঙ্গি দেখেই চেনা যায় এদের; কাফেতে ব'সে নতনেত্রে সুগভীরভাবে চিন্তা করে এরা, কিংবা এক পেয়ালা রাম্‌গন্ধী চা সামনে রেখে বেদান্তের সূত্র আওড়ায়;—শুধু যে পরমাত্মাই সত্য আর জগৎ মিথ্যা, এই কথাটা সদ্য আবিষ্কার ক'রে এরা যেন স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে, ভাবখানা কিছুটা এই রকম।

এই সেদিনও ঢিলেঢোলা কাপড় ছিলো ফ্যাশন: আঁটো পাৎলুনের উদ্ভব হ'লো কোথায় এবং কবে থেকে? অনুসন্ধান ক'রে এই প্রশ্নের কোনো সঠিক জবাব পাইনি। কেউ বলেছেন, সূক্ষ্মমুখ জুতোর মতো এরও জন্মস্থল সাম্প্রতিক ইটালি, আবার অন্য কারো মতে এটা ন্যুয়র্কেরই আবিষ্কার। সে যা-ই হোক, ফ্যাশনটা আজ নিখিলপশ্চিমে স্বীকৃত; আটলান্টিকের দুই তটবর্তী দুই মহাদেশে যেখানেই গিয়েছি এর ব্যত্যয় দেখিনি; ছাত্র ও যুবকদের পাৎলুন সর্বত্র কৃশ ও ঋজু, অনেক সময় কটিতে বা গুল্‌ফেও ভাঁজ থাকে না, তাদের খাটো কোর্তা কণ্ঠপ্রকাশক, আর উচ্ছল চুল অবিন্যস্ত। চল্লিশের ঊর্ধ্বে যাঁদের বয়স তাঁদেরও পরিচ্ছদ পূর্বের তুলনায় অপরিসর; বয়স্করা কিছুটা রক্ষণশীল হ'লেও কালস্পর্শ ঠেকাতে পারেননি। প্রথম গিয়ে একই রকম চমক লাগে মহিলাদের মাথার দিকে তাকালে: হঠাৎ মনে হয়, আট ঘণ্টা সুখনিদ্রার পরে আয়নার দিকে দৃক্‌পাত না-ক'রে এইমাত্র তাঁরা উঠে এসেছেন, কিংবা কেশপ্রক্ষালনের পর ভুলে গেছেন প্রসাধন করতে। অনভিজ্ঞের এমনি ভুল হয় প্রথমে, কিন্তু মনোযোগী হ'লেই ধরা পড়ে যে এই আপতিক অবিন্যাসই তাঁদের পরম বিন্যাস; এই যে হেলাফেলার ভঙ্গি, এই যে ঈষৎকৃষ্ণ, পীতাভ, তাম্র বা পট্টবর্ণ অলকদামের বিশৃঙ্খলা, এই যে এলোমেলো গ্রন্থি, ঘূর্ণি ও কুঞ্চন—যার ফলে কারো হয়তো একদিকে কপাল প্রায় ঢেকে গেছে, আর অন্য কারো চাঁদির উপরে অপ্রত্যাশিত ফণা তুলছে মনে হয়—বুঝতে দেরি হয় না যে এই সবই সুচিন্তিত ও বহুযত্ন-সাধিত, এ-ই হচ্ছে সর্বাধুনিক 'হেয়ার-ডু', রূপচর্চার পরাকাষ্ঠা, কেশশিল্পীর

মূল্যবান পরিচর্যার দ্বারা সম্পন্ন। এতেও আছে ছন্দ, আছে শ্রী, আর তা আছে ব'লেই ধ'রে নেয়া যায় যে জাপানি অথবা বঙ্গীয় ললনার ভূতপূর্ব বিরাট কবরীর মতোই এটা একটা বিশেষ শৈলী— যা মানুষের বুদ্ধি ও প্রযত্ন ভিন্ন সাধিত হ'তে পারে না।

তাহ'লে কি বীটবংশীয়রা প্রবর্তক, না অনুকারক; তাদেরই সংক্রাম কি সমাজের সব স্তরে পৌঁচেছে, না কি তারাও অন্য সকলের মতো সেই সব নিয়ন্তাদের অধীন, যারা অদৃশ্য ও অনেক সময় অনামা থেকে ফ্যাশনের ফর্মান জারি করেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, কিন্তু এটুকু বুঝি যে বীটনিকরা প্রক্ষিপ্ত নয়, এবং ফ্যাশন জিনিশটা শ্রদ্ধেয়। স্থান, কাল ও অবস্থার এক বিশেষ সন্নিপাতের ফলে সমাজের মধ্যে যখন যে-বিশেষ হাওয়া দেয়, চলতি ভাষায় তাকেই বলে ফ্যাশন; সেটাকে বলতে পারি যুগের মেজাজ, ইতিহাসের তরঙ্গ, সেটা বুদ্বুদের মতো দু-দিন পরে মিলিয়ে যাবে ব'লে আজকের দিনে কম সত্য নয়, আর মিলিয়ে গিয়েও তা আগামী দিনে কিছু উদ্বৃত্ত রেখে যাবে। আমাদের তুলনায় পশ্চিমী সমাজ অনেক বেশি সচল ও পরিবর্তনশীল, ব্যক্তিরাও অনেক বেশি আত্মচেতন, তাই ফ্যাশনের প্রভাব এখানে দুর্জয়; জীবনের ছোটো-বড়ো এমন-কোনো বিভাগ নেই যেখানে তা ব্যাপ্ত হ'য়ে না পড়ে; কাপড়ের ছাঁট, চুলের কায়দা, আসবাবপত্র, লোকাচার, কবিতার ছন্দ— এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা সামঞ্জস্য ধরা পড়ে যেন, এবং যে-অবিচ্ছিন্ন ও অদৃশ্য সূত্রটি এদের সম্পৃক্ত ক'রে রাখে তারই নাম ফ্যাশন বললে ভুল হয় না। তা আপনার আমার পছন্দ হয় কি না হয় সে-কথা অবান্তর, কেননা সেটাকে উপেক্ষা করলে যা বাকি থাকে তা কতকগুলো নির্বস্তুক ধারণা শুধু;— সেই ধারণাগুলো— অর্থাৎ লোকেরা অস্পষ্টভাবে যা ভাবছে, যা চাচ্ছে অথবা হ'তে চাচ্ছে— সেগুলোকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের ভাষায় এরাই তর্জমা ক'রে দেয়— এই চুলের ভৌল, কাপড়ের কায়দা, গ্রীনিচ গ্রামে বীটবংশের মিছিল।

মানতেই হবে যে ফ্যাশনের জন্যও লি পো-র কবিতা পড়া ভালো, মদিলিয়ানির ছবি দেখা ভালো, ফ্যাশনের জন্যও স্বীকার করা ভালো যে মানুষের আত্মা আছে আর তার তৃপ্তির পক্ষে আর্থিক উন্নতি যথেষ্ট নয়। এবং এই স্বীকৃতি গ্রীনিচ গ্রামে অবিরল ও অপর্যাপ্তভাবে দৃশ্যমান। এই ছোটো পাড়াটুকুর মধ্যে বইয়ের দোকান যত আছে, আমার বিশ্বাস অবশিষ্ট সমগ্র ন্যুয়র্কে ততগুলো নেই; সপ্তাহে প্রতিদিন রাত্তির বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে

এই দোকানগুলো, তাদের কর্মীরা প্রায় সকলেই বীটবেশধারী ও বয়সে তরুণ, হয়তো তারা ছাত্রছাত্রী, বা কেউ হয়তো দুটো-চারটে পদ্য লিখে ফেলেছে। এ-সব দোকানের ভিতরে ঢুকলে, বা বাইরে দাঁড়িয়ে কাচের জানলায় তাকালেও, স্বীকার না-ক'রে উপায় থাকে না যে সমকালীন জগৎ-সভ্যতায় আমেরিকার যা অন্যতম প্রধান ও গরীয়ান দান, তা এই পেপারব্যাক্ পুস্তকমালা, আবহমান বিশ্বসাহিত্যের সুলভ সংস্করণ, বহু দেশ ও শতাব্দীব্যাপী এই সর্বজনভোগ্য শ্রীক্ষেত্র। বিশেষত আমার মতো কেউ, যার নানা দেশের সাহিত্যে হানা দেবার অভ্যেস আছে, অথচ হানা দেবার মতো উপযুক্ত নতুন বই স্বদেশে যে তেমন বেশি খুঁজে পায় না— পথের ধারে এ-রকম কোনো দোকান দেখলে তার চলা স্তব্ধ হ'য়ে যায়, চোখ বিস্তারিত, মন কম্পমান। যে-সব বই বহুকাল ধ'রে পড়তে চেয়েছি কিন্তু হাতের কাছে পাইনি, যে-সব বইয়ের শুধু নাম শুনেছি কিন্তু চোখে দেখিনি কখনো, বিরল এবং দুষ্প্রাপ্য জ্ঞানে যে-সব বইয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম— সব আছে এখানে, সাহিত্যের কোনো বিভাগ বাদ পড়েনি, মৃত ও জীবিত প্রায় সমস্ত সভ্য ভাষার রত্নগুলি ইংরেজিতে সংকলিত হ'য়ে পর্যায়বদ্ধ— অল্প কিছু সিকি-আধুলি পকেটে থাকলেই দু-একখানা সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফেরা যায়। চলতি কালের বই— যা নিয়ে সবাই কথা বলছে বা ভাবছে বলা উচিত; বা চিরায়ত বই— সফোক্লিস বা দান্তে ধরা যাক— যাকে 'ভালো' ব'লে মানতে হলে প'ড়ে দেখারও দরকার হয় না আর: এই ভাণ্ডার এদেরই মধ্যে আবদ্ধ নয়; যা গুপ্ত, যা বিশেষ, যার দোকানপাট অনেকদিন আগে উঠে গেছে, কিংবা অন্য কোনো অনুরাগ বা চর্চার ফলেই যা নিয়ে কৌতূহলী হওয়া সম্ভব, এমন পুঁথিও অগুনতি আছে ছড়িয়ে: এক বাটি আইসক্রীমের দামে ভাসারির 'শিল্পীদের জীবনী', বা মধ্যযুগের 'পশুতত্ত্ব' হয়তো; কফি-আর-স্যাণ্ডউইচের খরচে শ্রীমতী মুরাসাকির 'গেঞ্জি-কাহিনী' বা পিসেম্‌স্কির 'এক হাজার আত্মা'। আমার পক্ষে অবিশ্বাস্য এই প্রাচুর্য, এবং প্রায় দুঃসহ; কেননা আমার চোখ যতক্ষণে মলাটগুলোর উপর দিয়ে দৌড়ে যায়, ততক্ষণে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে অনেক ছেঁড়া সুতো, হারানো গরজ, ভুলে-যাওয়া ভাবনা: জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে যত আগ্রহ অনুভব করেছিলাম, এবং যেগুলো খাদ্য না-পেয়ে ম'রে গিয়েছিলো— সব ফিরে এসে একসঙ্গে দংশন করে আমাকে, ভেবে পাই না কোনটাকে ফেলে কোনটার দাবি মেটাই। এখন কথাটা এই: এই কাগজের নৌকোগুলো কিছু-কিছু নতুন যাত্রীকে কি নতুন

দেশে অনবরত ভিড়িয়ে দিচ্ছে না? যত লক্ষ পাঠক এদের প্রতি বছর জোটে, তা থেকে, আমরা নিশ্চয়ই ধ'রে নিতে পারি, এক হাজার, বা একশো, বা পঞ্চাশ, বা অন্তত দশজন মানুষ সত্যি ধরা প'ড়ে যাবে কবিতার চক্রান্তে, নতুন ছন্দে বাজবে তাদের হৃৎপিণ্ড, নতুন চোখে দেখবে তারা জগৎটাকে— আর হয়তো নিজেদেরকেও? অতএব, এই গ্রীনিচ গ্রামে যদি শিল্পকলাই 'ফ্যাশনেবল' হয়, যদি এটাই হয় ন্যুয়র্কের সেই পাড়া যেখানে কবিতার বই থরে-থরে অলঙ্কৃত, আর রঙ্গমঞ্চে নাচ, গান, হল্লার বদলে ব্রেশ্‌ট আর আণ্টন চেখভ উন্মীল— তাহ'লে আর ফ্যাশনের নিন্দে করি কেমন ক'রে?

টাইমস স্কোয়ার ভালোই লেগেছিলো আমার, প্রথম যেবার সেপ্টেম্বরের এক রাত্রি ন্যুয়র্কে কাটিয়েছিলাম। তার উগ্রতা, আলো আর বিজ্ঞাপনের চীৎকার, তার দুর্ধর্ষ দেখানোপনা— এগুলোকে, আমার মনে হয়েছিলো, অর্থ দিয়েছে ব্রডওয়ের জনস্রোত— ঘন, অনবচ্ছিন্ন, রাত্রি-দিনের বিভেদভঞ্জন জনস্রোত। অন্যান্য অসংখ্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে আমি যেন এই বিরাট, চঞ্চল, নিদ্রাহীন নগরের আত্মাকে স্পর্শ করতে পারবো— এমনি আমার মনে হয়েছিলো তখন। কিন্তু এবার আমাকে টাইমস স্কোয়ার নিরাশ করলে। সব তেমনি আছে: শুধু পথে নেই লোক, নেই উৎসাহ, জঙ্গমতা। শীতের তরাসে সবাই কি আশ্রয় নিয়েছে ঘরে, ড্রাগ-স্টোরে, বা সাব-ওয়ের বিবরে? না কি শনিবার মানে প্রমোদ আর নেই, অনেকেই বাসা নিচ্ছে ঘণ্টাখানেক ট্রেনের আন্দাজ দূরে, বা নিতে বাধ্য হচ্ছে, কেননা সন্তানসমেত দম্পতির পক্ষে মানহাটানে ফ্ল্যাট পাওয়া প্রায় অসম্ভব?…কিন্তু যেদিন, দু-তিন সপ্তাহের ব্যবধানে, একটু বেশি রাত্রে 'গ্রামে' এলাম, সেদিনও ছিলো শনিবার, ঠাণ্ডাও কনকনে, তবু দেখলাম রাস্তায় ভিড় নিবিড়, চারদিকে স্বাচ্ছন্দ্য ও গতি: যেন এক অনুচ্চারিত নিমন্ত্রণের উত্তরে দলে-দলে নানা রকম মানুষ এসে মিলেছে এখানে, আমাদের দেশের খোলা হাওয়ার মেলার মতো আবহাওয়া যেন, কারো কিছু বাধ্যতা নেই, ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই, হাসছে, কথা বলছে, বা দাঁড়িয়ে আছে জানলার কাচে তুলুস-লোত্রেকের কোনো ছাপা ছবির দিকে তাকিয়ে। একটি তরুণী নিয়ে এসেছে পিঠে বেঁধে তার শিশুকে; একজন লোকের কাঁধের উপর খেলা করছে এক ক্ষুদ্রকায় বাঁদর:— এই শহরে, যেখানে শিশু বিরল, আর পশুরা সব চিহ্নিত ও মর্যাদাবান সেখানে দুটি অপ্রত্যাশিত অবোধ প্রাণীর বিহ্বল চোখ যেন ফক হারানো স্বর্গের স্মৃতি এনে দিচ্ছে তাদের

মনে, যারা ক্লান্ত আজ নিয়মে ও নিরাপত্তায়, অথচ তার অভাবও ঠিক সইতে পারে না। হয়তো অনেক বেদনা প্রচ্ছন্ন আছে এই ফুটপাতে ; নষ্ট আশা, ভাঙা বাসা, দীর্ণ জীবন ;— কিন্তু সেই ব্যর্থতাকে এরা যেহেতু সাহস ক'রে মেনে নিচ্ছে ও প্রকাশ করছে, তাই মনে হয় প্রাণ এখানে ব'য়ে চলেছে অবাধে, ভিড়ের মধ্যে, পথের মোড়ে-মোড়ে, উচ্ছল।

সন্দেহ নেই, এখানকার পথে, দোকানে, রেস্তোরাঁয় সঞ্চরণ করলে ভিন্ন একটা স্বাদ পাওয়া যায়, যা বিশেষভাবে ন্যুয়র্কীয় ও চলতি কালের, অথচ যা বিদেশীর অভিজ্ঞতার মধ্যে সহজে ধরা দেয়। চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না, বরং কাছে টেনে নেয়, এটাই এর প্রধান গুণ। ঋতু যখন মৃদু হ'য়ে এলো, তখন দেখেছি গ্রীনিচ গ্রাম চিত্রকলার অনুশীলনে উচ্ছল ; যেন সারা পাড়া জুড়ে বসেছে আঁকিয়ে ছেলেমেয়েরা ; কেউ তারা স্টুডিওতে ব্যস্ত, তাদের সামনে বিশেষ ভঙ্গিতে পেশাদার মডেলরা স্থির, আরো অনেকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছে ; কেউ তারা ফুটপাতেই চেয়ার পেতে ব'সে গেছে ; এক ডলার বা দেড় ডলার দিলে তক্ষুনি আপনার পোর্ট্রেট এঁকে দেবে প্যাস্টেলে, কিছু অধিক মূল্যে তামার ফলকে সাদৃশ্য তুলে দেবে। স্টুডিও, ছবির দোকান, প্রদর্শনী ; শিল্প-গুরুদের শস্তা প্রিন্ট, নব্যতম মার্কিনিদের মৌলিক নমুনা, একপাশে হয়তো কফির কাউন্টার, সিগারেটের কল, ঘোরানো তাকে পেপার-ব্যাক বই, আর সর্বত্র অলস ভিড় কৌতূহলে ছড়ানো : ফাঁকে-ফাঁকে, ইটালিয়ান আর হিস্পানি রেস্তোরাঁ, রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে কোনো অদ্ভুত নামের নাইট-ক্লাব ; ঢুকলে হঠাৎ অন্ধকারে মনে হয় কোনো ডাইনির গুহা বুঝি এটা ; কিন্তু ভয় পাবেন না, জায়গাটা আসলে খুব নিরীহ, কাব্যরোগে আক্রান্ত ছেলে-ছোকরাদের আড্ডা আরকি, সেইজন্যেই টেবিলে নেই কাপড়, চেয়ারগুলো নড়বড়ে, দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলোতে আপনি যাকে অর্থ বলেন তা খুঁজে পাবেন না ; একটু বসুন, ইচ্ছে হয় তো কান পাতুন ওদের গান-বাজনায় বা কবিতা পড়ায়, যদি এক পেয়ালা চা পর্যন্ত না-নিয়ে উঠে চ'লে যান তো কেউ কিছু বলবে না ; সব মিলিয়ে, রাত্রিটি বেশ সজীব ও স্বচ্ছন্দ। শুনতে বেশ ভালো লাগছে তো? কিন্তু সত্যের খাতিরে বলতেই হ'লো যে এই ছবির উল্টো পিঠও আছে। 'দি ভিলেজ'-এর মধ্যেই এমন কফিখানা পাবেন যেখানে এক পেয়ালা কফির মূল্য আধ ডলার, এবং আরো আধ ডলার পারিতোষিক দেয়া নিয়ম ; এই অগ্নিমূল্যের কারণ বোধহয় এই যে কফির বাটি আপনার

টেবিলে যারা এনে দেয় সেই মেয়েদের পরনে থাকে আঁটো, স্বচ্ছ, তিমিরকৃষ্ণ ইজের, মুখে গাঢ় পাণ্ডুতার প্রলেপ, আর চোখে—ঠিক বলতে পারবো না, কিন্তু মনে হয় সুর্মার কালিমা। এবং এখানেও আছে এমন নাইট-ক্লাব (অন্তত নামত তা-ই), যাতে ঢুকতে হ'লেই কিছু মূল্য দিতে হয়, আর ঢোকার পরে কিছু খান বা না খান, মাথা-পিছু একটা খরচ ধ'রে নেয়; কিংবা সেখানে একপাত্র অপেয় কফির সঙ্গে বস্তাপচা রসিকতা শোনার জন্য মাশুল দিতে হয় মাথাপিছু তিন-তিন ডলার। এক বাঙালি বন্ধুর সঙ্গে এমনি একটি জায়গায় গিয়ে দেখি, দেওয়ালগুলো কালো কাপড়ে ঢেকে দিয়েছে, পরিচারিকারা কৃষ্ণ-বসনা, শ্লথগমনা ও স্তব্ধবদনী, একদিকে প্রায় পুরো দেয়াল জুড়ে যে-কালিমা-লিপ্ত ছবিখানা ঝুলছে তার উদ্দেশ্য যেন অতিথির মনে ভীতিসঞ্চার। আর অতিথিরা প্রায় সকলেই নীরব ও নতদৃষ্টি, যেন কোনো শোধনাগারে আত্মার ক্ষালন করা হচ্ছে, এমনি আবহাওয়া সেখানে, আর ঐ যে নিগ্রো যুবকটি মাইক্রোফোনের সামনে খাতা খুলে স্বরচিত কবিতা প'ড়ে যাচ্ছে, তাও বোধহয় আমাদের কোনো অজ্ঞাত পাপের জন্য শাস্তিবিধান। বোঝা অবশ্য শক্ত নয় যে ঐ শোকাচ্ছদ, আলোর ম্লানিমা ও চিত্রিত সন্ত্রাস, ঐ অন্তহীন ও ক্লান্তিকর কবিতা— এ-সবই জায়গাটার আকর্ষণ; লোকেরা অধিক ব্যয়ে নারাজ হচ্ছে না যেহেতু তারা 'আর্ট'-এর উপাসক, অন্তত নিজেদের বিষয়ে তাদের এই ধারণা এমন মজবুত যে 'আর্ট' নামাঙ্কিত অদ্ভুতেও তাদের আপত্তি নেই। এমনি কয়েকটা লক্ষণ দেখে সন্দেহ জাগে, বুঝি গ্রীনিচ গ্রামও দেখানোপনা বা ব্যাবসাদারি থেকে মুক্ত নয়: এর যে কোনো ব্রডওয়ে-মার্কা বাবুগিরি নেই সেটাই এর জৌলুশ, কিংবা যেন এর অনুশীলিত অনটনই এর আড়ম্বর: সন্দেহ জাগে, এখানে শিল্পকলার চর্চা যেটুকু আছে তার চেয়েও বেশি আছে কিনা ভান, যাকে সরল বাংলায় 'কাব্যিয়ানা' বলে। কিন্তু— যদি ভান কিছুটা থাকেও, তাতেই বা কী এসে যায়? আবার বলি: ভালো জিনিশের ভানও অ-ভালো নয়, তবে মার্কিন জীবনের একটা অসুবিধে এই যে কোনো ভালোই অবহেলিত হ'তে পারে না, পারে না নিজের মনে ও নিজের ধরনে প'ড়ে থাকতে বা গ'ড়ে উঠতে; তা চোখে প'ড়ে যায় যূথের, আশ্রিত হয় সংঘের ছায়া; ফলত, যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আরম্ভ হয়েছিলো তার পরিণতি ঘটে— অন্য অনেক-কিছুর মতোই— একটি বহুল-প্রচারিত 'আকর্ষণে' বা পণ্যদ্রব্যে। এর উদাহরণ আমাদের গ্রীনিচ গ্রাম, যে বড্ড বেশি জেনে ফেলেছে সে রমণীয়, যার মুখপাত্র-

স্বরূপ দু-দুটো সাপ্তাহিক কাগজ চলছে আজ, যার ইতিহাস-ভূগোলের বিবরণপূর্ণ অনেকগুলো বই পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে। আর-এক উদাহরণ; খাঁটি বীটবংশের কবিরা;— অন্তত গিন্সবার্গের সঙ্গে দেখা হবার প'র তা-ই আমার মনে হ'লো।

* * *

লম্বা নন, বরং বেঁটের দিকে, ছিপছিপে শরীর, গায়ের রং হলদে-ঘেঁষা ম্লান, চোখে চশমা, নেহাৎ 'ভদ্রলোক'দের মতোই দাড়িগোঁফ কামানো, পরিষ্কার সিঁথি-কাটা চুল কিন্তু মাথা নোয়ালে ছোট্ট টাক দেখা যায়; অর্থাৎ চেহারায় শাস্ত্রসম্মত লক্ষণ একটিও নেই, যদিও পালিশহীন জুতো, ইস্ত্রিহীন প্যাণ্ট আর গায়ের গলা-খোলা কোর্তায় গোষ্ঠীচেতনার পরিচয় আছে।— এ-ই হলেন অ্যালেন গিন্সবার্গ, বীটবংশের এক নম্বর কবি, কেরুয়াকের পরেই আদি বীট যিনি, আর কেরুয়াকের সঙ্গে এই উন্মুখর আন্দোলনের স্রষ্টা। এঁর সঙ্গে আমার প্রথম যেখানে দেখা হ'লো, সেখানে গুণী-মানী অতিথি ছিলেন অনেক, আর গৃহকর্ত্রী ছিলেন এমন এক মহিলা যাঁর বন্ধুতা তিন মহাদেশে পরিকীর্ণ, এবং যাঁর ড্রয়িংরুমে অনেক, অনেক নতুন বন্ধুতার সূত্রপাত হয়েছে। এই রকমের বড়ো পার্টিতে অনেকের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু অনেকের সঙ্গেই কথা বলা সম্ভব হয় না; গিন্সবার্গ যখন ভাং অথবা চরস নিয়ে তর্ক ক'রে-ক'রে উত্তেজিত হচ্ছেন, বা প্রতিপক্ষীয় কোনো মহিলার পৃষ্ঠে কুশান তুলে আঘাত করছেন যখন, আমি ততক্ষণে জাপানি সাহিত্য বিষয়ে আমার জ্ঞানের অভাব কিঞ্চিৎ পরিপূরণের চেষ্টা করছি, বা কাউকে হয়তো বোঝাতে চাচ্ছি ভারতীয়ের পক্ষে ইংরেজি ভাষায় কাব্যরচনা কেন প্রায় সম্ভাবপরতার পরপারে। গিন্সবার্গের সঙ্গে আমার কয়েক মিনিট মাত্র কথা হ'লো সেই সন্ধ্যায়। প্রথমেই তিনি অধুনাবিস্মৃত ভারতীয় সোমরসের প্রসঙ্গ অবতারণা করলেন: আমি বললুম খুব সম্ভব সেটা ফরাশি বা ইটালিয়ান ওয়াইনের মতোই দ্রাক্ষারসমাত্র ছিলো, কিন্তু আমার এই অনুমানে গিন্সবার্গের তৃপ্তি হ'লো না। শুনলুম, তিনি তিন দিন পরেই য়োরোপে পাড়ি দিচ্ছেন, সেখান থেকে— যে ক'রে হোক— কোনো-একদিন ভারতবর্ষে পৌঁছবেন। 'আমেরিকার পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কবি এখন ভারতের পথে— কেরুয়াক, আমি—' দুঃখের বিষয়, অন্য তিনটি নাম আমার মনে নেই। এই ব'লে, চশমার পিছন থেকে বড়ো-বড়ো সরল চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে পরের দিন রাত্রে আমাদের সঙ্গে খেতে বললুম। 'আমার এই বন্ধুকে নিয়ে আসতে পারি?' 'নিশ্চয়ই।'

গিন্সবার্গকে কখনো কোথাও একা দেখা যায় না; তাঁর সারাক্ষণের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী হ'লো পীট, পিটার অর্লভস্কি; শুনেছি ইনিও নাকি কবিতা লেখেন এবং বীটসমাজে 'প্রিমিটিভ' ব'লে আখ্যাত। কেমন ঢিলে আর লম্বা মতো চেহারা এঁর, মুখেচোখে কোনো সাড়া নেই যেন, মুখের ভাষা ব্যাকরণ মেনে চলে না, উচ্চারণও অস্পষ্ট। এঁর বিষয়ে বেশি বলা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু গিন্সবার্গকে দেখে, তাঁর কথাবার্তা শুনে, আমার মন নিঃসাড় হ'য়ে রইলো না; আমাকে মানতে হ'লো যে বীটরা সম্প্রদায় হিশেবে যেমনই হোক না, এই মানুষটির আকর্ষণশক্তি আছে।

'আপনি গাঁজা খেয়েছেন?' গিন্সবার্গের প্রশ্ন আমাকে। 'সে কী? কখনো খাননি?···হ্যাঁ, আমি নেশা করি বইকি—মাঝে-মাঝে—যখন মেক্সিকোতে কি দক্ষিণ আমেরিকায় বেড়াতে যাই—কোথায় পাবো বলুন সে-সব জিনিশ এখানে, এমন দেশ যে হুইস্কির মতো সাংঘাতিক বিষ ঘরে-ঘরে চলতে দেয়, আর ঢুকতে দেয় না দেবভোগ্য মারিয়ুয়ানা! আপনার দেশে তো কত রকম আছে—ভাং, চরস, সিদ্ধি: ও-সব ভালো নয় বলছেন, কেন ভালো নয়? জানেন আমি কী চাই? আমি চাই প্রেরণা, চাই স্বর্গ খুলে যাক আমার সামনে, আমি ভগবানকে চাই। আমার 'হাওল' কবিতা এক বৈঠকে লিখেছিলাম, শুক্রবার রাত্তিরে আরম্ভ ক'রে যখন শেষ করলাম তখন রবিবার সকাল। না, আমি যা লিখি তা কখনো কাটি না, বদলাই না কিছু, কোনো মাজা-ঘষা করি না, আমার যখন আসে তখন অমনি আসে। একবার ছেলেবেলায়, আমি কলম্বিয়ার ছাত্র তখন, ব্লেইকের কবিতা পড়ছিলাম ব'সে-ব'সে—"Ah sunflower! weary of time"—অনেকক্ষণ ধ'রে পড়ছি—হঠাৎ আমার মনে হ'লো ব্লেইক নিজে আমাকে তাঁর কবিতা প'ড়ে শোনাচ্ছেন, স্পষ্ট তাঁর গলায় একটি, দুটি, তিনটি কবিতা শুনলাম আমি। পরদিন বন্ধুদের কাছে যখন সে-কথা বললাম কলম্বিয়ায় হৈ-চৈ প'ড়ে গেলো, প্রোফেসররা ভাবলে আমি পাগল হ'য়ে গিয়েছি, আমাকে আট মাস এক মানসিক চিকিৎসালয়ে আটকে রাখলে।'

'না, আমি "ভিলেজে" থাকি না—ওটা বাজে হ'য়ে গেছে আজকাল, যাকে বলে ব্যাবসাদারি তা-ই চলছে, আমার পক্ষে অসম্ভব খরচ ওখানে। আমি থাকি বাওয়ারির কাছে—আপনারা কখনো সেখানে যান না—নিগ্রো, পুয়ের্টোরিকান, সত্যিকার গরিবদের পাড়া সেটা—আর আমাদেরও মনোমতো

আস্তানা। আমার অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া পঞ্চাশ ডলার, তিন-চারজন একসঙ্গে থাকি ব'লে আরো অনেক শস্তা পড়ে। না—আমি আর-কোনো কর্ম করি না, কেউই তা করি না আমরা, এইভাবেই থাকি। আমার *Howl* ষাট হাজার কপি বিক্রি হয়েছে, মাঝে-মাঝে কবিতা প'ড়ে টাকা পাই, মোটের উপর মাসে দেড়শো বা দু-শো ডলার আয় হয় আমার, তাতেই চ'লে যায়, বা চালিয়ে দিই। লোকে বলে আমার কবিতার মানে হয় না—জানেন আমার উত্তর কী? লস এঞ্জেলেসে এক সভায় কবিতা পড়ছি একদিন, শ্রোতাদের একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—"আপনি কী বলতে চাচ্ছেন বুঝিয়ে বলুন!" "বলতে চাচ্ছি—এই!" ব'লে আস্তে-আস্তে সব জামা-কাপড় খুলে ফেলে ওদের সামনে দাঁড়ালুম আমি। আমার কবিতা কানে শুনতে হয়, কেরুয়াকের গদ্যও তা-ই। এই যে আমার নতুন বই এনেছি আপনার জন্য—*Kaddish* এটা আমার দ্বিতীয় বই, এইমাত্র বেরোলো, আর এই বীট অ্যান্থলজিটা: আপনি কেরুয়াক পড়েননি? আশ্চর্য গদ্য, আশ্চর্য ছন্দ ভাষায়—একটু প'ড়ে শোনাই আপনাকে, শুনছেন?—এই আমেরিকায় যে-নতুন ইংরেজি ভাষা জন্মেছে, আর সেই ভাষা ঠিক যেমন ক'রে মুখে-মুখে উচ্চারণ করে লোকেরা, তার তাল, তার ধ্বনি, তার স্পন্দন, সব অবিকল ধরা পড়েছে কেরুয়াকের লেখায়, আর প্রথম তাঁরই লেখায় ধরা পড়েছে।...হ্যাঁ, কেরুয়াকও যাচ্ছেন য়োরোপে, তবে ঠিক এক্ষুনি নয়, পীট আর আমি বুধবারে ছাড়ছি এখান থেকে: প্রথমে প্যারিস, তারপর—জানি না। কিন্তু এ-কথা ঠিক জানবেন যে সারা পথ হাঁটতে হ'লেও ভারতবর্ষে আমরা একদিন পৌঁছবোই, আপনাদের সঙ্গে কলকাতায় আবার দেখা হবে।'

যা বলা হচ্ছে তার জন্যে ততটা নয়, যে-ভাবে বলা হচ্ছে বা যে-মানুষটি বলছেন. তারই জন্যে এঁর সমস্ত কথা বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনছিলুম আমি। বীটদের বিষয়ে, আর সবচেয়ে বেশি গিন্সবার্গ বিষয়ে, যে-সব কাহিনী প্রচলিত আছে: তাঁদের সমাজদ্বেষ; বিবিধ উগ্র ওষধিতে আসক্তি; তাঁদের সমকামী যৌন আচরণ;—এগুলিকে তথ্য হিশেবে মেনে নিয়েও এদের সঙ্গে গিন্সবার্গ মানুষটিকে যেন পুরোপুরি মেলানো গেলো না। বরং এই রুশ-ইহুদি-মার্কিন-মিশ্রিত যুবকটিতে আমি যা পেলুম তাকে বলতে পারি প্রায় প্রাচ্য মৃদুতা, এক সুকুমার মুখশ্রী, বড়ো-বড়ো চোখের দৃষ্টি সরল ও নিষ্পাপ, কণ্ঠস্বর নম্র, বাচন শান্ত, অঙ্গভঙ্গি কোমল; কোনো কথাতেই তিলতম ভান বা আত্মম্ভরিতা নেই, আছে এক স্বভাবসিদ্ধ, হয়তো প্রায় শৈশবধর্মী, বিশ্বাসের আভাস। আমি বুঝতে

পারলুম, এঁর মধ্যে অন্তত পক্ষে সন্ধানটা খাঁটি, অন্তত এক ফোঁটা পবিত্র অনল ইনি পেয়েছেন। তাছাড়া এঁর সরল স্বভাব, আর বয়সের তারুণ্য— এই দুয়ের মিলনে গিন্সবার্গকে আমার তেমনি মনে হ'লো যাতে বিনা "ছেলেটি" ব'লে উল্লেখ করলে ভুল হয় না, বাংলায় কথা বলা সম্ভব হ'লে আমি নিশ্চয়ই তাঁকে "তুমি" বলতুম। অর্থাৎ মানুষটির বিষয়ে আমার যা অনুভূতি হ'লো, বাংলা ভাষায় তাকেই বোধহয় স্নেহ বলে।

* * *

'Beat', 'Beatitude' : এই দুটি শব্দের যমকে এঁদের নামকরণ; বীটবংশ বলতে চান যে তাঁরা সমাজের কাছে স্বেচ্ছায় হেরে গেছেন, এবং তাঁরা পুণ্যের পিয়াসী। এক সাংবাদিক একবার বিদ্রূপ ক'রে এঁদের যে-আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই 'beatnik' ও এখন মার্কিনি শব্দকোষের অন্তর্ভূত। আন্দোলনের সূত্রপাত হয় সান ফ্রান্সিস্কোতে, তখন ১৯৫৬ সাল; মাত্র পাঁচ বছরে এই 'পরাজিত'রা যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৃহদাকার দেশে যে-রকমভাবে জয়ী হয়েছেন, তার তুলনা সাহিত্যের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া শক্ত। এঁরা নিজেদের বিদ্রোহী বলেন কিন্তু বিপ্লবী বলেন না, আর এখানেই ইংলণ্ডের রাগি ছোকরাদের সঙ্গে এঁদের তফাৎ। যাঁদের বলা হয় রাগি ছোকরা, তাঁদের অস্তিত্ব শ্রেণীভেদনির্ভর; ইংলণ্ডের অনুচ্চ শ্রেণীর প্রতিবাদ, প্রতিক্রিয়া, বা প্রতিশোধের বাহন তাঁরা; যে-সব যুবক মেধাবী হ'য়েও জন্মদোষে 'লাল-ইট' বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্বাচীন আঙিনায় আবদ্ধ থেকেছেন, পৌঁছতে পারেননি অক্সফোর্ডে বা কেম্‌ব্রিজে, এই গোষ্ঠী তাঁদের দ্বারা গঠিত; এঁদের রাগের লক্ষ্য সমাজ যা তাঁদের প্রস্তাবিত পথে চলতে রাজি হচ্ছে না: অর্থাৎ, প্রথম যুগের রোমান্টিকদের মতো, এঁরাও সমাজ-সংস্কারে উৎসাহী। কিন্তু আমেরিকার প্রায় শ্রেণীহীন সমাজে এ-রকম ক্রোধের স্থান নেই, সেখানে বিদ্রোহ শুধু বিমুখতার নামান্তর হ'তে পারে। বীট কবিদের ঘোষণাও তা-ই: সমাজ তাঁদের মতে এতই ঘৃণ্য যে তার সঙ্গে বৈরিতার সম্বন্ধস্থাপনও অসম্ভব; শুধু বিশেষ কোনো দেশ-কালের নয়, যে-কোনো সমাজই পরিত্যাজ্য। অতএব তাঁদের সুচিন্তিত নীতি হ'লো সামাজিক অনুজ্ঞালঙ্ঘন: বিবাহ, পরিবার, প্রজনন, গার্হস্থ্য, শিষ্টাচার, রাষ্ট্র অথবা ধর্মযাজনার সংশ্রব— এই সব প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার পরম প্রত্যাখানই এঁদের ধর্ম। এঁদের বস্তিবাস, মাদকসেবন, পর্যটকবৃত্তি, যৌন অনাচার, অর্থকরী কর্মের প্রতি অনীহা— সবই এই প্রত্যাখ্যানের বিভিন্ন অঙ্গ; এগুলো তাঁদের পক্ষে কষ্টকর হ'লেও কর্তব্য, কেননা তাঁদের ধারণায় বুদ্ধ ও খৃষ্ট

দু-জনেই ছিলেন নগ্নপদ ভবঘুরে 'বীটনিক', অতএব এই পথে ভিন্ন মোক্ষলাভের আশা নেই। যদি দেশ হ'তো ভারত, আর কাল হ'তো কয়েক শতক আগে, তাহ'লে আমার মনে হয়, এঁরা চিহ্নিত হতেন নতুন একটি সাধক-সম্প্রদায়রূপে, হয়তো এঁরা তান্ত্রিক মার্গে নিক্রান্ত হ'য়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে চ'লে যেতেন; নিতান্তই বিশ শতকের প্রতীচীতে জন্মেছেন ব'লে অগত্যা এঁদের ক্রিয়াকলাপ শুধু কাব্যরচনায় আবদ্ধ থাকছে।

সুখের বিষয়, সর্বদাই যা হ'য়ে থাকে, বীট-নীতি ও বীট-ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নেই। গিন্সবার্গ যেমন অশাস্ত্রীয়ভাবে শ্মশ্রুহীন ও কাঁকুই-স্পৃষ্ট, তেমনি তাঁর কাব্যকেও বীট-তন্ত্রের বিরোধী বলা যায়। মার্কিন বন্ধুদের মুখে শুনেছিলাম যে বীটরা তাঁদের পিতামাতাকে ঘৃণা ক'রে থাকেন, কথাটার আমি এই অর্থ করেছিলাম যে নিরন্তর নির্বাণকামনার প্রভাবে তাঁরা জন্মেছেন ব'লে খিন্ন হ'য়ে আছেন, তাই জন্মের হেতুদ্বয়কে ক্ষমা করতে পারেন না। কিন্তু গিন্সবার্গের *Kaddish* (ঐ হিব্রু শব্দের অর্থ: শোকার্তের প্রার্থনা)— খুলে দেখি, কবিতাটি আর-কিছু নয়: তাঁর মৃত মাতার স্মরণে এক উদ্বেল শোকোচ্ছ্বাস। আঁরি মিশো, যিনি তিরিশ বছর আগে 'মায়ের ছেলে' বাঙালি জাতিকে ফরাশি ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছিলেন, তিনি এই কবিতাটি পড়লে দেখবেন যে ষাট সালের এক ইয়াঙ্কি কবির কাছে আর্দ্রতম বাঙালিও মাতৃপূজায় পরাস্ত। এবং মা অর্থ যেহেতু গৃহ ও পারিবারিক বন্ধন, তাই কেমন ক'রে বলি যে গিন্সবার্গ সর্বান্তঃকরণে অনিকেত বা উন্মূল?

আমার নিজের অবশ্য মন হয় না যে সমাজকে ত্যাগ করলেই আত্মার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, এবং মাদকের দ্বারা পশুপতির প্রসাদ যদি বা পাওয়া যায়, সরস্বতীর বরলাভ হয় কিনা সে-বিষয়েও আমার সংশয় দুর্মর। কিন্তু, হয়তো খুব ভুল করবো না, যদি বলি যে বীট-তন্ত্রের মূল কথাটি আমি ধরতে পেরেছি। মার্কিন সমাজ আজ সংঘবদ্ধতার এমন একটি চরমে পৌঁচেছে যে কোনো-একদিক থেকে বিদ্রোহ না-জাগলে অস্বাভাবিক হ'তো। তারই প্রবক্তা এই বীটবংশ: অত্যন্ত বেশি সংস্থা, অত্যন্ত বেশি স্বাস্থ্য, অত্যন্ত বেশি বীমা, ছোটো-বড়ো সমস্ত ব্যাপার অত্যন্ত বেশি ব্যবস্থাপনা— এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এঁদের, যা রচনার প্রান্ত ছাপিয়ে জীবনের মধ্যেও ঘূর্ণিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, সাহিত্যে এই বিদ্রোহ ব্যাপারটা নতুন নয়; রোমান্টিকদের সময় থেকে ডাডা ও এজরা পাউণ্ড পর্যন্ত কয়েকটা বড়ো, আর অনেকগুলো ছোটো-ছোটো ঢেউ আমরা উঠতে

দেখেছি; বীটবংশের ধরনধারন তাই চেনা লাগছে; এদের যন্ত্রপাতিও আগে দেখিনি তা নয়। বিদ্রোহের দ্বারা, পূর্ববর্তী আরো অনেকের মতো, তাঁরা সাহিত্যে কিছু টাটকা হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন, অন্তত এই কারণে আমার তাঁদের সমর্থন করতে বাধে না।

কিন্তু হায়, এই বিবেকপীড়িত, গুণতান্ত্রিক বিশ-শতকী প্রতীচীতে বিদ্রোহ ক'রে সার্থক হবার উপায় নেই; যুদ্ধে জেতা বড্ড বেশি সহজ হ'য়ে গেছে। আজকের দিনের সমাজে যাঁরা শক্তিশালী, তাঁরা নিজেদের বুদ্ধির উপর আস্থা হারিয়েছেন; ইতিহাস তাঁদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে; এখন তাঁরা পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্তে বদ্ধপরিকর। আর অনাহারে মরতে পারবে না কোনো তরুণ কবি, নাস্তিকতা বা মুক্ত প্রেম প্রচার করলেও পারবে না কোনো প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হ'তে, পূর্বাচরিত প্রতিটি প্রথা লঙ্ঘন করলেও হ'তে পারবে না সনাতনীদের নিন্দাভাজন। 'অবহেলিত প্রতিভা' সম্ভাবনার অতীত হ'য়ে গেছে; বরং কবিত্বশক্তির অঙ্কুরোদ্গম চোখে পড়ামাত্র প্রবীণ মান্যজনেরা বরমাল্য নিয়ে এগিয়ে আসছেন। জাতি, গোত্র, শিক্ষা, বয়ঃক্রম, ছন্দের পটুতা বা অপটুতা, ব্যাকরণের শুদ্ধি বা অশুদ্ধি— এই সব পুরাতন সূত্রের উপর নির্ভর ক'রে পূর্বযুগের 'কোয়ার্টার্লি রিভিয়ু'র দলবল যে-ধরনের সমালোচনা লিখতেন— ধরা যাক মূঢ়ের মতো, অন্ধের মতোই লিখতেন— তার একটা ভালো দিক এই ছিলো যে আঘাতের ফলে বিদ্রোহীদের শক্তি বেড়ে যেতো। কিন্তু এখন কোনো অজ্ঞাতকুলশীল যুবক, যে নিজেকে কবি ব'লে ঘোষণা করছে, তাকে মনে-মনে উন্মাদ ব'লে সন্দেহ করলেও প্রকাশ্যে কেউ পীড়ন করবেন না; বরং, তার রচনা যদি প্রলাপের মতো শোনায়, তাহ'লেই তার রাতারাতি করতালিলাভের সম্ভাবনা বেশি। 'কে জানে— আমরা আজ বুঝতে পারছি না, কিন্তু যদি বা হয় আর-এক ব্লেইক, আর-এক শেলি বা কীটস, বা নতুন এক ডি. এইচ. লরেন্স! নিন্দে ক'রে কি ভাবীকালের জন্য অনপনেয় কলঙ্ক রেখে যাবো!' 'লেডি চ্যাটার্লিজ লভার' ও 'ইউলিসিস'-এর বিরুদ্ধে সমাজের আক্রোশ ও আক্রমণ ছিলো উদ্ধত, আজ সেই আক্রমণকারীদের কৃপার চোখে দেখি আমরা, কিন্তু 'হাওল'-এর প্রথম প্রকাশের পরে সান ফ্রান্সিস্কোর যে-সব সুনীতিরক্ষক গুরুজন তার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন, বিচারকের মন্তব্য আঘাত করলো তাঁদেরই, সর্বসমক্ষে তাঁরা নির্বোধ ও হাস্যাস্পদ ব'লে প্রতিপন্ন হলেন। 'ট্রপিক অব ক্যানসার' সংক্রান্ত মামলাতেও মিলার হলেন জয়ী, একদা-

নিষিদ্ধ 'ললিটা', 'ফ্যানি হিল্' ইত্যাদিও পেপার-ব্যাকে সর্বত্র আবর্তমান, তাদের অনুকারক ও প্রতিযোগীর সংখ্যাও নগণ্য নয়। এই হ'লো সমকালীন কল্যাণ-রাষ্ট্রে সমাজের ও সমালোচনার ধারা; এর দ্বারা প্রথম লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হন ডিলান টমাস, যাঁর সম্বন্ধে এ রকম সন্দেহ করা যায় যে বিরতি-হীন মদ্যপ হ'য়েই তিনি অধিকতর খ্যাতিলাভ করেছিলেন। সনাতনী গোঁড়ামি, তা ইংলণ্ডের মতো দেশেও এতদূর পর্যন্ত ভেঙে গেছে যে ঐ দ্বীপ আজ ক্ষুদ্র কবিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত, এবং রাগি ছোকরারা আলালের ঘরের দুলাল হ'য়ে বিরাজমান। আর আমেরিকার বীট কবিরা? তাঁরা তো আজ ড্রয়িংরুমের অলংকার, মিলিয়ন-কাটতি পত্রিকায় তাঁদের জীবনী আর ছবি বেরোয়, 'প্লেবয়' পত্রিকায় এক হাজার শব্দের যে-কোনো রচনা ছাপিয়ে অ্যালেন গিন্সবার্গ— নিতান্ত যখন অর্থাভাব ঘটে— এক হাজার ডলার উপার্জন করেন, তাঁদের রচনার সংকলন সম্পাদনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক; আর সেই পুস্তকে থাকে তাঁদের 'জীবনদর্শনে'র ব্যাখ্যা, ব্যবহৃত পরিভাষার নির্ঘণ্ট, গ্রন্থপঞ্জি, তাঁদের বিষয়ে প্রকাশিত আলোচনার সূচি, এমনকি ছাত্রদের জন্য সম্ভবপর প্রশ্নমালা। তাঁরা কে কোথায় থাকেন, সপ্তাহে ক-দিন আহার করেন বা করেন না, তাঁদের দেহে অস্নানজনিত দুর্গন্ধের প্রবাদ কতদূর সত্য— এই সবই আজ লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত, বলতে গেলে গবেষণার বিষয়। এই সমাজত্যাগী বাউণ্ডুলেদের ঘিরে পূর্ণতেজে বিজ্ঞাপন জ্বলছে।

'মনে প'ড়ে গেলো এক রূপকথা ঢের আগেকার!' ঢের নয়, রূপকথাও নয়, মাত্র একশো বছর আগেকার সত্য ঘটনা। ঋণে ও ব্যর্থতায় জর্জর, শার্ল বোদলেয়ার পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াচ্ছেন প্যারিসের শস্তা ছেড়ে শস্তাতর হোটেলে। ব্রাসেলসে লণ্ডনে প্রণয়ঘৃণার গোপন যুদ্ধ শেষ ক'রে র‍্যাঁবো আবিসিনিয়ায় উধাও, আর ভেরলেন নিম্নতম বোহেমিয়ায় নিমজ্জিত। রোগে ও দারিদ্র্যে নষ্ট হয়েছে এঁদের দেহ-মন, পরিষ্কার বিছানায় শুতে হ'লে হাসপাতালে যেতে হয়েছে; বহু মিনতি সত্ত্বেও এক ছত্র প্রশংসা লেখেননি স্যাঁৎ-ব্যোভ; মা, বোন, স্ত্রী যথোচিতভাবে বিমুখ হয়েছেন। এঁদের দিকে ফিরে তাকায়নি সমাজ, সালঁর অধিকর্ত্রীদের স্নেহদৃষ্টি পড়েনি, এঁদের নাম অনুচ্চারিত থেকে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে; এঁদের রচনা ছাপা হয়নি সহজে, বা ছাপা হ'লেও বিক্রি হয়নি, বা কিছু বিক্রি হ'লেও কখনো পায়নি প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠাবানের অনুমোদন: ভিক্তর উগোর বিপুল খ্যাতি ও উপার্জন, গোতিয়ের সম্মত নেতৃপদ—

তার তুলনায় কী নগণ্য এঁরা, কী রিক্ত ও ধ্বনিহীন। অথচ এঁরাই, এঁদের স্বোপার্জিত দুঃখের নেপথ্য থেকে, জনতার অজ্ঞাতে, বৃত নির্বাসনদশায়, পাশ্চাত্ত্য কবিতার জন্মান্তরসাধন করলেন। এঁরাই: উগো নন, গোতিয়ে নন, সমালোচক সঁ্যাৎ-ব্যোভ নন। কিন্তু এই রকমই তো হওয়া উচিত, এটাই ঠিক সংগত, বিদ্রোহী হ'লে সমাজের প্রত্যাঘাত তো সইতেই হবে; যে-কবি সত্যি নতুন, তাঁর বিষয়ে সমকালীন সমাজের বৈরিতাকেই আমরা স্বীকৃতি ব'লে ধ'রে নিতে পারি। আজকের দিনে পশ্চিমী সমাজ প্রত্যাঘাতে পরাঙ্মুখ ব'লেই বিদ্রোহের আর অর্থ নেই সেখানে, তার ধার ক্ষ'য়ে-ক্ষ'য়ে এমন হয়েছে যে সেটাই এখন কৃতিত্বের রাজপথ। অশীতিপর ফ্রস্টের পরেই আজ আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত কবি সবেমাত্র তিরিশ পেরোনো অ্যালেন গিন্সবার্গ, আর এই খ্যাতির নির্ভর এক-আধুলি দামের একটি মাত্র চটি কবিতার বই। তিনি কোথাও কবিতা পাঠ করলে ঘরে আর ভিড় ধরে না; লোকেরা এখনই বলাবলি করছে যে 'ওয়েইস্ট ল্যাণ্ড'র পরে 'হাওল'-এর মতো প্রতিপত্তিশীল কবিতা ইংরেজি ভাষায় আর লেখা হয়নি। মজার ব্যাপার, এবং কিছুটা করুণও: যা-কিছু প্রাতিষ্ঠানিক তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে এই বীট কবিরা নিজেরাই এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলেন, তাই তাঁদের বিদ্রোহী আর বলা যায় না; আশঙ্কা জাগে, তাঁদের হৃদয়ের 'অকথ্য আগুন' অবশেষে না ব্রডওয়ের নিয়ন-বাতিতে পর্যবসিত হয়, কিংবা দু-চারটি চকমকি জ্বেলেই নিবে যায়। কেননা কবিদের যা সবচেয়ে বড়ো শত্রু, তা দারিদ্র্য নয়, অবহেলা নয়, উৎপীড়নও নয়— তা অত্যধিক সাফল্য, তা বহুবিস্তৃত বিজ্ঞাপন।

'দেশান্তর'

'যে-আঁধার আলোর অধিক'

পাঁচ মিনিট আগে পৌঁচেছি হোটেল ক্রাস্‌নাপোলস্কিতে। ঘরে ঢুকেই প্র. ব. শুয়ে পড়েছেন সোফায়, বিশ্রাম ছাড়া অন্য কিছুর জন্যেই এ-মুহূর্তে তাঁর আকাঙ্ক্ষা নেই। ক্লান্ত আমিও— আমাদের সাম্প্রতিক অবস্থায় শরীরের ক্লান্তি অনিবার্য। সেই যে এক বৃষ্টি-পড়া মলিন সন্ধ্যায় ন্যুয়র্ক ছেড়েছিলুম, তারপর থেকে দু-সপ্তাহ ধ'রে অনবরত ঘুরছি— স্থান থেকে স্থানান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে, হোটেল থেকে প্লেন, এবং প্লেন থেকে আবার এক অন্য হোটেলে। মন চায় জগৎটাকে গ্রাস করতে, কিন্তু দেহের সাধ্য সীমিত। রাস্তায়, চিত্রশালায়, আর মালবাহী অবস্থায় বিমানবন্দরগুলোতে মাইলের পর মাইল হেঁটে-হেঁটে আমার একটা পা খোঁড়া হ'য়ে গেছে, প্যারিসে এসে ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছি পায়ে, কিন্তু এখনো স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারছি না। গত দুই রাত্রি প্যারিসে প্রায় নিদ্রাহীন কাটিয়েছি, সেখানে একটি চমৎকার দল জুটেছিলো আমাদের— কলকাতা-বাসিনী বন্ধুপত্নী, দেশত্যাগী ভবঘুরে ভটচায ব্রাহ্মণ, পূর্ব পাকিস্তানি বাংলা সাহিত্যপ্রেমিক, শেষোক্ত দু-জনের বিদেশিনী বান্ধবীরা— এই যোগাযোগের ফলে এবং জুন মাসের রেশম-কোমল বাতাসের উৎসাহে, কাফেতে ঘুরে-ঘুরে রাত্রিযাপন না-করা অসম্ভব হয়েছিলো। মনে হয়েছিলো সারা প্যারিসই কাফেতে ব'সে আছে, কেউ ঘুমোচ্ছে না; আড্ডার এই রমণীয় রাজধানীতে ঘুম জিনিশটাকে মনে হয় নিতান্তই সময়ের অপব্যয়। আজ কাক-ভোরে উঠে প্লেন ধরতে হয়েছে; এক ঘণ্টায় আমস্টার্ডাম, নগরের কেন্দ্রস্থলে এই হোটেল, সামনে চওড়া চত্বর, রাজবংশের অন্যতম প্রাসাদ। এখন বেলা দশটা: আকাশ ঈষৎ মেঘলা, ভেজা-ভেজা অমুজ্জ্বল রোদ জানলা দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে আসবাবে ও গালিচায়, রাস্তায় একটি রক্তবর্ণ পুষ্টদেহ লোক বেহালা বাজিয়ে গান গাইছে, আমরা তাকে কয়েকটি মুদ্রা জানলা থেকে ছুঁড়ে দিয়েছি— আমি টেলিফোন তুলে বলেছি আমাদের ঘরে চা দিয়ে যেতে।

আমিও ক্লান্ত, কিন্তু আমার মনের উত্তেজনায় শরীরের ক্লান্তি চাপা প'ড়ে আছে। এই হোটেলে পা দেয়ামাত্র নিরাশ হয়েছিলুম আমি— কেননা এই মধ্য-নাগরিক অবস্থান আমার অভিপ্রেত ছিলো না। ন্যুয়র্কের আমেরিকান এক্সপ্রেসকে আমি বিশেষভাবে বলেছিলুম, আমরা এমন এক হোটেল চাই যেটা

খালের ধারে অবস্থিত, আর চাই এমন ঘর যার জানলা দিয়ে খালের জল দেখা যায়। বিদগ্ধ পাঠককে বুঝিয়ে বলতে হবে না যে বোদলেয়ারের 'ভ্রমণের আমন্ত্রণ' কবিতার দৃশ্য ও আবহকে প্রত্যক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য ছিলো। পুরোনো কোনো হোটেল, খাঁটি ওলন্দাজি ধরনে সাজানো একটি ঘর, মেঘে মাস্তুলে চিহ্নিত একটি সান্ধ্য আকাশ, জলে সূর্যাস্তের আভা—এই সব প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিলাম। তার বদলে এই ভিড়াক্রান্ত, আনকোরা-বিশ-শতকী, চিক্কণ ও নিশ্চরিত্র হোটেল দেখে মনটা দ'মে গিয়েছিলো—আমেরিকান এক্সপ্রেসের কর্মিকটির প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করিনি। কিন্তু এই ক-মিনিটে সেই আশাভঙ্গজনিত অসন্তোষও আমি কাটিয়ে উঠেছি। আমার মন-খারাপ করার সময় নেই, ক্লান্তি অনুভব করার সময় নেই, বিশ্রাম উপভোগ করার সময় নেই। আমি কোনো সাহিত্যিক বা সামাজিক কর্তব্য নিয়ে আমস্টার্ডামে আসিনি, কোনো প্রতিষ্ঠানের নিমন্ত্রিত আমি নই এখানে; আমি এখানে এসেছি সম্পূর্ণ নিজের গরজে, আমার প্রিয় ও পরিচিত একটি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে। যত শিগগির সম্ভব তাঁর কাছে আমি উপস্থিত হ'তে চাই।

প্র. ব. কিছুতেই আজ বেরোতে রাজি নন, লাঞ্চের পর আমি একাই বেরিয়ে পড়লুম। আমার দিন কাটলো রাইক্সম্যুজিয়মে, আমাকে সঙ্গ দিলেন সারাক্ষণ রেমব্রাণ্ট।

স্পিনৎসাকে বাদ দিলে যিনি হল্যাণ্ডের প্রধান পুরুষ, যাঁর কর্মজীবন নিরন্তর আমস্টার্ডামে কেটেছিলো, এই নগরের প্রধান চিত্রশালা সংগতভাবে তাঁরই দ্বারা অধিকৃত। অন্যান্য প্রতিভাবান শিল্পীরা তাঁর প্রতিবেশে যেন ম্লান এখানে; আজ অন্তত অন্য কারো জন্য আমার সময় নেই। এখানেই আছে সেই আলেখ্য, যা 'নৈশ পাহারা' নামে বিশ্ববাসীর বৃত হয়েছে: সবার আগে সেটি আমি দেখতে চাই। চোখের লোভ সামলে অনেকগুলো ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ পার হ'য়ে এলাম, তারপর একটি শূন্য গলির শেষে মেরুন রঙের মখমলের পর্দা ঠেলে একটি বিশাল কক্ষ পাওয়া গেলো। সামনের দেয়াল সম্পূর্ণ জুড়ে আছে 'নৈশ পাহারা'—বিরাট পট, একটি বিজ্ঞপ্তি প'ড়ে জানলাম একটি অংশ ছেঁটে ফেলে তবে ঐ প্রকাণ্ড দেয়ালে ধরানো গিয়েছিলো। অন্য দেয়ালে ভ্যান ডের-হেল্স্ট-এর একটি পট—যিনি সতেরো শতকে রেমব্রাণ্টের চেয়ে অনেক বেশি লোকপ্রিয় ছিলেন, আর আজ যাঁর নাম বিশেষজ্ঞ ছাড়া কেউ জানে না। এই কক্ষে এ-দুটি ভিন্ন ছবি নেই। দ্বিতীয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করে লোকেরা, প্রথমটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমিও দাঁড়িয়েছি এই ছবির সামনে—দূর থেকে, কাছে থেকে, কোণ থেকে, কেন্দ্র থেকে—বিভিন্নভাবে দেখে-দেখে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছি। অসাধারণ ভাগ্যরেখা নিয়ে এর জন্ম হয়েছিলো। রচনাকালে প্রত্যাখ্যাত ও অমানিত, পরবর্তীকালে জগৎ-জোড়া যশের অধিকারী, আঠারো শতক থেকে 'নৈশ পাহারা' নামে পরিচিত—যদিও তথ্যের হিশেবে ছবিটি নৈশ নয়, এবং এতে কোনো পাহারাও নেই। শুধু নামে নয়, রচনাশিল্পেও অসংগতি এর লক্ষণ—এর ব্যাখ্যা নিয়ে সমালোচকেরা যুগে-যুগে তর্কপরায়ণ, যেন এতে চিত্র-রচনায় কোনো-একটি গোপন সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে যা কোনো প্রামাণিক আদর্শের মধ্যে পড়ে না। রেমব্রান্টের একটি শ্রেষ্ঠ কৃতি একে হয়তো বলা যায় না, অথচ এটি 'মনা লিসা'র মতোই অফুরন্তভাবে আলোচিত। কেন এত তর্ক এই ছবি নিয়ে, কেন এর খ্যাতি এমন অসামান্য?

তার কারণ, এই চিত্র রহস্যময়—হয়তো বা য়োরোপীয় চিত্রকলায় রোমান্টিক ধারার প্রবর্তক, যে-অর্থে শেক্সপীয়র রোমান্টিক, সেই অর্থে। আমস্টার্ডামের তেইশ জন নগররক্ষী রেমব্রান্টের কাছে চেয়েছিলেন নিজেদের যৌথ প্রতিকৃতি, কিন্তু যা রচিত হ'লো তাতে 'শবব্যবচ্ছেদ'-এর নিখুঁত বাস্তবতা দেখা গেলো না: প্রত্যেকে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণভাবে চিত্রিত হবেন, এই দাবি উপেক্ষিত হ'লো। অতএব তাঁরা অগ্রাহ্য করলেন ছবিটিকে—তাঁদের দিক থেকে ভুল করলেন না, কেননা তুলির দ্বারা তখন-পর্যন্ত-অজ্ঞাত ক্যামেরার কর্ম করতে পারেন, এমন শিল্পীর অভাব ছিলো না হল্যাণ্ডে—পরে দলপতি কক্ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ভ্যান ডের হেল্স্ট-এর আঁকা প্রতিকৃতি পেয়ে। রেমব্রান্ট নিজেও পারদর্শী ছিলেন সেই বিদ্যায়, কিন্তু 'নৈশ পাহারা'য় নিজেকে তিনি অতিক্রম করলেন—এই ছবি থেকেই শুরু হ'লো তাঁর সংসারভাগ্যের পতন আর শিল্পী হিশেবে তাঁর মহত্তর পর্যায়।

ছবিটির সামনে দাঁড়ানোমাত্র আমরা যা অনুভব করি, তা গতি, চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা। 'শবব্যবচ্ছেদ'-এর আঁটো বাঁধুনি—প্রতিটি মুখের উপর সমতল আলো, শবের সুনিশ্চিত শবত্ব, চিকিৎসকবৃন্দের স্পষ্ট জ্ঞানস্পৃহা—এ-সবের সঙ্গে এই অস্থিরতার প্রতিতুলনা কতই না সহজ। 'নৈশ পাহারা'য় বাস্তবতা নেই, যাকে আমরা স্বাভাবিকতা বলি তাও নেই; যেন অনেক বিবাদী সুরের সমন্বয়ে, অনেক স্ববিরোধের ছন্দোবন্ধে এর রচনা। এর অজ্ঞাত-উৎস নামকরণ আসলে ভ্রান্ত নয়, কেননা এই বিরাট পট রেমব্রান্টীয় নৈশ আবহে

লিপ্ত হ'য়ে আছে। প্রতিবেশীর জামার উপরে ক্যাপ্টেন কক্-এর হাতের ছায়া দেখে সমালোচকেরা যদিও নিঃসংশয়ে বলেছেন যে সূর্য প্রায় মধ্যগগনে, তবু আমাদের চোখের ও মনের কাছে ঘটনাকাল রাত্রি ব'লে প্রতিভাত হয়। এমনকি আমরা উদ্ধত বর্শাগুলোকে মাঝে-মাঝে মশাল ব'লে ভুল করি, পুরোভূমির আংশিক উজ্জ্বলতায় যেন পটভূমির নৈশ তিমির দৃশ্যমান হ'লো। যে-আলো-আঁধারিতে রেমব্রাণ্ট তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন, যে-ভাবে, রাফায়েলের বিরুদ্ধে, রুবেন্স-এর বিরুদ্ধে, সমগ্র ইটালীয় রেনেসাঁস-শিল্পের বিরুদ্ধে তিনি পটের অধিকাংশ অন্ধকারে রেখে শুধু একটি বা কোনো-কোনো নির্বাচিত অংশকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতেন—তাঁর সেই মায়াজাল 'নৈশ পাহারা'তেও প্রত্যক্ষ করি আমরা। যেমন তাঁর অন্য অনেক স্মরণীয় চিত্রে তেমনি এখানেও অন্ধকারই প্রধান ও ব্যাপ্ত, যেটুকু আলো দেখা যাচ্ছে তা অন্ধকারেরই হৃদয় থেকে উৎসারিত। আমরা বিস্মিত হই, যখন দেখি প্রতিকৃতি আঁকার ফরমাশ নিয়েও বাস্তবধর্মী হবার কোনো চেষ্টাই করেননি রেমব্রাণ্ট—লোকগুলোর মধ্যে কেউ অত্যন্ত ঢ্যাঙা, কেউ এত বেঁটে যে প্রায় কুঁজো মনে হয়, কেউ অস্বাভাবিক স্থূলকায়, কারো-কারো শুধু মুখ, একজনের শুধু একটি চোখ দেখা যাচ্ছে, কোনো-কোনো মুখ ভৌতিক ধরনে অস্পষ্ট, অনেকে অন্ধকারে অর্ধলীন—আর সব সুদ্ধ এমন ঘেঁষাঘেঁষি ভিড় যে তেইশ জনকে খুঁজে পাওয়া সহজ হয় না। সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয় ছবির অনন্য নারীমূর্তিটি—খর্বকায়, প্রোজ্জ্বল, অসুন্দর, প্রায় অতিপ্রাকৃত—এই বীরবৃন্দের মধ্যে কী করছে সে, কেন সারা ছবিতে একমাত্র সে-ই পূর্ণ আলোয় উদ্ভাসিত, তার কোমর থেকে একটা মুর্গি ঝুলছে কেন? সে কি ইহুদি-পাড়ার কোনো দীন রমণী, কোনো পরি, কোনো রূপকথার নায়িকা, ছবির ডান দিকের ছায়াচ্ছন্ন কুকুরটির সঙ্গে তার কি কোনো সম্পর্ক আছে? কিন্তু—সে যেই-ই হোক, এই ছবিতে তাকে কেন স্থান দেয়া হ'লো?

এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, কিন্তু এই রমণীর সূত্র ধ'রে হয়তো রেমব্রাণ্টের অভিপ্রায় অনুমান করা যায়। তিনি কি চেয়েছিলেন এই আত্মাভিমানী ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের বিদ্রূপ করতে—যারা যুগধর্ম ও দেশাচার অনুসারে নিজেদের চাটুকারী প্রতিকৃতি দেখতে চেয়েছিলো—আর সেইজন্যেই এত অসংগতি মিশিয়েছিলেন? এর উল্টোটাই সত্য ব'লে মনে হয় আমার: রেমব্রাণ্ট চেয়েছিলেন এই সাধারণ মানুষগুলোকে স্বপ্নের স্তরে, কবিতার স্তরে

উন্নীত করতে, কোনো নাটকের চরিত্রে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। হয়তো সেইজন্যেই, একটুখানি লোকোত্তর আভাস দেবার জন্যেই, ঐ আকস্মিক ও দুর্বোধ্য নারীমূর্তির অবতারণা। ইতিহাস হিশেবে আমরা জানি যে ছবিটির বিষয় হ'লো 'ক্যাপ্টেন কক-এর শোভাযাত্রা'—অর্থাৎ দলপতি তাঁর কার্যালয় থেকে সদলে বেরোচ্ছেন অস্ত্রচালনা অভ্যাস করতে—কিন্তু এই তুচ্ছ বিষয়কে কোন সুদূরে ফেলে এসেছে রেমব্রাণ্টের কল্পনা! ছবিতে আমরা যা পাচ্ছি তা এক তীব্র সংকটের মুহূর্ত—এত অস্থিরতা ও অবিন্যাস সেইজন্যেই, সেইজন্যেই বসনভূষণের অঙ্কন এমন যত্নহীন, আর মানুষগুলোর বিন্যাসেও প্রথাবদ্ধ শৃঙ্খলা নেই। যেন বিরাট কোনো ঘটনা মুহূর্তকাল পরেই ঘটবে, বা মুহূর্তকাল আগে ঘ'টে গেছে, যেন নিশীথকালে অকস্মাৎ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে নগর, বা আশাতীত কোনো সুসমাচার এসে পৌঁছলো—মানুষগুলো যে যেমন ছিলো তেমনি বেরিয়ে এসেছে বর্শা বন্দুক দামামা আর পতাকা নিয়ে, সুপ্রসাধিত হবার জন্য অপেক্ষা করেনি; যে যেখানে জায়গা পেয়েছে দাঁড়িয়ে গেছে, চেষ্টা করেনি শোভনভাবে বিন্যস্ত হ'তে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রত্যেকের মুখের পেশী টান হ'য়ে আছে, উৎকণ্ঠিত তারা, কিসের যেন প্রতীক্ষা করছে, প্রস্তুত হচ্ছে যুদ্ধের অথবা অভ্যর্থনার জন্য, যেন দাঁড়িয়েছে এক স্মরণীয় মুহূর্তের মুখোমুখি। কী হচ্ছে, বা হ'তে চলেছে তা আমরা কেউ জানবো না কোনোদিন—কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক অনুষঙ্গ নেই, এক অনিশ্চিত অনির্ণেয় জগতে, এক রাত্রিপ্রতিম দিবালোকের প্রদোষে কতগুলো মানুষ যেন একাধিক অর্থে সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। এই ব্যাপ্ত উত্তেজনার মধ্যে শুধু মুর্গি-ধারিণী মেয়েটির মুখ নিতান্ত ভাবলেশহীন; তাকে মনে হয় যেন মানুষ নয়, পুতুল, মানবী নয়, প্রতিমা; এই ঘটনায় কোনো অংশ নেই তার—পট জুড়ে যে-বহুমিশ্র নিনাদ ধ্বনিত হচ্ছে তার মধ্যে সে একা শুধু শব্দহীন সাক্ষী।

'নৈশ পাহারা' রচনার সময় রেমব্রাণ্টের বয়স ছিলো ছত্রিশ। পূর্ণ যৌবন, আদরিণী বিত্তশালিনী স্ত্রী সাস্কিয়া, তুলি চালিয়ে বিবর্ধমান খ্যাতি ও উপার্জন—নানা দেশের ছবি, মূর্তি ও কারুকলার সংগ্রহে সমৃদ্ধ তাঁর পরিবেশ। একজন শিল্পীর পক্ষে যা-কিছু কাঙ্ক্ষণীয় হ'তে পারে, প্রায় সবই তাঁর ছিলো তখন। কিন্তু 'নৈশ পাহারা'র স্বল্পকাল পরে সাস্কিয়ার মৃত্যু হ'লো, ঐ ছবির প্রত্যাখ্যানের ফলে মন্দা লাগলো ব্যবসায়িক প্রসারে। স্ত্রীকে হারিয়ে, ক্রেতা হারিয়ে ছবি আঁকা একদিনের জন্যও থামালেন না, সাস্কিয়ার অর্থের উত্তরাধিকারী

হ'য়ে তাঁর স্বভাবসংগত অমিতব্যয়িতাও বজায় রাখলেন। নিজের ভোগ ও বিলাসিতার জন্য নয়, শিল্প-সামগ্রী সংগ্রহের জন্য এই অমিতব্যয়। ১৬৫৬ সালে—'নৈশ পাহারা'র চোদ্দ বছর পরে—ঋণজর্জর হ'তে-হ'তে অবশেষে লাল বাতি জ্বালতে হ'লো, পাওনাদারেরা নিলেমে তুললো রেমব্রাণ্টের যাবতীয় সম্পত্তি। সেই একই বছরে অন্য এক কঠিনতর আঘাত পেলেন: তাঁর দ্বিতীয়া প্রেয়সী হেনড্রিকিয়েকে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সশরীরে উপস্থিত হ'য়ে কবুল করতে হ'লো যে তিনি 'চিত্রশিল্পী রেমব্রাণ্টের সঙ্গে বেশ্যার মতো বসবাস্ করছেন।' সাস্কিয়ার উইলে একটি শর্ত ছিলো যে রেমব্রাণ্ট আবার বিবাহ করতে পারবেন না, কিন্তু—যেমন অন্য অনেক শিল্পীর জীবনে—তেমনি রেমব্রাণ্টের পক্ষেও নারীর প্রেম ও সঙ্গ ছিলো অপরিহার্য—অতএব এক সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী প্রাক্তন পরিচারিকার সঙ্গে বিনা-অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হলেন। খুব সম্ভব রেমব্রাণ্ট ভেবেছিলেন যে ভগবানের চোখে বিবাহ ব'লে কিছু নেই, এবং পারস্পরিক প্রণয়ের দ্বারাই স্ত্রী-পুরুষের মিলন পুণ্য হয়—কিন্তু এ-সব যুক্তি যেহেতু সমাজপতিরা সাধারণত উপেক্ষা ক'রে থাকেন, তাই নিগ্রহভোগ করতেই হ'লো। হেনড্রিকিয়ে ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা তখন; ধর্মপিতারা শাসালেন যে তিনি তাঁর 'পাপ' প্রকাশ্যে স্বীকার না-করলে তাঁরা তাঁর অজাত সন্তানের আত্মাকে অনন্তকালের জন্য নরকে পাঠাবেন। সন্তানের আত্মাকে বাঁচাবার জন্য হেনড্রিকিয়ে মেনে নিলেন নিজের ধর্মচ্যুতি, 'বেশ্যাবৃত্তি'র শাস্তিস্বরূপ যীশুর করুণালাভের সম্ভাবনা থেকে তিনি চিরকালের মতো বঞ্চিত হলেন—অন্ততপক্ষে চার্চের তা-ই ফতোয়া বেরোলো; তবে যীশু তাঁর স্বনিয়োজিত মর্ত্য প্রতিভূদের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন কিনা, তা আমাদের জানা নেই।

যুগপৎ বিখ্যাত ও দরিদ্র হবার বেদনা আমরা কেউ-কেউ প্রত্যক্ষভাবে জেনেছি। দারিদ্র্য শুধু কষ্টের নয়, তা অসম্মানজনক, তা আমাদের বাধ্য করে হৃদয়ের দিক থেকেও সংকুচিত হ'তে, নানা ধরনের ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোযোগ দিতে। সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে দারিদ্র্য তাই সহজে মেলে না, প্রতিভাবানকে বিকল ক'রে দেবার ক্ষমতা আছে তার। এই অবরোধ ও মালিন্যের মধ্যেই রেমব্রাণ্ট কাটালেন তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়, কিন্তু সাংসারিক দুর্গতি তাঁর সৃষ্টিকে ব্যাহত করতে পারলে না। পুত্র টিটুস ও বুদ্ধিমতী হেনড্রিকিয়ের প্রযত্নে কোনোরকমে সংসার চলে: যা-কিছু তিনি ভালোবাসতেন, তাঁর আজীবন-সঞ্চিত শিল্প-সামগ্রী, কিছুই আর নেই এখন, উঠে এসেছেন ছোটো বাড়িতে,

কিন্তু অটুটভাবে স্বধর্মে তিনি প্রতিষ্ঠিত। অবশেষে প্রিয়তমা হেনড্রিকিয়ে ও টিটুসেরও মৃত্যু হ'লো, তবু তিনি সৃষ্টিশীলতায় অবিচল। শুধু যে অবিরাম চিত্ররচনা করছেন তা-ই নয়, শুধু যে অবক্ষয়ের কোনো চিহ্ন নেই তা নয়, দুর্দিনে আরো গভীর হয়েছে তাঁর শিল্প, আরো মনস্বী, হ'য়ে উঠেছে বিশ্ববেদনার চিত্ররূপ। মৃত্যুর পরে, তাঁর সম্পত্তি রইলো কিছু জীর্ণ বস্ত্র, ছবি আঁকার সরঞ্জাম—আর রইলো অমরতা।

কিন্তু—শুধু শেষ জীবনে নয়, তাঁর সৌভাগ্যের উত্থানকালেও তাঁকে ঘিরে আলোর চেয়ে অন্ধকার কি বেশি ছিলো না, স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে বেশি ছিলো না গোপনতা? অদৃষ্টের এক চমৎকার খেলা দেখা যায় দুই প্রতিবেশী দেশে, প্রায় একই সময়ে, দুই শিল্পীর জীবনধারা। রুবেন্স—ইটালির আলোকপ্রাপ্ত রোমান ক্যাথলিক, ধর্মরাজ ও পৃথ্বীরাজদের প্রিয়পাত্র, বিদগ্ধ, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বশালী, ইয়োরোপের প্রধান বেসরকারি রাজদূত, বিপুল বিত্ত ও প্রতিপত্তি নিয়ে একাধিক অর্থে শিল্পসম্রাট। আর রেমব্রাণ্ট-প্রটেস্টাণ্ট, কিন্তু চার্চের দ্বারা নির্জিত, অনভিজাত, স্বল্পশিক্ষিত, কুলীনসমাজে প্রবেশের অধিকারহীন, সাংসারিক অর্থে অকৃতী এবং উত্তরজীবনে দরিদ্র—এমন একটি মানুষ, যাঁর সমস্ত মেধা ও উদ্যম, সমস্ত ভাবনা ও প্রয়াস একটিমাত্র লক্ষ্যের দিকে অনবরত ধাবিত হয়েছে। রেমব্রাণ্ট কখনো ইটালিতে বা ইংলণ্ডে যাননি, কোনো রাজা অথবা গুণীর সঙ্গে পত্রবিনিময় করেননি, তাঁর কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো ব'লে জানা যায় না: ভ্রমণবিমুখ, অমিশুক ও উৎকেন্দ্রিক স্বভাবের জন্য লোকমুখে তাঁর ডাকনাম হয়েছিলো 'প্যাচা'; খৃষ্টান হ'য়েও আমস্টার্ডামের ইহুদিপাড়ায় বহু বৎসর কাটিয়েছেন, সরু গলিতে, অবহেলিত বিধর্মীদের সংসর্গে—হয়তো বা স্পিনৎসার প্রতিবেশী ছিলেন কোনো সময়ে—যাদের ম্লান মুখাবয়ব ও অচারু বেশবাস বহুবার তাঁর চিত্রে আমরা দেখতে পাই। রুবেন্সের তুলনায় তাঁর জীবন যেমন বৈচিত্র্যহীন, তেমনি তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তুও সীমিত: গ্রীক ও রোমক পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল, খৃষ্টীয় ঐতিহ্য, নারী ও পুরুষ, শিশু ও পশু, মানুষ ও দেবতা—রুবেন্স যেন সারা জগতের লুণ্ঠনকারী: আর রেমব্রাণ্ট অক্লান্তভাবে নিরীক্ষণ করেছেন শুধু মানুষের মুখ, দর্পণে তাঁর নিজের মুখ, নানা বেশে, নানা ভঙ্গিতে, নানা ভাবে আবিষ্ট তাঁর নিজের মুখ মানুষের দেহের মধ্যে যা সবচেয়ে আধ্যাত্মিক সেই অংশটি তিনি বেছে নিয়েছিলেন, আর তারও মধ্যে সেই মুখের প্রতি তাঁর বিশেষ মনোযোগ, যা আমাদের প্রত্যেকের

পক্ষেই নিজস্ব হ'লেও আসলে অচেনা। আমরা অবাক হই না যখন শুনি যে, ১৬৩৬ সালে হল্যাণ্ডে বেড়াতে এসে রুবেন্স সে-দেশের প্রত্যেক বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন; যাননি শুধু রেমব্রান্টের কাছে। শোনা যায়, টলস্টয়ের সঙ্গে ডস্টয়েভস্কির কখনো দেখা হয়নি, কিংবা দেখা হ'লেও যোগাযোগ ক্ষীণ ছিলো। টলস্টয় ও ডস্টয়েভস্কি, গ্যেটে ও হ্যেল্ডার্লিন, উগো ও বোদলেয়ার, টোমাস মান্ ও কাফকা—এই সব বিপরীত যুগল যেমন শিল্পীজীবনের দুই মেরুর প্রতিভূ, তেমনি রুবেন্স ও রেমব্রাণ্ট। কিন্তু কী ভাগ্যে রেমব্রাণ্ট একজন ওলন্দাজ রুবেন্স হ'য়ে জন্মাননি, কী ভাগ্যে রুবেন্স যা-কিছু নন, রেমব্রাণ্ট ছিলেন অবিকল তা-ই।

আমি কি সাহস ক'রে বলবো যে রুবেন্স, রাফায়েল, হালস, ভেলাস্কেজ, টিৎসিয়ানো, বা এমনকি মিকেলাঞ্জেলো আমার মনে কখনো তেমন প্রবল আলোড়ন তোলেননি? আমার রুচির পক্ষে রুবেন্স বড়ো বেশি ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বড়ো বেশি বিলাসী। তাঁর স্থূলবপু খৃষ্টদের মুখে আমি কোনো দেবত্ব দেখতে পাই না; তাঁর স্থূলবপু মাংসল নারীদের অরুণবর্ণ ত্বক—যার আভা সারা পটে ছড়িয়ে পড়ে—তাঁর শ্মশ্রুধারী, পেশীবহুল দৃপ্তকাম বীরবৃন্দ, তাঁর ফেনোচ্ছল ভোগস্পৃহা—এ-সব দেখে আমার চোখ ধাঁধিয়ে যায়, কিন্তু কোনো চিত্তশুদ্ধি ঘটে না। মিকেলাঞ্জেলোতে আমি দেখতে পাই এক অতিমানবিক ক্ষমতার প্রকাশ, কিন্তু আমার মনে তাঁর কোনো বার্তা পৌঁছয় না; আর রাফায়েলের কেন যে এত খ্যাতি তা আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। আধুনিক যুগের পূর্ববর্তী য়োরোপীয় শিল্পীদের মধ্যে আমার পক্ষে যাঁরা মর্মস্পর্শী, তাঁদের মধ্যে আছেন দা ভিঞ্চি, এল গ্রেকো, ড্যুরের, গোইয়া—আর হয়তো বা সবার উপরে রেমব্রাণ্ট।

রাইক্সম্যুজিয়মের কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরছি—রেমব্রাণ্টকে অনুসরণ ক'রে। তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের নমুনা ঝুলছে দেয়ালে-দেয়ালে। ভূদৃশ্য, বাইবেল-চিত্র, সাস্কিয়া, হেনড্রিকিয়ে ও টিটুসের প্রতিকৃতি, বিখ্যাত 'বস্ত্র-ব্যবসায়ীর সংসদ'। শেষোক্ত চিত্রটিকে ভালোবাসতে পারলুম না আমি, কিন্তু টিটুসের একটি প্রতিকৃতি আমাকে মুগ্ধ করলো। রেমব্রাণ্ট ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে রমণীপ্রেমিক, কিন্তু নারীচিত্র অল্পই এঁকেছিলেন, এবং তাঁর সাস্কিয়ার নগ্নচিত্রেও ইন্দ্রলোকের উল্লাস নেই; উর্বশীরা তাঁর জগৎ থেকে নির্বাসিত। কিন্তু কোনো-এক মুহূর্তে তাঁর তুলি থেকে ক্ষরিত হয়েছিলো কৈশোরের মনোহরণ কান্তি, এই কঠিন ও

সাত্ত্বিক প্রকৃতির পুরুষের পক্ষে আশ্চর্য কোমল তাঁর পুত্রের এই প্রতিকৃতি। কিন্তু যে-সব ছবিতে অমোঘ ও গভীরতম রেমব্রাণ্টকে আমরা খুঁজে পাই—হয়তো না-বললেও চলে, তা তাঁর আত্মপ্রতিকৃতির পর্যায়।

আটাশ বছর বয়সে রেমব্রাণ্ট তাঁর নিজের ও সাস্কিয়ার একটি যৌথ প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন—পুস্তকে দেখা সেই ছবিটি আমার মনে পড়ছে। তাঁর সাংসারিক সৌভাগ্যের দিন বিধৃত আছে সেই চিত্রে—তাঁর এক হাত স্ত্রীর কটিতে ন্যস্ত, অন্য হাতে উঁচু ক'রে ধরেছেন সুরাপাত্র: ফ্যাশনদুরস্ত তাঁর পোশাক, গোঁফ সুচারু, মুখ হর্ষোৎফুল্ল, চোখ ঈষৎ মদির। এই সুখী রেমব্রাণ্টকেই আবার আমরা দেখতে পেয়েছি ক্রুদ্ধ স্যামসনের ছদ্মবেশে, সমকালীন অন্য একটি আত্ম-প্রতিকৃতিতে। কিন্তু সারা জীবন সুখভোগ করা তাঁর ভাগ্যে ছিলো না, অন্য এক মহত্তর নিয়তির জন্য তিনি চিহ্নিত ছিলেন। এবং সুখী রেমব্রাণ্ট, যুবক রেমব্রাণ্ট—এ-সব কেমন অশোভন মনে হয় আমাদের, প্রায় আস্থার অযোগ্য, যে রূপে তিনি আমাদের মনে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে আছেন তা এক প্রৌঢ়ের, অকালবৃদ্ধের, দুঃখভোগীর। তার বয়স বাড়ছে, অবস্থার পতন হচ্ছে, শোকের পর শোক পাচ্ছেন, নিঃসঙ্গ থেকে নিঃসঙ্গতর হচ্ছেন কালক্রমে, ক্রমশ নিজের মধ্যে আরো বেশি সংবৃত ও সংহত, মগ্ন হচ্ছেন তাঁর নিভৃত ধ্যানে—এই সব কথাই আমাদের জানিয়ে দেয় তাঁর উত্তরজীবনের পরম্পর আত্ম-প্রতিকৃতি। নারী, সুরা, সুখ—সব অবলুপ্ত; ত্বক জীর্ণ ও শিথিল, ললাট কুঞ্চিত, ছায়াচ্ছন্ন বিস্রস্ত বেশবাস, বেদনাবিদ্ধ মুখ, অন্তর্বীক্ষণে দীর্ণ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, মাঝে-মাঝে ব্যঙ্গচ্ছুরিত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষমাশীল। আমরা লক্ষ্য করি, তাঁর উত্তরপর্যায়ে আত্ম-প্রতিকৃতির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে—যেন উন্মাদের মতো, বোদলেয়ারীয় 'ড্যাণ্ডি'র মতো, তৃপ্তিহীনভাবে অবলোকন করছেন নিজেকে, সেই আত্ম-সমীক্ষাই যেন দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে তাঁর উত্তর এবং বিজয়ঘোষণা। রেনেসাঁস-পরবর্তী শিল্পীদের মধ্যে রেমব্রাণ্টই সবচেয়ে অনুচ্চার—তিনি কোনো ডায়েরি অথবা নোটবই লেখেননি, তাঁর চিঠিপত্র উল্লেখের অযোগ্য, তাঁর কোনো সংলাপ বা বচনও লিপিবদ্ধ হয়নি, তিনি কোনো দুঃখের আঘাতে বিলাপ যদি বা ক'রে থাকেন তা অন্য কেউ জানে না—কিন্তু এই মৌন ও নিভৃত মানুষের আত্ম-জীবনী আমরা প'ড়ে নিতে পারছি তার এই চিত্রপর্যায়েই। শুধু আত্মপ্রতিকৃতি নয়—অন্যান্য ছবিতেও মাঝে-মাঝে তাঁকেই আমরা দেখতে পাই—কখনো তিনি অ্যাবসালম, কখনো বা তরুণ য়োসেফ, কখনো তিনি ক্রুশকাষ্ঠ থেকে

যীশুকে নামাচ্ছেন—কত বিভিন্নভাবেই নিজেকে তিনি অন্বেষণ ও আবিষ্কার করেছেন! এবং যে-সব ছবি আত্ম-প্রতিকৃতি ব'লেই উল্লিখিত সেখানেও তাঁর বেশবাস বিচিত্র, বৈদেশিক, কখনো বা অদ্ভুত, যেন অভিনেতার মতো বিভিন্ন ভূমিকায় নামছেন; কিন্তু এর কারণ নয় কোনো নার্সিসীয় স্বপ্রীতি, কেননা আসলে তাঁর কৌতূহল সর্বমানবের বিষয়ে। নিজের মুখের দিকে অফুরন্ত বার তাকিয়ে অফুরন্ত বার নতুন মানুষ, অন্য মানুষ আবিষ্কার করেছেন তিনি, তাই এই বেশবাসের বৈচিত্র্য ও বৈদেশিকতা; —আমরা দেখতে পাই যে তিনি শুধু নিজের ইতিহাসই ব'লে যাননি, আমাদের সকলেরই গোপন বেদনা উদ্‌ঘাটন ক'রে গেছেন। তাই তাঁর সঙ্গে সংলাপ চলে আমাদের, তাঁর কিছু বলার আছে আমাদের জন্য, আমাদের হৃদয়ের ঘুম ভাঙাতে জানেন তিনি। তাঁর ছবি দেখে আমাদের ইন্দ্রিয় পরিশীলিত হয় না, জগৎ বিষয়ে নতুন কোনো তথ্যও পাই না তাতে, কিন্তু নিজেকেই নতুনভাবে—হয়তো আরো একটু তীব্রভাবে—আবিষ্কার করি।

বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে রেমব্রাণ্ট বোধহয়, একমাত্র, যিনি কখনো সুন্দরের বেসাতি করেননি। নিজে তিনি সুপুরুষ ছিলেন না; তা গোপন করার তিলতম প্রয়াস নেই তাঁর চিত্রে—বরং কোনো-কোনোটিতে তাঁর অনভিজাত মুখাবয়ব ও বার্ধক্যকে যেন বাস্তবের চেয়েও বেশি ক'রে দেখানো হয়েছে। তাঁর সাস্কিয়া বা হেণ্ড্রিকিয়ে আমাদের নয়ন হরণ করে না; —স্নানরতা সুজানা বা বাথশিবা বা এমনকি তাঁর মাতা মেরীরাও সুন্দরী নন; তাঁর যীশুভক্তেরা সামান্য ও দরিদ্র মানুষ; তাঁর হোমর অথবা আরিস্টটলের মুখাবয়বে ক্লাসিকাল সৌষ্ঠব নেই, তাতে বরং কিছুটা ইহুদিভাব ধরা পড়ে। তিনি ভালোবাসতেন ইহুদিদের ছবি আঁকতে, দীন, বৃদ্ধ, চিন্তাকুল সেই সব মুখ আমাদের দিকে যে-অব্যক্ত আর্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকে, তার অর্থ হয়তো আমরা খুঁজে পাই তাঁর কোনো-কোনো আত্মপ্রতিকৃতির মুখোমুখি হ'লে। আমি ভাবছি সেই সব চিত্রের কথা, যাতে তাঁকে দেখা যায় বার্ধক্যে ও বেদনায় বিধ্বস্ত, যাতে জরাজনিত রেখাগুলি স্থূল ও নিষ্ঠুর, লালিত্য নিঃশেষে ঝরে গেছে; সারা মুখ ভাবনার প্রভাবে চিন্ময়। রেমব্রাণ্টকে বলা যায় বিশেষভাবে প্রৌঢ় ও নাস্তিমানের কবি, আত্মিক সৌন্দর্যের, পার্থিব বঞ্চনার। তাঁর সমকালীন চিত্রধারা থেকে এ-বিষয়ে তিনি আশ্চর্যরকম পৃথক।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। হল্যাণ্ডের তৎকালীন ঐশ্বর্যের

চিহ্নমাত্রা নেই তাঁর রচনাবলিতে; তাঁর ছবি দেখে এমন সন্দেহ হয় না যে তাঁরই জীবৎকালে হল্যাণ্ড হ'য়ে উঠছিলো পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ একটি দেশ, স্পেনের আধিপত্য থেকে মুক্ত হ'য়ে বাণিজ্য বিস্তার করছিলো পূর্ব-এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত, ঘরে-ঘরে ঝংকৃত হচ্ছিলো স্বর্ণমুদ্রা, ধনে-মানে প্রধান হ'য়ে উঠছিলো বণিকবৃন্দ। সতেরো শতকের ওলন্দাজ বণিকেরা কী-রকম প্রাচুর্যে ও আরামে দিনযাপন করতেন, কী-রকম সুচারু ছিলো তাঁদের গৃহসজ্জা, কী-রকম পরিপুষ্ট ও সালংকার ছিলেন তাঁদের স্ত্রীরা ও দাসীরা—তা জানতে হ'লে ভেরমের আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক। এই রাইক্সম্যুজিয়মেই দেখছি ওলন্দাজি শিল্পের অন্য এক ধারা: পৃথিবীর ভোগ্যবস্তুর হরিলুঠ প'ড়ে গেছে যেন;—গৃহস্বামী শিকার থেকে ফিরলেন, ঘরের মধ্যে আসবাবের ভিড়, পোষা কুকুর, পোষা ময়না, দেয়ালে ছবি, টেবিলে মাছ মাংস সব্জি পনির ফলমূলের স্তূপ, বোতলে সুরা, শিকার-করা মৃত পাখিরা মেঝেতে প'ড়ে আছে, এক কোণে কোনো তরুণী অর্ধাবৃত স্তন এবং সুগোল বাহু নিয়ে আলিঙ্গন করছে প্রণয়ীকে, গৃহস্বামিনী সারা মুখে অভ্যর্থনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, দরজার বাইরে ঘোড়া, কিছু দূরে কানন, কাননের উপরে আকাশ;—জীবিত ও মৃত, রচিত ও প্রাকৃত, নিসর্গ ও গার্হস্থ্য জীবন, যুগপৎ সব উপস্থিত। এই রকম ছবি পর-পর কয়েকটি দেখার পরে যাবতীয় সম্ভোগে কেমন বিতৃষ্ণা জন্মে, মানুষকে মনে হয় নিতান্তই ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আবদ্ধ জীব। তখন মুক্তির আস্বাদের জন্য আবার রেমব্রাণ্টের কাছে ফিরতে হয়।

চরিত্রসৃষ্টিতে তিনি প্রতিভাবান ব'লে, রেমব্রাণ্টের সঙ্গে শেক্সপীয়রের তুলনা অনেকেই ক'রে থাকেন। কিন্তু শেক্সপীয়রের সর্বমুখিতা তাঁর ছিলো না: তাঁর কল্পনার অতীত ছিলো ক্লিওপ্যাট্রা বা ফলস্টাফ, প্রস্পারো বা লেডি ম্যাকবেথ। য়ান সিক্স-এর প্রতিকৃতি সত্ত্বেও, বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের সুনিপুণ চিত্রণ সত্ত্বেও, রেমব্রাণ্ট সর্বোপরি আর্তির কবি, তাঁকে বলা যায় য়োরোপীয় চিত্রকলার বিষাদের আবিষ্কারক, প্রধানত দুঃখের পথ ধ'রেই মানবাত্মার সন্ধান পেয়েছেন তিনি। আমরা অধিকাংশ মানুষই ট্রাজিক নই—সক্রিয়ভাবে, প্রায় সচেতন-ভাবে, সর্বনাশের দিকে ধাবিত হই না; একটি সামাজিক প্রচ্ছদ বজায় রেখে শুধু মনে-মনে দুঃখ ভোগ করি। কিন্তু কোনো-কোনো নির্জন মুহূর্তে সেই প্রচ্ছদ খ'সে পড়ে, আমাদের মুখমণ্ডলে গাঢ় হয় রেখা, দৃষ্টি যেন কুয়াশায় ডুবে যায়;—যেমন ঘুমন্ত অবস্থায়, তেমনি এই সব মুহূর্তে, অত্যন্ত পরিচিতকেও হঠাৎ দেখলে

হয়তো অচেনা মনে হয়। সেই অন্তরতম মানুষের দ্রষ্টা হলেন রেমব্রাণ্ট-যে-মানুষ বীর নয়, সন্ত নয়, লিয়র অথবা কর্ডেলিয়া নয়, যে-মানুষ সংঘাতের বাইরে, সংগ্রামের বাইরে একান্ত তার নিজের মধ্যে আবিষ্ট, পরবর্তী কালে রিলকের কবিতায় মাঝে-মাঝে আমরা যার দেখা পেয়েছি। মানুষের মৌল নিঃসঙ্গতাকে এমন ভাস্বর ক'রে তুলতে পারেননি আর কোনো চিত্রশিল্পী - সেই যে তাঁর পট-জোড়া অন্ধকারের মধ্যে অল্প একটু সংহত ও তীব্র উদ্ভাস তা যেন আমাদের আত্মিক জীবনের আলেখ্য। যাকে আমরা সৌন্দর্য বলি, নৈতিক অর্থে ভালো মন্দ বলি, যে-সব সামাজিক চিহ্ন ধারণ ক'রে আমরা দৈনন্দিন জীবন কাটাই— তাঁর শিল্পের পক্ষে তা সবই অবান্তর: কিন্তু যা আমাদের সত্তার অন্তঃসার গোপন, নামহীন প্রচ্ছন্ন—হঠাৎ কখনো যার দেখা পেলে আমরা চমকে উঠি - রেমব্রাণ্ট আমাদের সেই অংশকে উন্মোচন করেছেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর নিজের বেদনাকে রূপান্তরিত করেছেন অমৃতে।

> আর কী প্রমাণ আছে? ভগবান, এই তো পরম,
> এ-ই তো নির্ভুল সাক্ষ্য আমাদের দীপ্ত মহিমার,
> এই যে আকুল অশ্রু যুগে-যুগে করে পরিশ্রম
> অবশেষে লীন হ'তে অসীমের সৈকতে তোমার!

'দেশান্তর'